জন্মভূমি।

দশম ভাগ—দশম বর্ষ।

(১৩০৮ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাস
পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

কলিকাতা,—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
"জন্মভূমি কার্য্যালয়" হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা;
৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, 'চৈতন্যপ্রেসে'
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৯ সাল।

[বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।] [ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।

সূচীপত্র।

জন্মভূমি।

দশম ভাগ—দশম বর্ষ।

(১৩০৮ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাস
পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

কলিকাতা,—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
"জন্মভূমি কার্য্যালয়" হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ;

৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, 'চৈতন্যপ্রেসে'
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৯ সাল।

ার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।]

[ডাকমাশুল ।৶০ ছয় আনা।

সূচীপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা ।)

দশম বর্ষ । } ১৩০৮ সাল, শ্রাবণ । { ১ম সংখ্যা ।

সোমপ্রকাশ ।

বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রের ইতিহাস ।

যাহার আবির্ভাবে ও প্রভাবে সংবাদপত্র-মহলে হুলস্থূল পড়ে, তাহাই "সোমপ্রকাশ।" 'সোমের' 'প্রকাশে'—বিধুর আবির্ভাবে—অন্ধকার দূরীভূত হয়, * সেই হেতুই ঐ সাপ্তাহিক সমাচার-পত্র, "সোমপ্রকাশ" আখ্যায় আখ্যাত। ইহার অপর অর্থও, না আছে,—এমন নয়। প্রতি সপ্তাহের 'সোমবারে' যে সংবাদপত্র, প্রচারিত হইত, তাহা "সোমপ্রকাশ" সংজ্ঞায় অভিহিত হইত ও এখনও হয়। "সোমপ্রকাশ"-প্রকাশের পূর্ব্বাবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন ছিল। বাস্তবিক কথার অবতারণা করিলে, উক্ত উক্তির সারবত্তা, স্বীকার করিতেই হইবে। এখানে সংবাদ-পত্রিকার তালিকা তুলিয়া দিয়া, পাঠক মহাশয়গণ, আমরা আপনাদের নিকট আমাদের কথার সারবত্তা, প্রতিপাদিত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। পশ্চাৎ তালিকা উদ্ধৃত হইতেছে। যে যে সংবাদপত্রের নাম, বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইল, সেই-গুলিই, প্রসিদ্ধ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকা।

১ম। "বেঙ্গল্ গেজেট্"।	৫ম। "তিমির-নাশক"।
২য়। **"সমাচার-দর্পণ"**।	৬ষ্ঠ। (১ম) "বঙ্গদূত"।
৩য়। **"সংবাদ-কৌমুদী**।	৭ম। "সুধাকর"।
৪র্থ। **"সমাচার-চন্দ্রিকা**।	৮ম। **"সংবাদ-প্রভাকর"**।

* এদিকে ইন্দু-কিরণ, ভীষণ বা তীক্ষ্ণ নয়—উহা, মৃদু ও স্নিগ্ধ।

৯ম। "সংবাদ-রত্নাকর"।
১০ম। "সমাচার-সভা-রাজেন্দ্র"।
১১শ। "সংবাদ-সার-সংগ্রহ"।
১২শ। "সুধাকর"।
১৩শ। "জ্ঞানান্বেষণ"।
১৪শ। "অনুবাদিকা"।
১৫শ। "সংবাদ-রত্নাবলী"।
১৬শ। "সত্যবাদী"।
১৭শ। "সংবাদ-পূর্ণ-চন্দ্রোদয়"।
১৮শ। "সংবাদ-সুধাসিন্ধু"।
১৯শ। "দিবাকর"।
২০শ। "সংবাদ-সৌদামিনী"।
২১শ। "সংবাদ-গুণাকর"।
২২শ। "সংবাদ-মৃত্যুঞ্জয়"।
২৩শ। (২য়) "বঙ্গদূত"।
২৪শ। (১ম) "অরুণোদয়"।
২৫শ। "সংবাদ-ভাস্কর"।
২৬শ। "সংবাদ-রসরাজ"।
২৭শ। "মুর্শিদাবাদপত্রিকা"।
২৮শ। গবর্ণমেণ্ট "বেঙ্গল্ গেজেট্"।
২৯শ। "সুজন-রঞ্জন"।
৩০শ। "জ্ঞানদীপিকা"।
৩১শ। (১ম) "জ্ঞানোদয়"।
৩২শ। "জ্ঞানসিন্ধুতরঙ্গ"।
৩৩শ। ভারতবন্ধু।
৩৪শ। নিশাকর।
৩৫শ। বেঙ্গল্ স্পেক্টেটর্।
৩৬শ। (১ম) ভৃঙ্গদূত।
৩৭শ। সংবাদ-রাজরাণী।
৩৮শ। সর্ব্ব-রস-রঞ্জিনী।
৩৯শ। জগদুদ্দীপক ভাস্কর।
৪০শ। মার্ত্তণ্ড।
৪১শ। সমাচারজ্ঞানদর্পণ।
৪২শ। পাষণ্ড পীড়ন।
৪৩। নিত্য-ধর্ম্মানু-রঞ্জিকা।
৪৪। ইবেঞ্জিলিষ্ট।
৪৫। দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী।
৪৬। জ্ঞানসঞ্চারিণী।
৪৭। হিন্দুবন্ধু।
৪৮। রঙ্গপুর-দিক্প্রকাশ।
৭৯। সাধুরঞ্জন।
৫০। আক্কেল্ গুড়ুম্।
৫১। কাব্যরত্নাকর।
৫২। দিগ্বিজয়।
৫৩। সুজন-বন্ধু।
৫৪। মনোরঞ্জন।
৫৫। জ্ঞান-রত্নাকর।
৫৬। দিনমণি।
৫৭। রত্নবর্ষণ।
৫৮। সংবাদজ্ঞানদর্পণ।
৫৯। দুর্জ্জন-মানব-দলন।
৬০। রস-সাগর।
৬১। (১ম) জ্ঞানচন্দ্রোদয়।
৬২। (২য়) ভৃঙ্গদূত।
৬৩। (২য়) অরুণোদয়।
৬৪। বারাণসী চন্দ্রোদয়।
৬৫। কৌস্তুভ-কিরণ।
৬৬। সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা।
৬৭। ভৈরব দণ্ড।
৬৮। সুজনবন্ধু।

৬৯। (২য়) জ্ঞানচন্দ্রোদয়।
৭০। সর্ব্ব-শুভকরী।
৭১। ধর্ম্ম-মর্ম্ম-প্রকাশিকা।
৭২। সত্য-প্রদীপ।
৭৩। সুধাংশু।
৭৪। বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়।
৭৫। বর্দ্ধমান-সংবাদ।
৭৬। (২য়) জ্ঞানোদয়।
৭৭। জ্ঞানদর্শন।
৭৮। সংবাদ-লস্কর।
৭৯। বঙ্গবার্ত্তাবহ।
৮০। কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা।
৮১। জ্ঞানারুণোদয়।
৮২। সুধাবর্ষণ।
৮৩। বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা।
৮৪। সংবাদ-চারু-চন্দ্রোদয়।
৮৫। জ্ঞানদর্পণ।
৮৬। "এডুকেশন্ গেজেট্"।
৮৭। সোমপ্রকাশ।

ইংরাজি "১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত এই (১১) একাদশ বৎসরের মধ্যে নানা সংবাদপত্র, প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে অনেক-গুলি জঘন্য। এই সময়ে "আক্কেল্ গুড়ুম্" নামে একখানি সম্বাদ-পত্র, প্রকাশিত হয়। ইহার লিখন-ভঙ্গী দেখিয়া, লোকের 'আক্কেল' যথার্থই 'গুড়ুম' হইত। "সোমপ্রকাশ"-প্রকাশের পূর্ব্বের সম্বাদপত্র-সকল, অশ্লী-লতা-দোষে অত্যন্ত দূষিত ছিল। "প্রভাকর" ও "রসরাজে" যখন ঝগড়া হইত, তখন রাস্তায় ময়লা-পরিষ্কারকারক-জাতীয় লোক ঝগড়া করিয়া পরস্পরের হণ্ডিকাস্থিত ময়লা লইয়া, পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে, যেরূপ জঘন্য দৃশ্য হয়, সেইরূপ জঘন্য দৃশ্য হইত। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বাঙ্গালা সম্বাদপত্রকে প্রথম এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করেন।" (১)

"সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র (২), "সোমপ্রকাশ"-নামক এক সংবাদপত্র-প্রচারের বাসনায় সমুদায় উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নানা কারণ বশতঃ তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারায়, ১৭৮০ শাকের অগ্রহায়ণ (খৃঃ ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর) হইতে ইনি (৩) এই পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া সাপ্তাহিক-রূপে উহা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই অবধি তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত তাঁহা কর্ত্তৃকই ঐ পত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এই পত্রিকার সম্পাদকতা নিবন্ধন অবকাশাভাবেই, বোধ

(১) "বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা", ৬০ পৃষ্ঠা।
(২) "সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য" নামক এক বধির ব্যক্তি।
(৩) পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

হয়, তিনি আর কোন গ্রন্থ-রচনায় হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই। এই কাল মধ্যে কেবল "ভূষণ-সার" নামে একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ব্যাকরণ, এবং "বিশ্বেশ্বর-বিলাপ"-নামক একখানি ক্ষুদ্র পদ্যপুস্তক, তাঁহার লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে।" (৪)

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, "সোমপ্রকাশের" প্রথম ও প্রধান সম্পাদক। জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত "চাঙ্গড়িপোতা" গ্রামই, তাঁহার জন্ম-ভূমি। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়, পশ্চাৎ পাওয়া যাইবে। আপাততঃ এই ক্ষেত্রে এইমাত্র বলিলেই, পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তিনি কলিকাতা-স্থিত রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে সানন্দ অন্তরে চিরকাল অধ্যাপকতা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম রাজপুরুষ, তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানে বিমোহিত হইয়াই, তাঁহাকে উক্ত গুরুত্বমূলক কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। ধন্য বিদ্যাভূষণ! ধন্য তোমার সুশিক্ষা! তোমার চমৎকারময় জ্ঞান, এমনই সুশোভন ছিল বটে!

যৎকালে এতদঞ্চলে "সোমপ্রকাশ" প্রকাশ পায়, তখন উহার সন্দর্ভ-সৌন্দর্য্যে, ভাবপ্রাচুর্য্যে, মতামতের গাম্ভীর্য্যে—উহা, বঙ্গীয়-বার্ত্তাবহ-সমূহের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ভাষার বিশুদ্ধতা, রুচির পবিত্রতা, মন্তব্যের গভীরতা ইত্যাদি ব্যাপারে "সোমপ্রকাশে" লোকের মানস-প্রসূন, বিকাশ পাইয়াছিল। এই ঘটনা, এক দিকে সম্পাদকের সম্পূর্ণ গুণশালিতা ও জ্ঞানবত্তা, মতিমত্তা ও চক্ষুষ্মত্তার অদ্বিতীয়, অখণ্ডনীয় ও অভাবনীয় পরিচয় করিয়া দেয়। অন্য দিকে সম্পাদক মহোদয়ের সুরুচিরও সম্যক্ প্রমাণ-নিদর্শন নিরীক্ষণ করা যায়।

সম্পাদক বিদ্যাভূষণ মহাশয়, সংস্কৃত-ভাষা-রূপ সুন্দর অবিনশ্বর উপবনের রাজীব-রাজী-বৎ সুশোভিত হইতেন। তিনি পরমপূত অথচ সুপরিষ্কৃত, অক্ষয় কিন্তু পুষ্টাবয়ব, সুসজ্জিত ও সুমার্জিত। ইংরাজিতে তদীয় পারদর্শিতার কথা শুনিতে পাইয়াছি (৫)। সংস্কৃত-সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডারে না কি তিনি প্রাপ্তাবসর

(৪) বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ২য় সংস্করণ, ২৮৮ পৃষ্ঠা।

(৫) বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয়ের মুখের কথা, এখানে লিখিয়া দিতেছি। একদা তিনি আমাদিগকে বলিলেন—"আমার নিকট বিদ্যাভূষণ মহাশয়, "মিল্‌টনের" কাব্যাদি পড়িয়াছিলেন"!

ছিলেন—তাই তাঁহার অগাধ বোধশক্তিতে ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বিস্ময় জন্মাইয়া দিত। তিনি কেবলই নিজ-মাতৃস্বরূপিণী ভাষা-জননীর অকপট ও উৎকট, প্রকৃষ্ট ও অত্যুৎকৃষ্ট এক উপাসক ছিলেন। বিজাতীয়া বিমাতার সেবায় কে—কবে তাঁহাকে ব্যাপৃত দেখিয়াছেন, বলিতে পারিবেন কি? এই প্রবন্ধের আনুসঙ্গিক বিষয়ের প্রসঙ্গে এই ব্যাপারের অবতারণায় আমাদের কোন অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্যজনক তাৎপর্য্য আছে। বিদেশের অশেষ ভাষায় না হউক, অন্ততঃ একটী ভাষাতেও অত্যধিক মাত্রায় ব্যুৎপত্তি-সম্পত্তি সঞ্চিত না থাকিলে, কি রাজনীতিক, কি সামাজিক—আর, কি বিদ্যাবিষয়ক—কোন আন্দোলনেই আনন্দোৎফুল্ল প্রাণে প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল প্রসূন-সম গৌরব-ময় সৌরভ-বিস্তারে সামর্থ্যের সম্ভাবনা ঘটে কি? কিন্তু কি বিস্ময়ের বিষয় দেখুন—ইংলণ্ডীয় ভাষার রাজনীতিতে তদীয় জ্ঞানাভাব-সত্ত্বেও সেই রাজনীতির অনুশীলনে তাঁহার কি একটা অভূতপূর্ব্ব সিদ্ধি সংঘটিত হইয়াছিল!

সম্পাদক মহোদয়, কলিকাতার অধিবাসী না হইলেও, কলিকাতার প্রবাসী বটেন। কিন্তু 'সোমপ্রকাশের' জন্মভূমি—কলিকাতা-চাঁপাতলার "বাঙ্গালা-যন্ত্র"। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐ জন্মস্থানেই পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত হইতেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে (১২৬৯ সালে) বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিজ-ভবনে উহার কার্য্যালয় ও যন্ত্রালয়, স্থানান্তরিত হয়। কেননা, তখনই "মাতলার রেল্‌ওয়ে লাইন্" খোলা হইয়াছে। যে "চাঙ্গড়িপোঁতা" বিদ্যাভূষণের জন্মভূমি বলিয়া আসিয়াছি, সেই গ্রামে গমনাগমনের পক্ষে ঐ লাইন্ই সুবিধাজনক। ঐ "রেলওয়ে" কি উপায়ে খোলা হইতে পারে—খোলা হইলে, রেলওয়ে কোম্পানিদেরও কি সুযোগ ঘটিবে, তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলিয়াছিল। এখানে কিয়ৎকাল মুদ্রাযন্ত্র, বেশ সতেজে চলিয়াছিল।

তাহার পর ইং ১৮৭৪ সালে উহাকে "ভবানীপুরে" আনিতে হয়। তাহাতে কার্য্যের অধিকতর সুবিধা-সংঘটনের প্রত্যাশাতেই ঐ ব্যবস্থার অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। এইখানেই ভবানীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি এই ঘটনার কিছু পর হইতে "কাব্যবিশারদ" উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছেন) ও রায়না-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহকারিতায় নিযুক্ত হন। শেষোক্ত ব্যক্তি, মাসিক

২০৲ (বিংশ) মুদ্রা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। পত্রিকার মাসিক মূল্য ··· ১৲ (এক টাকা)। বার্ষিক মূল্য (অগ্রিম) ··· ১০৲ (দশ টাকা)। "সোম-প্রকাশের" মুকুট-ভূষণ শ্লোকটী এই,—

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ,
সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হি হীয়তাং।"

প্রবন্ধের তালিকা দেখুন ঃ—

৩য় ভাগ, ২২ সংখ্যা।—১২৬৮ সাল, ৪ঠা বৈশাখ (১৮৬১ খৃঃ, ১৫ই এপ্রেল)।

১। মফস্বলে সোমপ্রকাশ-প্রেরণের নিয়ম।

২। বিজ্ঞাপন।

৩। নূতন বর্ষ (ঐ সাল, ঐ তাং)—[সম্পাদকীয় প্রবন্ধ]।

৪। লেঙ্ সাহেব ও কানাড়া রেলওয়ে („)।

৫। তূল উৎপাদনের উৎকৃষ্ট প্রস্তাব („)।

৬। প্রাপ্ত (গতবারের শেষ) [বর্দ্ধমানের বর্ণনা]।

৭। বিবিধ সংবাদ ;—(ক) "প্রভাকরের" বর্ষ-বৃদ্ধি-উপলক্ষে সভা ও পুরস্কার দান)। (খ) হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান্ পর্ব্বাহের ছুটীর তালিকা।

৮। সুপ্রিম্ কোর্ট।

৯। ব্যবস্থাপক সভা।

১০। ইউরোপীয় সমাচার।

১১। গবর্ণমেণ্ট-বিজ্ঞাপন।

১২। প্রেরিত পত্র।

---

২৩ সংখ্যা—১২৬৮। ১১ই বৈশাখ (১৮৬১ খৃঃ, ২২শে এপ্রেল)।

১৩। খৃষ্টান হওয়ার দুইটী বিবরণ।

১৪। ভারতবর্ষীয় শাসন-প্রণালী-বিপ্লব-লক্ষণ।

১৫। মফস্বলে ছোট আদালত স্থাপন।

১৬। দরবার।

১৭। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তাঞ্জোরের বিষয়-প্রসঙ্গ।

১৮। স্বাধীনতা লাভ।

১৯। হুগলী হইতে প্রাপ্ত ('দস্যুভয়')।

২০। কমিল্লা („)।

২১। ভ্রমণবৃত্তান্ত (গতবারের শেষ)।

২২। বিবিধ সম্বাদ। (ক) ১৮৫২ খৃঃ, বীটন্ সোসাইটিতে পঠিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। (খ) "হরকরা" হইতে গঙ্গার খাত-খননের বর্ণন।

২৩। ৯ নং দেখ।

২৪। ১০ নং দেখ।

২৫। ১১ নং দেখ।

---

২৪ সংখ্যা।—১২৬৮। ১৮ই বৈশাখ (১৮৬১। ২৯শে এপ্রেল)।

২৬। জেলা আদালতের আমলাদিগের বেতন-নিয়ম।

২৭। ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি ও "হরকরা"-সম্পাদক।

২৮। ইন্‌কম্ টাক্‌স।

২৯। বার্ত্তাশাস্ত্রের বিরোধী ব্যবহার।

৩০। উভয় সৈন্যদলের একীকরণ।

৩১। কাউয়েল্ সাহেব-কৃত বাণিজ্য-সংক্রান্ত উপদেশ।

৩২। বিবিধ সংবাদ—("ঢাকাপ্রকাশ"-পত্রিকা-বিষয়িণী নিন্দায় সোম-প্রকাশের অনভিপ্রায়। (পত্রলেখকের মতামত)। ২৮৩ পৃষ্ঠা হইতে ২৮৫ পৃ—"ঢাকা-প্রকাশের" উদ্ধৃতাংশ।

৩৩। ব্যবস্থাপক সভা।

৩৪। ২৮৬ পৃঃ "এডুকেশন্ গেজেট্" হইতে গৃহীত অংশ।

---

২৫ সংখ্যা।—২৫।১।১২৬৮ (৬।৫।১৮৬১ খৃঃ)।

৩৫। লেঙ্ সাহেব-কৃত আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত বক্তৃতা।

৩৬। অল্প ব্যয়ে রেলওয়ে গাড়ী চালাইবার প্রস্তাব।

৩৭। ইঁহারাই কি ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন ?

৩৮। ডাকঘরের দোষ-সংশোধন-প্রার্থনা।

৩৯। নীলকর কি ভয়ঙ্কর পদার্থ!

৪০। লেঙ্ সাহেবের বক্তৃতা।

৪১। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের লিখিত একখানি পত্র।

---

২৬ সংখ্যা।—১।২।১২৬৮ (১৩।৫।১৮৬১ খৃঃ)।

৪২। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অসচ্ছল কেন ?

৪৩। অযোধ্যায় রেলওয়ে।

৪৪। লেড্ সাহেবের পীড়া।

৪৫। কলিকাতা ট্রেনিঙ্ স্কুলের পরিচালকগণ :—

(ক) রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

(খ) বাবু রমানাথ ঠাকুর।

(গ) „ হীরালাল শীল।

(ঘ) „ কালিদাস দত্ত।

(ঘ) „ রামগোপাল ঘোষ।

(চ) রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর। ইত্যাদি।

৪৬। নীলকর হইতে এদেশের উপকার-লাভ।

৪৭। নীলকরদিগের অত্যাচার শেষ হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ।

৪৮। বিবিধ সংবাদ।

(ক) "বঙ্গহিতার্থিনী" নামে একখানি নূতন পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিবকৃষ্ণ দত্ত। তিনি এ পত্রিকাতে যে সকল বিষয় লিখিবেন—প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদি সেই প্রতিজ্ঞাত বিষয়গুলি, উত্তমরূপে লিখিত হয়, এতদ্দ্বারা বঙ্গদেশবাসীদিগের উপকারের সম্ভাবনা আছে।" ৩০৮ পৃ, ২য় কলমের শেষ ও ৩য় কলমের প্রথমাংশ।

(খ) "বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভারতবর্ষীয় সভায় অবৈতনিক সেক্রেটারি হইয়াছেন। উপযুক্ত পাত্রে ভার, সমর্পিত হইয়াছে।" ৩০৯ পৃঃ ১ম কলম।

৪৯। শ্রীঠাকুরাণী দেবীর প্রেরিতপত্র। ২।৩ বর্ষ পূর্ব্বে গদ্যে ও পদ্যে "প্রভাকরে" তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন।

---

২৭ সংখ্যা।—১২৬৮। ৮ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৬১। ২০শে মে)।

৫০। নীলকরদিগের কি ক্ষোভ !

৫১। পবলিক্ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট।

৫২। সিকিমের যুদ্ধ ও সন্ধি।

৫৩। নৌকায় অধিক লোক তুলিবার নিষেধ।

৫৫। বিবিধ সংবাদে (১) "হরকরা" হইতে "দলিপসিংহের" কথা উদ্ধৃত। (৩২২ পৃ)

ঐ (২) নীলের সংবাদ (৩২৩ পৃ)

[২৮ সংখ্যা।—১২৬৮। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৬১। ২৭শে মে)]

৫৬। বিজ্ঞাপন—এই বর্ষ হইতে—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ("বিবিধার্থ সংগ্রহের" সম্পাদক)।

„ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় („ সহকারী সম্পাদক)।

৫৭। বিধবা-বিবাহ-সমাচার।

৫৮। ঠিকা গাড়ীর ভাড়া নির্ণয় করিবার বিল।

৫৯। সার্ চার্লস্ উড্ ও নীলকর।

৬০। পব্লিক্ ওয়ার্ক।

৬১। উপনিবেশ-প্রেরিত মজুরদের দুঃখ।

৬২। "হরকরা" সম্পাদকের প্রলাপ।

৬৩। আমেরিকার কি দুর্ভাগ্য।

৬৪। বিবিধ সংবাদ ঃ—লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণরের অনুরোধ অনুসারে যে যে স্থান, ইন্‌কম্ টাক্স-বর্জ্জিত, তাহার তালিকা ঃ—

(১) বোয়ালিয়া-দরিদ্রালয়।

(২) ভগলপুরের চিকিৎসালয়।

(৩) মুঙ্গের „

(৪) পূর্ণিয়ার „

(৫) লরেন্স টেষ্টিমোনিয়াল্ ফণ্ড।

(৬) তেজপুর মিশন ফণ্ড।

(৭) কলিকাতার স্ত্রী স্কুল।

(৮) কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়।

(খ) নানা সাহেবের নানাবিধ অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত।

---

২৯ সংখ্যা। ১২৬৮। ২২শে জ্যৈষ্ঠ (১৮৬১। ২রা জুন)।

৬৫। নীলকরদিগের দুরাশা।

৬৬। অ-কৃষ্ট পতিত ভূমি-বিক্রয়।

৬৭। নীলকর ও ‘নীলদর্পণ’।

৬৮। মাতলা-রেলওয়ে।

৬৯। ভারতবর্ষীয় সভা।

৭০। দুর্ভিক্ষে দান ও ভারতবর্ষীয়দিগের প্রার্থনা।

৭১। সিটেন্‌কার্‌ সাহেব ও ‘দীলদর্পণ’।

---

৩০ সংখ্যা। ১২৬৮। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৮৬১। ১০ই জুন)।

৭২। ১৮৬১-৬২ থৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়-বৃত্তান্ত।

৭৩। কর্ণেল্‌ বেয়ার্ড স্মিথের বাণিজ্য ও দুর্ভিক্ষ-বিষয়ক রিপোর্ট।

৭৪। যশোহরের হত্যাকাণ্ড।

৭৫। মরিস্‌ সাহেবের রিপোর্ট।

৭৬। ভারতবর্ষীয় সভা ও গবর্ণর জেনেরল্‌।

৭৭। বিবিধ সংবাদ—“ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে” এক অদ্ভুত তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। সে এই,—“মৃত ব্যক্তিরা, কথন কথন জীবিত ব্যক্তি-দিগকে দর্শন দিয়া থাকেন। রেবারেণ্ড ষ্টবো, ইহার পোষকতা করিয়া-ছেন।”—৩৫৫ পৃষ্ঠা।

৩১ সংখ্যা। ১২৬৮। ৪ঠা আষাঢ় (১৮৬১। ১৭ই জুন)।

৭৮। ইংরাজ-জাতির মহানুভাবতা।

৭৯। ইন্‌কম্‌ টাক্স কি এই প্রকার থাকিবে ?

৮০। লঙ্‌ সাহেবের নামে অভিযোগ—নীলকরদিগের উন্মত্ততা।

৮১। কটকস্থ নদী।

৮২। ডিকিন্‌সন্‌ সাহেব ও নীলকরগণ।

৮৩। “হিন্দুপেট্রিয়ট্‌” সম্পাদকের মৃত্যু।

৮৪। শব্দসার,” “জীব-রহস্য” ও “বিবিধার্থ-সংগ্রহ”-সমালোচনা।

---

৩২ সংখ্যা। ১২৬৮। ১১ই আষাঢ় (১৮৬১। ২৪শে জুন)।

৮৫। খানাকুল-কৃষ্ণনগরস্থ ইংরাজী-সংস্কৃত-বিদ্যালয়।

৮৬। বিধবা-বিবাহ।

৮৭। ইংরাজ-জাতির মহানুভাবতা।

৮৮। পতিতোদ্ধার।

৮৯। মৃত 'পেট্রিয়ট'-সম্পাদকের স্মরণার্থ আমাদিগের কর্ত্তব্য।

৯০। ইনকম্ টাক্স।

৯১। আমেরিকার যুদ্ধ।

৯২। বিবিধ সংবাদ (ক) " 'সজ্জন-রঞ্জন'—সম্পাদক শুনিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী পদে নিয়োজিত হইয়া, গত সোমবার তথায় যাত্রা করিয়াছেন"—(৩২৯ পৃ)।

(খ) প্রেরিত পত্র—(বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের লিখিত "খানাকুল-কৃষ্ণনগরস্থ ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়" † বিষয়ক রিপোর্ট ও বক্তৃতা)।

---

৩৩ সংখ্যা। ১২৬৮। ১৮ই আষাঢ় (১৮৬১। ১লা জুলাই)।

৯৩। "পরাপরাধেন পরস্য দণ্ডঃ।"

৯৪। মাণ্ট্রসর্ সাহেবের রিপোর্ট।

৯৫। লঙ্ সাহেবের আত্মপক্ষ-সমর্থন।

৯৬। স্নানযাত্রা।—এতদ্দেশীয় সমাজের অবস্থা।

(৯৬ক) "পত্রপ্রেরকের প্রতি।"—(৩৯৬ পৃ)

---

৩৪ সংখ্যা। ১২৬৮। ২৫শে আষাঢ় (১৮৬১। ৮ই জুলাই)।

(৯৬খ) সোমপ্রকাশ।—২৫ আষাঢ়। (সম্পাদকীয় বক্তব্য)।

৯৭। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, শেষে কোন্ দিকে যাইবেন ?

৯৮। কনট্রাক্ট বিলের পুনরুজ্জীবন-চেষ্টা।

৯৯। লঘুপাপে গুরুদণ্ড !

১০০। মিউনিসিপল্ কমিসন্।

১০১। শাখা রেলওয়ে।

১০২। আসামে 'চা'র কৃষিকার্য্য।

---

† ১২৬৬ সালে (১৮৫৯ খৃঃ) স্থাপিত।

---

৩৫ সংখ্যা। ১২৬৮। ১লা শ্রাবণ (১৮৬১। ১৫ই জুলাই)

"বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম ও সম্ভ্রম, দেশমধ্যে যে, এতদূর বাড়িয়াছিল, "নীতিসার" বা 'ইতিহাস'রচনা, তাহার হেতু নহে—"সোমপ্রকাশ" পত্রের সম্পাদকতাই, তাহার একমাত্র হেতু। তিনি এই পত্রের উন্নতি-করণ-বাসনায় যে, কত পরিশ্রম করিয়াছিলেন,—ইংরেজি ও সংস্কৃত কত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—ও কত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সংবাদপত্র-মাত্রেই, শ্রেণীবিশেষের পক্ষপাত-দোষে কিঞ্চিৎ দূষিত হইয়া থাকে ; "সোমপ্রকাশ" সেই সাধারণ দোষে একবারে নির্লিপ্ত, এ কথা বলিলে হয় তো পাঠকগণ, আমাদিগকে চাটুকার মনে করিবেন ; এ জন্য এই বলা যাইতেছে যে, "সোমপ্রকাশে" ঐ দোষ বড় অল্প লক্ষিত হইত। যুক্তি-বল অবলম্বন করিয়াই, "সোমপ্রকাশ" বিচার করিত, এবং সেই সকল যুক্তি, সম্পাদকের সরল ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইতে বহির্গত হইত। বিচারের সময় বিবাদ-মগ্ন হইয়া বাচ্যাবাচ্য-বোধ-হীন হইতে "সোমপ্রকাশকে" আমরা কখন দেখি নাই। বিপক্ষে গালি দিলেও, "সোমপ্রকাশ" বিজ্ঞতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার উত্তর দিয়া থাকিত। গাম্ভীর্য্য-রক্ষা "সোমপ্রকাশের" এক প্রধান ও রমণীয় গুণ। সে দিনও বহুবিবাহসম্পর্কে যে বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে "সোম-প্রকাশের" ন্যায় কেহই গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সকল গুণ থাকায় "সোমপ্রকাশ" বাঙ্গালা-সংবাদপত্র-সমূহের শীর্ষস্থানে আরো-

হণ করিয়াছিল। দেশীয় ও ইয়ুরোপীয় সকল সমাজেই "সোমপ্রকাশ" পরম সমাদর পাইয়াছে। দেশীয় সমাজকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিক্ষা প্রদানে "সোমপ্রকাশ" প্রচুররূপে সহায়তা করিয়াছে। অধিক কি, অনেকে, "সোমপ্রকাশ" পাঠ করিয়াই, বিশুদ্ধরূপে বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা করিয়াছেন।" (৬)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

চিত্রা ও গৌরী।

(সমালোচনা।)

"The person who, outside of pure Mathematics, pronounces the word "impossible" is lacking in judgement."—Arago.

"অমিশ্র-অঙ্কশাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও যিনি "অসম্ভব" শব্দ প্রয়োগ করেন, তাঁহার বিবেচনাশক্তি কম।" আরাগো।

সিদ্ধহস্ত উপন্যাস-লেখক শ্রীযুত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় "চিত্রা ও গৌরী" নামে দুইখানি ছোট ছোট ছবি, বঙ্গীয় সমাজকে উপহার দিয়াছেন। হারাণবাবু যে সাহিত্য-জগতের একজন সুনিপুণ চিত্রকর, তাহা আর নূতন করিয়া কাহাকেও বলিতে হইবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী গল্প দ্বারা বর্ত্তমান বাঙ্গালী-সমাজের দুইখানি চিত্র অধুনা তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণে প্রয়াসী হইয়াছেন। নিতান্ত ছোট ছোট হইলেও, গল্প দুইটী অবলম্বন করিয়া আমাদের বিস্তর ভাবিবার—চিন্তিবার আছে।

প্রথমখানি ;—'চিত্রা' ঃ—ইউরোপ ভ্রমণান্তে আমেরিকা যাত্রাকালে দৈবদুর্য্যোগ বশত কয়দিন জিব্রল্টারে অবস্থিতি করিতে হয়। সেই সময় জনৈক পেন্সন-প্রাপ্ত ইংরাজ কর্ণেলের সহিত সপ্তাহাধিককাল একত্রে বাস ঘটে। ইনি ত্রিশ বৎসরকাল ভারতবর্ষে চাকরী করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের অবস্থা বেশ ভালই জানিতেন। একদিবস কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেন,—"আপনি সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিলেন, ভরসা

(৬) "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব"—২৮৯—২৯০ পৃঃ, ২য় সংস্করণ।

করি, তদ্দ্বারা এটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নারীজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপীয়গণ এতদূর উন্নতি লাভে সক্ষম হইয়াছেন ঃ—ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে অবলাগণের শিক্ষা ও শক্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ভারতীয় পুরুষগণ হাজার শিক্ষিত হইলেও, যতদিন তাঁহাদের রমণীগণ জেনানাতে বদ্ধ থাকিয়া অজ্ঞানাবস্থায় দিনযাপন করিবেন, ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। আমরা আপনাদের দেশে গিয়া এ সকল কথা বলিলে, অনেকে রাগ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া গেলেন, তাহা স্বদেশীয়দিগকে বুঝাইয়া বলিলে, তাঁহারা বিরক্ত হইবেন না; সুতরাং তদ্দ্বারা সুফলের সম্ভাবনা ইত্যাদি।” বাস্তবিক হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র পুরুষগণ ষোল আনা শিক্ষিত হইলেও, ফলে বার আনা সুক্তি গিয়া সিকি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অর্দ্ধেকাংশ মহিলা একেবারে অশিক্ষিত থাকিলে সমগ্রের উপর দাঁড়াইল আট আনা; আবার সেই আট আনা বাকী অর্দ্ধেকের সংঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে কেবলমাত্র চারি আনা থাকে। এ হিসাব প্রযুজ্য খাটী শিক্ষার উপর, এবং তাহাও যদি দেশের সকল লোকে পায়; কিন্তু তাহা কোথায়? অধিকাংশ স্থলে ‘চিত্রা’র নায়ক সুরেশবাবুর শিক্ষা-বিভ্রাটই নয়নগোচর হইয়া থাকে। সুরেশবাবুর যে শিক্ষা,—মরি! মরি! উহার গুণের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। হারাণবাবুর ছবিখানি যদি ঠিক হয়, দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ওরূপ শিক্ষা শীঘ্র শীঘ্র বন্ধ না করিলে অচিরে সমাজের ভিটাতে ঘুঘু চরিবে। এইখানেই বলিতে হয় যে, চিত্রার গুণরাশির সঙ্গে সঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ লেখাপড়ার জোর থাকিত, তাহা হইলে এরূপ বিষময় পরিণাম হইত না। দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজের নেতৃবর্গকে কোন বিষয়ে কিছু বলা ঝকমারী; তাঁহারা সকল প্রকার ত্রুটির দিকে চক্ষু বুজিয়া আরামের সহিত ভবলীলা সাঙ্গ করিতে ভালবাসেন; হাত পা নাড়িতে বড় রুচি দেখা যায় না।

চিত্রার রূপগুণ থাকিলে কি হইবে? প্রথম নম্বরেই বেচারীর বিষম গলদ্—নামটী নিতান্ত সেকেলে। জনৈক হাইকোর্টের যুবক উকীল, একদিন কোন যুবতীর নাম উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,—“কি ভয়ানক! উহার নামটা শুনিয়াছেন? ‘মোক্ষদা’—শুনিবামাত্র অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া আইসে। উহার বাপ মা সখ্ করিয়া নাম রাখিয়াছিল কিনা,—

'মোক্ষদা'—যমের অরুচি! মানুষের অরুচি !!" পাঠক আর কি চা'ন! ইনি সুরেশবাবুর স্কন্ধে যান। কতক সৌভাগ্য যে, সৌখীন সুরেশচন্দ্র "চিত্রা" নামটা লইয়া গোড়াতেই একটা কাণ্ড করিয়া বসেন নাই! হারাণবাবু বলিয়াছেন যে, "চিত্রা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, চিত্রার পিতামাতা আদর করিয়া কন্যার ঐ নাম রাখিয়াছিলেন।" বুক ঠুকিয়া বলিতে পারা যায়, এটা নেহাত সেকেলে ব্যবস্থা। যে আইন অনুসারে এইরূপ নামকরণ প্রচলিত ছিল, এখন সে আইন রদ্ হইয়াছে। হাল আইন অনুযায়ী কি প্রকার নাম রাখা কর্ত্তব্য, তাহা চিত্রার পিতামাতার জানা উচিত ছিল। এস্থলে আমাদের আধুনিক নাম-মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে, পাঠক নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। সেকালের লোক জানিত যে, মৃত্যুকালে বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত এক-মাত্র প্রিয়পুত্রের "নারায়ণ" নাম বারম্বার উচ্চারণ করা হেতু, অজামীল বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন; ভগবানের নাম উচ্চারণের এত ফল। তদনুসারে সকলেই বাছিয়া বাছিয়া দেব দেবীর নামে সন্তান সন্ততির নামকরণ করিতেন; পূর্ব্বগত সাধু মহাত্মা বীরপুরুষগণের নামও ব্যবহৃত হইত। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশ সমূহে এখনও পর্য্যন্ত উক্ত প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কেবলমাত্র কোমল-প্রকৃতি ফুল-বাবু বাঙ্গালীগণ দেব-দেবী ও বীর বা বীরপ্রসবিনীর নাম গ্রহণ করিতে নিতান্ত নারাজ; তবে যদি সৌখীন গোছের হয়, বা যোড়া-তাড়া দিয়া সৌখিন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে আপত্তি দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান সময়ের ফেশন-প্রবাহ অনুযায়ী দেখা যাইতেছে যে, পুরুষের পক্ষে একটা "ঈশ" "ইন্দ্র" বা "কৃষ্ণ" যোগ করা চাই, আর অবলা-গণের জন্য শেষে একটা "বালা" "শশি" বা "লতা" নিতান্তই আবশ্যক। নামের অর্থ কিছু হউক আর নাই হউক, উক্তরূপ গঠন হওয়াই চাই; যথা—স্বর্ণেন্দ্রনাথ, বর্ষাকৃষ্ণ,বরফেশ-চন্দ্র, গ্যাস্‌লাইট বালা, রৌদ্রশশি, শেমিজলতা ইত্যাদি। উপরোক্ত কয়টা শব্দ যুক্ত হইলেই দেখিতে ভাল, শুনিতে ভাল, বলিতে ভাল:—জনার্দ্দন, যুধিষ্ঠির, জানকী, কাত্যায়নী প্রভৃতি আর বিকায় না। যেমন সর্ব্বত্র, তেমনি এ স্থলেও কেবল ফিন্-ফিনে সখ। গিল্টীর উপর আমাদের সমাজ চলিতেছে, চারিদিকেই অসার ফাঁপা জিনিসের জামাই-আদর; আসল নিরেট সামগ্রীর প্রতি কাহারও নজর নাই।

"চিত্রা" গল্পটী দ্বারা হারাণবাবু দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষিত যুবকের শিক্ষা-বিভ্রাট, বুদ্ধিবিভ্রাট এবং বুদ্ধিবিভ্রাটে চরিত্রবিভ্রাট ঘটিয়া কি ভয়ানক অনর্থপাত হইতেছে। সুরেশচন্দ্রের চরিত্র কলুষিত হওয়ায় তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী দারুণ মনোদুঃখে রোগাক্রান্ত হইয়া তনুত্যাগ করেন। শেষটা স্বামীর সহিত চিত্রার দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল।

গল্পের শেষভাগে একটী সাধারণভাবে অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ। "সাধারণ ভাবে" অলৌকিক বলা হইল এই জন্য যে, দৈবশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইলে সামান্য মানুষের দ্বারা যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাকে লোকে "অলৌকিক" "অমানুষিক" "অপ্রাকৃতিক" বলিলেও বাস্তবিক সেগুলি প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ নহে। * ত্রিভুবনে যতপ্রকার নিয়ম বিধতা কর্তৃক প্রচারিত, তাহার লক্ষাংশের একাংশও আমরা আজ পর্য্যন্ত জানিতে সক্ষম হই নাই। অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য প্রভৃতি লোক লোকান্তরে কোথায় কতকাণ্ড—কোন্ নিয়মে কোন্ প্রণালীতে ঘটিতেছে, আমরা কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। সুতরাং হারাণবাবুর লিখিত ঘটনাটী সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কিছু বলিবার আমাদের আদৌ অধিকার নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাপ্রকারের অদ্ভুত ঘটনাবলী সম্বন্ধীয় অনেক গল্প আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। ইদানীং অর্থাৎ ইংরাজাধিকারে পাশ্চাত্য শিক্ষার জড়বাদের স্রোতে ভাসমান হওয়া অবধি, আমরা ঐ শ্রেণীর বৃত্তান্তগুলিকে নেহাত পিতামহীর কাল্পনিক উপকথা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছি। পরন্তু বিশ পঁচিশ বৎসর হইতে

---

* প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের ভদ্রেতর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মরা-মানুষ ফিরিয়া আসিবার একটা হুজুগ উঠিয়াছিল। অবশ্য সে সময় সে কথা লইয়া অনেক হাস্যকৌতুক হইয়া যায়। পরন্তু আজকাল পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতগণ মানবের পঞ্চকোষের ব্যাখ্যা দ্বারা যেরূপ বুঝাইতেছেন, তাহাতে মৃত্যু শব্দই নিরর্থক হইয়া যাইতেছে। মৃত ও জীবিত ব্যক্তিগণ দ্বারা জড়দেহ ব্যতীত যে সকল অতি কঠিন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, যেরূপ তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশ, তাহা ভাবিলে জ্ঞানহারা হইতে হয়।

ইয়ুরোপ আমেরিকার কঠোর জড়-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত মানুষের অন্তর্নিহিত চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে গবেষণা করত স্বীকার করিতেছেন যে, উহা দ্বারা না হইতে পারে এমন কাণ্ড নাই।

দ্বিতীয়খানি, 'গৌরী'!—এ গল্পটীতে প্রতিমাপূজার মাহাত্ম্য প্রচারিত হওয়ায়—কেহ ভাল, কেহ মন্দ বলিবেন। অবশ্য হিন্দু-ভক্তদিগের পক্ষে অতীব মধুর উপদেশপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এই পুস্তিকাতেও অদ্ভুত দৈব ঘটনা বর্ণিত। একমাত্র প্রিয়তমা কন্যার শোকে কোন ব্রাহ্মণের মনে শ্মশান বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়; পরে গুরু, সাক্ষাৎকার হইয়া দুর্গোৎসবের জন্য আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে দুর্গার প্রতিমাপূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। পূজাবসানে "প্রতিমার পদতলে আছড়াইয়া পড়িয়া গুরুর পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কৈবল্যধামে গমন করিলেন।" হারাণবাবুর পুঁথিও ফুরাইল। উপন্যাসটী নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও উহা হারাণবাবুর ধর্ম্মভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। মা জগদম্বার চরণে যে তাঁহার অচলা ভক্তি, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। হারাণবাবু বর্ণ-চোরা সুপক্ক আম্র। যদি আমাদের গল্পলেখক ভ্রাতৃগণ হারাণবাবুর মত ধর্ম্মপ্রাণ হন, তাঁহাদের লেখনীদ্বারা অশেষ কল্যাণ সম্ভাবনা।

হারাণবাবুর নূতন ধরণের সুমধুর ভক্তিপ্রচার আমাদের শিক্ষাপ্রদ। ভবভয়-হারিণী জগন্মাতা হারাণবাবুকে আরও কোলের দিকে টানুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

শৈলের স্বপ্ন।

(১)

শৈল,—রায় মহাশয়ের একমাত্র দুহিতা বলিয়া বাড়ী শুদ্ধ সকল লোক শৈলকে তিলে হারায়। রাইপুরের হেমচন্দ্র রায় মহাশয় একজন তালুক-দার মস্ত বড় লোক; নগদ টাকাকড়িও মন্দ ছিল না। তাঁহার পুত্র পাঁচটি। তাহার পরে এই কন্যা শৈল। একে শেষ সন্তান, তাহাতে ঐ এক কন্যামাত্র, তাই রায় মহাশয় শৈলকে পুত্রগণের অপেক্ষাও খুব বেশী

আদর করিতেন। ভাইদের ত কথাই নাই, একমাত্র ভগিনীকে তাহারা যে কোথায় রাখিবে, কিরূপে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-ধারায় তাহাকে অভিষিক্ত করিবে, তাহা যেন ভাবিয়া পাইত না। বাটীর অন্যান্য পরিজনবর্গ, দাসদাসী সকলের নিকটই শৈল আদরিণী। পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শৈলকে বড় একটা মাটিতে হাঁটিতে দেখা যায় নাই। একজনের কোল হইতে অন্যের কোলেই তাহার গতায়াত সম্পন্ন হইত। কেহ একবার কোলে লইলে অন্যের দ্বারা প্রার্থিত না হইলে আর তাহাকে কোল থেকে নামাইত না। শৈলের বাল্যমাধুরীও বড় সুন্দর ছিল। তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ কুন্তল-দাম, তাহার সুন্দর ভাসা ভাসা চোক দুটি, আরক্তিম গণ্ডদ্বয়, গোলাপপুট সন্নিভ কোমল ওষ্ঠাধর, এবং সুগঠিত অঙ্গ-সৌষ্ঠব সকলের নিকটই তাহাকে একটি দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিল—যে দেখিত, সেই মুগ্ধ হইত।

ভ্রাতৃগণের মধ্যে ৩ জন চাকরী করিত, ২ জন পড়াশুনা করিত, সকলেই বিদেশ হইতে আসিবার সময় শৈলের জন্য নানারূপ পোষাক, জুতা, জামা, এসেন্স, দন্তের তরল আল্‌তা লইয়া আসিত, এবং প্রায় প্রত্যহ তাহাকে নবীন সাজে সাজাইয়া তাহার বাল্য মাধুরীর সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়া দিত, এবং শত শত স্নেহ-চুম্বনে শৈলের আরক্তিম গণ্ডদেশ আরও সুরঞ্জিত করিয়া তুলিত। যখন শৈল সুন্দর সবুজের আভাযুক্ত উৎকৃষ্ট সাটিনের গাউনে সজ্জিতা হইয়া, গোলাপী আতর, এবং সুবাসিত এসেন্স গন্ধমণ্ডিতা হইয়া ভ্রমণ করিত, তখন যেন তাহাকে নন্দন-কাননভ্রষ্ট একটি পারিজাত-কুসুম বলিয়া ভ্রম হইত। রায় মহাশয় আদর করিয়া শৈলকে অপ্সরা বলিয়া ডাকিতেন। শৈলবালা এইরূপ অত্যধিক আদর, স্নেহ, এবং বিলাসিতার মধ্যে স্বীয় জীবনের প্রায় দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিল। বলাবাহুল্য এই বয়স পর্য্যন্ত শৈল কোনরূপ কাজকর্ম্মই শিক্ষা করে নাই, কেহ তাহাকে শিখাইতেও চেষ্টা করেন নাই। ভ্রাতৃগণের চেষ্টায় সে কিছু লেখাপড়া শিখিতেছে বটে, কিন্তু অন্য কোন কাজকর্ম্ম, কিছুই সে জানে না। বাল্যকাল হইতে কেবল বাবুগিরীতে অভ্যস্ত হওয়ায় সে এখনও কেশ, বেশ, শয্যা পারিপাট্য, পরিচ্ছদ বৈচিত্র্য এই সব লইয়াই থাকে। এবং নানারূপ পরিচ্ছদ, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদির উপর সে স্বভাবতই কিছু বেশী অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আর তার জন্য সে অপব্যয়ও বড় কম

করে না। কোথায় একটু কি অপরিষ্কার দেখিল, অমনি একশিশি এসেন্স সেখানে ঢালিয়া দিল; বিছানাতে পর্য্যন্ত সে গন্ধদ্রব্য ছড়ায়, দেহে ও পরিচ্ছদাদিতে তো ব্যবহার করেই। এখন যদি কেহ কিছু সে জন্য বলে, তবে তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করে না। তবে শৈলর একটা গুণ ছিল যে, তাহার প্রকৃতিটা উদ্ধত ছিল না; কেহ কিছু বলিলে চুপ করিয়া থাকিত। কাহাকেও গালাগালি দেওয়া বা উচ্চ কথা বলা তার অভ্যাস ছিল না। কেহ তাহাকে কিছু বলিলে অভিমানিনীর চক্ষুদুটি জলে পূর্ণ হইয়া আসিত, কোমল পল্লবতুল্য ওষ্ঠাধর একটু কম্পমান হইয়া তাহার অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া দিত; হয় ত তথা হইতে চলিয়া যাইত, নয় ত ঘাড় হেঁট করিয়া অশ্রুজলে ধরণীবক্ষ সিক্ত করিত। এত আদরেও যে শৈলর উদ্ধত প্রকৃতি হইতে পায় নাই, সে কেবল তাহার মাতৃ-দেবীর গুণে। শৈলের মা অশেষ সৎগুণশালিনী রমণী। তিনি শৈলকে আদর করিতেন বটে, কিন্তু অবিনয় বা অন্যায় দেখিলে তাঁহার নিকট মার্জ্জনা ছিল না। গৃহিণীর উপযুক্ত সমস্ত গুণই তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, তিনি শৈলকে অত বিলাসিনী করার সপক্ষে ছিলেন না। অবশ্য সন্তানকে সুসজ্জিত করিয়া তাহার রূপমাধুরী বৃদ্ধি করিতে কোন্ মাতা না যত্নশীলা। কিন্তু তথাপি তিনি পুত্রগণকে অনেকবার নিষেধ করিয়াছেন যে, অতটা বিলাসের লোভ দেখান কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে ফল ভাল হইবে না। শৈলকে তিনি অনেক সময় বুঝাইয়াছেন, ছেলেবেলা হইতে সংসারের কাজকর্ম্ম শিক্ষা করা যে কত আবশ্যক, তাহা অনেক বলিয়াছেন, কিন্তু শৈল তাহা বড় শুনে নাই,—বিশেষতঃ রায় মহাশয় তাহার সম্পূর্ণ বিপক্ষে থাকায় এবং শৈল প্রায়ই বহির্ব্বাটীতে থাকায় সেটা সুসিদ্ধ করিতে গৃহিণী সুবিধা পান নাই। কিন্তু তথাপি স্বভাবের কোমলত্ব রাখিতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার ফলেই শৈল কোমল প্রকৃতিবিশিষ্টা হইয়াছে। তবে এমন আদরের মেয়ের অভিমান না থাকিয়া যায় না। শৈলরও ছিল, তাহাতে বড় বেশী ক্ষতি ছিল না। আর এক—মাতা ছাড়া অন্য কেহই প্রায় কখন তাহাকে কটুকথা বলিত না। কিন্তু তাহার বিলাসিতা এবং অপব্যয়ের মাত্রা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল; আর তাহার ফলে সে অত্যন্ত অলসপ্রকৃতি এবং গল্পপরায়ণা হইয়াছিল। লোকে নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না, সুতরাং

শৈল পারিত না, সে সমবয়স্কাদিগকে সংগ্রহ করিয়া চেয়ারে বসিয়া গল্প গুজব, আমোদ আহ্লাদ করিত; তাহারা সংসারের কাজকর্ম্মের আপত্তি দেখাইলে তাহা উড়াইয়া দিত। শৈলের মা দেখিলেন, শৈলর পরিণাম বস্তুতই ভয়প্রদ।

তিনি তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন, তাহাতে শৈলর কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। তিনি রায় মহাশয়কে একথা বলিলেন, তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, "আরে, ওসব আপনিই সেরে যাবে। তুমি ভেবো না।"

গৃহিণী বলিলেন, "আর সারবে কবে! এইতো বারো বছর যায়, বিয়ের বয়স হয়ে এল; আমার এক মেয়ে কিন্তু ওর থেকেই আমার মুখে চুণ কালী পড়বে। আগে থেকেই বলেছিলাম, মেয়েছেলেকে অত বিলাসিতা দিতে নাই, আর আলসে কর্ত্তে নাই, তাতো শুনলে না, এখন আমার মুখেই সকলে নুড়ো জেলে দেবে। শ্বশুরবাড়ীতে নিন্দে হবে, ছি! ছি! আমি পরের মেয়ে মানুষ করলাম, নিজের মেয়ে ভাল করতে পারলাম না।" গৃহিণীর চক্ষে জল দেখা দিল। কর্ত্তা বলিলেন, "আমি বলছি, দেখো ও তোমার মুখ উজ্জ্বল করবে।"

গিন্নি কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "সে এখন ভগবানের ইচ্ছা, আর তোমার আশীর্ব্বাদ। মা দুর্গা করুন, যেন তাই হয়। যেটের কোলে বাছা আমার বারো বছর পার হয়ে এই তেরয় পড়লো, আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে গায়েও একটু ভরা ভরা আছে, আর বিয়ে না দিয়ে রাখা ভাল দেখায় না।"

কর্ত্তা একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "তা বটে, আমি দেখ্‌ছি! একটি ছেলে আছে, মন্দ নয়, এবার এল-এ পাশ দেবে, সংসারের অবস্থা মধ্যম রকম, ছেলেটির স্বভাব বেশ ভাল। সব খোঁজই নিয়েছি। তার বাপও স্বীকার আছে, এখন ছেলেটি পরীক্ষা দিলেই দিন ঠিক করা যাবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তবে সেইটাই একটু মন দিয়ে দেখো।" কর্ত্তা বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এই কথাবার্ত্তার ৪ মাস পরে ঐ ছেলে এল-এ পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হরকুমার বসুর পুত্র সুশীলকুমারের সহিত শৈলের শুভবিবাহ জ্যৈষ্ঠ মাসের কোন শুভদিনে বিশেষ ঘটা করিয়া নির্ব্বাহ হইয়া গেল। ইহাদের বাটী কুসুমপুর; রাইপুর হইতে প্রায় এক দিনের পথ।

(২)

এক বৎসর হইল শৈলের বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পরই একবার ২।৪ দিনের জন্য শৈল শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল, তথা হইতে আসিয়া, সে যে মত প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে গৃহিণী বড়ই ভীতা হইয়াছেন। শৈল বলিয়াছে, "ওখানে আর যাব না—মলেও যাব না; কি সব ছোট ছোট ঘর, স্যাঁতানে মেজে, উঠানে মাটি, সান্ বাঁধা নয়, পা দিলে ভিজে ভিজে লাগে; জুতো পায়ে দেওয়া দেখ্‌লে নাকি তারা রাগে; আর বাড়ীর সেই গিন্নিটা (শৈলের শাশুড়ী) ভারি নোংরা, গোলা-হাঁড়ি নিয়ে ঘর দোর লেপে বেড়ায়; এখানে কালি, ওখানে ঝুল, ময়লা কাপড় চোপড়, একটু এসেন্স নাই, কিছু নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি। শৈলের চক্ষে কুসুমপুরের সকল জিনিসই খারাপ, এমন কি অচেতন পদার্থগুলি পর্য্যন্ত তাহার বিষ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। গৃহিণী শৈলকে নানারূপ বুঝাইয়াছেন, কিন্তু তেমন কোন ফল হয় নাই।

জামাতা সুশীলকুমার নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। বাস্তবিকই তাহার স্বভাব বড় পবিত্র, নম্র এবং ধীর! চেহারাটিও বেশ সুন্দর। এজন্য সকলেই তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। সে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়িতেছে। পূজার সময় একবার আসিয়াছিল, এবং ৫।৭ দিন ছিল; প্রথম স্বামীসম্ভাষণে শৈল অপ্রীতা হয় নাই। সে প্রথম দিন বড় লজ্জা করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সুশীলকুমারের সস্নেহ আদরে ও ব্যবহারে সে একটু কথাবার্ত্তা বলিয়াছে।

সুশীলকুমার চলিয়া গেলে, মধ্যে মধ্যে শৈলর তাহার কথা মনে হইত, কোন দিন কিরূপ আদর করিয়াছিল, কি কি কথা বলিয়াছিল, শৈল কোন দিন কেমন লজ্জা করিয়াছিল, সব মনে আসিত; আর মনটা যেন কেমন হইত। মোট কথা, সুশীলের উপর শৈলর একটা স্নেহ বসিতে ছিল।

কিন্তু সুশীলকুমারও একটু পরোক্ষে শৈলর বাবুগিরীর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিল, ইহা মনে হইলে তার বড় রাগ ও অভিমান হইত। সুশীল মধ্যে মধ্যে পত্রাদি দিতেন বটে কিন্তু শৈল কোন উত্তর দিত না, তার ভারি লজ্জা করিত; ছি! লোকে কি বলিবে, অথচ অল্পে অল্পে সুশীলের প্রতি তাহার হৃদয় অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছিল; তাহা কিন্তু তখনও সে বুঝিতে পারে নাই।

বৈশাখ মাসের শেষে সুশীল আর একবার ওখানে আসিলেন এবং সেবার প্রায় ১০।১২ দিন সেখানে থাকিয়া গেলেন। তিনি প্রকাশ করিয়া গেলেন, শীঘ্রই শৈলকে কুসুমপুর যাইতে হইবে।

সুশীল শৈলকেও তাহা বলিয়াছিলেন, শৈলর তাহাতে খুব আপত্তি। সুশীল রাইপুরে আসিলেই ত পারে? শৈলর কেবল সুশীলকে দেখিতে পাইলেই হইল।

সুশীল শৈলকে অনেক উপদেশ দিলেন; তাহাদের সংসারের অবস্থা তেমন নহে সুতরাং বাবুগিরী করিলে চলিবে না, তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষার জন্যই তাহার বিবাহ স্বীকার করা, কোন অবস্থাতেই স্ত্রীলোকের বাবুগিরী ভাল নহে, অলসতায় লক্ষ্মী ছাড়ে ইত্যাদি অনেক প্রকার সদুপদেশ সুশীলকুমার বিশেষ স্নেহ ও আদরের সহিত শৈলকে দিলেন; শৈলর সে সব পছন্দ হইতেছিল না। কারণ সে সব কথা তাহার বিরোধী, তাই শৈল একটু বিরক্তই হইতেছিল। সুশীল তাহা বুঝিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না।

শৈল সুশীলের আদরে, স্নেহে, আবার সে সব ভুলিয়া গেল; এইরূপে কয়েকদিন শৈলর আনন্দেই কাটিল।

যে দিন সুশীল যাইবে, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে একটা ঘটনায় সুশীলকে শৈল বড় কষ্ট দিল। আগামী কল্য সুশীল চলিয়া যাইবেন বলিয়া শৈলর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন, এবং আবার ঐ সব বিলাসিতা ও বাবুগিরীর কথা শৈলর মনে করাইয়া দিলেন, শৈল আবার দুঃখিত হইল, মনে মনে বিরক্ত হইল। সে নীরবে চুপ করিয়া শুনিল।

সুশীলকুমার হঠাৎ বলিলেন, "শৈল, আমার জলপিপাসা পেয়েছে, এক গ্লাস জল নিয়ে আসতে পার?"

শৈল তখন একটু তন্দ্রা-বিষ্টা, কথাটা বেশ কাণে গেল, কিন্তু একেই অলস প্রকৃতি, তাহাতে বেশ শুইয়াছে, আবার এখন কে উঠ্‌তে যায়—শৈল উঠিল না। সুশীল আবার ডাকিলেন, গায়ে ধাক্কা দিলেন, শৈলর তন্দ্রা ভাঙ্গিল, রাগ হইল—সে রাগের বশে হঠাৎ জবাব দিল, "আমি আর উঠ্‌তে পারি না, ওঘরে জল আছে; খেয়ে এলেই হয়।" সুশীল বলিলেন, "কোথায় আছে, আমি খুজ্‌তে যাব, তুমিই বা উঠে দিলে, এতে আর কোন কষ্ট নাই!" শৈল বলিল "তুমিই তবে যাও না কেন, আমি আর

পাচ্ছি না, বড় গা কেমন কচ্ছে।" শৈল পাশ ফিরিয়া শুইল। সুশীল আর কোন কথা বলিলেন না, নিজেই জল গড়াইয়া পান করিলেন এবং আলো জ্বালিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে একখানি কাগজ লইয়া তাহাতে কি খানিক লিখিলেন, এবং খামে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দীপ নির্ব্বাণ পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। ঘুমাইলেন কিনা তিনিই জানেন, তবে ভোর অন্ধকার থাকিতেই তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন; শৈলকে আর ডাকিলেন না, জাগাইলেন না। অতি সত্বরই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সুশীলকুমার শ্বশুর প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাইপুর ত্যাগ করিলেন। যাওয়ার কালে শয়নগৃহে গিয়া নিজের ব্যাগ্‌টি বাহির করিয়া আনিলেন; শৈল তখনও নিদ্রিতা, সুশীল একখানি পত্র শৈলর আয়নার মধ্যে চুপে চুপে রাখিয়া গেলেন, তিনি জানিতেন, শৈল বেলায় উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া আরসী দ্বারা মুখ দেখিয়া থাকে।

সুশীল শৈলর নিদ্রাচ্ছন্ন সুন্দর মুখখানির দিকে একবার তাকাইলেন মাত্র—অমনি মনটা কেমন হইল! তাড়া তাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

শাশুড়ী বিশেষ লক্ষ্য করিলেন, সুশীলের মুখখানা যেন কিছু মলিন, কিন্তু সুশীল তাহা উড়াইয়া দিলেন, এবং হাস্যমুখে প্রণাম করিয়া রওনা হইলেন।

গৃহিণীর মন কিন্তু ভাল লাগিল না, ভাবিলেন, কোন কিছু হইয়া থাকিবে, বিশেষতঃ কন্যার ভাব গতিকে তিনি সর্ব্বদা সঙ্কিত থাকিতেন। যাহা হউক তখন আর কিছু না তদন্ত করিয়া তিনি গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

(৩)

শৈল সূর্য্যোদয়ের একটু পরেই জাগিল, পাশ ফিরিয়া দেখিল, সুশীল কুমার পাশে নাই। তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া বসিল এবং যেখানে সুশীল কুমারের ব্যাগ্, ছাতা, লাঠি সব ছিল, সে দিকে তাকাইয়া দেখিল—তাহাও কিছু নাই। শৈলর মনটা দমিয়া গেল, সে বুঝিল, সুশীলকুমার তাহাকে না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছেন—হঠাৎ তাহার মুখখানি ভারি হইয়া পড়িল, অভিমানিনীর চোকদুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল—বাস্তবিক স্বামী তাহাকে না বলিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই, তাই বড় অভিমান হইল। মনটা যেন কেমন হইয়া পড়িল—এত স্নেহ, এত আদর, আর না বলিয়াই চলিয়া গেলেন? না হয় শৈল একটু

বেলা পর্য্যন্তই ঘুমাইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া কি ডাকিতে নাই? আবার কতদিনে দেখা হইবে—যাওয়া কালে সে একবার দেখিয়াও লইতে পারিল না—বাস্তবিক এইরূপ অপ্রত্যাশিত অনাদরে তার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল; আজ শৈল বেশ বুঝিতে পারিল, সুশীলকুমারের সদয়, সস্নেহ ব্যবহারে সে তাহার প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছে। নতুবা এমন কষ্ট হয় কেন! শৈলর চক্ষে তাহা না হইলে জল কেন? শৈল বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাহার রাত্রির কথা মনে পড়িল! শৈলর গাটা চমকিয়া উঠিল! কাল শৈল তো বড় অবাধ্যতা করিয়াছে, তুচ্ছ একটু জল দিতে আপত্তি করিয়া শৈল স্বামীকে বড় কষ্ট দিয়াছে। পিপাসার জল—শত্রুও যদি চায়, তাহাকেও দেওয়া কর্ত্তব্য—আর ভাল স্বামী—যিনি তাহাকে এত ভাল বাসেন, এমন আদর করেন,—তিনি একটু জল চাহিয়াছিলেন, তুচ্ছ আলস্যের খাতিরে শৈল তাহা দিতে আপত্তি করিয়াছে! সেই জন্যই স্বামী মনে কষ্ট পাইয়া আর না ডাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শৈল যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তার মনটা আকুল হইতে লাগিল। স্বামী দেবতাতুল্য, তাঁকে অবহেলা, ইত্যাদি অত শত কথা বালিকার মনে আসিল না, কেবল তাঁর মনে কষ্ট দিয়াছে এই ভাবিতেই তার চোকে জল আসিতে লাগিল, আর নিজের উপর রাগ হইতে লাগিল। স্বামীর দোষ কি? শৈল তাঁর উপর বৃথা অভিমান করিয়াছে, তারই তো দোষ! স্বামী বাবুগিরীর কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া বিরক্ত হয়েছিলাম—তাই ছি! ছি! শৈল এখন আর সে কথা মনে করিতে পারে না, ঠোঁটটা কামড়াইয়া লাল করিয়া ফেলিল, আর যেন কেমন একটা অশান্তি বোধ করিতে লাগিল। যতই ভাবিতে লাগিল, ততই অশান্তি বাড়িতে লাগিল, শৈল নিজের গালে নিজেই চাপড়াইতে লাগিল।

সে কতক্ষণ এই ভাবে থাকিল, তাহা বলা যায় না; ইতিমধ্যে মা ডাকিলেন, "শৈল, আজ কি উঠ্‌বি না?" শৈল তাড়াতাড়ি মুখ চোক মুছিয়া বাহিরে গেল, মা কন্যার ভার মুখ দেখিলেন, কিছু বলিলেন না।

শৈল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আবার ঘরে আসিল, আয়নার মুখ দেখিতে গেল না, চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে তার মনে হইল, তার চোক মুখ বুঝি বড় লাল হয়েছে। তাই দেখিবার জন্য আয়নাখানি পড়িল, দেখিল, তার মধ্যে একখানি পত্র—সুশীলের হাতের লেখা, কম্পিত

হস্তে শৈল পত্রখানি লইল, বুকের মধ্যে দুর্‌দুর্‌ করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—যেন কি বজ্রপাতই পত্রে আছে—পত্রখানা খুলিয়া খাটে বসিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল—পারিল না, শুইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিল ঃ—

পত্র।

"শৈল, ভাবিয়াছিলাম, তোমার চেহারা যেমন, গুণেও তেমনি হইবে, কিন্তু আমি দেখিলাম, সে আশা বৃথা। আমি তোমাকে স্নেহ ভালবাসা দিতে ক্রুটী করি নাই, কিন্তু আমার প্রতি তোমার একটুও স্নেহ মমতা নাই, তাহা আজ রাত্রিতে বেশ বুঝিলাম। আমরা গরীব, আমার পিতা মাতা গরীব, তোমাদের বাড়ীর দাস দাসীদের মত ; তোমার তাঁহাদের প্রতি নোংরা বলিয়া বিতৃষ্ণা, আমার বাড়ীর উপরও বিতৃষ্ণা ; তোমার মত বাবু স্ত্রী লইয়া আমার ন্যায় গরীবের সুখ হওয়া অসম্ভব। যে স্ত্রী এক গ্লাস জল দিতে পর্য্যন্ত আপত্তি করে, তাহার স্নেহ কতদূর, তাহা বেশ বুঝাই যাইতে পারে। আর আমি যদি তোমার সহিত খারাপ ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলেও বা কথা ছিল। যাহা হউক, তুমি সুখে থাক, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিব না, প্রাতে আর তোমাকে জাগাইব না—আর আবশ্যকই বা কি ? যদি কোন দিন গরীবের স্ত্রী হওয়া অপমান বোধ না কর বলিয়া জানিতে পারি, তখন আবার দেখা হইবে।

"আমার এ পত্রের কথা গোপন রাখিলেই ভাল হয়। মনে বড় কষ্ট পাইয়াই আমি ইহা লিখিলাম। ইতি শ্রীসুশীলকুমার।"

শৈল পত্রখানি পড়িল, পুনরায় পড়িল, শেষে একটু চুপ করিয়া থাকিল। তার পর বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল,—ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল—তাহা যেন আর থামিতে চাহে না।

উঃ! কি নির্দ্দয় পত্র! তুমি তো ভালবাস, তবে এমন মর্ম্মান্তিক পত্র শৈলকে লিখিলে কেন ? না হয় সে একটা অপরাধই করিয়াছিল, বালিকা, বুঝিতে পারে নাই। যেমন করিয়াই হউক একটা দোষ করিয়াছে, তাই কি তোমার ন্যায় সুবোধের বিদ্বানের এমন করিয়া লেখা উচিত ? ক্ষমা করিলে কি পারিতে না !—না, তোমারই বা দোষ কি, তুমি তো কত বলিয়াছ, শৈল শুনে নাই, তার পর এই সামান্য কাজে এমন অবাধ্যতা, এমন কর্কশ উত্তর সে দিয়াছে—একথা মনে আসিবামাত্র শৈল আরও আকুল হইয়া পড়িল—আবার কাঁদিতে লাগিল। দুঃখ কষ্টের সময় ক্রন্দন জীব-

গণের বাঁচাইবার ভগবদ্দত্ত একটি অমোঘ উপায়, ক্রন্দন না থাকিলে দুঃখ তরঙ্গাঘাতে হৃদয়প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যাইত। কবি সত্যই বলিয়াছেন, শোকে ও ক্ষোভে হৃদয় প্রলাপ দ্বারাই রক্ষা পায়।

শৈল ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইল, তবে মনের ভার কমিল না। সর্ব্বদা কি যেন ভাবিতেছে। শৈলর মাতা দুই একবার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না, তিনিও বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না। এইরূপে ক্রমে দিন গত হইল।

সন্ধ্যাকালে শৈল ছাদে বসিয়া কি ভাবিতেছে, সন্ধ্যার ছায়া ঘোর হইয়া আসিল, ঠাকুরবাড়ীর শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, গৃহস্থ বধূগণ প্রদীপ হস্তে এ ঘর ও ঘর যাতায়াত করিতে লাগিল, শৈল তখন নীচে নামিয়া আসিতেছে, এমন সময় যেন তার পাশে কি একটা ছায়ামত দেখিল, গাটা কাঁটা দিয়া উঠিল; শেষে তাকাইয়া দেখে, কিছুই নয়, একটা প্রদীপের আলো সিঁড়ির দেওয়ালে পড়িয়া একটা মানুষের ছায়ার মত দেখাচ্ছে। শৈল নিচে গেল কিন্তু তবু তাহার ভয় গেল না। সে রাত্রে আর কিছু আহার করিবে না বলিয়া তাহার মায়ের বিছানায় গিয়া শয়ন করিল, এবং নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িল।

(৪)

চিন্তাক্লিষ্টা শৈল নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল, সে যেন একটি খরস্রোতা নদীর তীরে একটি সুন্দর ছোট ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছে। উজান ভাটিতে কত নৌকা পাল তুলিয়া জল কাটিয়া চলিয়া যাইতেছে, কতক বা গুণে যাইতেছে। কত লোক সে নদীতে সাঁতার কাটিতেছে, কেহ গা ভাসাইয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ উজানে প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতার দিয়া যাইতেছে। শৈল বেশ কৌতূহলী হইয়া নদীর সব ব্যাপার দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি নৌকা ভাটিতে পালভরে তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া শৈলের বারান্দার নিকটেই নোঙর ফেলিল। আহা, সে নৌকার কি সাজসজ্জার পরিপাট্য। বাহিরে সব সোণালি হলকরা ঝালর, নানা রকম রেশমী নিশানদ্বারা সাজান, নৌকাতো নয়, যেন ইন্দ্রপুরী, এমনি চিত্র বিচিত্র করিয়া সাজান! বাহিরে কত গদী মোড়া চেয়ার, কৌচ ঝক্ ঝক্ কচ্ছে, তক্‌মা পরা, জরির পোষাক পরা মাঝিমোল্লাগণ যেন এক একটা রাজা কি আমির! আর নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিবামাত্রই সুগন্ধে ঘাট আমোদিত হইয়া গেল। নৌকা হইতে

সুমধুর সঙ্গীতলহরী তান লয় সঙ্গত হইয়া শৈলর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। শৈল আনন্দে বিভোর হইয়া তন্ময়চিত্তে নৌকার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন রাজ পরিচ্ছদ ভূষিত চাকর নৌকা হইতে জালা জালা আতর ও এসেন্স আনিয়া চারিদিকে ঢালিয়া দিতে লাগিল, সুন্দর সুকোমল মখমল থান আনিয়া নদীর কূলে বিছাইয়া দিতে আরম্ভ করিল, শৈল অবাক্! এরা করে কি?

তার পর শৈল যাহা দেখিল, তাহাতে আর তার জ্ঞান থাকিল না—সে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া গেল, একি স্বর্গের বিদ্যাধরী! একটি রূপসী রমণী নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীর পোষাকের ও অলঙ্কারের ছটায় সূর্য্যের কিরণও যেন ম্লান হইয়া পড়িল। কত সাটিন, কত চুমকী, কত হীরা মাণিক ঝল্‌মল্ কচ্ছে। রমণীর সর্ব্বাঙ্গ অতি মূল্যবান্ পরিচ্ছদে ভূষিত। পায়ে মোজা, তার উপর জরির অতি সূক্ষ্ম কাজকরা চটিজুতা; হাতে মূল্যবান্ রেশমী রুমাল, আর এসেন্সের শিশি! রমণী সদা হাস্যমুখী; ওষ্ঠাধর, গণ্ডদেশ যেন কি এক সুন্দর রাগে রঞ্জিত। মুখের উপর একখানি অতি সূক্ষ্ম রেশমী ওড়না স্থাপিত, তাহাতে যেন রূপের জ্যোতি আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

চক্ষের দৃষ্টি বড় চঞ্চল, বড় মনোহর—তাহাতে যেন কি এক মোহিনী শক্তি মিশ্রিত আছে, যাহার দিকে সে দৃষ্টি পতিত হয়, দৃষ্টি বিষসর্পের দৃষ্টির ন্যায় তাহাকেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে।

শৈল এমন রূপ আর দেখে নাই, এত ঐশ্বর্য্য আর দেখে নাই সে একেবারে ভুলিয়া গেল, তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া চক্ষু ও জীবন সার্থক করিবার জন্য সে বারান্দা হইতে নদীকূলে আসিয়া দাঁড়াইল। নৌকাস্থিতা রমণী তাহাকে দেখিয়া মোহিনী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, সুমিষ্ট হাস্যে তাহাকে মোহিত করিয়া ধীরে ধীরে শৈলকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন, শৈল নৌকার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। রমণী সেইরূপ মধুর হাসি হাসিয়া হাতের এসেন্সের শিশি হইতে খানিকটা এসেন্স শৈলর গায়ে ঝাড়িয়া দিলেন, শৈল সে সুগন্ধে মত্ত হইয়া পড়িল। রমণী ডাকিলেন, "আমার নৌকায় আসিবে?"

ভয়ে ও বিস্ময়ে শৈল কথা কহিতে পারিল না। রমণী আবার ডাকিলেন, "শৈল, এসনা ভাই?" শৈল চমকিয়া উঠিল, বিস্ময়ের সহিত বলিল, "আপনি

আমার নাম কেমন করিয়া জানিলেন? আপনি কে?" রমণী মধুর হাস্যের সহিত বলিলেন, "হা! হা! আমি তোমাকে চিনি না? তুমি আমার প্রিয়সখী! আজ বার তের বৎসর আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছি, তোমার ভাব গতিক দেখিতেছি, তাহাতে আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমার প্রিয়সখী হইবার ঠিক যোগ্য, তাই তোমাকে আজ আমার নৌকায় লইতে আসিয়াছি।" শৈল আরও বিস্মিতা হইল—"কই আপনাকে তো আমি দেখি নাই—আপনি কে?" রমণী বলিলেন, "আমি পরীর দেশের লোক, তুমি দেখিতে পাইবে কেন? আমার নাম বিলাসিনী, পোড়া লোকে আমার বদ্‌নাম করিয়া সর্ব্বনাশিনীও বলে। তা বলুক, তুমি তা শুনো না। দেখ, আমার নৌকায় সুখের সব আছে। সংসারে আসিয়াছি, আমোদের জন্য—আমার কাছে কেবল আমোদ, কেবল সুখ, দেখ কেমন ঐশ্বর্য্য আমার, কেমন ভাটিতে পাল তুলিয়া মহাসুখে যাইতেছি। দেখ কত পোষাক, কত পরিচ্ছদ, কত সুগন্ধি, কত অলঙ্কার, গান, বাজানা, আমোদ, আহ্লাদ, রূপ, সৌন্দর্য্য সব আমার কাছে। আহা, তোমার এমন কোমল, নধর শরীর, ওকি পরিশ্রমের জন্য—ভূতের মত খাটিবার জন্য—তুমি একবার আমার নৌকায় এস, আমাকে সখী বলিয়া ডাক, আমি তোমাকে এই নৌকার সব ঐশ্বর্য্য, সব সুখ দিব। আমার সখী হইলে চিরকাল সুখে আমোদে বাবুগিরী করিয়া কাটাইতে পারিবে—সকলে তোমার সেবা করিবে। তুমি আমার মত রাণীর হালে থাকিতে পারিবে—কত কত থিয়েটার, সারকাস, নাচ, তামাসা, খেলা, আমোদ—রাত দিন করিতে পারিবে—গাড়ী, ফেটিন্ চড়িয়া বেড়াইবে, সুখের আমোদের চূড়ান্ত হইবে,—আমাকে দেখিয়াই বুঝিতেছ! এস, এস, প্রিয়সখী আমার! আমি তোমার জন্যই আসিয়াছি, তুমি এসব ভালবাস, তাই আমার এত কষ্ট করিয়া আসা; এমন সুখের সুযোগ কি ছাড়িতে হয়? এস ভাই, এস—ঐ দেখ কেমন গীত বাদ্য হচ্ছে।" নৌকা হইতে সঙ্গীতলহরী শৈলর কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল, সে নৌকায় উঠিবার জন্য হাত বাড়াইল, রমণী স্বহস্তে তাহাকে ধরিতে যাইবেন, ইতিমধ্যে তাহার মায়ের স্বরে কে তাহাকে স্নেহের সহিত ডাকিয়া হাত ধরিল,—শৈল, মা, কোথা যাও।" নৌকার রমণী বিরক্তা হইয়া কৌচে বসিলেন আর বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন;

হঠাৎ এই সুখভোগে বাধা প্রাপ্ত হইয়া শৈল বড় বিরক্তা হইল, ফিরিয়া দেখিল, আর একটি প্রৌঢ়া রমণী তাহাকে বাধা দিতেছে। শৈল প্রথমে রাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া আর সে রাগ থাকিল না। তাঁর মুখে কোন রাগ বা রং নাই কিন্তু তথাপি মুখখানিতে যেন পবিত্রতা প্রসন্নতা এবং আনন্দমাখা। সে মুখের প্রসন্নতা দেখিলেই যেন, পবিত্র মাতৃভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ এবং একটা শ্রদ্ধার ভাবে মস্তক অবনত হয়। অঙ্গে পরিচ্ছদের বা অলঙ্কারের কোন প্রকার জাঁক জমক নাই কিন্তু তথাপি সেই সাদাসিদে পরিচ্ছদের মধ্য দিয়াই যেন কি এক পবিত্র জ্যোতিঃ বাহির হইয়া দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছে। ইহার দিকে তাকাইলে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে দেখিলে আপনিই হৃদয় ভক্তিভরে অবনত হয়। রমণীর হস্তে ছুঁচ, সুতা, একটা ছিন্ন ছোট জামা, অঞ্চলে এক থোলো চাবি। ইহার দৃষ্টিতে তেমন মাদকতা ও চঞ্চলতা মোটেই নাই, কিন্তু সেই সদা অবনত দৃষ্টির মধ্যে প্রেম, স্নেহ সর্ব্বদা খেলা করিতেছে। আর রমণীর স্বর তো স্নেহমাখা, কথা মধুমাখা। দেহ সুগঠিত অথচ কোমল, দেহে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দীপ্তিমান্, অন্য অলঙ্কারে সে স্বর্গীয় শোভার বৃদ্ধি সাধনের প্রয়োজন নাই। শৈল রমণীর দিকে একটু নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া দেখিল, তাঁহার মধ্যে যেন তাহার মায়ের মূর্ত্তি দেখিতে পাইল; রমণী সস্নেহে শৈলর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কোলের দিকে টানিয়া লইলেন, এবং মধুর স্নেহমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কোথায় যাইতেছিলে?"

আগামীবারে সমাপ্ত।

শ্রীবদ্নাথ চক্রবর্ত্তী।

ফুলের রাণী।

১

ওই বাগানে, আয় দু'জনে,
ফুল তুলিগে আয় না বালা!
মনের মতন, গেঁথে গেঁথে,
পরিয়ে দিব গোড়ে মালা;

লতার তলে, পরিমলে,
ফুলের রাশি তুলে আনি',
আয়না বালা, সাজিয়ে দিব,
সাজিয়ে দিব ফুলের রাণী !

২

ধীরে ধীরে. বহিছে সমীর,
ভাস্‌ছে কত সুবাস-ধারা,
মানস-পটে, উঠ্‌ছে ফুটে,
মধুর কত জীবন-তারা ;
এখন তুলে, সাজাই ফুলে,
লাজে ভরা তোর মু'খানি,
ধীর বালিকা, আয় না ছুটে,
সাজিয়ে দিব ফুল-রাণী !

৩

কুঞ্জ-তলে, দলে দলে,
ঘুর্‌ছে কত প্রেমিক অলী,
উঠ্‌ছে ফুটে, প্রেম-আদরে,
মধুর কোমল ফুল-কলি ;
সেই বিজনে, ফুলের সনে,
আদর ক'রে বুকে টানি',
চল্. চল্, চল্, সরল বালা,
সাজিয়ে দিব ফুলের রাণী !

৪

সমীর ভরে, সরোবরে,
কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে জল,
তরুর ছায়া, মধুর আকাশ,
কাঁপ্‌ছে তা'তে অবিরল ;
ওই সোপানে, জলের পানে,
চেয়ে র'ব দুটী প্রাণী,
আয় না সখি, সাজাই ফুলে,
সাজাই সাধের ফুল-রাণী !

৫

দূর আকাশে,		চাঁদ্‌টী হাসে,
উষার মধুর মুখটী চেয়ে,
তা'র অদূরে,		শুক তারাটী,
জ্বল্‌ছে যেন কোলের মেয়ে ;
এমনি ভোরে,		কোল্‌টী ভরে,
শুন্‌ব কত সোহাগ-বাণী,
অবোধ বালা,		আয় না কাছে,
আয়না সাজাই ফুলের রাণী !

৬

ফুলে ফুলে,		ভর্‌'ব হৃদি,
গাঁথ্‌'ব ফুলে কাণের বালা,
ফুলের রাশি,		ফুলের হাসি,
ওই মু'খানি ক'রবে আলা ;
ফুলের বসন,		পরিয়ে দিব,
ফুলে ফুলে ভ'র্‌ব পাণি,
আয় বালিকা,		সাজাই সাধে,
সাজাই প্রাণের ফুল-রাণী !
ফুলে ফুলে সাজাই রাণী !

স্বর্গীয় কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

ফাঁকি।

১

দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট-গিরি লঙ্ঘিবারে হায়,—
মানব কি ছার ! নাহি পারে দেবতায়।
উচ্চ—উচ্চ—উচ্চ কত,
মহান সে সমুন্নত,
উত্তাল তরঙ্গ যেন তুলি উচ্চ শিরে,
থমকে দাঁড়ায়ে আছে চকিতে গম্ভীরে।

২

মানব মনের সদা বলে যেই জন,
ফুলবন ত্যজি তার মরুতে ভ্রমণ!
মৃগতৃষ্ণিকায় ঘোরে,
সতত সেই ত ঘোরে,
নিমিষে পরিণাম তার তৃষ্ণা মিলায়,
অদৃষ্টে লিখেছে তার বিধি হায় হায়!

৩

তাই বলি কেন মন আতঙ্কে আকুল,
এস যাই কাঁটা হ'তে বেছে নিই ফুল।
জেনো তুমি সমুদয়,
শুধু ভাল কভু নয়,
মন্দ ভাল, ভাল মন্দ ধাতার সৃজন,
এ ধরা পরীক্ষাস্থল ধাঁধার এ বন।

৪

চল চল চল মন, মিলে তব আঁখি,
যেন নাহি পড় ফাঁকে হেথা সব ফাঁকি,
সে ফাঁকির ফাঁক দিয়ে,
চল যাই বাহিরিয়ে,
হেরিবে সে মহাদৃশ্য বিশ্ব মিলাইয়ে,
আছে, দেরে হরে পুত তাঁরে ধেয়াইয়ে।

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।

সমালোচনা।

নারীধর্ম্ম।—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (সরস্বতী) প্রণীত। পুস্তক মধ্যে পাঁচটি সন্দর্ভ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক সন্দর্ভের অভ্যন্তরে সুশিক্ষার সমাবেশ,—ভাষার একটা মাধুর্য্য,—লালিত্য আছে। লেখিকা আপন মতামত সকল দৃষ্টান্তে পরিণত করিবার নিমিত্ত, অনেক শাস্ত্রের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। "নারীধর্ম্ম" পুস্তকে ভাবিবার, শিখিবার, বুঝিবার অনেক কথা আছে। লেখিকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা ।)

দশম বর্ষ । } ১৩০৮ সাল, ভাদ্র । { ২য় সংখ্যা ।

ভারত রত্ন সার ।

(২)

১১ । কোটরাগ্নি যথা ঽশেষং সমূলং পাদপং দহেৎ ।

ধর্ম্মার্থৌতু তথায়োঽপি রাগদোষো বিনাশয়েৎ ॥ ৩০ ॥

তরুকোটরের অন্তরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলে, সেই অগ্নি ক্রমে ক্রমে যেমন তরুকে সমূলে দগ্ধ করে, তদ্রূপ মানবের হৃদয়ে অল্পমাত্রও বিষয়বাসনা যদি স্থান পায়, তথাপি ক্রমশঃ সেই বাসনা বলবতী হইয়া ধর্ম্মভাব ও সদুদ্দেশ্যকে বিনাশ করে ॥ ১১ ॥

১২ । বিপ্রয়োগে ন তু ত্যাগী দোষদর্শী সমাগমে ।

বিরাগং ভজতে জন্তু, র্নির্ব্বৈরো নিরবগ্রহঃ ॥ ৩১ ॥

কোনও কারণে ধন বিনষ্ট হইয়া গেলে, তাহার উপভোগ করিতে পারিল না, ইহাতে লোক "ত্যাগী" হয় না, কিন্তু অহর্নিশি ধনে বেষ্টিত হইয়া থাকিলেও প্রতিক্ষণ ধনের দোষ অনুধাবন করিলেই তাহাকে "ত্যাগী" ও "বিরাগী" বলা যায়, সে অবস্থায় ঐ ধনীর কেহই শত্রুভাবাপন্ন হয় না, আর তখন তাহার বাধা বিঘ্ন থাকে ॥ ১২ ॥

১৩ । জ্ঞানান্বিতেষু যুক্তেষু, শাস্ত্রজ্ঞেষু কৃতাত্মসু ।

ন তেষু সজ্জতে স্নেহঃ পদ্মপত্রেষ্বিবোদকং ॥ ৩৩ ॥

যাহারা জ্ঞানী, ঈশ্বর প্রাপ্তির নিমিত্ত যাহাদের চিত্ত ব্যাকুল, যাহারা শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছে, আর শাস্ত্রীয় সৎক্রিয়ায় যাহাদের

অন্তঃকরণ বিমল হইয়াছে, তাহারা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত থাকিলেও পদ্মপত্রের জলের মত উহাদের স্নেহে লিপ্ত হয় না ॥১৩॥

১৪। রাগাভিভূতঃ পুরুষঃ, কামেন পরিকৃষ্যতে।
ইচ্ছা সংজায়তে তস্য, ততস্তৃষ্ণা বিবর্দ্ধতে ॥ ৩৪ ॥

বিষয়-বাসনায় যে পুরুষ অভিভূত হয়, তাহাকেই কামনায় ইতস্তত আকর্ষণ করে, কামনায় আকৃষ্ট হইলেই তৎপূরণার্থ ইচ্ছা জন্মে, তৎপরে রুচির আতিশয্য-প্রযুক্ত তৃষ্ণা বলবতী হইতে থাকে ॥ ১৪ ॥

১৫। তৃষ্ণা হি সর্ব্বপাপিষ্ঠা নিত্যোদ্বেগকরী স্মৃতা।
অধর্ম্মবহুলা চৈব ঘোরা পাপানুবন্ধিনী ॥ ৩৫ ॥

সকল পাপের মধ্যে তৃষ্ণাই প্রবল পাপ, তৃষ্ণাই বিবিধ উদ্বেগের কারণ, তৃষ্ণা হইতেই নানাবিধ অধর্ম্ম প্রচিত হয়, একমাত্র তৃষ্ণাই নিজের পশ্চাতে পশ্চাতে অনেকানেক পাপকে বাঁধিয়া আনে, উঃ! তৃষ্ণার মত আর ভয়ঙ্করী কি আছে? ১৫ ॥

১৬। যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভি র্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকোরোগ স্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখং ॥ ৩৬ ॥

অল্পবুদ্ধি মানব যে তৃষ্ণাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, যে তৃষ্ণা জরাজীর্ণ ব্যক্তিও ছাড়ে না, প্রাণান্ত না হইতে যে তৃষ্ণারোগ নিবৃত্ত হয় না, সেই তৃষ্ণাকে যে ছাড়িতে পারে, সেই সুখী ॥ ১৬॥

১৭। রাজতঃ সলিলাদগ্নে শ্চোরতঃ স্বজনাদপি।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণভৃতামিব ॥ ৩৯ ॥

প্রাণিগণ যেমন এক মৃত্যুর ভয়ে সতত উদ্বিগ্ন থাকে, সেরূপ ধনিগণ, রাজা জল অনল তস্কর ও কুটুম্ব যাচক প্রভৃতির ভয়ে প্রতিক্ষণ জড়সড় থাকে ॥ ১৭ ॥

১৮। যথা হ্যামিষমাকাশে পক্ষিভিঃ শ্বাপদৈর্ভু বি।
ভক্ষ্যতে সলিলে মৎস্যৈ স্তথা সর্ব্বত্র বিত্তবান্ ॥ ৪০ ॥

যেমন মাংসখণ্ড আকাশে রাখ, পক্ষীতে খাইবে, ভূতলেরাখ, কুকুরাদিতে খাইবে, জলে রাখ, মৎস্যে খাইবে, কিছুতেই মাংসখণ্ডের নিস্তার নাই, সেরূপ ধনিগণেরও কোথাও শান্তি নাই; সর্ব্বত্রই কেহ না কেহ ধনীর ধনের দিকে লোলুপ-লোচনে দৃষ্টিপাত করিবেই ॥ ১৮ ॥

১৯। অর্থএব হি কেষাঞ্চিদনর্থং ভজতে নৃণাং।
অর্থশ্রেয়সি চাসক্তো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নরঃ ॥ ৪১ ॥

অনেকানেক মূর্খের কেন, পণ্ডিতেরও অর্থ অনর্থের কারণ হয়, অতএব অর্থসাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্যে শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই॥ ১৯॥

২০। ধর্ম্মার্থং যস্থ বিত্তেহা বরং তস্থ নিরীহতা।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কানাং দূরাদস্পর্শনং বরং॥ ৪৯॥

ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার জন্ত অর্থার্জ্জনের চেষ্টা করা অপেক্ষায় চেষ্টা না করাই ভাল, কেন না—কর্দ্দম গাত্রে লেপন করিয়া প্রক্ষালন করা অপেক্ষায় কর্দ্দম লেপন না করা কি উচিত নহে?॥ ২০॥

এ পর্য্যন্ত সংসারত্যাগী শৌনক ঋষি বিরক্তি উৎপাদনের জন্ত নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বিরত হইলেন। অতঃপর সংসারীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া যুধিষ্ঠির কহিবেন— [ক্রমশঃ]

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ।

শ্রীহট্টে হিন্দু স্বাধীনতালোপ।

খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১২০৩ অব্দে) নদীয়ানগরে মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজীর সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে প্রবেশমাত্র সেন বংশীয় শেষ নরপতি লক্ষ্মণ সেন উড়িষ্যা পলায়ন করিলেই যে সমগ্র বঙ্গদেশ মুসলমানদিগের শাসনাধীন হইয়াছিল, একথা কোন পুরাতত্ত্ববিদ্‌ই স্বীকার করেন না। লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের পরেও বঙ্গদেশের নানা স্থানে হিন্দু-নরপতিগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। গৌড়েশ্বরের অধীন সামন্ত রাজগণ তখনও আপনাদিগের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করেন নাই। বক্তিয়ার খিলিজীর নবদ্বীপ অধিকার করিবার সময়ে বঙ্গে মুসলমান-রাজত্ব অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তৎকালে রাঢ় অঞ্চলের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তাচলশায়ী হইলেও পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে হিন্দু স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র অপচয় হয় নাই।

শ্রীহট্ট পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে প্রাচীনতম স্থান। হিন্দুদিগের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের স্থাপিত গ্রাম, নগরাদির পূর্ব্ব বৃত্তান্তও তাদৃশ পরিস্ফুট নহে। সংস্কৃত পুরাণাদি গ্রন্থে শ্রীহট্টের উল্লেখ আছে, মহাভারতেও উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উহা নিতান্ত আধুনিক নহে। ইংরাজী "সিলেট" নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, গৌর

গোবিন্দ নামে গৌড়ের কোন ব্যক্তি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, শ্রীহট্ট নগরের পত্তন ও নামকরণ করেন,* ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। তাঁহার মতে গৌরগোবিন্দ হইতেই শ্রীহট্টে হিন্দু-রাজ্যের বিস্তার ও বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। তিনি যৎকালে গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া, শ্রীহট্টে আইসেন, তৎকালে পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতিরা এখানে বাস করিত, তাহাদের মধ্যে মুসলমানেরও বাস ছিল। সে যাহা হউক, গৌরগোবিন্দ যে শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুরাজা, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌরগোবিন্দের পূর্ব্বে যে সকল হিন্দুরাজা শ্রীহট্টে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বলিতে হইতেছে যে, শ্রীহট্টের হিন্দু-রাজাদিগের ইতিহাস অতীব দুর্জ্ঞেয়। তবে এরূপ অনুমান করিবার আপত্তি দেখা যায় না যে, শ্রীহট্টে একটী পৃথক হিন্দুরাজ্য ছিল না, উহা গৌড়েশ্বরের অধিকৃত প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল। গৌড়ের রাজারাই শ্রীহট্টের রাজা ছিলেন। যখন গৌড় হিন্দু-স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইল, তখন যিনি যতটা চেষ্টা দ্বারা সমর্থ হইয়া ছিলেন, তিনি ততটা স্বাধীতনা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু মস্তকহীন দেহে কতক্ষণ জীবনীশক্তি থাকিতে পারে? গৌড়েশ্বরের পতনে গৌড় রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল, মুসলমান তখন প্রবল পরাক্রমে—বন্যার বারি-রাশির ন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল, অগত্যা বঙ্গেশ্বরের অধীন রাজন্যবর্গ মুসলমানদিগের প্রতিরোধে সমর্থ না হইয়া, একে একে তাঁহাদিগের অধীনতা-স্বীকারে বাধ্য হইলেন। এইরূপে সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের প্রভুতা বদ্ধমূল হইতে অনেকদিন লাগিয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীহট্টে হিন্দু-স্বাধীনতা লোপই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা তাহারই বিষয় বলিব।

গৌরগোবিন্দ মুসলমানদিগের বড়ই নির্যাতন করিতেন, তাঁহার রাজত্বে বাস করিয়া মুসলমানেরা যার-পর-নাই নিপীড়িত হইয়া, অনেকেই বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বনে জঙ্গলে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে দুই একজন মুসলমান এইরূপে নিগৃহীত হইয়াও শ্রীহট্টের বাস পরিত্যাগ

* I dare say that when Gour Gobindo obtained the ascendency, he first gave that name to this country.

Syllet by SAMBHU CHANDRA DEY B A. B L.

করে নাই, তাহাদের মধ্যে বুরুণ্ডি সেখ নামে একজন আপন পুত্র-কামনায় স্বজাতির দেবতাকে গো বলি দিতে প্রতিশ্রুত হয়। দৈবানুগ্রহেই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, বুরুণ্ডি সেখের পুত্রলাভ ঘটিলে, সে তাহার দেবতাকে একটী গো বলি অর্পণ করিয়াছিল। বলিদত্ত গোমাংস পশু পক্ষী কর্ত্তৃক নানাস্থানে নীত হয়। গৌরগোবিন্দের রাজবাটী মধ্যেও তদ্রূপে গোমাংস বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া, অনুসন্ধানে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তিনি গো-বধের দণ্ডবিধানার্থ বুরুণ্ডি সেখকে ধরিয়া আনিতে পাঠাইলেন, বুরুণ্ডি সেখ রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, আপনার অরপাধ স্বীকার করিলে, রাজা তাহার সদ্যজাত শিশুকে আনয়ন করিয়া, তাহাকে নিহত করেন এবং বুরুণ্ডির দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দেন।

মর্ম্মাহত বুরুণ্ডি সেখ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল, কয়েকদিন অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইল, পরিশেষে প্রতিহিংসার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া তাহার উপায় চিন্তায় নিবিষ্ট হইল। কিন্তু তৎকালে স্বদেশের মুসলমানগণ অতিশয় হীনবল, তাহাদিগের নিকট প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সে দিল্লী যাত্রা করিল। তখন হিন্দুদ্বেষী আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তিনি নিগৃহীত মুসলমানের দুঃখকাহিনী এবং স্বধর্ম্মের মর্য্যাদাহানির বিষয় অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র সেকেন্দর সাকে সসৈন্যে শ্রীহট্ট অধিকার ও গৌরগোবিন্দের কৃতাপরাধের দণ্ডবিধানার্থ এদেশে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র-শোকাকুল বুরুণ্ডি সেখও সঙ্গে আসিল।

সেকেন্দর সা যথাকালে ঢাকা অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া, প্রাচীন সুবর্ণগ্রামে শিবির সন্নিবিষ্ট করিলেন। কিছুদিন সুবর্ণগ্রামের শোভা-সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া, তিনি ব্রহ্মপুত্র-তীরে উপস্থিত হইলেন। যবন-সৈন্যের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া, অস্ত্রসিদ্ধ গৌরগোবিন্দ আপনার ইষ্টদেবতার পূজা করিলেন, এবং কায়মনোবাক্যে আপনার বিজয় কামনা করিয়া দেবনির্ম্মাল্য গ্রহণ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, গৌরগোবিন্দ অগ্নিবাণসিদ্ধ ছিলেন, তিনি দৈববলে সর্ব্বজয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ হইল, যুদ্ধে হিন্দুরই জয় হইল, সেকেন্দর সা পরাভূত হইয়া

দুঃখের সীমা ছিল না। সেকেন্দরের সেনাসংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছিল, তিনি শ্রীহট্টেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, বুরণ্ডি পুনরায় দিল্লী যাত্রা করিল, দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সম্রাট আলা উদ্দিনকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পরাভব-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য ও কয়েকজন সেনা-পতিকে সেকেন্দরের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। তৎকালে সা-জালাল নামে এক বুজরুকি মুসলমান দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি ইসলাম ধর্ম্মের অবমাননা ও অপদস্থতার কথা শুনিয়া, শ্রীহট্টে হিন্দু-রাজত্বের বিলোপ সাধনার্থ সতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাত্রা করিলেন। সম্রাটের পীর নিজামদ্দি নামে অপর এক বুজরুকি সা-জালালকে দৈববলে হীন মনে করিয়া ততটা গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু সা-জালালের ক্রিয়াকলাপ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কৃষ্ণ কপোতযুগল উপহার দান করেন। সা-জালাল মুসলমান-সৈন্যের সহিত শ্রীহট্টে যাত্রা করিলেন। সেনাপতি হইয়া আসি-লেন, বোগদাদনিবাসী সৈয়দ নসিরদ্দি।

যথাকালে সা-জালাল এবং সেনাপতি নসিরদ্দি বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া পরাভবাবনত সেকেন্দর সাহের সহিত মিলিত হইলেন। যখন তাঁহারা ব্রহ্মপুত্রতীরে উপস্থিত হয়েন, তখন পরপারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য নৌকা না পাইয়া, নমাজ পড়িবার আসন অবলম্বনে সা-জালাল সমস্ত সৈন্যসমেত আপনি নদী পার হইয়াছিলেন। এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক বুজরুকির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যবনসৈন্য শ্রীহট্ট নগরের প্রান্তভাগে শিবির সন্নি-বিষ্ট করিল, গৌরগোবিন্দও যুদ্ধের সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারিলেন না, এবার মুসলমানদিগেরই জয় হইল। শ্রীহট্ট জয়ে সৈনিকবল অপেক্ষা দৈববলেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সা-জালালই শ্রীহট্টে মুসলমান-রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

সা-জালাল শ্রীহট্ট অধিকার করিয়া, তথায় কতকগুলি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। তাহাদের মধ্যে "আদিনা" মসজিদই সমধিক প্রসিদ্ধ। উহা বহুদিন বিদ্যমান ছিল, অবশেষে নবাব ইস্কিন্দির খাঁ তাহা ভগ্ন করিয়া তাহারই উপকরণ দ্বারা সা-জালালের সমাধি মসজিদের সমীপে একটী সুন্দর মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। আদিনা মসজিদের অনেকগুলি চূড়া ছিল, আকার আয়তনেও অতি বড়, অতঃপর শ্রীহট্টে হিন্দুগৌরব বিলুপ্ত হইল। মুসলমানের বঙ্গ-বিজয়ের পরেও পূর্ব্ববঙ্গে যে হিন্দুস্বাধীনতার চিহ্ন ছিল

তাহাও বিলুপ্ত হইল। ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষাংশের কথা। মিঃ ব্লক-ম্যান বলেন, শ্রীহট্ট ১৩৮৪ অব্দে মুসলমানদিগের অধীন হয়।

গৌরগোবিন্দ মুসলমান কর্ত্তৃক পরাভূত ও হৃত-গৌরব হইয়া শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি তথা হইতে সাত আট ক্রোশ দূর-বর্ত্তী পচাগড় নামক একটী ক্ষুদ্র শৈলে আপন বাস-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া, নিরুদ্বেগে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মুসলমান দরবেশ সা-জালাল তাঁহার প্রতি আর কোন উপদ্রব অত্যাচার করেন নাই।

সা-জালাল দিল্লী হইতে আসিবারকালে প্রায় তিন শত শিষ্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট আপনাদিগের করতলগত করিয়া, তিনি সেকেন্দর সাকে রাজসিংহাসন অর্পণ করিলে তিনি তত্রত্য শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, এবং সা-জালালের শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়া, অচিরকাল মধ্যে শ্রীহট্ট অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি করিলেন। কালক্রমে কেবলমাত্র পরিচয় দিবার জন্য দুই একজন মাত্র হিন্দু তথায় রহিলেন, প্রায় সমস্ত অধিবাসীই মুসলমান হইয়া গেল।

কোন বিশেষ অপরাধের জন্য সেকেন্দর সা-জালালের বিরাগভাজন হইলে, তিনি তাহার উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। একদিন নির্ব্বাত নির্ম্মেঘ সময়ে সেকেন্দর সুর্ম্মা নদীতে তরণীবিহার করিতেছিলেন, সা-জালালের ইচ্ছা, তিনি জলমগ্ন হইয়া নদীজলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। সেকেন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন প্রিয়তম ভৃত্য সা-জালালের আজ্ঞানুসারে শ্রীহট্টের সিংহাসন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীহট্টে মুসলমান-রাজত্ব বদ্ধমূল করিয়া, দ্বিষষ্ঠি বৎসর বয়ঃক্রমকালে সা-জালাল ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করেন। সা-জালালের নাম শ্রীহট্টে জানে না, এমন লোকই নাই। তাঁহার সমাধি-মঠ মুসলমানদিগের মধ্যে অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন, একথা সকলেই স্বীকার করেন। সা-জালালের সমাধি সমীপে আরও কতকগুলি সমাধি (গোর) দেখিতে পাওয়া যায়, সে গুলি তাঁহার শিষ্যদিগের। এই সকল শিষ্যের মধ্যে আরব দেশের ইমেন প্রদেশের রাজপুত্র তাঁহার বড়ই অনুগত ছিলেন, তিনি রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুর সহিত ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, এবং যাবজ্জীবন গুরুসেবায় কালক্ষেপ করিয়া মরণান্তে গুরুরই সমাধি সমীপে সমাহিত হইয়াছিলেন।

সা-জালালের পরলোক প্রাপ্তির পর শ্রীহট্টের মুসলমান-শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীনভাবেই অবস্থিতি করিতেন, শ্রীহট্ট যেন দেবোত্তর সম্পত্তির ন্যায় ছিল, উহার উপস্বত্ব সা-জালালের সমাধিমঠের ব্যয় নির্ব্বাহেই প্রযুক্ত হইত। সা-জালাল পীর বলিয়া সকলের নিকট পূজিত। অন্ততঃ ধর্ম্মের উদ্দেশে উহার উপস্বত্ব ব্যয় করা হইত বলিয়া, দিল্লীর সম্রাটেরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

ইংরেজ আমলে শ্রীহট্ট ইংরেজ-রাজত্বের অন্তর্গত হইয়াছে। উইলিস্ সাহেব উহার সর্ব্ব প্রথম কালেক্টর ছিলেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

কবিকেশরী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃষি ফারমে—আলুর চাষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রবীন্দ্রনাথ শিলাই দহস্থ বিস্তৃত প্রান্তর দেখিয়া নূতন কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা দিবার এই প্রশস্ত সময় বুঝিলেন। কিন্তু মূর্খ কৃষকদিগকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে মুখে বক্তৃতা দিলে তাহারা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না, বরং বিপরীত ফল হইতে পারে; এই আশঙ্কায় তাহা না করিয়া, নিজেই তাহার আদর্শ হইলেন। বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া এবং অন্য কোন নূতন কৃষির সময় নয় বলিয়া—শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। বর্ষাকালের উপযোগী বেগুন, লাউ, চালকুমড়া, মিঠে কুমড়া, ঝিঙ্গে, কাঁকরোল, চিচিঙ্গা প্রভৃতি কাঁচা তরকারী; নটে শাক, চাঁপানটে, পুঁই প্রভৃতি শাক ইত্যাদির বীজ বপন করিলেন। যাহাতে শাক-শবজী-গুলি সুজাত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও যত্ন করিতে লাগিলেন। বাগানে মালী ও আবশ্যক মত কুলিমজুর সকল যথাসময়ে কার্য্য করিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষান্তে শীতের প্রারম্ভেই নৈনীতাল আলুর চাষ করিবেন, মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম দেশে গিয়া এই আলুর চাষ দেখিয়া আসিয়া, নিজের দেশে প্রবর্ত্তিত করিবেন, অনেক

দিন হইতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এক্ষণে তাহার প্রশস্ত সময় বুঝিয়া Now or Never এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আলুর চাষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আলুর চাষের প্রণালী বিশেষরূপে জানা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ভারতের এগ্রিকলচার ডিপার্টমেন্টের অন্যতম সহকারী ডিরেক্টর, তাঁহার অন্যতম সুহৃদ, বঙ্গের সুপরিচিত ব্যঙ্গ 'কবি' শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া শিলাইদহে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আলুর চাষের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সমস্ত অবগত হইলেন। আলুর জমি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, অর্থাৎ কয়বার লাঙ্গল দিতে হয়, মাটী কেমন চূর্ণ হইলে মৈ দিয়া জমি সমান করিতে হয়; প্রতি বিঘা জমিতে কি পরিমাণে সার দিতে হয়, সারের মধ্যে পচা গোবরের পরিমাণ কত এবং রেড়ীর খইলেরই বা পরিমাণ কত, সার ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবার নিয়ম ও সময় কি? আলুর বীজ কেমন ভাবে—কয়খানি করিয়া কাটিতে হয়, কয় হাত অন্তর কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বীজ ক্ষেত্রে প্রোথিত করিতে হয়, প্রথম আলুর পাতা বাহির হইবার পর গাছ কত বড় হইলে কতবার গাছের গোড়ায় মাটী দিতে হয়, কেমন করিয়া আইল বাঁধিতে হয়, গাছে জল দিবার নিয়ম কি? আলুর গাছ পাকিলে কেমন করিয়া ক্ষেত্র খনন করতঃ আলু বাহির করিতে হয়, ভবিষ্যৎ ফসলের জন্য কেমন করিয়া বীজ সংগ্রহ করিতে হয়, ইত্যাদি আলুর চাষের কার্য্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথ এতদ্দেশে আলুর চাষ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তাঁহার জমিদারীতেই প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা, উদ্যম ও অর্থব্যয় অতীব উল্লেখযোগ্য। রুষসম্রাট পিটার দি-গ্রেট একদিন সাধারণ মনুষ্যবেশে আমষ্টার্ডম নগরের সার্দ্দম নামক একটী সহরে জাহাজ-নির্ম্মাণ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মশিক্ষাকালে অন্যান্য সহকর্ম্মচারীদিগের ন্যায় স্বোপার্জ্জিত যৎসামান্য অর্থে দিনযাপন করিতেন। কিন্তু অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া কতদিন থাকিতে পারে? কিছুদিন পরে তিনি রুষসম্রাট বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইলেন। তখন জাহাজে কাপ্তেন, তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি লেন, "আমি রুষসম্রাট মাষ্টার পিটার, আমার রাজ্যের প্রজারা জাহা র্ম্মাণ করিতে জানে না। সেই সকল মূর্খ লোকদিগকে শিক্ষা

দিবার জন্য আমি জাহাজ-নির্ম্মাণ-বিষয়ক-বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়াছি।” তখন জাহাজস্থিত সকল লোক বিস্মিতনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। রুষসম্রাট স্বদেশের জন্য—রাজ্যের প্রজাদিগের উন্নতির জন্য আত্মগোপন করিয়া জাহাজে ছুতারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার কম মহত্বের কথা নয়? তাঁহার উদারতা, মহত্ব ও মনুষ্যত্ব আজ পৃথিবীতে দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছে। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণ লোকশিক্ষকরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া লোক-হিতার্থ এইরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন।

লোকশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভেই আলুর চাষ আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা এগ্রিকলচার আফিস হইতে আলুর চাষের উপযুক্ত ‘বীজ’ ও ‘সার’ আনয়ন করিয়া স্থানীয় কৃষকদিগকে আলুর ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত করতঃ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আলুর কৃষি-প্রণালী অর্থাৎ আলুর ক্ষেত্রকর্ষণ, সার দেওন, বীজ রোপণ, জলসেচন প্রভৃতির পদ্ধতি কর্ম্ম-ক্ষেত্রেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আলুর গাছে পাতা ফুটিলে—গাছগুলি যত বড় হইলে যেরূপে গাছের মূলে সার ও মৃত্তিকা দিতে হয়, যেরূপে আইল বাঁধিয়া দিতে হয়, যেরূপে ক্ষেত্র জলসিক্ত করিতে হয়, মৃত্তিকার রসের তারতম্য অনুসারে যে সময়ে জলসিঞ্চন করিতে হয়, তৎসমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কৃষকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কৃষিক্ষেত্র মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া কৃষকদিগের আলুর চাষ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিল কি না, এক আধটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা অবগত হইতেন। আলুর গাছগুলি যথানিয়মে বর্দ্ধিত হইতেছে কি না, চাষের কার্য্য-প্রণালী-সিদ্ধ হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা এগ্রিকল-চার অফিস হইতে ইন্স্পেক্টার লইয়া যাইতেন। আলুর চাষের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার পক্ষে তাঁহার যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম অসাধারণ। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া এই বৎসর আলুর কৃষিতে লাভবান হইতে পারেন নাই। এগ্রিকলচার ডিপার্টমেণ্টের অফিসারগণ বলেন, জলের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। যে পরিমাণ জল দেওয়া হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ ...রিমাণ জল দেওয়া উচিত ছিল। আলুতে লাভ হয় নাই বটে—কিন্তু যে ... জন্মিয়া-ছিল, তাহা নৈনীতাল আলু অপেক্ষা কথঞ্চিৎ আকারে বড়, ...রি... স্বাদও অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইয়াছিল। Land Records and Agricu... অফিস হইতে প্রকাশিত সন ১৮৯৯ সালের ...ৎসরিক রিপোর্টে ... অনে...থের

আলুর চাষের উল্লেখ আছে। নিম্নে সেই রিপোর্টের কতকাংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"Experiments with Nainital potatoes were made by Mr. Rabindra Nath Tagore in the Tagore Estate at Shelidah in the Kustea Sub Division. The crop was not satisfactorily owing to the defective cultivation. One of Mr. Tagore's continents however working under more favourable circumstances obtained a bumper crop from a portion of the same seed, and success of this experiment is said to have induced several neighbouring Rayats to take the potatoes cultivation. These experiments together with others introduced by Mr. Tagore on his farm will be continued."

রবীন্দ্রনাথ আলুর চাষ বিস্তৃতির জন্য কলিকাতা এগ্রিকলচার অফিস হইতে আলুর বীজ আনয়ন করিয়া প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন, এবং আলুর কৃষিপ্রণালীর বিষয় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার একজন প্রজা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথমবারেই আলুর চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছিল। প্রত্যেক গৃহস্থ অন্যান্য শস্যাদির ন্যায় পাঁচ কাঠা, দশ কাঠা করিয়া আলুর চাষ করিলে গৃহস্থবিশেষে তাহাদের বৎসরের আলুর খরচ অনায়াসে সংকুলান হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ শীতকালোৎপন্ন বাঁধা কপি, ফুল কপি, ওল কপি, বীট শালগম, গাজর, সীম, বরবটী, বোম্বাই মুলা, পাটনাই মটর, লাল আলু, শাঁক আলু প্রভৃতি কাঁচা তরকারীর চাষও করিয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

শৈলের স্বপ্ন।

(২)

সে স্নেহ পাইয়া বালিকা শৈল বড় সুখ বোধ করিল, পূর্ব্বের মত ভয় থাকিল না, সে বলিল, "ঐ নৌকায় পরীর কাছে যাচ্ছিলাম। উনি আমাকে সব সুখ দেবেন বলেছেন।" রমণী শৈলের কোমল চিবুক উন্নমিত করিয়া—মাতৃ-স্নেহের পবিত্র চুম্বনে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া বলিলেন, "তা মা, যাইতে হয়, যাইও, কিন্তু আমার কাছেও গোটা-কয়েক কথা শুনিয়া যাও, আমি পরীর বিষয় কিছু জানি; আমার কাছে সব শুনিয়া শেষে তোমার যাইবার ইচ্ছা হয়, যাইও; তোমাকে ধরিয়া রাখিব না।"

শৈল বলিল, "তা বলুন, কিন্তু আপনি কে, কোথা থেকে এলেন? আপনার কথাগুলি এবং ভাব যেন আমার মায়ের মত লাগ্‌ছে।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া রমণী শৈলের মুখে চুম্বন করিলেন, এবং বীণাস্বরে বলিলেন, "মা, তা বটে। তোমার মা আমার প্রিয়সখী; আমি তোমার মায়ের সঙ্গে, তোমার মায়ের মূর্ত্তিতে কতবার তোমার কাছে গিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই, আমাকে ভালও বাস নাই, আমি মা ঐ নৌকা—যে খানাতে সাদা একটা নিশান উড়ছে, ঐ নৌকায় এসেছি। সর্ব্বনাশিনীর নৌকা তোমার জন্য আসিতেছে দেখিয়া, আমিও তোমার কাছে এই শেষবার আসিলাম। তোমার মা আমাকে খুব জানেন, তিনি আমার বড়ই প্রিয়সখী; আর আমার সখীর মেয়ে সর্ব্বনাশিনীর হাতে পড়িবে, আমি তার কোন চেষ্টা করিব না, তাও কি হয়? আমার নাম মা গৃহিণীপণা। আমি সর্ব্বদা রমণীকুলের মঙ্গল সাধনের জন্য চেষ্টা করি, আর ঐ সর্ব্বনাশিনী কেবল অমঙ্গল চেষ্টা করে। উহার কথায় কথায় মিথ্যা, প্রবঞ্চনা। দেখ মা, এই যে নদী দেখিতেছ, এটা সংসারের প্রবৃত্তি স্রোত; এ নদীর একটা আশ্চর্য্য রহস্য এই যে, উপরে দেখিতেছ, একটানা ভাটি স্রোত; কিন্তু ইহার নীচে আবার একটা উজান দিকের স্রোত আছে। ভাটিতে গা ভাসাইয়া যাওয়া খুব সোজা কিন্তু শেষে বড় কষ্ট, এই নদীর ভাটিস্রোত ক্রমে গভীর বন-জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া উপরে শুকাইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে উহা আবার ফিরিয়া উজান স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে। সে দিকটা বড় ভয়ঙ্কর, যাহারা ইহাতে

ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারা সেখানে গিয়া কেবল হায় হায় কচ্ছে। এখন সুখ বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত সুখ নহে। আর যাহারা এ স্রোতের প্রতিকূলে উজান বাহিয়া চলিয়াছে, তাহাদের এখন একটু কষ্ট বটে, কিন্তু পরিণামে কেবল সুখ, আর শান্তি। মা, এই সর্ব্বনাশিনী বিলাসিনী সেই প্রবৃত্তি স্রোতের কর্ত্রী; সে তোমাকে যে সব সুখের প্রলোভন দেখাইয়াছে, তাহা দিবার ক্ষমতা তার নাই, আর সে সব প্রকৃত সুখ নহে। দেখ, প্রকৃত সুখে আর পরে অনুতাপ হয় না; কিন্তু ঐ সর্ব্বনাশিনী যে সুখ দেয়, তাহার পরিণামে বড় কষ্ট হয়। এই দেখ, তুমি কাল রাত্রে তোমার স্বামীর মনে একটু কষ্ট দিয়াছ ব'লে কত কষ্ট মনে কচ্ছো—(শৈল এখানে চমকিয়া উঠিল) চমকিও না মা, আমি সব জানি, সেই যে কষ্ট দেওয়া—তাও এই সর্ব্বনাশিনীর প্রলোভন। সেই তোমার কাছে তার সহচরী অলসতাকে পাঠাইয়া তোমাকে এই-রূপ করিয়াছে। দেখ, এখন কত কষ্ট পাচ্ছ। এখন এই একটু কষ্ট দিয়াছ ব'লে দুঃখ করিতেছ, কিন্তু ঐ সর্ব্বনাশীর সখী হইলে পদে পদে স্বামীকে কষ্ট দিবে। ঐ সর্ব্বনাশী যে সব ঐশ্বর্য্য দিবে বলিয়াছে, তাহা সে ঘর হইতে দিবে না, তুমি তোমার স্বামী প্রভৃতির কাছ থেকে জোর করিয়া আদায় করিবে। দেখ, তোমার স্বামীর যে অবস্থা, তাহাতে যদি তাহাকে এই জোগাইতে হয়, তাহা সে কেমন করিয়া পারিবে? একবার ঐ অপব্যয়িতা সর্ব্বনাশিনীর সখী হইলে ঐ সব বিলাসের জিনিষ তোমারও দরকার হইবেই; সুতরাং স্বামীকে কত কটু বলিবে, কত অবজ্ঞা করিবে, তার সীমা নাই মা, কিন্তু তাহাতেও তোমার কষ্ট হইবে না! এমনই ঐ সর্ব্বনাশীর কুহক! মা, যারা ঐ সর্ব্বনাশীর সখী হয়, তাহারা কেবল নিজের স্বচ্ছন্দতা, বিলাস ইত্যাদির জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। স্বার্থপরতা উহার এক সহচরী। নিজে ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব, সর্ব্বদা এই চিন্তা হয়। অলসতা, স্বার্থপরতা, অপব্যয়িতা ইত্যাদি সব ঐ সর্ব্বনাশীর সখী, যে সব রমণী ঐ সর্ব্বনাশীর সখী হয়, লোকে তাহাদিগকে কখন প্রশংসা করে না, কেবল নিন্দা করে। তোমাদের গ্রামের 'বাবু বৌ' কে জান তো?—হাঁ, সে এই বিলাসিনীর সখী, দেখ—সে স্বামীর অর্থ কতরূপে অপব্যয় করে—সে জন্য স্বামী কত কষ্ট পায়, লোকে দেখ তার প্রশংসা করে না।

মা, অলসতা রমণী জীবনের প্রধান শত্রু। তোমার মা আমার সখী, তাঁহার এ সব দোষ কিছুই নাই। আমিও মা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকি, আমার নৌকাও দেখ বেশ পরিস্কার, তবে আমি চিত্র বিচিত্র প্রজাপতি সাজি না। ছি! ভদ্রঘরের মেয়ে তা কেন করিবে? আমি মা, অলস হই না, দেখ তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ছি, অথচ ছেঁড়া জামাটা সেলাই, কচ্ছি। আমি অবসর মত কাঁথা সেলাই করি, সূতা কাটি, জামা সেলাই কি ছেঁড়া জামা কাপড় রিপু করি। নিজের ঘরের ছেলেদের অব্যবহার্য্য জামা কাপড় আমি রিপু করিয়া এই সব অনাথ আশ্রমে, কি কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাই, গরীব ছেলে পিলেরা গায় দিতে পারিবে। আমি মা অত আতর, গোলাপ, এসেন্স মাখি না, সে পয়সা দিয়া সংসারের জন্য আবশ্যক জিনিস পত্র করি বা কোন গরীবকে দান করি। সংসারের অবস্থা বুঝিয়া সব কাজকর্ম্ম নিজেও করি বা তার তত্ত্বধান করি। বাটীর সকলের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখি। সকলকে খাওয়াইয়াই আমি আমোদ পাই, নিজের খাওয়ার জন্য আমার ব্যস্ততা নাই। আমি উল, মোজাও বুনি, তবে যদি গরীব হই, তবে আগে কাঁথা সেলাই করি, শিকে ভাঙ্গাই—কারণ সেই সব সংসারে আগে দরকার। তারপর সময় থাকিলে উল, মোজাও বুনি। আমি মা সর্ব্বদা সংসারের অবস্থা বুঝিয়া চলি, কোন জিনিস অপব্যয় বা অপচয় আমি দেখিতে পারি না। আমি যে আমোদ করি না, গল্প করি না, কি বই পড়ি না, তাহা নহে। তবে অত থিয়েটার, সার্কাস, নাচ, তামাসা দেখা আমার পোষায় না, আমি ভালও বাসি না। আমার কাজকর্ম্ম হয়ে গেলে আমিও সখীদের সঙ্গে সৎবিষয় গল্প করি, ভাল ভাল বই পড়ি; আমার নৌকায় দেখ— মহাভারত, রামায়ণ, নবনারী, স্বর্ণলতা, ধাত্রীশিক্ষা ইত্যাদি সব বই আছে। তবে সারাদিন গল্প করা, কাজ ফেলিয়া বই পড়া, কি আমোদ করা, তা আমার মতবিরুদ্ধ।

মেয়ে ছেলে পিলে মা বিলাসী হলে, আল্‌সে হলে, কি সংসার চলে? আমার কথা আর বেশী কি বলিব, তোমার মা, আমার প্রিয়সখী, তার কাজকর্ম্ম, চলা-ফেরা সবই আমার ছাঁচে গড়া। তাই সব মনে করিয়া দেখ, আর ভাবিয়া দেখ, "বাবু বৌ"এর প্রশংসা বেশী, কি তোমার

মার দ্বারা তোমাকে কতবার সাবধান করিয়াছি মা, তুমি তাহা বুঝ নাই। এখন এই সব ভেবে দেখ। আমার মতে চলিলে তুমি সর্ব্বনাশীর মত বাবুগিরী করিতে পারিবে না সত্য, কিন্তু মা দশের প্রশংসা পাইবে, মনে সুখ ও শান্তি পাইবে, নতুবা ঐ সর্ব্বনাশীর কুহকে পড়িলে শেষে কাঁদিয়া মরিতে হইবে। উহার নিজের মনেই প্রকৃত সুখ নাই। আর ঐ যে রূপ দেখিতেছ, ওটাও একটা বাহিরের কুহক মাত্র, উহার প্রকৃত রূপ দেখিলে তুমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে। উহার সঙ্গে যাহারা ভাসিয়া যায়, তাহাদের দুর্দ্দশা পরে দেখাইব, আমার সখীদের পরিণামে কি সুখ, তাহা একবার চোক বুঝিয়া দেখ।"

শৈল যেন চোক বুজিল এবং দেখিল, সেই নদীর উজানে অনেক দূর গিয়া সুন্দর বাগান, কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য। সুন্দরী প্রৌঢ়া রমণীগণ সেখানে কত আনন্দ করিতেছে, ছেলে মেয়েরা আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে, সকলের মুখেই আনন্দ, সকলের মুখেই পবিত্র প্রসন্নতা। কোন জাক-জমক নাই। অথচ কি একটা সৌন্দর্য্য সেখানে মাখা। দেখিয়া শৈল বড় সুখী হইল। তার পর রমণী আবার বলিলেন, "এইবার চোক বুঁজিয়া দেখ তো!" শৈল আবার যেন চোক বুঁজিয়া দেখিল, নদীর ভাটিতে অনেক দূর গিয়া কেবল কাঁটা বন, পাথর, কাঁকর, আগুনের শিখা, কত শত যুবতী হাহাকার করিতেছে, তাহাদের চেহারা অতি কদাকার; কেহ চুল ছিঁড়িতেছে, কেহ বুক চাপড়াইতেছে। সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া শৈল চমকিয়া উঠিল, আর যেন দেখিতে পারিল না। সে চক্ষু মেলিল, রমণী বলিলেন, "দেখিলে, এখন যে পথ ইচ্ছা—যার সঙ্গে ইচ্ছা যাইতে পার—আমি চলিলাম।" রমণী উঠিয়া গেলেন, বিলাসিনী তখন আবার শৈলকে লোভ দেখাইতে আরম্ভ করিল। শৈল সে মোহে ভুলিয়া আবার নৌকায় উঠিতে যাইতেছে,—এমন সময় একটা দম্‌কা বাতাসে রমণীর মুখের ওড়না উড়িয়া গেল, তখন শৈল দেখিল, ঐ সুন্দরীর মুখ কি কদাকার—তাহা যেন ঠিক রাক্ষসের মত বীভৎস! সে ভয়ঙ্কর চেহারা দেখিয়া শৈল এত ভীত হইল যে, সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা! মা! আমি তোমার পথেই চলিব, আমায় ফেলিয়া যেও না।"

শৈলর মাতা কন্যাকে কোলে টানিয়া সস্নেহে বলিলেন, "ষাট্ ষাট্ বাছা আমার, ভয় কি, আমি ত কাছেই আছি। মা শৈল, অমন করে উঠ্‌লি কেন?"

শৈল তাকাইল, দেখিল—মায়ের কোলেই সে শুইয়া আছে, প্রত্যয় হইল না। সে বলিল, "তুমি কি আমার সেই মা?" মা বলিল, "বাট্, আমি সেই মা বই কি মা আমার!" মা কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন, সে চুম্বন যেন শৈলের সেই স্বপ্নে প্রাপ্ত চুম্বনের মত বোধ হইল। শৈল এক গা ঘামিয়া উঠিয়াছে। মা শৈলকে মুছাইয়া দিলেন, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন, শৈল আর কিছু বলিল না, কেবল বলিল, "মা! আজ থেকে তুমি যেমন বলিবে, আমি তেমনি চলিব—তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি কর্‌লাম; তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার মেয়ে এই নাম রাখিতে পারি।" কন্যা মাতাকে প্রণাম করিল। ঊষার বিমল কিরণচ্ছটা তখন রন্ধ্রপথে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পবিত্র প্রভাতকালে মাতা হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা শ্রীহরির ইচ্ছায়, মা দুর্গার ইচ্ছায় তাহাই হউক।"

মা ও মেয়ে বাহির হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে গেল। আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি, সেইদিন হইতে শৈল নূতন শিক্ষা পাইয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই শৈল "গেরস্থর মেয়ের" সমস্ত সদ্‌গুণ আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। তাহার অলসতা, বিলাসিতা, সব দূর হইয়া গেল। উপযুক্তা মাতার শিক্ষাধীনে থাকিয়া কন্যাও রমণীসুলভ গুণাবলীতে ভূষিতা হইল।

তারপর শৈল স্বামীকে সেই প্রথম পত্র লিখিল।

"আমি আপনার চরণে যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার ক্ষমা নাই। যদি দয়া করিয়া ক্ষমা করিতে পারেন, দাসীকে একবার দেখা দিলে সে কৃতার্থ হইবে। আমি আর কি লিখিব, দেখা হইলে মনের কথা বলিব এবং চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব। আমি "গরীবের ঘরের স্ত্রী" হইতে চেষ্টা করিতেছি; আপনি আসিয়া দেখুন, তাহা সত্য কি না। * * *

অপরাধিনী শৈল।"

* * * * *

সুশীলকুমার শৈলকে লইয়া বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন। শৈল পিতার ভবিষ্যৎবাণী সফল করিয়া মায়ের নাম উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহা আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

জন্মাষ্টমী।

বসুদেব-দেবকীর শুভ পরিণয়
সমারোহে নির্ব্বাহিলা উগ্রসেন-সুত
কংস, সমর্পিয়া সুখে বিবাহ-যৌতুক—
মণিরত্ন আভরণ! মহার্ঘ বসন;
মঙ্গল আচার করি, প্রিয় ভগিনীরে
ভগিনী-পতির সহ আনিলা ভবনে,
নব-দম্পতীর চিত্ত সানন্দে তুষিলা।
মঙ্গল আচার করি কুলবালা-দলে
বরিলেন বর বধূ উলুধ্বনি দিয়া;
উড়িল কেতন রথে, প্রসাদে চৌদিকে
বাজিল কোমল বাগু মঙ্গলের তালে;
মুরলী গাইল গীত মঙ্গলের সুরে।
দ্বারে দ্বারে পূর্ণঘট, কদলীর তরু;
সারি সারি রাজপথে উড়িল পতাকা;
আনন্দ-উল্লাস-বাণী সবাকার মুখে,
জয় জয় জয় রবে মাতিল মথুরা।
নারদ অন্তরযামী, জানিলা আকাশে—
ঘটিল বিষম বাধা জগতের হিতে;
মিত্রভাবে বসুদেবে রাখে যদি রাজা
কংস পাপাশয়, নিজ রাজপুরী মাঝে—
সভবনে সমাদরে দেবকীর সহ,
তবেত হবেনা ভবে কৃষ্ণ-অবতার!
তবেত হবেনা ভবে ধর্ম্মের বসতি,
তবেত সুশীলবৃন্দ দুরন্ত পীড়নে
জ্বলিবেন অহরহঃ, রবে না নিস্তার,
দস্যুহস্তে দুর্ব্বলের পরিত্রাণ নাই!
কি হবে উপায় তবে, কিবা প্রতীকার,
মনে মনে সদুপায় করিলেন স্থির,

দেবঋষি, উড়িলেন মথুরা নগরে,
আশুগতি করিলেন কংস সম্ভাষণ।

পাদ্য, অর্ঘ্য, আশীর্ব্বাদে কিছুক্ষণ পরে,
বসিলেন দেবঋষি পবিত্র আসনে ;
কহিলেন, রাজা তুমি, রাজকার্য্য জান,
উদাসীন, তবু আমি পারিনা বলিতে।
পূর্ব্বাপর ভাল মন্দ করিতে বিচার—
বিচার দূরের কথা, করিতে ভাবনা—
নাহি তব কংসরাজ ! হেন অবসর।
কি যে ভাবিয়াছ তুমি উৎসবে মাতিয়া,
দেবকীর বিয়া দিয়া বসুদেব সহ,
ভাবিতে পারিনা রাজা ! কি বিষম ভ্রম !
দেবকীর গর্ভজাত তনয়ের হাতে
তোমার নিধন লেখা নিদান পুস্তকে !
তোমার মঙ্গল চাহি, সেই হেতু আজি
আসিয়াছি আশীর্ব্বাদ করিতে তোমায়।
সাবধান থাক রাজা, জানিনা নিশ্চয়,
দেবলোকে দেবলোক-মুখে শুনিয়াছি,
উদিবেন কৃষ্ণচন্দ্র দেবকী-উদরে।
পৃথিবীর ভার নাশে বিষ্ণু-অবতার।

চকিতে অদৃশ্য শূন্যে, যোগী দেবঋষি
নারদ। মাতিল কংস আতঙ্কে হিংসায় !
চারিদিকে কৃষ্ণ দেখে ভয়ে কাঁপে প্রাণ !
যত পাপ করিয়াছে সব পড়ে মনে,
মরিব না ভাবে, কিন্তু কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
এই ভাবে দিন যায়, পাপনিষ্ঠ মনে ;
সদা আসে মন্দ চিন্তা, তবু প্রাণে মায়া !
উন্মত্ত হইয়া যেন উঠে কংস রাজা।

বধিলেক পাপ কংস, দুরন্ত নির্দ্দয়,
আপনি বাঁচিবে ভেবে, শিশুহত্যা করে!
ক্রমেতে অষ্টম গর্ভ হইল সঞ্চার;
এই গর্ব্ভে কৃষ্ণ হবে, কল্পনাতে আনি,
অধিক নৃশংস মূর্ত্তি ধরিল বিক্রমে,
দারুণ দুরন্ত কংস; আশু আদেশিলা,
লোহার শিকলে বাঁধি যন্ত্রণা প্রদানি—
বসুদেব দম্পতীরে পুরীর বাহিরে—
বন্দী করি রাখা হয় অন্ধ কারাগারে।
তাহাই পালিত হইল, আদেশ যেমতি।
বিনা দোষে কারাগারে বন্ধনদশায়
সাধুসতী রহিলেন; রক্ষ নারায়ণ।
ভাদ্রমাস, কৃষ্ণাষ্টমী, নিশীথ সময়
উদয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবকীর কোলে।
শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ, চূড়াপরা শিরে
অঙ্গতেজে জ্যোতির্ম্ময় অন্ধ কারাগার।
কহিলা নবীন শিশু মাতাকে চাহিয়া,
পিতাকে সম্বোধি বাক্য, সকরুণ ভাব।
রূপান্তর নবশিশু নিমেষ পতনে।
দ্বিভুজ শ্যামলবর্ণ 'খোকা' মূর্ত্তি ধরি,
হাসি হাসি হাপু হুপু খেলিলেন হরি।
দূর হলো দম্পতীর নিগড় বন্ধন,
শিশুক্রোড়ে দাঁড়াইলা শান্ত বসুদেব।
কাঁদিলা দেবকী সতী চাহিয়া সন্তানে;
নীরবে রোদিলা সতী, সন্তানের মায়া!
সেই মায়া পুনর্ব্বার ভুলাইল সব।
সব দ্বার অবারিত, কেহ কোথা নাই,
দ্বারে দ্বারে প্রহরীরা ঘুমে অচেতন,
নিরাপদে বসুদেব কৃষ্ণ কোলে করি,
হইয়া যমুনা পার পশিলা গোকুলে;

যশোদার কোলে রাখি আপন পুত্রটি,
যশোদার কন্যাটিরে, লইলেন ক্রোড়ে।
আবার যমুনা পার। পারাপার বাণী
সংক্ষেপে কহিব কিছু, শাস্ত্র যাহা বলে।
অষ্টমীর দিবানিশি অন্ধকারময়!
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সুনীল আকাশ।
সঘনে জলদজাল, গরজন করি,
বিন্দু বিন্দু বরিষণে ভিজায় মেদিনী,
নিশাকালে ঘোর বৃষ্টি, মুষলের ধারে।
সেই জলে বসুদেব নবশিশু কোলে,
ভিজিয়া দাঁড়ান গিয়া যমুনার তীরে।
কেমনে হবেন পার, কতখানি জল,
কেমনে বা জানিবেন? জনপ্রাণী নাই!
সেই জলে ভগবতী শিবারূপ ধরি;
হাঁটিয়া হইলা পার, হাঁটু মাত্র জল।
দেখিয়া পুলকে পূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের পিতা
বসুদেব। অবিরাম জলদ গর্জ্জন,
শিরোপরে মুষলের ধার, বৃষ্টিধারা!
শাস্ত্র বলে, জগতের পতি ছিল কোলে,
সেই পুণ্য নাগপতি বাসুকী আপনি,
ছত্রধর হয়েছিলা বসুদেব পাছে।
বসুদেব প্রবেশিলা পূর্ব্ব কারাগারে,
কন্যাটিকে রাখিলেন দেবকীর কোলে।
জানা ছিল পূর্ব্ব কথা হাসিলা দেবকী।
প্রভাত হইয়া গেল জন্ম বিভাবরী।
স্বভাবে কাঁদিলা কন্যা উচ্চরব করি,
বাহিরে প্রহরী ছিল, শুনিল তাহারা।
কখন সন্তান হয়, জানিবার তরে
দলে দলে প্রহরীরা দিবা রাত্রি ঘোরে।
শিশুর ক্রন্দনধ্বনি প্রহরীরা শুনি,

রাজাকে সংবাদ দিল, কালব্যাজ নাই।
পাত্রমিত্রসহ কংস বার দিল আসি
কারাগার দ্বারে, আজ্ঞা দিল খোল দ্বার ;
আকর্ষিয়া আনো শীঘ্র দৈবকীর ছেলে,
অষ্টম গর্ব্ভের শিশু দেখিব কেমন !
দূতেরা একান্ত বাধ্য, কারাগৃহে পশি,
দেবকীর ক্রোড় হতে আকর্ষি মায়াকে
উপস্থিত করি দিল রাজার সম্মুখে।
রাজা ত দুর্জ্জয় কংস, যাহা ধরে করে ;
রুধিরাক্ত মেয়েটিকে হাতে করি তুলি,
আছাড়ি মারিতে যায় মর্ম্মর প্রস্তরে,
অবসরে এক মন্ত্রী উপদেশ দিয়া,
বলেছিলা বীরকংসকে ক্ষান্ত করিবারে—
শিশুহত্যা। মহারাজ ! পুত্র এতো নয়,
কন্যাটি বধিলে তব কি হবে পৌরুষ ?
কন্যা কভু মাতুলের হন্তা হইবে না।
কেহ কেহ বলে ছিল, (রাজপ্রিয় সখা,)
প্রাণ যুদ্ধে পুত্র কন্যা কে করে বিচার ?
অষ্টম গর্ব্ভের শিশু মাতুলে বধিবে,
দৈববাণী শোনা আছে, সে বাণীতে কিছু
পুত্র কন্যা ভেদাভেদ প্রকাশিত নাই ;
তবে এই মেয়েটাকে রাখিয়া কি ফল ?
যে পথে সকলে গেছে, সেই পথে যাক্।
উৎসাহ পাইল কংস, মারিল আছাড় !
পিছলিয়া শূন্যপথে উঠি গেলা মায়া !
যোগমায়া তিনি, দেবী, যশোদা জঠরে
জনম লইয়া ছিলা কংসবধ হেতু ;
সেই মায়া, মায়াবলে আজি মথুরায় !
শূন্যপথে অষ্টভুজা দুর্গারূপ ধরি—
কহিলেন যোগমায়া সম্ভাষি কংসেরে—

"তোমারে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।"
এই দৈববাণী শুনি চাহিল আকাশে
ঘূর্ণিত লোচন কংস, সন্ধানিতে অসি,
অন্তর্দ্ধানে যোগমায়া নির্ব্বাক্ সকলে।
কংসের কুটিল মতি অন্যপথে গেল!
কে আছে গোকুলে দেখ, সদ্যজাত শিশু,
বিনাশ তাহার প্রাণ, যে প্রকারে পার।
এই আজ্ঞা প্রচারিল কংসরাজ-মুখে,
ছুটিল অসুরবৃন্দ মায়ামূর্ত্তি ধরি,
অঘাসুর বকাসুর বৃষাসুর আদি
কত কত মায়ারূপী গিয়াছিল ব্রজে,
এখানে বর্ণনা তার প্রয়োজন নাই।
বিষ দিতে গিয়াছিল পূতনা রাক্ষসী,
বাছা বলে কোলে তুলে যশোদানন্দনে,
তাহাও পুরাণে আছে, এখানে বিফল।
জন্মলীলা আমাদের ধর্ম্মের আচারে
গৃহীত হইয়া আছে সেই অনুরাগে,
গাহিনু জনম-গীত, শক্তি অনুসারে
এইবার নন্দসুতে করিয়া স্মরণ,
বলি আমি নমঃ নমঃ নমো নারায়ণ!

সমাপ্ত।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিধবা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সে কতদিন জানি না,—আমার বিবাহ কবে হইয়াছিল মনে নাই; কিন্তু আমার মনে আছে, যখন আমি দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করি, তখন আমার স্নেহময়ী জননী আমার জন্য কত কাঁদিতেন—আমাকে দেখিলে পিতার চক্ষু ছল ছল করিত; যেন রুদ্ধ শোকাবেশ নয়নদ্বয় হইতে নিঃসৃত হইয়া আমায় ভাসাইতে চায়! কৈ, তখন ত আমার মনে কোনও চিন্তা উদিত হইত না? অনন্ত সুনীল গগনের কোলে ক্ষুদ্র পাখিটীর ন্যায়, উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীবক্ষে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায়, কোলাহলময় সংসারে আমি নিমজ্জিত থাকিতাম! আমার নিজের স্বত্বা বা অবস্থা উপলব্ধি করিবার অবসর পাইতাম না!

আমি নিতান্ত হতভাগিনী; নতুবা এইটুকু সুখও বিধাতা আমায় ভোগ করিতে দিলেন না কেন? স্বামীসোহাগ কেমন জানি না, দাম্পত্য-প্রেম সুখময় কি দুঃখময় জানি না, সন্তান-বাৎসল্য হৃদয়ে কি অমৃত-মন্দাকিনী প্রবাহিত করে জানি না! এ সমস্ত আমার আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে না! আমি ত কখনও আকাঙ্ক্ষা করিও নাই! বারিপূর্ণ মেঘের ন্যায় যৌবন সমাগমে আমি আপন মনে হাসিয়া খেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিলাম। বিধাতা! ইহাও কি তোমার সহ্য হইল না? আকাশের চাঁদ আছে, পুণ্যতোয়া কলনাদিনী জাহ্নবীপ্রবহমানা শীতল সমীরণ আছে, সরোবরে প্রফুল্ল সরোজিনী আছে, কুমুদ, কহ্লার, জাতি, যূথি, শেফালিকা গোলাপ, রজনীগন্ধ—আর কত নাম করিব,—আছে, তবে বিধাতার রাজ্যে ভোগ্য-বস্তুর অভাব কোথায়? যখন প্রথম আমার দগ্ধাদৃষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তখন আমিও মনকে তাই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলাম! কিন্তু কৈ, এখন ত ভাগীরথী-শীকর-সম্পৃক্ত মন্দানিল, কৌমুদী-বিধৌত জাহ্নবী-জল, পুষ্প-পরাগ-বহমান গন্ধবহ আমার চিত্ত-বিনোদন করিতে পারে না? কেন, কে বলিবে কেন?—

আমি কুলীন ব্রাহ্মণ-তনয়া। পিতার কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত নির্ম্মম হৃদয়ে পিতা আমায় বলিয়া দিয়াছেন! আর কেন, আমার পাপের

ভার বৃদ্ধি করি, আমার পিতামাতা আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, আমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা—এখন স্বর্গবাস করি-তেছেন; আমি অভাগিনী, তাঁহাদের কার্য্যসম্বন্ধে বিচার করিবার কে? তাঁহারা বোধ হয় ভালই করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেই আমার স্বামীদেবতা—হিন্দুমতে স্ত্রীজাতির ঈশ্বর—আমার চিরবিরহে দগ্ধ হইবার জন্য এই শোক তাপ জরাময় সংসার তিরাশী বৎসর বয়সে (অকালে) কোন ব্যাধি না হইলেও, অজ্ঞানে ত্যাগ করিলেন!

আমার পিতা বরাবর বিদেশে থাকিতেন; মার নিকট শুনিয়াছি, বাঙ্গালা দেশের কোন বিষ্ণুপুরে আমাদের বাড়ী ছিল, আমি কখনও সে দেশ দেখি নাই—আর কখনও দেখিবার আশাও নাই। আমার যখন পূর্ণযৌবন, তখন এক বৎসরের মধ্যে পিতামাতা উভয়ে আমায় ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি তাঁহাদের একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব আমার জন্য রাখিয়া গেলেন। আমি এ সমস্ত লইয়া কি করিব? আমি ত সংসারের কিছুই জানি না; আমার মন্দভাগ্য হইয়াছিল বলিয়া, জননী আমায় কখন কিছু করিতে দিতেন না—আমি অকূল সমুদ্রে ভাসিলাম!

যে ব্যক্তি সমুদ্রে ভাসিতে থাকে, সামান্য তৃণকেও সে অবলম্বনীয় মনে করে, আমারও তাহাই হইল; আমি আমার পিতার জনৈক বন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমার পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমার ভরণ-পোষণের কোনও অভাব হইত না; কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ করিবে কে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয় বলিতে পারেন, আমি জীবনী লিখিতেছি কেন? কেন লিখিতেছি জানি না, হৃদয়ে তুষানল সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, আমি তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। আমি দুঃখিনী, অশিক্ষিতা বঙ্গ-ললনা, আমার জীবন-কাহিনী শুনিয়া কাহারও কোনও লাভ নাই! কিন্তু কি করি, এ জ্বালা যে আর সহ্য করিতে পারি না! দুঃখের কথা শুনিবার লোক পাইলে শান্তি পাওয়া যায়; দুঃখকাহিনী শুনিয়া 'আহা' বলিলে অনেক দুঃখ লাঘব হয়! ভাই পাঠক, তুমি এ কথা বিশ্বাস কর কি?

মনে কর দেখি ভাই, প্রভু কর্তৃক নির্বাসিত যক্ষের কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল? বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, যক্ষ দূরস্থিত প্রণয়িনীসকাশে জড়মেঘকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিল। আমারও সেই দশা, আমার জীবনে 'রোমান্স' নাই, আমার জীবনী 'হরিদাসের গুপ্ত-কথার ন্যায় লোমহর্ষণ ঘটনাবলী পূর্ণ নহে—তথাপি আমার এ আগ্রহ দেখিয়া বিদুষীমণ্ডলে আমি উপহসিতা হইব সন্দেহ নাই। তবু বলি—ভাই, একটু শোন।

আমি বাল্যকালে একটু লেখা-পড়া শিখিয়াছিলাম। অনেক বাঙ্গালা বই পড়িয়াছি। পিতা আমার জন্য 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী' লইতেন। ইহাতে যে কোনও নূতন পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিলেই আমি পিতাকে বলিতাম, তিনিও পুস্তক আনাইয়া দিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতেন। কত ছাই ভস্ম, কত কি পড়িতাম। এখনও কত কি পড়ি, কৈ শান্তি ত পাই না, এ পোড়া হৃদয়ে কি কখনও শান্তিবারি সিঞ্চিত হইবে না?

পাঠককে আর অধিক বিরক্ত করিব না। আমার পিতার বন্ধুটী এক বৎসর মধ্যে তাঁহার বিষয়-বুদ্ধির প্রাখর্য্যবশতঃ আমার পিতৃত্যক্ত সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া, অপার করুণাবশে বন্ধু-কন্যাকে অনুগ্রহ করিয়া পালন করিতে লাগিলেন! তাঁহার এই অনন্যসাধারণ বন্ধু-প্রেমের কিছুমাত্র প্রতিদান দিই, আমার এ ক্ষমতা নাই। তবে প্রত্যূষে উঠিয়া আবশ্যক গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, ৮টার মধ্যে কর্ত্তার দুলালটীকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন না দিতে পারিলে, গৃহিণীর নথ একটু দুলিত, কর্ত্তার গলার স্বর একটু সপ্তমে চড়িত, আর পিসীমার সে দিন হস্তকণ্ডূতি উপস্থিত হইত। তাহার পর কর্ত্তাদের আহারাদি সমাপ্ত হইলে তাঁহাদের সকলের পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি পরিস্কৃত করিবার ভার আমার উপর ছিল; অবশেষে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্বপাকে স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকাদি ব্যঞ্জন সমভিব্যাহারে লক্ষ্মীদেবী দ্বারা এই দগ্ধোদর পরিপূর্ণ করিয়া পুনরায় বৈকালিক জলযোগের আয়োজন করিতে হইত। বলিতে কি, ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১০টার মধ্যে আমার তিলার্দ্ধ অবসর ছিল না। এত করিয়াও আমি কাহারও মন পাইতাম না—আমার উপর সকলেই বিরক্ত—কেন হইবেন না, আমি যে হিন্দু-বিধবা, আমায় ঘৃণা না করিলে অনন্ত নরকবাস অবশ্যম্ভাবী!

তোমরা বল দেখি গা! এমন করিয়া মানুষ কতদিন স্থির থাকিতে পারে? আত্মীয়স্বজনবিহীনা হিন্দু-বিধবা কি কষ্টে জীবন যাপন করে, তাহা অন্তর্য্যামী ব্যতীত কেহই জানেন না! এত কষ্টের উপর এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিয়া, যদি সময় সময় আমার একটু চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, একটু কবিতা পড়িতে যদি সাধ হয়, তবে আমি ক্ষমার্হা কি না? একদিন, তখন রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা, আমি আপন মনে একটু সুর করিয়া পড়িতেছি;—

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে!
না হ'লে এমন দশা নারী আর কই রে;
মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ!
রমণীর চিরসাধ চিকুর বন্ধন,
হাদে দেখ সে সাধেও বিধি বিড়ম্বন!"—

এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি, আর আমার দ্বারে কাহার মৃদু মৃদু করাঘাত শব্দ পাইলাম। ভয়ে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—কিসের ভয় বুঝিতে পারিলাম না। তবু কি জানি কেন, বুকের মধ্যে যেন একটা প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল। আমি আস্তে আস্তে কবাট উন্মুক্ত করিলাম। হরি! হরি! এ কি! এ যে আমার প্রভু—আমার মৃত পিতার বন্ধু, আমার করুণাময় প্রতিপালক!

এ অবস্থায় প্রভুকে দেখিয়া আমার ভয় বাড়িতে লাগিল, এত রাত্রে সংসারের তৈল অপব্যয় করিয়া আমি পুস্তক পাঠ করিতেছি, দেখিয়া ত প্রভু তিরস্কার করিলেন না? অনেকক্ষণ পরে প্রভু কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "সৌদা—সৌদামিনী—আমায় বাঁচাও।" পাঠক! আর শুনিয়া কাজ নাই, অতঃপর আমার পিতৃস্থানীয় পিতৃবন্ধু যে ঘৃণিত প্রস্তাব করিলেন, আমার রূপশিখায় তিনি দগ্ধপক্ষ হইয়া যন্ত্রণাময় জীবন বহন করিতে পারিতেছেন না, ইত্যাদি আর শুনিয়া কাজ কি! আমি কি উত্তর দিব? বলিলাম, "পিতঃ! আমায় ক্ষমা করুন।"

প্রভু আমায় ক্ষমা করিলেন, জন্মের মত ক্ষমা করিলেন, কিন্তু পরদিন আমার ক্ষুদ্র পোর্টমেণ্টোটী লইয়া আমায় ইহজীবনের জন্য প্রভুর পুণ্যময় সংসার ত্যাগ করিতে হইল! আমি কত কাঁদিলাম, কিন্তু আমার কথায় কে কর্ণপাত করিবে? দরিদ্রের ক্রন্দন বুঝি পরমেশ্বরও গ্রাহ্য করেন না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তার পর কি হইল? সে পাপ চিত্র আর দেখাইতে পারি না! শুনিয়াছি, নিজমুখে নিজকৃত অপকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতে পারিলে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। কিন্তু আমি কেমন করিয়া ভদ্র পাঠক-পাঠিকার নিকট আমার সে নরক-কাহিনী বিবৃত করিব?

আর আমার মনের বল নাই, হৃদয়ের পবিত্রতা নাই, জীবে প্রীতি নাই, মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব নাই, নরকের ভয় নাই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই! হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; কিন্তু বাহিরে আমায় দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। বিধাতা আমায় সুন্দরী করিয়া গঠন করিয়াছিলেন, এই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে। আমি সংসার-বাণিজ্যক্ষেত্রে আমার সৌন্দর্য্যপণ্য ক্রয় করিবার জন্য অসংখ্য ক্রেতা পাইয়াছি, শারীরিক সুখের চূড়ান্ত উপভোগ করিয়াছি—কিন্তু হৃদয়ে যে অশান্তি বিরাজমান, তাহা যে সহ্য হয় না! ভগবন্! এ নরক-যন্ত্রণার অবসান কর, আমায় মরিতে বল দাও!

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

উন্নতি না অবনতি ?

বৈশাখ মাস; কলিকাতায় বেজায় গরম পড়িয়াছে। পাকাবাড়ী ও খোলার ঘর ভিন্ন ত কলিকাতায় আর খড়ের ঘর দেখা যায় না। গাছ লতাপাতার বংশ প্রায় ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। তবে কোম্পানীর কৃপায় মধ্যে মধ্যে একটু একটু ছায়া ও হাওয়া মিলে। কলের জল, কলের হাওয়া, কলের পাইখানা ও কলে প্রস্তুত-খাদ্য প্রভৃতির কলে কলে কলিকাতা বিকলপ্রায়। শুধু কলিকাতায় কেন, সুসভ্য সহর মাত্রেরই এই দশা। এখানে প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈচিত্র কিছুই অনুভূত হয় না। জীবন-সংগ্রামের এই ঘোর দুর্দ্দিনে সহরবাসী কেরাণী বেচারীগণকে ঠিক্ ৯টায় বাহির হইতেই হইবে। এখন গরমই বোঝে কে? ঠাণ্ডাই বোঝে কে? তাই এই দারুণ গ্রীষ্মে কলিকাতার বাবুদের বড়ই কষ্ট; বিশেষতঃ যাহারা স্থূলকায়, সারা-দিন হংসপুচ্ছ ও মস্যাধারের যুদ্ধ সমাপনান্তে তাই বাবুরা একটু হাওয়া খাইবার ইচ্ছা করেন। সে দিন হেদোর ধারে দেখি, একটী স্থূলশরীরী বাবু হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন। সঙ্গে হ্যাট কোটধারী একটি সাহেব বাবু।

সেটী সাহেব কি বাবু প্রথম বুঝা গেল না। তবে কথায় বুঝিলাম, খাঁটী বাঙ্গাল। কিন্তু বিলাত ফের্‌তা। উভয়ের নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল। আমিও বদ্ধ বাঙ্গাল। বিলাতের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য তাহাদের পিছু পিছু বেড়াইতেছিলাম। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট; কোথায় বিলাতের কথা শুনিব, না উভয়ের ঘোর দার্শনিক বিচার আরম্ভ হইল শুনিতে লাগিলাম। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহাদের কথোপকথন যতদূর স্মরণ আছে, তাহাই লিখিলাম।

বাবুটীর নাম রমেশ, আর হ্যাটকোটধারী সাহেব বাবুটীর নাম (Mr. Pal) মিষ্টার পাল। রমেশবাবু বলিলেন, Mr. Pal (মিঃ পাল) শুনিয়াছি, তুমি নাকি বিলাতে গিয়ে Philosophy (দর্শনশাস্ত্র) পড়িয়াছিলে? ভাল, পাশ্চাত্যদর্শন ও আমাদের হিন্দুদর্শন এ উভয়ের মধ্যে কোন্ মত তোমার ভাল বোধ হয়?

মিঃ পাল। বিলাত গিয়ে সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় ফেল হয়ে তৎপর আমি এক বৎসরকাল (Oxford) অক্সফোর্ডে দর্শন পড়ি। তাতে আমার বোধ হয়, ওরূপ দর্শনশাস্ত্র আর নাই। ডারবিনের (Darwin's) evolution theory (ক্রমোন্নতি বাদ) যেন জগতের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছে।

রমেশ। তা হবে। শুনিয়াছি, পাশ্চাত্যদার্শনিকেরা নাকি বলেন, জগৎ কেবল উন্নতির দিকেই যাচ্ছে। কেবল বিকাশ, কেবল বিকাশ। বানর হইতে মানুষের বিকাশ, অসভ্যতা হইতে সভ্যতার বিকাশ, জড় হইতে চৈতন্যের বিকাশ। আবার এখন শুনিতেছি যে, স্ত্রী হইতেই নাকি পুরুষের পর্য্যন্ত বিকাশ হইয়াছে। এ সব ভাই সত্য না কি?

মিঃ পাল। রমেশবাবু, আপনি যাহা যাহা বল্লেন, সব সত্য। একদিন অক্সফোর্ডে প্রফেসার টারন্‌বুল সাহেবও আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। গাছ লতা পাতা ফুল ফল কীট পতঙ্গ সরীসৃপ পশু বানর ওরাঙ্গওটাঙ্গ এবং মানুষ, এ সকলই সেই ক্রমোন্নতির (evolution) সিঁড়িমাত্র। এর শেষ নাই। জড়জগতে যেমন ক্রমোন্নতি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। স্পেন্‌সার প্রভৃতি দার্শনিকেরা সেই মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের সমর্থনে বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

রমেশ। ভাই, আমি ফিলজফি টপি কিছু জানি না; কিন্তু আমার

সহজজ্ঞানে এই বোধ হয় যে, যাহাকে তোমরা ক্রমোন্নতি বল, ক্রমাবনতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একত্র পদক্ষেপ করিতেছে।

মিঃ পাল। ছি! ছি! ও কি কথা বলেন? মহাকবি টেনিসন্ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন;—"Our life increases with the process of the suns". অর্থাৎ দিনের পর দিন আমাদের জীবন ক্রমেই বিকাশ লাভ করিতেছে। তাহাদের মত কি কখনও মিথ্যা হতে পারে?

রমেশ। তা হবে। কিন্তু আমাদের বেদান্তদর্শন বলে, সকলই সেই এক "সৎ" হইতে জন্মিয়াছে। সেই "সৎ" যে কারণেই হোক্, বহুধা হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ভঙ্গে তরঙ্গিত হইতেছে, অর্থাৎ "অসৎ" রূপে প্রতিভাত হইতেছে। "সৎ" এর অসৎ ভাব ত উন্নতি না বুঝাইয়া ক্রমাবনতিই সূচনা করিয়া দিতেছে।

মিঃ পাল। রেখে দিন আপনাদের বেদান্ত ফেদান্ত। কান্ত, ডোসেন্, হেগেল্, কোমট্ এবং স্পেন্সার প্রভৃতি মহাদার্শনিকগণ যখন ও কথা বলেন নাই, তখন বেদান্তকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

রমেশ। ভাল, আমাদের সাংখ্য-দর্শনেও ত ক্রম-বিকাশবাদের কথা আছে। তবে তাহা পাশ্চাত্যমতের অনুরূপ মত। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মপুস্তকেও আছে যে, প্রথমে আদম্ ও ইভ্ নিতান্ত পবিত্র ছিল। জ্ঞানের ফল খেয়ে নাকি মহাপাপে পাপী হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মের আদিসৃষ্টির বিবরণও ত ঠিক্ ঐরূপ। আর ভাই, আমাদের হিন্দুধর্ম্মও প্রথমেই সত্য, তৎপর ক্রমে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, লোক ক্রমে সৎ হইতে অসতে, সত্য হইতে অসত্যে, পুণ্য হইতে পাপে অধোগতি লাভ করিতেছে।

মিঃ পাল। পুরাণ ও বাইবেলাদির আষাঢ়ে গল্প রেখে দিন। আমাদের ফিলজফি ওরূপ বলে না। ফিলজফি বলে, "there is only evolution. সবই ক্রমোন্নতির পথে যাচ্ছে।"

রমেশ। তা হবে। স্বীকার করিলাম, যেন অবনতি হইতে উন্নতির দিকে জগৎ যাচ্ছে। সে উন্নতির শেষ কোথায়?

মিঃ পাল। তার আবার শেষ কি? সে Infinite অনন্ত, অসীম।

রমেশ। এখানে তোমার যুক্তি কি?

মিঃ পাল। ইহা যুক্তির বাহিরে। সহজজ্ঞানগম্য।

রমেশ। দার্শনিক হইয়া তুমি যুক্তি দেখাইতে না পারিলে আমিও ত বলিতে পারি, জগৎ ক্রমে অধঃপাতে যাচ্ছে; ইহাও ত আমার সহজ জ্ঞানগম্য। আমি বলি, উন্নতিই আমাদের স্বভাব। আমরা ক্রমাবনতির চক্রের মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে আবার সেই উন্নতির সাক্ষাৎ লাভ করিব। তুমি অধোগতিটাকে (Involution) প্রথম ধরিয়া লইতেছ কেন? তাহাতে আমাদের বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তিবাদেও ত দোষ পড়ে। কারণ, যাহার স্বভাবই অসৎ, তাহার সৎ হইবার আর আশা নাই। বাবুই গাছে আঁব ফলে না। আমি তাই বলি, উন্নতিই আমাদের স্বভাব।

মিঃ পাল। আপনার কথায় বুঝিলাম, ভারতীয় দার্শনিকেরা উন্নতি-টাকেই প্রথম ধরিয়া লইয়াছেন; আর পাশ্চাত্যদার্শনিকেরা অনুন্নতি-টাকে প্রথম অবস্থা ধরিয়া লইয়াছেন। এইমাত্র প্রভেদ।

রমেশ। ঠিক্ কথা। কিন্তু এ উভয় মতের মধ্যে কোন্‌টী অধিক মর্ম্ম-গ্রাহী বল দেখি?

মিঃ পাল। কেন? এ উভয়ই তুল্য বলবান্।

রমেশ। তা নয়। যদি চিরশান্তি, নির্ব্বাণ, ঈশ্বরলাভ বা একত্বানু-ভূতিই মানব-জীবনের চিরলক্ষ্য হয়, তবে হিন্দুদার্শনিকগণকেই সমধিক উচ্চাসন দিতে হয়। তোমাদের ফিলজফিও ত বলে যে, যার যা স্বভাব, তাহা ছাড়িতে পারে না। এক যুগচক্র পরিবর্ত্তনের পর after a cycle সকলেই আবার স্ব স্ব রূপে অবস্থিত হয়। তোমাদের staticsও বলে যে, গতি motion এক সাইকল cycle পরে আবার সেখানেই আসে। একটা সরল রেখাকে বর্দ্ধিত করিলে নাকি আবার বক্রপথে ঘুরিয়া সেখানেই আসে। তবে অসৎ যদি জীবের স্বভাব হয়, তবে ত সৎ স্বরূপ লাভের আর আশা থাকে না। কিন্তু সৎ হইতে আমাদের আরম্ভ হইয়াছে ধরিলে তবে সৎ স্বরূপে আমাদের পর্য্যাপ্তি হওয়া যুক্তিসম্মত।

মিঃ পাল। আপনি যাহা বলিলেন, আধ্যাত্মিক অর্থে তাহা সঙ্গত হইলেও আধুনিক সভ্যজগতের দিকে চাহিলে দেখা যায় যে, জগৎ উন্নতির পথে চলিয়াছে।

রমেশ। তাই বা বলি কিসে? সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ত বিপদও বাড়ি-তেছে। এ সভ্য জগতেও অত্যাচার অবিচারের ত্রুটী নাই। ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে মুহূর্ত্তমধ্যে লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণ যায়। "বলবান্ নিরন্নের মুখের

গ্রাস কাড়িয়া লয়, এই ভাব চিরকালই জগতে আছে, ছিল ও থাকিবে। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্মের সমষ্টি চিরকাল একই আছে। তবে কোন যুগে কোনটা একটু বেশী, কোনটা একটু কম হয়, এইমাত্র প্রভেদ।

মিঃ পাল। আপনার কথায় আজ আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি অদ্য হইতেই হিন্দুদর্শন পড়িতে আরম্ভ করিব এবং আপনার কথাগুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিব।　　　　শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাধ-পূর্ণ।

(১)

কোন সাধ নাহি রে আমার!
সব সাধ ফুরায়েছে,　　　　মোহঘুম ভেঙ্গে গেছে,
জাগিয়াছি, ঘুমাব না আর!

(২)

লীলাখেলা সাঙ্গ সমুদয়।
শৈশবে শৈশবখেলা,　　　　খেলিয়াছি ছুটিবেলা,
ভুলি নাই, সব মনে হয়!

(৩)

তার পর যৌবনের খেলা!
যুবতী কামিনী সঙ্গে,　　　　খেলিয়াছি নানারঙ্গে,
রঙ্গে রঙ্গে কুরঙ্গের মেলা!

(৪)

বেড়েছিল ধনের পিয়াসা!
ধর্ম্মাধর্ম্ম মানি নাই,　　　　হিতাহিত বুঝি নাই,
তবু নাহি মিটিয়াছে আশা!

(৫)

রজতের মোহিনী মায়ায়—
মোহিয়া মুর্খের মত,　　　　কু-কার্য্য করেছি কত,
ঠকায়েছি কত অবীরায়!

(৬)

সাজিয়াছি জাল ম্যানেজার!

(৭)

পরধনে ধনী হইয়াছি !
ঠকায়েছি কত জনে, সব কথা আছে মনে,
ঠকাইয়ে কত হাসিয়াছি !

(৮)

ধর্ম্মের মুখোস মুখে দিয়া—
রঙ্গভূমে নামিয়াছি, রঙ্গে ভঙ্গে নাচিয়াছি,
ধনলোভে তাথিয়া তাথিয়া !

(৯)

আজি শুধু অনুতাপ সার !
সে ধন কোথায় এবে, কিছু নাহি পাই ভেবে,
চারিদিক্ হেরি অন্ধকার !

(১০)

কালবশে বৃদ্ধ হইয়াছি।
অচল ইন্দ্রিয়গণ, বিরাম লভে না মন,
সদা ভাবি, কেন বেঁচে আছি !

(১১)

বেঁচে আছি যাঁহার ইচ্ছায়—
তাঁহার চরণে মন, করিবারে সমর্পণ,
বাসনা আসিছে এ দশায়।

(১২)

তুমি প্রভু নিত্যনিরঞ্জন !
তোমারে ভুলিয়া হরি, ধর্ম্মপথ পরিহরি,
বিপথে করেছি বিচরণ !

(১৩)

দেহ নাথ, দেহ পদাশ্রয় !
আর আমি ভুলিব না, কূট তর্ক তুলিব না,
রাঙ্গা পদে মতি যেন রয়।

(১৪)

কোন সাধ নাহি রে আমার !
সব সাধ ফুরায়েছে, মোহঘুম ভেঙে গেছে,
জাগিয়াছি ঘুমাব না আর !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।)

দশম বর্ষ। } ১৩০৮ সাল, আশ্বিন। { ৩য় সংখ্যা।

ভারত-রত্নসার।

বৈর-নির্য্যাতনে পরিতপ্ত যুধিষ্ঠিরের হৃদয়, শৌনক ঋষির বিষয়-বৈরাগ্য-সূচক উপদেশে প্রশান্ত হইল না, বরং ততোধিক উত্তপ্ত হইল, তখন যুধিষ্ঠির কহিতে লাগিলেন,—

২১। নার্থোপভোগলিপ্সার্থমিয়মর্থেপ্সুতা মম।
ভরণার্থন্তু বিপ্রাণাং ব্রহ্মন্! কাঙ্ক্ষে ন লোভতঃ॥ ৫০॥

হে ঋষে! আমার এই ধন-লালসা নিজের উপভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, পরন্তু অতিথি ব্রাহ্মণগণের পোষণার্থই আমি ধনাকাঙ্ক্ষা করিতেছি, লোভপ্রযুক্ত নহে॥

২২। কথং হ্যস্মদ্বিধোব্রহ্মন্! বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমে।
ভরণং পালনঞ্চাপি ন কুর্য্যাদনুযায়িনাং॥ ৫২॥

হে ঋষে! বলুন দেখি, আমার মত লোক গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া অবশ্য ভরণযোগ্য ভৃত্যবর্গাদির পালন কিরূপে না করিয়া থাকিতে পারে॥

২৩। তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
সতামেতানি গেহেষু নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥ ৫৪॥

হে ঋষে! গৃহস্থভবনে উপস্থিত সজ্জনেরা অসমর্থ গৃহস্থ যদি আসনের অভাবে উপবেশনার্থ তৃণমুষ্টিও প্রদান করে, তাহা না থাকিলে হস্তদ্বারা মার্জ্জিত একটুকু ভূমিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়, পাদপ্রক্ষালনার্থ বা ভক্ষ্য দ্রব্যের অভাবে পানার্থ উদকমাত্রও প্রদান করে, তদভাবে যদি দুইটি বিনয়পূর্ণ মধুর বচনও প্রয়োগ করে, তাহাও প্রত্যাখ্যান করে না॥ ২৩॥

২৪। দেয়মার্ত্তস্য শয়নং স্থিতশ্রান্তস্য চাসনং।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনং॥ ৫৫॥

আর্ত্তের শয়নার্থ শয্যা, শ্রমাতুরকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল ও ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ২৪॥

২৫। চক্ষুর্দ্দদ্যান্মনোদদ্যাদ্বাচং দদ্যাৎ সুভাষিতাং।
উত্থায় চাসনং দদ্যাদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৫৬॥

উপস্থিত অতিথিকে দৃষ্টি দান করিবে—অবলোকন করিবে, তাহার অভ্যর্থনায় মনোযোগ করিবে, মিষ্ট আলাপ করিবে, উঠিয়া আসন প্রদান করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম॥ ২৫॥

২৬। অগ্নিহোত্র মনড্বাংশ্চ জ্ঞাতয়োঽতিথি বন্ধবাঃ।
পুত্রা দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চ নির্দ্দহেয়ুর পূজিতাঃ॥ ৫৭॥

গৃহস্থের স্থাপিত "অগ্নিহোত্র" যজ্ঞের অগ্নি, গো, বৃষ, জ্ঞাতি, অতিথি, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র, ভার্য্যা এবং ভৃত্যবর্গ যদি সমুচিত আদর না পায়, তবে তাহাদের অভিশাপে গৃহস্থ সমূলে বিনষ্ট হয়॥ ২৬॥

২৭। আত্মার্থে পাচয়েন্নান্নং ন বৃথা ঘাতয়েৎ পশূন্।
ন চ তৎ স্বয়মশ্নীয়াৎ বিধিদ্যন্ন নির্ব্বপেৎ॥ ৫৮॥

কেবল নিজের উদর পূরণার্থ অন্ন পাক করাইবে না, দেবার্চ্চন ব্যতীত বৃথা পশু হিংসা করিবে না, এবং যাহা যথাশাস্ত্র দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট না হইয়াছে, সেই হিংসিত পশুর মাংস নিজে ভোজন করিবে না।

২৮। শ্বভ্যশ্চ শ্বপতেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ভুবি।
বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ংপ্রাতশ্চ দীয়তে॥ ৫৯॥

কুকুর, চণ্ডালাদিনীচজাতি ও পক্ষীদিগকে ভূমিতে, দিবা ও রাত্রিতে দুই বেলাই যথাসাধ্য অন্নদান করিবে, ইহাকেই গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য "বৈশ্বদেব যজ্ঞ" কহে॥ ২৮॥

২৯। যোদদ্যাদপরিক্লিষ্ট মন্নমধ্বনি বর্ত্ততে।
শ্রান্তায়াদৃষ্টপূর্ব্বায় তস্য পুণ্যফলং মহৎ॥ ৬২॥

যে ব্যক্তি আর কথনো উপস্থিত হয় নাই এমন শ্রমাতুর পথিককে অক্লেশে অন্নদান করে, তাহার পুণ্যফল অতি মহৎ॥ ২৯॥

৩০। এবং যো বর্ত্ততে বৃত্তিং বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমে।
তস্য ধর্ম্মং পরং প্রাহুঃ কথং বা বিপ্র! মন্যসে॥ ৬৩॥

গৃহস্থাশ্রমে থাকি। এই প্রকারে যে ব্যবহার করে, ধার্ম্মিকগণ ইহাই তাহার পরম ধর্ম্ম কহিয়াছেন, হে ঋষিবর! শৌনক! এ সম্বন্ধে আপনারই বা কি মত? ॥ ৩০ ॥

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

আগমনী।

আবর্ত্তিল বর্ষচক্র, নব কন্যারাশি,
নব-বর্ষরাশিচক্রে দেখা দিল আসি।
এই রাশি মাতুর্গার আদরের মাস,
বঙ্গভূমে বিশেষতঃ; প্রশস্ত ভারতে।
গৃহে গৃহে বিরাজেন দেবীব্রহ্মময়ী,
ভাগ্যবলে তথা তথা, ভাগ্যবান্ যাঁরা,
সাদরে করেন পূজা রাঙ্গা পা-দুখানি।
চিরপ্রথা,—মেনকার হৃদয়-মন্দিরে
আশাবাসে, হেরিবারে উমা চন্দ্রাননা—
ভবানী আনন্দময়ী—কুমারীরূপিণী।
আনিবারে গিরিপুরে কন্যা গিরিজারে,
বিনাইয়া গিরিবরে বলেন মেনকা
গিরিরাণী; সুখ সনে শোক মিশাইয়া,
কৈলাস শিখর হৈতে তিন দিন তরে;
আঁধারী কৈলাসপুরী আসেন অম্বিকা।
অধুনা সে চিরপ্রথা নব রূপ ধরি—
বঙ্গগৃহে শত শত মেনকা সাজায়;
কন্যাভাবে মহামায়া অর্চ্চিবার হেতু,
ভাগ্যবতী গৃহিণীরা আনন্দে মগনা।
এসো মা আনন্দময়ি আনন্দ ভবনে!
অর্পিবে কুসুমাঞ্জলি তুয়া রাঙ্গা পায়,
আনন্দে ভকতবৃন্দ বড় সাধ মনে।
নিরানন্দ বঙ্গদেশ, দুরন্ত দুর্দ্দিন!

কর মা আনন্দময়ি—নিরানন্দ নাশ,
বিতর আনন্দকণা সুখের আশ্বিনে।
হাসি খেলা ভুলিয়াছে বঙ্গের সন্তান,
হা অন্ন হা অন্ন রব সবাকার মুখে
শুনিছ মা অন্নপূর্ণা, অন্তর্যামী তুমি;
কেমনে সহিছ দুর্গে! মায়ের পরাণে?
ফেলিছে চক্ষের জল, কাঁদিছে বিরলে
মা তোমার পুত্রকন্যা; নিরানন্দ সদা
তারা সব। দয়া করি এসো দয়াময়ি,—
দয়া করি মুছাইয়া দাও নেত্রজল,
জানাইয়া দাও সবে দয়াময়ী নাম,
বিতর আনন্দ-কণা করুণা বিতরি
সদানন্দময়ী তুমি বিখ্যাত সংসারে।
চিরদিন থাকিবে না; চিরদিন কেহ
পারিবে না রাখিবারে ধরিয়া চরণে,
চাহে শুধু বঙ্গবাসী পূজিতে তোমায়
তিন দিন তিন রাত্রি মনের উল্লাসে।
সে উল্লাস তুমি বিনা ত্রিভুবন মাঝে
কেহ পারিবে না দিতে উল্লাস প্রসূতি!
দেহ মা আনন্দ দেহ ত্রিদিবা রজনী।
শোক তাপ বিভীষিকা ভুলাইয়া দাও,
তিন দিন, ত্রিনয়নি, এই ভিক্ষা করি!
বর্ষে বর্ষে দয়া হয়, হইবেও দয়া
এ বরষে, জানি তাহা, তথাপি কামনা
ভকতের প্রতিমাতে হয়ে আবির্ভূতা,
মায়াজালে মুগ্ধ কর মায়িক সংসারে,
ঘুচাইয়া নিরানন্দ, আনন্দ বিতর!
আমিও করিব পূজা, এসো মহামায়া,
দশভুজা রূপ ধরি হৃদয়-মন্দিরে।
প্রতিমা আমার নাই, জানি না গড়িতে,

মানসে পূজিব তোমা, সাধ্য অনুসারে!
ছত্রভঙ্গ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ সঘন,
অনাবৃষ্টি, মহাবন্যা, নিত্য নব ব্যাধি
দগ্ধ করিতেছে নিত্য ইহ বঙ্গধাম,
এই সব ভুলে যাব, এই সব কথা
কারো মুখে মহামায়ি! শুনিব না কাণে,
রোগ শোক পরিতাপ চক্ষে হেরিব না;
তুমি মা আনন্দময়ী, তব আগমনে
কেবল আনন্দময় হেরিব সংসার।
ত্রিদিবস, ত্রিযামিনী, যে দিকে চাহিব,
কেবল আনন্দমূর্ত্তি দরশন করি
জুড়াইব জগদ্ধাত্রি, তাপিত হৃদয়,
এই বাঞ্ছা বাঞ্ছাময়ি, তব শ্রীচরণে
জানাইনু সকাতরে, যাহা ইচ্ছা কর,
ইচ্ছাই তোমার মায়া, ইচ্ছাময়ী নাম;
তথাপি বাসনা এই, ইচ্ছাময়ীরূপে
দেখা দিও ভগ্ন বঙ্গে কৃপা বিতরিয়া,
তিন দিন, তিন রাত্রি, শারদ আশ্বিনে।
তাই আজি ডাকিতেছি কৃতাঞ্জলিপুটে,
এসো মা আনন্দময়ি আগত শরত।
দুর্গতি কর মা দূর দুর্গতিনাশিনি!
আনন্দে কর মা পূর্ণ নিরানন্দ পুরী,
চৌদিকে আনন্দ চন্দ্র হউক বিকাস,
আনন্দ আলোকে বঙ্গ হউক উজ্জ্বল,
তোমার সাধের বঙ্গ আনন্দ আশ্রম!

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ছোট মা।

(১)

রামসেবকবাবুর বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে, তিনি বড়ই অধীর হইয়া পড়িলেন। গিন্নী গৃহের লক্ষী ছিলেন; রামসেবকবাবু যখন বিবাহ করেন, সে আজ ৪৩ বৎসরের কথা,—তখন তিনি স্বরূপপুরের বাবুদের বেগমগঞ্জের কাছারীতে শিক্ষানবীশ ছিলেন, তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল—দিনপাত হইত না, কিন্তু রামসেবকবাবু বলেন, গিন্নী বড়ই পয়মন্ত; গিন্নী ঘরে অসিবার পর হইতেই, তাঁহার সংসার যেন উথলিয়া উঠিল; দরিদ্র শিক্ষানবীশ রামসেবক এখন স্বরূপপুরের বাবুদের সমকক্ষ ধনী। কেহ কেহ বলেন, লাটের কিস্তীর টাকা কম পড়িলে স্বরূপপুরের পাঁচ আনীর বাবুরাই তিন আর সাত আনিই তিন—রামসেবক বাবুর নিকট হইতে ধার করিতে হয়। বৃদ্ধবয়সে আর পরের চাকুরী ভাল দেখায় না বলিয়া, রামসেবকবাবু বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন। বড় ছেলে প্রাণবন্ধু বিষয়-কর্ম্ম দেখেন; মধ্যম পুত্র অনাথবন্ধু—মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ দিয়া, একা কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন; ছোট ছেলেটী এবার এম্-এ, পরীক্ষা দিবে।

রামসেবক বাবুর তিনটী ছেলে ও একটী মেয়ে; মেয়েটীকে বেশ বড় ঘরেই বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অদৃষ্ট মন্দ—বিবাহের দেড় বৎসর পরেই সুশীলা বিধবা হইল। গিন্নীর ঐ একই মেয়ে,—বড়—আদরের ধন; তিনি মেয়েটীকে আর শ্বশুর বাড়ী পাঠাইলেন না,—বিধবা কন্যা রামসেবক বাবুর পোষ্যের মধ্যেই গণ্য হইল।

বড় ছেলের দুইটী পুত্র সন্তান, কন্যা নাই; মেজ বাবুর ছেলেপিলে হয় নাই; ছোট বাবু দীনবন্ধু এখনও বিবাহ করেন নাই।

এমন সুখের সংসার ছাড়িয়া একদিনের সামান্য জ্বরে সতী সাধ্বী গিন্নী পুত্রকন্যা পৌত্রে বেষ্টিত হইয়া স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া, পাকা চুলে সিঁদুর পরিয়া, সতীধামে চলিয়া গেলেন। রামসেবকবাবু বড়ই অধীর হইয়া পড়িলেন, বৃদ্ধবয়সে গৃহিনীশোক বড়ই বেশী লাগে।

(২)

যথাসময়ে মহা ঘটা করিয়া গৃহিণীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া শেষ হইয়া গেল; অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া প্রাণবন্ধুবাবু মায়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ করিলেন।

এক মাস দুই মাস যায়, বৃদ্ধের গৃহিণীশোক ধীরে ধীরে চাপা পড়িতে লাগিল। বৈঠকখানায় আবার মজলিস বসিতে লাগিল; গ্রামের আর দশটী বৃদ্ধ, দু-পাঁচ জন বেকার ভদ্রলোক আবার আসিয়া উঠা বসা করিতে লাগিলেন। বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেমন পরামর্শ চলিত, এখনও তেমনি চলিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে আরও একটী পরামর্শ ধীরে ধীরে পায় পায় অগ্রসর হইতেছিল, স্বয়ং কর্ত্তা ও তাঁহার নিতান্ত শুভানুধ্যায়ীগণ ব্যতীত সে সংবাদ আর কেহ জানিতে পারিল না।

হঠাৎ একদিন গ্রামময় রাষ্ট্র হইল যে, কুসুমনগরের রামব্রহ্ম ঘোষের কন্যার সহিত রামসেবকবাবুর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। দেখা-শুনা, দেনা-পাওনা সমস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে,—এমন কি, ভবিষ্যত উইলের মুসাবিদা পর্য্যন্তও হইয়া গিয়াছে।

এই সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছিলে সুশীলা ত একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিল—অনাথিনী বিধবা দিব্যচক্ষে দেখিল, এতদিনে তাহাকে বাপের ভিটা ছাড়িতে হইবে—একমুষ্টি অন্নের জন্য আজ ২৭ বৎসর পরে আবার শ্বশুর-বাড়ীর সঙ্গে নূতন করিয়া সম্বন্ধ পাতিতে হইবে। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। বড়-বৌ মেজ-বৌ অবাক্ হইয়া গেলেন। কর্ত্তার যে এখন কাশীবাসের সময়; এই সময়ে কি না একটা মেয়েকে স্কন্ধে করিয়া—তাহাকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া যাইবেন।

প্রাণবন্ধু বাবু যখন এই সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস হইল না। এও কি হয়—তাঁহার পিতার মত এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এমন কাজ করিতে পারেন! এ বোধ হয় গ্রামের লোকের একটা রং তামাসা। কিন্তু এ সন্দেহ আর বেশীক্ষণ থাকিল না; শেষে যখন শুনিলেন, সমস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন আর কি করিবেন। পিতার নিকট এ কথা তিনি তুলিতে পারিবেন না। বড় বধূ স্বামীকে অনেক করিয়া বলিলেন; বলিলেন, "ও গো, তুমি কর্ত্তাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি এমন কর্ম্ম করিবেন না। সংসার যে ছারখার হইয়া যাইবে।" প্রাণবন্ধু বাবু বলিলেন, "সুকুমারী, শোন নাই—

পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ পিতাহি পরমংতপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

বড়-বৌ আর কথা বলিলেন না।

(৩)

সুশীলা কিন্তু এ সংবাদ পাইয়া স্থির থাকিতে পারিল না; সে দেখিল, বিপদ তাহারই অধিক; সুতরাং সে একবার পিতাকে বুঝাইবার মনস্থ করিল।

আহারান্তে রামসেবকবাবু যখন বাহিরের বৈঠকখানার পাশের ঘরে বিছানায় অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় তামাকু সেবনে নিরত ছিলেন, সেই সময়ে সুশীলা ধীরে ধীরে পিতার পদতলে আসিয়া বসিল, ধীরে ধীরে পিতার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। রামসেবকবাবু মেয়েকে অসময়ে তাহার নিকট আসিতে দেখিয়া, কথাটা বুঝিয়া ফেলিলেন এবং বড়ই আদর করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার আহার হয় নাই?"

সুশীলা বলিল, "বাবা, এখনও বাড়ীর কাহারও আহার হয় নাই, এখনই আমাদের আহারের কি!" এই বলিয়াই সুশীলা নীরব হইল; তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ অসময়ে এখানে কেন?"

"বাবা, মনে কিছু করিও না, একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

"কি কথা মা?"

"পাড়ার সকলে বলিতেছে, তুমি নাকি আবার বিবাহ করিবে; তা বাবা—" সুশীলার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

রামসেবকবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। সুশীলা আর কিছুই বলিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে ভিতর বাটীতে চলিয়া গেল।

(৪)

বিবাহের দিন পূর্ব্বাহ্নেই রামসেবকবাবু নাপিত, পুরোহিত এবং তাঁহার মত তিন চারিটী বৃদ্ধ বরযাত্রি সহ বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। অনেক পথ যাইতে হইবে—প্রায় সাত ক্রোশ রাস্তা; তাই একটু সকাল সকালই চলিয়া যাইতে হইল।

রামসেবক বাবু চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই মেজবাবু অনাথবন্ধু বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এতদিন কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেছিলেন, কিন্তু পরিবার বাড়ীতেই ছিল। আজি হঠাৎ বাড়ীতে

আসিয়াই বড় দাদার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, আজই অপরাহ্ণে তিনি বাড়ীর সকলকে লইয়া কলিকাতায় যাইবেন। বড় বাবু মনে ভাবিলেন, অনাথ বাবু বোধ হয় 'সকলকে' অর্থে মেজ বধূমাতার কথাই বলিতেছেন। তাই তিনি বলিলেন, "দেখ অনাথ, বাবার অনুপস্থিতি সময়ে, তাঁর অমতে মেজ বধূমাতাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া কি ভাল হইবে?"

অনাথ বলিলেন, "আমি সকলকেই লইয়া যাইব। বড় দিদি ছেলেপিলে লইয়া আজই আমার সঙ্গে যাইবেন; দিদিকেও রাখিয়া যাইব না। এ বাড়ীতে কেহই থাকিতে পাইবে না। দাদা, তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। আমি এখন যাহা পাই, তাহাতে অনায়াসে খরচপত্র চলিয়া যাইবে।"

বড়বাবু বলিলেন, "অনাথ, তা কি হয়। বাবা কি বলিবেন। তিনিই না হয়—একটা অন্যায় কাজ করিতেছেন, তা বলিয়া কি আমাদের এ প্রকার ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য বুঝিতেছি, আমাদের সংসারের সুখ এতদিনে ঘুচিয়া গেল, কিন্তু তাই বলিয়া দোষের বোঝা আমরা স্কন্ধে করিতে যাইব কেন? বাবা আসুন, নূতন মা আসিয়া কেমন ব্যবহার করেন আগে দেখি; তাহার পর তোমার কাছে ছাড়া আর কোথায় সকলকে পাঠাইব।"

অনাথ বাবু কোন যুক্তি-তর্কই শুনিলেন না; বড় বাবু যতই বুঝাইতে যান, অনাথ বাবু ততই রাগিয়া উঠিতে লাগিলেন। বেগতিক দেখিয়া বড়বাবু চুপ করিয়া গেলেন; বুঝিলেন, অনাথবাবুর কথার জবাব দিয়া কোন লাভ নাই, তিনি যাহা স্থির করিয়া আসিয়াছেন, তাহা করিবেনই।

সেই দিন অপরাহ্ণে বাড়ীর সকলকে লইয়া অনাথ বাবু কলিকাতায় চলিয়া গেলেন; প্রাণবন্ধু বাবু কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে গেলেন না। তিনি একাকী বাড়ীতে রহিলেন।

(৫)

বিবাহের পরে ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে। রামসেবক বাবু বাড়ীতে আসিয়া পুত্রদিগের ব্যবহারে বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ জীবনে আর ছেলেদের মুখ দেখিবেন না। বড় ছেলে প্রাণবন্ধুর উপরেও খড়্গহস্ত হইলেন। প্রাণবন্ধু বাবু বেগতিক দেখিয়া, বিষয় কর্ম্মের ভার গোমস্তার হস্তে দিয়া লোহার সিন্দুকের চাবী ছোট মায়ের পায়ের কাছে রাখিয়া—বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ছয় মাসের মধ্যে

বৃদ্ধ রামসেবক বাবুও ছেলেমেয়েদের সংবাদ লইলেন না, ছেলেমেয়েরাও বাড়ীর কোন সংবাদ লইল না। তবে বড়বাবু ইহারই মধ্যে তিন চারিবার বাড়ী আসিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার নির্দ্দয় ব্যবহারে তিনি এক রাত্রির বেশী কোন বারই গৃহে তিষ্ঠিতে পারেন নাই।

নূতন গৃহিণী সংসারের এই অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ বদনে থাকেন; তাঁহার মনে সুখ নাই। বয়সও তেমন বেশী নহে, এই সবে পনর পার হইয়া ষোল বৎসরে পা দিয়াছেন। তিনি সংসারের কি জানেন, কি বোঝেন। কিন্তু এ কথা যখনই তাঁহার মনে হইত যে, তাহারই জন্য সকলে দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন তাহার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত। সে ভাবিত, "আমার অপরাধ কি? আমি কি করিয়াছি যে, সকলে আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। কেন আমি এ সংসারে আসিয়াছিলাম।"

বৃদ্ধ রামসেবক বাবু নূতন গৃহিণীর মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন; কিসে গৃহিণী সুখে থাকিবে, তাহারই দিকে তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি; কিন্তু কিছুতেই তিনি গৃহিণীর বিষণ্ণভাব দূর করিতে পারিলেন না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে গৃহিণী শুধু "হাঁ" "না" বলিয়া সারিয়া দেন।

এরূপভাবে কতদিন চলিবে। এই নির্জ্জন গৃহবাস গৃহিণীর অসহ্য হইয়া উঠিল, অথচ সে মনের কথা কর্ত্তাকে খুলিয়াও বলিতে পারে না—কর্ত্তা যে রাগী। কিন্তু একদিন আর সে থাকিতে পারিল না। কর্ত্তাকে বলিল, "দেখ, তুমি কলিকাতায় যাইয়া সকলকে লইয়া আইস। তাহাদের না আনিলে আমি এ বাড়ীতে থাকিব না, আমার জন্য তাহারা বাড়ী ছাড়িয়া গেল। এ কথা মনে করিতেও আমার কষ্ট হয়।" কর্ত্তা বলিলেন, "তাহাদের কথা মুখেও আনিও না। আমি তাহাদিগকে ত্যজ্যপুত্র করিব; আমার বিষয়-আশয় সমস্ত তোমার নামে লিখিয়া দিয়া যাইব। তাহারা আমার বিষয়ের এক পয়সাও পাইবে না।" গৃহিণী তখন বলিলেন, "এমন কথা মুখে আনিও না। আমি তোমার বিষয় লইয়া কি করিব? তাহা হইবে না; তুমি তাহাদিগকে বাড়ীতে আনিতে পার ভাল, তা না হয়, আমাকে বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও। না হয় আমি পরের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

কর্ত্তা মহাবিপদে পড়িলেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। গোলেমালে কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

শেষে গৃহিণী একবারে নারাজ হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি স্পষ্ট

বলিলেন, "তুমি না পার, লোকজন সঙ্গে দিয়া আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দাও। যদি তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারি, তবে আসিব, নতুবা তাহাদের কাছেই থাকিব। তাহাদের লইয়াই জীবন কাটাইব। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি আমাকে স্মরণ করিও, না হয়, না করিও। আমি এমন পাপের বোঝা, এত কষ্ট সহিতে পারি না। আমার জন্য তোমার ছেলে মেয়ে বাড়ী ছাড়িল!" গৃহিণী আর কথা বলিতে পারিল না; তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

শনিবার অপরাহ্ণ ৫টা। ডাক্তার অনাথবাবু একটী রোগী দেখিয়া এইমাত্র বাসায় ফিরিয়াছেন, এখনও কাপড় ছাড়েন নাই; বাহিরের বারাণ্ডায় পাইচারি করিতেছেন; এমন সময়ে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া তাঁহার বাসার সম্মুখে দাঁড়াইল। কোচবাক্স হইতে গোমস্তা নরহরি দত্ত নামিয়া আসিল, এবং মেজবাবুকে বারাণ্ডায় দেখিয়া করজোড়ে নমস্কার করিল। মেজবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে! নরহরি যে? কি মনে করে? গাড়ীতে কে?" নরহরি বলিল, "বাবু! গাড়ীতে ছোট মা আসিয়াছেন।" "ছোট মা! সে কি নরহরি! ছোট-মা হঠাৎ কলিকাতায় কেন? এখানে কেন?"

"তিনি আপনাদিগকে দেখিতে এলেন।"

"বাবা কোথায়?"

"তিনি বাড়ীতেই থাকিলেন। আমাকে ও ঝিকে সঙ্গে দিয়া ছোট মাকে পাঠাইয়া দিলেন।"

"কেন? ব্যাপার কি হে নরহরি?"

"ছোট মা আপনাদের জন্য দিবারাত্রি কাঁদেন। কর্ত্তা শেষে অন্য উপায় না দেখিয়া, তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন।"

অনাথ বাবু তখন তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে সংবাদ পাঠাইলেন। সকলেই সংবাদ শুনিয়া অবাক্। অবশেষে বড় বধূ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ছোট মাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ছোট-মা বড় বধূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল। তাঁহার মুখ দিয়া কথা সরিল না। কত কথা বলিবেন বলিয়া মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু চক্ষের জলে সব ভাসিয়া গেল। বড় বধূও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অনেক কষ্টে ছোটমা কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু "আমার কি অপ—" বলিতে বলিতেই তাঁহার আবার কণ্ঠ-রোধ হইল; আর কিছু বলা হইল না। বলিবার বুঝি কিছু বাকিও রহিল না।

দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে তার আসিল; "রামসেবক বাবুর ভয়ানক জ্বর।" গোমস্তা নরহরি তার পাঠাইয়াছে। তখন আর কাহারও রাগ থাকিল না; এই দুই দিনে ছোট মায়ের ব্যবহারে সকলেরই মন নরম হইয়াছিল; তাহার পরে এই সংবাদ পাইয়া সকলেই বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ রাম-সেবকের সঙ্গে আর কাহারও দেখা হইল না। সকলে যখন বাড়ীতে পৌছিলেন, তখন বৃদ্ধ রামসেবকের প্রাণহীন দেহ গৃহপ্রাঙ্গণে তুলসীতলায় রহিয়াছে।

ছোট-মায়ের গুণে সকলে বশ। সুশীলা দেখিল, মা বাঁচিয়া থাকিলেও বুঝি তাহাকে এত আদর করিত না। ছোটমা বয়সে ছোট হইলেও সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থা হইয়া ছিলেন। ছোট-মা তিনটা দাসীর কাজ একলা করেন; বধূদের ছেলে-মেয়ে তাঁহার প্রাণ, এত যত্ন কেহ করিতে জানে না।

একদিন সুশীলা ছোট-মাকে বলিল, "দেখ ছোট-মা! আমাদের অপরাধ কি তুমি ক্ষমা করিয়াছ? আমরা তোমার উপায় বড়ই খারাপ ব্যবহার করিয়াছিলাম।"

ছোট-মা বলিলেন, "কৈ-মা! আমার উপর তোমরা ত কোন খারাপ ব্যবহার কর নাই? বিমাতার ভয়ে তোমরা বাড়ী ছাড়িয়া ছিলে। আমি কি তোমাদের বিমাতা?"

"না মা, সে কথা বলিও না। তুমি আমাদের মা, আমাদের ছোট-মা। বহু পুণ্যফলে তোমার মত মা মিলে।"

শ্রীজলধর সেন।



সাহেবের জলদান।

বিন্দু বিন্দু জলে সিন্ধু উথলায়,
বিন্দু বিন্দু জলে দেশ ভেসে যায়,
বিন্দু বিন্দু জলে তৃষ্ণা নাহি যায়?
তোমার শুষ্ক পুকুর ছুটছে কুকুর,
"হা জল হা জল" বলে কাঁদছ কেন ঠাকুর?
সাগর পারে শিশি করে রেখেছি মিষ্টি জল,
এনেছি যাহা, দেখ্‌ছ তাহা, এতে নাইক কোন মল।
হাঁ কর গো, লাজ ত্যজ গো, নেও গো আমার বিন্দু,
খোল বাক্স, দেও ট্যাক্স, তুমি কৃপাসিন্ধু।



আজিমার টিকে ।

গুড়ি গুড়ি আয় গো বুড়ী,
আজ দিব তোর টিকে ;
আমি মস্ত রাজা ইংরেজ-ভজা,
ছাড়ব পাঁচ সিকে ।
প্লেগ এসেছে, হুড় পড়েছে,
(সবাই) যাচ্ছে নগর ছেড়ে,
আমি রাজদ্বারি জারি জুরি
যাবে আমার বেড়ে ।
আই আই আই,
তোমার কপালে চিদিয়ে,
টিকে দিয়ে যাই ;
এবার হব গো 'কে সি এস আই' ।



চুরুট বাবু

চুরুট বাবু।

চু—চু—চু—
কু—কু—কু—
শু—শু—শু—
যার যেমন মন, তেমনি ধন,
যতন করলে রতন মিলায়।
পক্ষীর চক্ষু, ভারি রুক্ষু,
ছোঁড়াছুঁড়ি আইবুড়ী.
সবাই টানে, মানা না মানে,
থিয়েটারে আর গুসল ঘরে,
মানুষ যারা, বলছে তারা,
জয় চরুটের জয়!
ঐ দেখ চুরুট মুখে ধোঁয়া ফুকে
নাগরালির বাধাই গায়।



আমরা দুটি ভাই—
সকল দেশে যাই—
বিলাই শুধু, সাধের মধু,
সবার মাথা খাই।
ব্রাণ্ডি :— রোগে আমি ভাই-নাম-গেলি-ছাই ;
দাদা আমার
রোগে শোকে, সুখে দুঃখে,
ও—দি—ভাই (Eau-de-vie)
জীবন দিয়ে যাই !
হুইস্কি :— আমি ছিলাম ধেনো
এবে হ'লাম বেনো,
আমার তোড়ে, রকম ঘোরে,
ভাই-নামের
মুখে ছাই।
আমরা দু'টি ভাই
সকল দেশে যাই,
সাবাস্ বাবু, কেবল হাবু,
হয় না কাবু
ব্রাণ্ডী পাণি— দিল্ জানী—
সেকেণ্ড-করে-যাই।
আস্‌ছে পূজা, দু'লাখ মজা,
রাজা প্রজার বিচার নাই,
আমরা ঘরে ঘরে যাই।
কেবল প্রেম বিলাই ;
সেকেণ্ড করো ভাই।



মানভঞ্জন ।

মান ত্যজ মানিনীলো, প্রাণ যে আমার যায়,
　　তুমি ইষ্টমন্ত্র রাধাতন্ত্র,
চরণ ছাড়া নইক আমি, তোমার প্রেমের দায় ।
আমি পলিটিকেল পাণ্ডা, দেশের দুঃখ গুণে গুণে
　　খাই গো আমি মোণ্ডা ।
আমি উনুনমুখো, হুম্‌কো হুম্‌কো,
কলম কাঠের জ্বাল দিয়ে তাই,
　　এণ্ডায় গুণি গণ্ডা ।
মান ত্যজ মানিনীলো প্রাণ যে আমার যায়,
　　আমি পড়েছি বিষম দায়,
　　আমার বড়ই পেটের দায়,
আমার কলম ফেটে বেরয় গালী, লোকে দেয় গো আমায় শাল্,
　　পড়ে সেই লোভে,
　　বড়ই মনের ক্ষোভে
তোমার চাঁদমুখের ফাঁদ ভুলে গিয়ে মানের চুলোয়
　　জুটিয়েছি কত জঞ্জাল্ ।
ধরচি তোমার পায়, জীবন বুঝি যায়,—
রাই রাখ রাই রাখ বলে, ডাকছি তোমায় হায় ।
দেখ চন্দ্রহার,　খুল্‌বে কত বাহার,
　　হবে পাড়া গুল্‌জার ।
মানের দায়, প্রাণ যায়, রাখো পদছায়ায় ।

পূজার হাওয়া।

বঙ্গসাগরে উৎসবের তরঙ্গ অন্যদিকে ফিরিতেছে। বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে দুর্গোৎসবে বঙ্গবাসী আর্য্য-সন্তানের হৃদয়-সমুদ্রে যেরূপ আনন্দের ঢেউ খেলিত, এখন আর তাহা নাই। সাহেবের আফিসে দুর্গা-পূজার ছুটি কমাইবার জন্য বর্ষে বর্ষে যাঁহারা মত্ত হইয়া নৃত্য করেন, সেই সকল বঙ্গবন্ধুর মধ্যে যাঁহারা কিছু কিছু উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, পূজার সময় তাঁহাদের অনেকেই সুদীর্ঘ অবকাশ পাইয়া সপরিবারে শৈলবিহারে অথবা বিদেশবিহারে বাহির হইয়া থাকেন। পূজার হাওয়া গায়ে লাগিবার ভয়ে, বড় বড় বঙ্গসন্তানেরা পূজাক্ষেত্রে থাকিতে পারেন না; তাঁহাদের ভদ্রাসনেও মহামায়ার আগমন হয় না। যাঁহারা চাকরিজীবী নহেন, জমিদারির প্রজাগণের টাকায় অথবা কোম্পানির কাগজের সুদে যাঁহাদের বাবুগিরি চলে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূজার সময় বঙ্গরাজ্য ছাড়িয়া দূরদেশে পলায়ন করেন।

এরূপ খেয়াল তাঁহাদের কেন হইয়াছে, ইহাও ভাবিতে হয়। দুর্গা-পূজাকে তাঁহারা তামাসা বলেন। তামাসা ভাল লাগে না বলিয়াই, পূজার সময় গৃহে বাস করিতে তাঁহাদের প্রাণ চায় না! এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সত্যই কি আমাদের দুর্গাপূজাটি বঙ্গভূমির তামাসা? বঙ্গের কথা দূরে থাকুক, অযোধ্যার ধর্ম্মশীল রাজা রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে লঙ্কার সমুদ্রতটে শরৎকালে অকালে বোধন করিয়া দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন; সেই দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়াও কি স্বীকার করিতে হইবে, দুর্গা পূজাটি সত্য সত্যই তামাসা? এদেশে ইংরাজ আগমনের পর হইতে বঙ্গসন্তানেরা কেহ কেহ নিজে নিজেই পবিত্র পূজার অঙ্গে তামাসা মিশাইয়া লইয়াছেন,—সে দোষ দেশের নহে, দুর্গারও নহে;—সে দোষ আমাদের।

হায়! হায়! ধর্ম্মবিশ্বাসে বঙ্গদেশে একি বিষম বিপর্য্যয়! দুর্গার হাওয়া অথবা পূজার হাওয়া অঙ্গস্পর্শ করিলে পাপ হয়, কিংবা শরীর অসুস্থ হয়, ইহা ভাবিয়াই বড় বড় বাঙ্গালী বাবুরা বিদেশে হাওয়া বদ্‌লাইতে যান। অর্থব্যয়ে কাতর হন না;—পরিবার সঙ্গে লইয়া বড়মানুষী ধরণে বিদেশে হাওয়া খাইতে যাইলে,—এক মাস দেড় মাস বিদেশে বাস করিতে এক একজনের অন্যূন ৭০০।৮০০ শত টাকা ব্যয় হয়; সেই টাকায় তাঁহারা

স্বচ্ছন্দে ভদ্রাসনে পৈতৃক প্রথানুসারে দুর্গাপূজা করিতে পারেন, তামাসা ভাবিয়া সেটি তাঁহারা করেন না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পূজার সময় স্ত্রীপুত্র লইয়া বঙ্গসন্তানের দেশ ঘুরিতে যাওয়াটা কি সত্য সত্য তামাসা নহে? যে দেশের যেটি ধর্ম্ম, সেইটিতে অনাস্থা প্রদর্শন করিলেই দেশের দুর্গতি হয়, ধর্ম্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া পড়ে, দেশের উৎসবও কমিয়া যায়; সত্য সত্য ইহাই কি বঙ্গের পক্ষে শুভ লক্ষণ? শৈলবিহারীবাবুগণের নিকটে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিতেছি।

উদ্দীপনা।

বাজুক হৃদয়-তন্ত্রী, হৃদয়ের অন্তস্তলে,
বাজুক হৃদয়-বীণা মাতাইয়ে হৃদাগার;
উঠুক প্রাণের উৎস থরে থরে অনিবার,
উজলি' হতাশ প্রাণে, সহস্থথ, আশাদলে!
যা'ক চ'লে দেহ হ'তে মদ, মোহ, অন্ধকার;
যাক্ না প্রাণের শোক—নিরাশায় সমুদিত,
অসার এ ধরা হ'তে; ত্যজিয়ে আকুল চিত,
যাক্ না প্রাণের জ্বালা, সহ দুঃখ কল্পনার,
যাক্ এ হৃদয় হ'তে বিষাদের মৃদুতান।
উঠুক হৃদয়াকাশে উষার আলোক-ভাতি,
পুলকে পূরিত প্রাণে আর যেন অমারাতি
করে না অনন্তকাল এ হৃদয়ে দুঃখ দান!
বিরাজে যেন রে সদা সুমধুর আশা-কণা,
প্রফুল্ল পরাণমাঝে, সহ সুখ-উদ্দীপনা!

৺কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

মৃত্যু সুহৃদ। *

(১)

ভাঙ্গিয়ে গিয়েছে সুখের স্বপন,
মোহন মুরলী বাজে না আর!
এমন করিয়ে কে পারে বহিতে,
নিরস কঠোর জীবন-ভার !!

(২)

হৃদয়-কানন শুধু মরুময়,
শুকায়ে গিয়েছে কুসুম-রাশি।
অনন্ত অতল কালসিন্ধু মাঝে,
বাসনা-লহরী গিয়েছে মিশি॥

(৩)

জীবন-বসন্তে উষা সমাগমে,
শিথিল হয়েছে ধমনী যত।
এলায়ে পড়েছে দেহ যষ্টিখানি,
জীবন মরণ একই মত॥

(৪)

পারি না চলিতে নিমিষের পথ,
এমনি অসার হয়েছে দেহ।
সবে মোরে সদা করে দূর ছাই,
জগতে আমার নাহি যে কেহ !!

(৫)

যাঁরে ভালবাসি সেও ঠেলে পায়,
হেলায় চলিয়ে যায় গো দূরে।
সহেনা যাতনা বিষম বেদনা,
কেমনে থাকিব পিশাচ-পুরে॥

(৬)

হে মৃত্যু-সুহৃদ, লও কোলে করি,
তুমি বিনে সখা কে আছে আর।
তুমি যার ভাই তার কেন এত,
হৃদয়-মাঝারে যাতনা ভার !!

(৭)

তাই এত করে ডাকি গো তোমায়,
এস আজ ভাই আমার ঘরে।
তৃষিত পরাণে তুমি শান্তি-বারি,
যা বলে তোমায় বলুক পরে॥

(৮)

নবীন জীবন তব পরশনে,
লভিব আবার আঁধার ঘোর।
নাহি রবে আর নবীন তপন,
জাগিবেক পুনঃ জীবনে মোর॥

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে।

---

* কবিবর কালিদাস চক্রবর্ত্তী বিয়োগে লিখিত।

কয়েকটী প্রাচীন কথা।

অনেকেই আজকাল পুরাতন বিষয়ের আলোচনায় আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। সেই নিমিত্ত আপনার পাঠকদিগের কৌতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত কয়েকটী প্রাচীন কথার সূচনা করিলাম। আশা করি, ইহা পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদন হইবে।

১। এমত প্রকাশ যে, জমীদার-শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরকে কলিকাতার প্রকাশ্যপথে গ্রেপ্তার করা হয়। কোন অজ্ঞাত-কুল-শীল ইংরাজ মহোদয়ের প্ররোচনায় ইঁহাকে ধৃত করা হয়। "খাল্‌সা কাছারিতে" উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নদীয়ার মহারাজের উপর সমন জারি করা হয়। তৎকালে এই বিষয় লইয়া উক্ত "খাল্‌সা কাছারিতে" বিশেষ আন্দোলন হয়। অবশেষে এইরূপ স্থির হয় যে, অতঃপর এদেশীয় কোন জমীদারকে কোন কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মচারী ঋণদান করিতে পারিবেন না। কারণ, জমীদারদিগকে কারারুদ্ধ করিলে কোম্পানি বাহাদুরের স্বার্থের ক্ষতি হইবে এবং টাকা আদায়ের নানা গোলমাল হইবে। বলা বাহুল্য, উপযুক্ত জামিন লইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরকে মুক্তি দেওয়া হয়। "খাল্‌সা কাছারির" সদস্যগণ ইহাও স্থিরসিদ্ধান্ত করেন যে, অতঃপর এই সকল বিষয়ের বিচার তাঁহাদিগের নিকট না হইয়া সাধারণ কাছারিতে হইবে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই নবেম্বর তারিখে এই দেশ হইতে কোম্পানির বিলাতে যে পত্র যায়, উহাতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

২। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটী সাধারণ পাঠাগারের (Public Library) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রকাশ—সেই সময় বিলাত হইতে বৎসরে একবার করিয়া এই দেশে ইংরাজী পুস্তক আসিত। পুস্তক-মুদ্রাঙ্কণ তৎকালে এই দেশে বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। ১৪২ পৃষ্ঠার একখণ্ড পুস্তক ২৪৲ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

৩। তৎকালে চুঁচড়ায় ওলন্দাজদিগেরও একটী উপনিবেশ ছিল। ওলন্দাজ রমণীরা তৎকালে নৃত্য গীতে আসক্ত থাকিতেন বলিয়া বর্ণিত আছে। ইঁহাদের দৈনিক জীবনের কতক আভাস এই স্থলে প্রদত্ত হইল। প্রাতঃকালে এই সকল কোমলাঙ্গীগণ্ অর্দ্ধ-সুপ্তাবস্থায় সময় কাটাইতেন। মধ্যাহ্নে আহারাদি ও অপর কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, এবং অপরাহ্নে

রীতিমত সুনিদ্রা দিতেন, এবং যামিনীর অর্দ্ধভাগ অবধি আমোদ-প্রমোদে পরম সুখে সময় অতিবাহিত করিতেন। কলিকাতা হইতে ইংরাজ-বন্ধুগণ ও চন্দন-নগর হইতে পাল্কী আরোহণে ফরাসীগণ এই সকল বিলাসিনীদিগের নিকট গতিবিধি করিতেন।

৪। আরমানিগণ এদেশে বহুকাল অবধি বসবাস করিতেছেন। কলিকাতার ইহারা অতি প্রাচীন অধিবাসী। পারস্য উপসাগর, খোরাসান, কান্দাহার এবং কাবুল হইতে ইহাদিগের শুভাগমন হইয়াছে। গুজরাট, সুরাট, ৺কাশীধাম ও বেহারপ্রদেশে ইহারা বাস করিতেন। প্রাচীন গ্রন্থাবলী দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহারা চুঁচড়ায় ওলন্দাজদিগের অধীন বাস এবং তাঁহাদিগের অধীনে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ইহুদীদিগের ন্যায় আরমানিরা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ তৎকালে ইহাদিগকে রাজকার্য্যে ও নানা ব্যবসায়ে গোমস্তারূপে নিযুক্ত করিতেন। বর্ত্তমান চীনাবাজারে ইহারা একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে আরমানীদিগের কিছু প্রতিপত্তি হইলে, ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান সেণ্ট নাজারত নামক ধর্ম্মমন্দির (St. Nazareth) প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানি বাহাদুর ইহাদিগের কর্ম্মে এত দূর সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই মর্ম্মে একটী ঘোষণা প্রচার করেন যে, ভারতে যে কোন স্থানে অন্ততঃ ৪০ জন আরমানি বসতি করিলে কোম্পানি বাহাদুর তাহাদিগকে নিজব্যয়ে ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন এবং ৭ বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাদিগের পুরোহিতের মাহিয়ানা নিজ হিসাবে বহন করিবেন।

৫। সে দিন সাহিত্য-সভায় বঙ্গের ছোট লাট স্যারজন উডবরণ, মুক্তকণ্ঠে বঙ্গভাষার প্রশংসা করেন। কিন্তু ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভাষার অবস্থা বিশেষ শোচনীয় ছিল; বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম মিত্র রেভারেণ্ড লঙ্ মহোদয় এই বঙ্গভাষাকে ধীবরদিগের ভাষা বলিয়াছেন। কালের কি পরিবর্ত্তন? ওয়ারেণ হেষ্টিংস মহোদয় বোলষ্ট (Bolst) নামক অপর একটি ইংরেজ বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ মহোদয় অতি সহজ ভাষায় বাঙ্গালী জাতির সহিত কথোপকথন করিতেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার পার্শী ও বঙ্গভাষার শিক্ষক ছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এদেশীয় অধিবাসিগণ ইংরাজী আইনের বঙ্গানুবাদ

করিবার জন্য কোম্পানি বাহাদুরের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন। তৎকালে এমন কি দ্বাদশজন এদেশীয় লোক, ইংরাজী জানিতেন কি না, সন্দেহ।

৬। উমিচাঁদ বা আমিনচাঁদের বিষয় লইয়া শিক্ষিত-সমাজে বেশ আন্দোলন চলিতেছে। ইনি পাঞ্জাবী ও শিখসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। রাজা হুজুরী মাল ইহাঁর ভগিনীপতি হইতেন। ইহাঁর বাসস্থান বড়বাজারে ছিল; উমিচাঁদের বাগান—বর্ত্তমান হালসির বাগানের অন্তর্গত, ইহাঁর আরাম-স্থান ছিল। উমিচাঁদ দাতা ছিলেন। অনেক দুঃস্থ শিখদিগকে তিনি সাহায্য করিতেন, উমিচাঁদ যে শিখ ছিলেন, তাহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ রাজা স্যার রাধাকান্তদেব বাহাদুরের সংগৃহীত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের জীবনাবলী-সংক্রান্ত যে কাগজ পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন, তাহাতে উল্লেখ আছে। তৎপরে প্রাচীন কলিকাতার "রিভিউ" নামক মাসিক পত্রে উল্লেখ দেখা যায়। সম্প্রতি সাহিত্য-সংহিতাতে হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ সুশিক্ষিত উকীল শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এ বিষয় সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

৭। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর জাতিতে কায়স্থ ও পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। এই মহানুভব রাজনীতিজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সম্ভবতঃ এই মহাত্মা নবাব সিরাজ-দ্দৌল্লার সময় একজন পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। তৎপরে নবাব মির্জ্জাফরের আমলে দেওয়ানী কার্য্য করিতেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীবিঃ ——

আমরা সভ্য হইয়াছি।

বক্তা মহাশয়েরা সুখে থাকুন, দীর্ঘজীবী হউন, তাঁহাদের প্রসাদে স্থানে স্থানে প্রায়ই আমরা নূতন নূতন বক্তৃতা শুনিতে পাই। দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা, সুরঞ্জিত বক্তৃতা, মন-কল্পিত আকাশ-কুসুমের বক্তৃতা। শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্মদেব, বিদুর, ব্যাসদেব, ডিমস্থিনিস, সিসিরো, যীশুখ্রীষ্ট এবং চৈতন্য প্রভুর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। আজকাল • ইংরাজ-বাগ্মীরা

এতদ্দেশে বক্তৃতা করিতেছেন, এদেশের অনেকগুলি লোককেও বক্তৃতা করিতে শিখাইতেছেন। নানাস্থানে নানা রকমের বক্তৃতা হয়।

ধর্ম্মের জন্য বক্তৃতা, ধর্ম্মের নিন্দার জন্য বক্তৃতা, আইনের পাণ্ডুর প্রতিবাদ করিবার জন্য বক্তৃতা, মানুষ মরিলে বক্তৃতা, শোকে সহানুভূতি জানাইবার বক্তৃতা, মৃতলোকের স্মরণচিহ্ন রাখিবার বক্তৃতা, মারীভয়ের বক্তৃতা, দুর্ভিক্ষে বক্তৃতা, প্লেগ তাড়াইবার বক্তৃতা এবং অতি বৃষ্টি ঝটিকা ও জল প্লাবনাদি দৈব উপদ্রবেও বড় বড় বক্তৃতা। ফল কোনটাতে কি হয়, তাহা সর্ব্বদা বুঝা যায় না। প্রতিষ্ঠিত সভায় সভায় বক্তৃতা হয়, একবেলার জন্য নূতন বিরাট সভায় বক্তৃতা হয়, বন্ধুগণের ডিবেটিং ক্লাবে, ছোট বড় লাইব্রেরি ঘরে পারিতোষিক বিতরণের দিন ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়েও বক্তৃতা হয়, উপলক্ষ নূতন হইলে থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চেও বক্তৃতা হয়। ইহা ছাড়া ময়দানে, উদ্যানে, দীঘিতে, বাজারে এবং মেলার স্থলে কত রকম বক্তৃতার তুফান বহে। বাঙ্গালায় অধুনা বক্তৃতা মঙ্গলের যুগান্তর।

ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে ভারতের কতদূর উপকার হইয়াছে, তদ্বিষয় গণনা করিবার জন্য যেখানে যেখানে বক্তৃতা হয়, সেই সেই স্থলে ইংরাজীর জয় জয়কার। বড় বড় সাহেবেরা এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, হ্যাটকোটধারী ইংরাজী-পড়া বাঙ্গালী বক্তৃতাও তাহারই প্রতিধ্বনি করেন। প্রায় সর্ব্বদাই হয়, দিনক্ষণ সন্ধান করিবার ততটা প্রয়োজন হইত না, কিন্তু "নূতন পেলে পুরাতনে কে করে যতন ?"—এই মাসে আমরা একটী নূতন বৃত্তান্ত পাইয়াছি।

আমাদের একজন মাননীয় সুপণ্ডিত বন্ধু সম্প্রতি এক স্থানের ঐরূপ বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তা একজন বড় সাহেব। শ্রোতা সহস্রাধিক। বক্তা সর্ব্বপ্রথমেই সুর ধরিলেন, "ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে ভারতবাসী পরমসুখী। ইংরাজী বিদ্যার প্রচলনে ভারতবর্ষের অশেষবিধ উপকার হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষা করাতে ভারতবাসীর অনেক কুসংস্কার দূর হইয়া গিয়াছে, ভূতের ভয় ঘুচিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে গাছপাথর দেখিলেই ভারতবাসী হিন্দু করযোড় করিয়া নমস্কার করিত, ইংরাজী শিক্ষা-প্রভাবে তাহারা এখন সেই সকল গাছপাথর গ্রাহ্য করে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

বক্তৃতা খুব দীর্ঘ হইয়াছিল। ঝাড়া তিন ঘণ্টার পাঁচ মিনিট কম।

আমাদের বন্ধু বলিলেন, সেই বক্তৃতার উপর তাঁহার দুই এক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, সময়ে কুলায় নাই। বক্তাটীর মুদ্রা দোষ ছিল না, সেই জন্য কথাগুলি বেশ মিষ্ট লাগিয়াছিল, সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভেরা— ময়ূরপুচ্ছাবৃত দাঁড়কাকেরা ঘন ঘন করতালি দিয়া ইংরাজী ভাষায় "hear hear, excellent." ইত্যাদি শব্দ বর্ষণ করিয়াছিল। সাহেবটীর ভাগ্য ভাল, উল্লাসিত শ্রোতারা একবারও ইঙ্কোর দেয় নাই।

সভাস্থলে যাহা বলিবার ইচ্ছা ছিল, বন্ধু সেই কথাগুলি আমাদের কাছে বলিয়াছেন। ঠিক্ ঠিক্ উদ্ধার না করিয়া আমাদের ভাষায় তাহার মর্ম্মার্থগুলি অস্ত জন্মভূমির পাঠক মহাশয়গণের বিচারে অর্পণ করিলাম।

ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের "অশেষবিধ উপকার হইয়াছে, বক্তা মহাশয়ের এইটিই প্রথম কথা। শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে, রাজবিচার সম্বন্ধে, শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে, বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে স্থানের পারিপাঠ্য সম্বন্ধে এবং পর্য্যটনের সুগম সাধনাদিতে অশেষবিধ উপকার হইতেছে, একথা অস্বীকার করিবার কোন বিশেষ কারণ এ স্থানে দৃষ্ট হয় না; তাঁহার বিচার করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা ভারতের আর্য্যসংসারের সামাজিক কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহাই আমরা দেখিব।

আমরা সভ্য হইয়াছি। না, আমরা সভ্য হই নাই; আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী পড়িয়াছেন, তাঁহারাই সভ্য হইয়াছেন। তাঁহারা যদি ষোল আনাকে ঐ দলে টানেন, তাহা হইলে ঠকিবেন। ভারতের ত্রিশ কোটী অধিবাসীর মধ্যে এখন উর্দ্ধ সংখ্যা দশ কোটীর পেটে অল্পাধিক ইংরাজী কালীর অক্ষর প্রবেশ করিয়াছে, বাকি বিশ কোটী চলন ভাষায় মূর্খ, অসভ্য।

যাঁহারা ইংরাজী পড়িয়াছেন, আত্মবিশ্বাসে তাঁহারা আপনারাই বলুন, "আমরা সভ্য হইয়াছি।" কি কি লক্ষণে সভ্য হওয়া গিয়াছে, তাহাও সাধারণে জানিতে চান। অতএব তাঁহারা একটু ব্যাখ্যা করিয়া এই ভাবে বর্ণনা করুন, "আমরা সভ্য হইয়াছি।" ইংরাজী পড়িয়া সভ্যতা শিক্ষা। ইংরাজী ধরণে হ্যাটকোট পরিতে শিখিয়াছি। গুরুলোকের প্রতি অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছি, মাতা পিতাকে অন্ন দিতে কাতর হইতে শিখিয়াছি, বিবি লইয়া পৃথক বাস করিতে শিখিয়াছি, দাড়ী রাখিয়া, চস্‌মা পরিয়া সিগারেটের সেবা করিতে শিখিয়াছি, অতএব আমরা সভ্য

হইয়াছি। ইংরাজী ধরণে কাপড় পরি, ইংরাজী ধরণে স্নান করি, ইংরাজী ধরণে খানা খাই, ইংরাজী ধরণে মদ খাই, পুতুল পূজায় অশ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি, কুসংস্কার তাড়াইয়া দিয়াছি; ডাইভোর্সের আইন পাশ করাইবার চেষ্টায় আছি, জাতিভেদ ত্যাগ করিয়াছি। সভ্যতার যত কিছু অঙ্গ, সমস্তই আমরা শিক্ষা করিয়াছি; বেশীর ভাগে ইংরাজী বিদ্যার মধুরভাবে মুগ্ধ হইয়া মাতৃভাষায় জলাঞ্জলী দিতে শিখিতেছি। তবে আর বাকি রাখিয়াছি কি? জীবন? তাহাও ত সভ্যতার উপদেশে সভ্যপদে সমর্পণ করিয়াছি; পুরুষানুক্রমে দাসত্ব করিতে শিখিয়াছি, সভ্যতার এত গুণে আমরা বিভূষিত, তথাপি আবার একটা নূতন গুণ শিখিয়া লইয়াছি। ইংরাজী বিদ্যার সভ্যতা প্রভাবে বিবাহের সময় উচ্চমূল্যে পুত্র বিক্রয় করিয়া পুত্রবধূর গৃহস্থ পিতাকে পথের ভিখারী করিতে শিখিয়াছি, অতএব আমরা সভ্য হইয়াছি।

যাহারা সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা কেবল ঐ সকল কথা ভিন্ন অন্য কোন নূতন কথা বলিতে পারেন না। তাহাতেই যে জন্মভূমি দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে, আর্য্যকুলের পবিত্রাচার কলঙ্কিত হইতেছে, প্রকৃতি-সিদ্ধ শান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতাভিমানী বা উগ্রভাব ধারণে গর্ব্বিত হইয়া উঠিতেছে, ইহাও বোধ হয় তাঁহারা জানেন না; ইংরাজের গুণ অনেক, পাপও অনেক। কেবল পাপের অনুকরণ করিয়া সভ্য নাম জারি করা মনুষ্যত্ব নহে, গুণের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী জাতির "বুদ্ধিমান" বিশেষণের গৌরব রক্ষা করিতে পারিলে সমস্তই শোভা পাইত। এক্ষণকার লক্ষণে সিদ্ধান্ত হয়, বুদ্ধিমান বিশেষণটা বাঙ্গালীতে আর খাটে না। নির্লজ্জ বাঙ্গালী সেই জন্যই এখন বুক ফুলাইয়া দশের সাক্ষাতে সদম্ভে বলে, "ইংরাজী পড়িয়া আমরা সভ্য হইয়াছি।"

চিন্তাকণিকা।

ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র সকল আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেও কেহ ঋষি হইতে পারে না। ঐ সকল শাস্ত্রের ভাবার্থ যাঁহার হৃদয় হইতে স্বতঃই উত্থিত হয়, তিনিই ঋষিপদ বাচ্য। ১।

যে যেমন লোক, সে তেমনি লোকের সঙ্গেই সম্মিলিত হয়। মাটি মাটিতেই থাকে, জল জলেই মিশিতে চায়। ২।

মানুষ স্ত্রীপুত্র লইয়া তাহাদের মায়াতে যতই আবদ্ধ হয়, ততই তাহার অন্তর জড়তায় পূর্ণ হইতে থাকে। ৩।

স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখ, অন্তরে সকলকেই দেখিতে পাইবে। কাহারও জন্য কোথায়ও যাইতে হইবে না। ৪।

যে ব্যক্তি অন্তরে সকলকে প্রতিষ্ঠিত দেখে, তাহার কিছুরই অভাব থাকে না। ৫।

বিষয় চিন্তায় একবার যাহার চিত্ত প্রবেশ করিয়াছে, তাহার চিত্তকে ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন রাখা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। ৬।

সংসার-কূপে পড়িলে আর উঠিবার শক্তি থাকে না। যাঁহার আত্ম-জ্ঞান প্রখর, তিনিই কেবল উঠিতে সমর্থ হন। ৭।

এই শরীর মন ও ইন্দ্রিয় হইতে আপনাকে পৃথক ভাবিয়া নিজের স্বরূপ অবগত হইলেই আপনাকে উদ্ধার করা হয়। ৮।

সংসার বড় বিষম স্থান। এখানে খুব সাবধানে থাকিবে। বহুদিনের সাধন-ফল সঙ্গদোষে এক মুহূর্ত্তেই নষ্ট হইয়া যায়। ৯।

সুখ কামনা পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকামনায় স্ত্রীসহবাস কর। ১০।

মুখে বল, পায়ে চল; চিত্ত যেন তাঁহাতে লাগিয়া থাকে। ১১।

ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম কর; কিন্তু মনকে সর্ব্বদাই নির্ম্মল রাখিবে। তাহাকে কর্ম্ম স্পর্শ করিতে দিও না। ১২।

সঙ্গীত, চিকিৎসা প্রভৃতি যত কিছু বিদ্যা আছে, সকলই ব্রহ্মজ্ঞানা-লোকের নিকট জোনাকি পোকা বলিয়া বোধ হয়। ১৩।

আত্মজ্ঞানে যেমন তৃপ্তি, এমনটি কোন জ্ঞানেই হয় না। ১৪।

জোনাকি পোকার যাহা কিছু গৌরব, সে কেবল আঁধারে। সূর্য্যোদয় হইলে আর তাহার গৌরব থাকে না। ১৫।

পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যা শিখ্‌লেও, কিছুই শেখা হয় না। এক আত্ম-জ্ঞানেই সকল শিক্ষার শেষ হয়। আত্মজ্ঞান হইলে আর কিছুই শিখিতে হয় না। ১৬।

আপনাকে জড় থেকে টেনে এনে চৈতন্যে মিশিয়ে দাও। ১৭।

তুমি কে তাহা জান, তাহা হইলেই তোমার বন্ধন ছুটিবে। ১৮।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়াই, হৃদয়কে এত সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছ। তাহাতেই এত দুঃখ পাইতেছ। ১৯।

জগত অপেক্ষা জগতের মহান্ কি বাঞ্ছনীয় নহে? ২০।

আপনার স্বরূপ ছেড়ে যা কিছু করতে যাও, সকলই কুকর্ম্ম। ২১।

এ সংসারে আপনাকে হারিয়ে এত গণ্ডগোল। আপনাকে লয়ে তাঁর চরণে উৎসর্গ কর। ২২।

সংসারাসক্ত জীবগুলি পৃথিবীর এক একটি ভার। তারা নিজে যেমন কষ্ট পায়, অপরকেও তেমনি কষ্ট দেয়। ২৩।

তুমি যে কে, তাকি তুমি ভাব্‌বে না। ২৪।

ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবগুলি বড়ই নিরেট। তাহাদের ভিতরে কিছুই নাই। ২৫।

লোকের পরিণামদর্শিতা থাকিলে সংসারে এত চঞ্চলতা থাকিত না, গভীরতায় পূর্ণ হইয়া যাইত। ২৬।

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, শ্বাস, প্রশ্বাস, যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহাতে আহুতি দাও। ২৭।

একাগ্র হৃদয়ে চিন্তাশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হও। ২৮।

ইন্দ্রিয়গুলি মন-মাজনে মাজন দিয়ে, হৃদয়-লাটাইয়ে উল্টো ক'রে গুটিয়ে ফেল। হৃদয়-আসনে মন-বাসনে, তাঁতে ভক্তি রেখে কর্ম্ম কর। ২৯।

থেকো এ সংসারেতে কোন মতে, নিজের ঠিক রেখে ঠিক দিতে থাক। ৩০।

হৃদয়ে জল্‌ছে আগুন দিবানিশি, সেই আগুনে আগুন লাগাও। বিষয়-গুলি চূর্ণ ক'রে সেই আগুনে বহাও নদী। ৩১।

হৃদয়-উননের ময়লা ধুয়ে, প্রেম-আগুনের কয়লা জ্বেলে বসে থাক দিবানিশি। ৩২।

জীবনধারণ উদ্দেশে আহার কর। পবিত্র আহারীয় দ্রব্য পবিত্র ভাবে স্বাহা মন্ত্রে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দাও। দেখো, যেন লোভ-পিশাচে উচ্ছিষ্ট না করে। ৩৩।

হনুমানের মত দুই হাত দিয়া বুক চিরিয়া হৃদয়ের মধ্যে যে ভগবানকে দেখাতে পারে, সেই হচ্ছে প্রকৃত ভক্ত। ৩৪।

শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সং।

গোষ্ঠযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা গাজন ইত্যাদি পর্ব্বে অনেক স্থানে অনেক প্রকার সং হয়; বিবাহ, যাত্রাতে এবং বারইয়ারী পূজাতে অনেকেই সং দেখায়; থিয়েটারে এবং যাত্রার দলে রকমারী সং সাজে। আঁকা সং অথবা সভা সং অতি সুদৃশ্য। তাহাতে অনেকগুলি রাজা ঋষি দেবতা ও গোবৎসাদির প্রতিমা থাকে। সংঙের খাতিরে দেবতাকে পর্য্যন্ত সং হইতে হয়। এক বৎসর কার্ত্তিক পূজা রাত্রে এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গিয়া আমরা দেখিয়াছিলাম, কার্ত্তিকটি হ্যাট-কোটে সাজানো। গালপাট্টাযুক্ত গুচ্ছ গুচ্ছ গোঁফ দাড়ি, চক্ষে নীলবর্ণের চস্‌মা; মুখে সিগারেটের নল—মাথায় শোলা হ্যাট। অনেকগুলি নিমন্ত্রিত লোক "সং" বলিয়া সে কার্ত্তিককে নমস্কার পর্য্যন্ত করেন নাই; যথার্থই সং। কাচড়া পাড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কুলের পাট নামক স্থানের বার্ষিক মেলায় এক বৎসর একখান চৌকিতে দু'টী রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ছিল। সাজ-করেরা সেই কৃষ্ণের চূড়াধড়া খুলিয়া সাবেক সদরওয়ালাদের মত কাটা পোষাক (জোড়া) পরাইয়া দিয়াছিল, চন্দ্রমুখে দীর্ঘ দীর্ঘ চাপদাড়ী লাগাইয়া ছিল, ওকালতী পাগড়ী সালের সামলা। রাধিকার দস্তরমত গোপিনী-বেশ। মেলার লোকেরা সেই রাধাকৃষ্ণকে সত্য সত্য সং বলিয়াই দর্শন করিয়াছিল।

সঙের কথা অনেক। সব কথা বলা অনাবশ্যক, আজ কেবল গুটি কতক দুঃখের সং দেখাইব। লক্ষণ যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এখন আর সং দেখিবার কৌতুকে বারওয়ারীতলায় কিংবা রাসমঞ্চে যাইবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না। কলিকাতায় আজকাল প্রায় ঘরে ঘরেই সং। রাস্তাঘাটেও সং। ইংরাজী পোষাকপরা, ক্যাপ মাথায়, চুরুট মুখে, চস্‌মা চোখে বাঙ্গালী-সন্তান বুক চিতাইয়া রাস্তায় রাস্তায় হাঁটিতেছে, বাড়ীতেও আধখোলা ইংরাজী পোষাকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। চাকরের উপর ইংরাজী হুকুমজারি করিতেছে, তাদৃশ মানবগুলি নিশ্চয়ই সং। আফিসের পোষাকে বাবুলোকে আফিসে যান, তাহাতে আপত্তি হয় না; কেবল উপসর্গেই সংগিরি প্রকাশ প্রায়।

আর এক প্রকার সং হইয়াছে, বেলা ১০টার পর আর তিনটার পর

বড় বড় স্কুল বাড়ীর ফুটপাতে। যাত্রাদলের জুরিদের মত চোগা চাপকান পরা দুই চারিজন বড় বড় ছাত্র—দুই একখানা বড় বড় কেতাব হস্তে লইয়া গজেন্দ্রগমনে চলিতেছে। বক্ষে ঘড়ী, চক্ষে চস্‌মা, ওষ্ঠে সিগারেট, মাথায় সিঁতি। এই জুড়ী ছাত্রদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন বালক ছাত্র; কলাতলায় যেমন শুপারির চারা। সেই চারাগুলির মধ্যেও কতকগুলির চক্ষে চস্‌মা, মুখে বার্ডসাই। পূর্ব্বে এ প্রকার শোচনীয় সজীব সংঙের উপদ্রব কলিকাতায় ছিল না।

বঙ্গবালাগণকে অসম্ভব স্বাধীনতাদানে যাহারা উন্মত্ত, তাহারাও এক প্রকার সং, দিবানিশি স্বাধীন জেনানার পদতলে বসিয়া মানভঞ্জনের পালা গাওয়া সেই সকল সংঙের কার্য্য হইবে—এরূপ লক্ষণ দেখা দিতেছে। সেমিজ বডি আঁটা এলোকেশী অঙ্গনাকুল সারি গাঁথিয়া সহরের রাস্তা পার হয়, কেশের সুগন্ধে মুখের কাছে মধুকর উড়িয়া বেড়ায়। আমাদের মত মূর্খলোকেরা মনে করে, উহারা নূতন প্রকারের মেয়ে-সং, ছেলেবুড়া যুবা সকলেই সং সাজিয়া সমাজ উজ্জ্বল করিবে—রূপ দেখাইয়া লোক হাসাইবে, ইহা আমাদের মনে ছিল না। তাহারা সভ্য হইয়াছে—সুতরাং এখন বোধ হয়, অসভ্য সমাজ তাহাদিগকে কোন কথা বলিতে পারে না। বলিলেই মানহানি তৎক্ষণাৎ। তবে আমরা এই সব কাণ্ড দেখিয়া কি বলিব? কে যেন উপর হইতে শিখাইয়া দিতেছে, তোমরা বল—সভ্যযুগের সভ্য সং। কুকুর লইয়া খেলা কর, বানর লইয়া নাচাও, পরিবারকে বিবি সাজাও, বিবিদের কোলে পিয়ানো হার-মোনিয়ম সাজাইয়া দাও, এক বৎসরের মধ্যে সং সভ্যতা চড়ক গাছের মাথায় উঠিয়া বন্ বন্ শব্দে ঘুরিবে। বার্ষিক কনভকেশনে খোসনামি মিলিবে, উপাধি মিলিবে, বক্‌সিস মিলিবে। এক এক কেন্দ্রে পাদকযুক্ত সং যেগুলি আছেন, দিন কতকের জন্য মানহানি কলহ ভুলিয়া তাঁহারা

সমালোচনা।

বিজয় গীতিকা।—প্রথম ভাগ বর্দ্ধমানেশ্বর যোড়শ নৃপতি শ্রীমন্মহারাজ বিজয়চন্দ মহাতাব বাহাদুর এই আখ্যায়িকায় ৫২টী সংগীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার আদেশানুসারে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও শ্রীমন্মনবীন মহারাজের প্রতিকৃতি নয়ন মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কণকার্য্য এরূপ সুন্দর হইতে পারে, ইহা আমাদের কল্পনার অতীত। আমরা অভিনিবেশ পূর্ব্বক "বিজয় গীতিকা" আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। সমস্ত গীতেই পরমার্থভাব, সকরুণ ভাব, সংসার ভাব এবং মানবের মানসিকভাব বিদ্যমান; প্রকৃতির চিত্রও কয়েকটী গীতে পরিদৃষ্ট হয়। গীতগুলির রচনা অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, এক কথায় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে। আভাষে পরিচয় হয়— শ্রীমন্মহারাজ অতি অল্প বয়সেই জগতমোহিনী সংগীত বিদ্যায় ও রচনায় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছেন। কেন না, বিবিধ রাগ-রাগিণীতে এই গীতগুলি বিরচিত, আমরা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা মিলাইয়া দেখিয়াছি, একটি স্থলেও উপযুক্ত সুরতালের অঙ্গ ভঙ্গ হয় নাই।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের ভাগ্যবান সন্তানগণের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই অটল আলস্যে এবং বৃথা বিলাসে কালহরণ করেন। বর্দ্ধমানের শ্রীমন্মহারাজ স্বদেশীয় কাব্য সাহিত্যের প্রতি অন্তরের সহিত অনুরাগী হইয়াছেন,—ইহা অবশ্যই স্বদেশের শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। বিজয় গীতিকার রচনা-কর্ত্তা একটি বিপুল অর্থশালী মহারাজ, তন্নিমিত্তই আমরা প্রশংসা করিতেছি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন; বাস্তবিকই প্রশংসা করিবার যথেষ্ট সামগ্রী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

লণ্ডন রহস্য।—জগদ্বিখ্যাত রহোন্যাস বিরচক রেনল্ড সাহেবের "মিষ্ট্রীজ অব দি কোর্ট অব লণ্ডন" অভিধেয় পুস্তকের অবিকল বঙ্গানুবাদ। কলিকাতার সুবিখ্যাত পোষাক-বিক্রেতা—পি, সি, পাল কোম্পানি ইহার প্রকাশক। অনুবাদকের নাম নাই। অনুবাদিত "লণ্ডন রহস্য" বৃহৎ বৃহৎ দুই খণ্ডে প্রায় দুই সহস্র পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; মূল্য ১১৲ টাকা। আমরা এই বৃহৎ পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, যথার্থই অবিকল অনুবাদ

হইয়াছে। ইংরাজী পুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলির যে প্রকার তেজস্বীতা, যে প্রকার মাধুর্য্য, যে প্রকার করুণা, যে প্রকার প্রহসন এবং যে প্রকার প্রকৃতি-সঙ্গত কল্পনার বর্ণনা, বাঙ্গালা "লণ্ডন রহস্যে" তাদৃশ রসাল ভাব-লহরী সংরক্ষিত না হইলেও অনুবাদক পূর্ণাংশে প্রশংসনীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এক ভাষা হইতে ভাষান্তর করিতে হইলে মূল ভাষার ঠিক ঠিক সমস্ত ভাব রক্ষা করা যায় না, সর্ব্বদেশের বিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরা অকপটে একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন। অতএব লণ্ডন রহস্যের বঙ্গানুবাদ নিষ্কলঙ্ক।

পি, সি, পাল কোম্পানি সাহিত্যানুরাগ-বশে এই বহুব্যয়সাধ্য সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশের সাহিত্য সংসারের একটি বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এদেশে এখনও সাধারণতঃ সকলের ইংরাজী চর্চ্চা আরম্ভ হয় নাই, কেবল মাতৃভাষায় অভিজ্ঞ, এমন সাহিত্যানুরাগী পাঠক এদেশে এখনও অনেক আছেন। ভাল ভাল ইংরাজী গল্পগুলির নূতন নূতন ঘটনাবলীর নূতন নূতন ভাব রস কল্পনা ইত্যাদির জন্মপরিগ্রহে অনেকেরই ইচ্ছা হয়; নির্ব্বাচিত গ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হইলে তাদৃশ পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করা হয়। পি, সি, পাল কোম্পানি এই উপকারক বৃহৎ ব্যাপার বিশুদ্ধরূপেই সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাকেই সাহিত্য-সংসারের ধন্যবাদভাজন বলিয়া সম্মান দেওয়া কর্ত্তব্য।

অনুবাদের কথা বলিতে হইলেই নিগূঢ় কথা বলিতে হয়। অনুবাদকেরা কেহ যেন তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হন। ইংরাজী পুস্তক সম্মুখে রাখিয়া কথায় কথায় অবিকল অনুবাদ করিতে হইলে মাতৃভাষার বেশী আদর রক্ষা হয় না, প্রায় প্রত্যেক পদে ইংরাজী ভাব আসিয়া পড়ে, তাহাতেই বঙ্গভাষা স্থানে স্থানে কিছু কিছু উৎকট উৎকট শুনায়। মূল গ্রন্থকারের সাময়িক মনোভাবের সহিত অনুবাদকের মনোভাবের মিলন না হইলে অনুবাদিত ভাষার কদাচ সৌন্দর্য্য রক্ষা হইতে পারে না। যাহা হউক, মোটের উপর লণ্ডন রহস্যের অজ্ঞাত অনুবাদক এ কল্পে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে; অনুবাদ উত্তম। ইংরাজী অনভিজ্ঞ-সাহিত্যামোদী পাঠকগণ এতদ্দ্বারা অনেক উপকার পাইবেন, সন্দেহ নাই।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।)

দশম বর্ষ। } ১৩০৮ সাল, কার্ত্তিক। { ৪র্থ সংখ্যা।

হিন্দুর গর্ভাধান।

কালের কঠোর উৎপীড়নে, শিক্ষার বিজাতীয়তা দোষে, রুচির বৈপরীত্যবশতঃ ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজ হইতে হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপগুলি উৎপাটিত হইতে বসিয়াছে। বিশ্বাস ছিল, দশবিধ সংস্কার হিন্দুসমাজে 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর' প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কিন্তু কৈ? তাহাও যে যায়! লোকে কথায় বলে, 'রাজার ট্যাক্স আয়ের বা সম্পত্তির উপর, কিন্তু হিন্দু পুরোহিতের ট্যাক্স হিন্দুর শরীরের উপর।' জন্মিলেও দিতে হইবে, মরিলেও দিতে হইবে। কিন্তু সে কাল উঠিল। কোনও কোনও সুসভ্য প্রাচীন সমাজে হিন্দুর গর্ভাধান সংস্কারের অস্তিত্ব আর পরিলক্ষিত হয় না। অথচ সেই সমাজস্থ প্রায় সকল লোকই বুদ্ধিমান্ ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত; কিন্তু হইলে কি হইবে? বাজারে আগুন ধরিলে পীরের ঘর কি রক্ষা পায়? আমরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কেবল মর্ম্মাহত হই। কি করিব! অরণ্যে রোদন!

পাঠক! আজ একটু রোদন করিব। ইচ্ছা হয় আপনারা কর্ণপাত করিবেন, না হয় অনন্ত আকাশের গায়েই মিশিয়া যাইবে।

প্রথমে দেখা উচিত, সংস্কারকে সংস্কার বলে কেন? আকরস্থিত মণি যেরূপ মৃত্তিকা ও প্রস্তরলেপে কলুষিত থাকে, তাহাকে উদ্ধৃত করিয়া, ধাত্বন্তর চূর্ণাদি সংযোগে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ শুক্রশোণিত সম্ভব সন্তানের, গর্ভবাস অবস্থায় দেহ, মন ও আত্মা অবিশুদ্ধ থাকে, দশবিধ সংস্কার দ্বারা সেই সকল দোষ সংস্কৃত হয় বলিয়া, উহার

নাম সংস্কার। যেমন মণি উদ্ধারের পূর্ব্বে খনির উপর দুগ্ধাদিসেচন না করিলে, উত্তোলিত মণি পশ্চাৎ শত প্রতিক্রিয়াতেও পরিষ্কৃত হয় না, তদ্রূপ গর্ভাধানাদি সংস্কার ভিন্ন জাতসন্তানের দেহ, মন ও আত্মা পশ্চাৎ স্বাধ্যায়াদি দ্বারাও বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। মণির সংস্কার দ্বারা তাহার কেবল বাহ্যদীপ্তি প্রকাশ পায়, কিন্তু গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা সন্তানের দেহ, মন ও আত্মা, এমন কি আন্তরীণ বৃত্তিগুলিও বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ঃ—

"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভ সমুদ্ভবং।"

এইরূপ দশবিধ সংস্কার দ্বারা, মানবের শুক্রশোণিতসম্ভূত দোষ সকল নিরাকৃত হয়।

মহাকবি কালিদাস তদীয় সুমধুর কাব্য রঘুবংশে লিখিয়াছেন ;—

"দিলীপসূনুর্মাণ রাকরোদ্ভবঃ।
প্রযুক্তসংস্কার ইবাধিকং বভৌ॥"

দিলীপকুমার রঘু কৃতসংস্কার হইয়া কৃতসংস্কার মণির ন্যায়, অধিকতর শোভা ধারণ করিলেন।

দশবিধ সংস্কার দ্বারা যে মানবের দেহ মন ও আত্মা বিশুদ্ধ হয়, তাহা যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যাইতেছে। এখন যুক্তির যুগ পড়িয়াছে। যুক্তি ভিন্ন এখন আর কেহ বসিতেও চাহেন না। সুতরাং আমি সরল স্মৃতিশাস্ত্র ব্যবসায়ী হইয়া, আজ আয়ুর্ব্বেদোক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিমার্গের অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ আমার এই স্বেচ্ছাচারিতা মার্জ্জনা করিবেন।

দশবিধ সংস্কারের মধ্যে আদিম সংস্কার গর্ভাধান। ইহা পিতৃ কর্ত্তব্য হইলেও ইহাদ্বারা পুত্রের দেহাদি বিশুদ্ধ হয়, এজন্য উহা পুত্রের সংস্কার বলিয়াই গণ্য।

এক্ষণে এরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, গর্ভ+আ+ধা+অন, অর্থাৎ গর্ভ (গর্ভস্থ জীব) আহিত হয় যে, কার্য্যের দ্বারা তাহাকে গর্ভাধান কহে। এরূপ অবস্থায় ভার্য্যাগমন মাত্রকেই গর্ভাধান বলিতে হয়। তবে তাহাতে আবার উপবাস কেন? দেবপূজারই বা আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে, ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারাই জাতসন্তানের দেহ মন ও আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, এই জন্য ঐ সকল কার্য্য গর্ভাধান সংস্কারের অঙ্গীভূত।

সুসন্তান উৎপাদন করিতে হইলে যে উপবাসাদির আবশ্যক, তাহার যুক্তি পর পর প্রদর্শিত হইতেছে।

গর্ভাধান সংস্কারটীকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম উপবাস। ২য় দেবপূজা। ৩য় যোনিস্পর্শ। ৪র্থ ভার্য্যাগমন। ইহার উপকারিতা ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

১ম উপবাস। বেদান্তদর্শনে লিখিত আছে, "কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে।" অর্থাৎ কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রান্ত হয় *। ইহা সত্য হইলে শুক্রশোণিত সম্ভব পুত্রও যে শুক্রশোণিতের গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাও অবিসংবাদী সত্য।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন ;—

"বীজাত্মকর্ম্মাশয় কালদোষৈর্মাতুস্তথাহার বিহারদোষৈঃ।
কুর্ব্বন্তি দোষাঃ বিবিধাঃ প্রদুষ্টাঃ সংস্থান বর্ণেন্দ্রিয়বৈকৃতানি॥
বর্ষাসু কাষ্ঠাশ্ম ঘনাম্বুবেগা স্তরোঃ সরিৎ স্রোতসি সংস্থিতস্য।
যথৈব কুর্য্যুর্বিকৃতিং তথৈব গর্ভস্য কুক্ষৌ নিয়তস্য দোষাঃ॥"

শারীর স্থান ২য় অধ্যায়।

পিতামাতার বীজ দোষ, জীবের অদৃষ্ট দোষ, কাল দোষ ও মাতার আহার বিহার দোষ, এই সমুদয় কারণে প্রাণিগণের অবয়ব বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি জন্মে। যেমন বর্ষাকালে স্রোতোবেগে আনীত কাষ্ঠ, প্রস্তর, মেঘ ও জলের বেগ, এই সমুদয় দ্বারা নদীর স্রোতস্থিত বৃক্ষের

* কারণ দ্বিবিধ। সমবায়ি কারণ ও নিমিত্ত কারণ। কুণ্ডলের (স্বর্ণালঙ্কার বিশেষের) কারণ দুইটী। ১ম স্বর্ণ। ২য় স্বর্ণকার ও সন্দংশাদি যন্ত্রবিশেষ। স্বর্ণ সমবায়িকারণ অর্থাৎ প্রধান উপাদান। স্বর্ণকারাদি নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ গৌণ উপাদান। পদার্থ সমবায়ি কারণের গুণই সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। নিমিত্ত কারণের গুণ আংশিক ভাবে গ্রহণ করে। কুণ্ডল স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য উত্তমত্ব ও উপকারিত্ব সম্পূর্ণরূপেই পায়। স্বর্ণকারের নির্ম্মাণ কৌশল ও যন্ত্রাদি চিহ্নও পাইয়া থাকে। জাতসন্তান শুক্রশোণিতের গুণ সম্পূর্ণরূপেই লাভ করে। তত্রত্য জলবায়ুর গুণও কিয়দংশে গ্রহণ করিয়া থাকে। শুক্রশোণিত প্রাপ্তির সমবায়ি কারণ। সুতরাং সমবায়ি কারণটীকে বিশুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।

বিকৃতি জন্মায়, সেইরূপ বীজ প্রভৃতি দ্বারাও গর্ভস্থিত শিশুর বিকৃতি জন্মিয়া থাকে।

এরূপ অবস্থায় বীজের অর্থাৎ শুক্রশোণিতের পরিশুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। স্ত্রীপুরুষের শরীর যেরূপ ভাবাপন্ন থাকে, শুক্রশোণিতেরও সেইরূপ ভাব অবশ্যম্ভাবী।

আয়ুর্ব্বেদে পিত্তকে সত্ত্ব, বায়ুকে রজঃ ও শ্লেষ্মকে তমঃ বলা হইয়াছে। মানব পিত্ত প্রধান অর্থাৎ সত্ত্বভাবাপন্ন হইলে দীর্ঘায়ুঃ, দেবদ্বিজে ভক্ত, সৎস্বভাব ও করুণহৃদয় হইয়া থাকে। বায়ু প্রধান অর্থাৎ রজোভাবাপন্ন হইলে চঞ্চল, অস্থির মতি ও মধ্যায়ুঃ হয়। শ্লেষ্ম প্রধান হইলে অল্পায়ুঃ, নির্ব্বোধ, স্থূলকায়, নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ও লম্পট হইয়া থাকে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রবন্ধান্তরে পরিস্ফুট করা যাইবে।

সুতরাং সকলেরই বায়ুপ্রধান বা পিত্তপ্রধান অথবা বায়ুপিত্তপ্রধান সন্তান লাভই প্রার্থনীয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, শুক্রশোণিত যেরূপ ভাবাপন্ন থাকে, সন্তানও তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইবে। সুতরাং শুক্রশোণিতের শ্লেষ্মভাগকে বিদূরিত করিয়া তাহাকে বায়ুপিত্ত প্রধান করিয়া লওয়া, প্রত্যেক সুসন্তানাকাঙ্ক্ষীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

যখন পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, শ্লেষ্ম প্রধান (তমোভাবাপন্ন) শুক্রশোণিতে জাতসন্তান, অল্পায়ুঃ, ক্ষুদ্র চেতাঃ, নিষ্ঠুর, লম্পট, পাপকর্ম্মশালী ও আসুর প্রকৃতি হয়, তখন সৎপুত্রকামী কোন্ পিতামাতা, নিজ শরীরকে শ্লেষ্ম প্রধান রাখিয়া, গর্ভাধানে প্রবৃত্ত হইবে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা তাহার অনুমোদন করিবে?

তাই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন ;—

"যথোক্তেন বিধিনোপ সংস্কৃতশরীরয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ
মিশ্রীভাবমাপন্নয়োঃ শুক্রশোণিতেন সহ সংযোগং গমেত্যাব্যাপন্নেন
যোনা বনুপহতায়ামপ্রদুষ্টে গর্ভাশয়ে গর্ভমভিনির্বর্ত্তয়ত্যেকান্তেন।"

যথোক্ত বিধানানুসারে সংস্কৃত শরীর কৃতমৈথুন স্ত্রীপুরুষের বিশুদ্ধ শুক্র, বিশুদ্ধ শোণিতের সহিত সংযুক্ত হইয়া, অদুষ্টযোনিপথে অদুষ্ট গর্ভাশয়ে উপস্থিত হইয়া বিশুদ্ধ গর্ভ (গর্ভস্থ প্রাণী) উৎপাদন করে।

শুক্রশোণিত বিশুদ্ধির বহুবিধ উপায় থাকিলেও, সেগুলি সহজসাধ্য

নহে, এই বিবেচনায় স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক একমাত্র উপবাসই বিহিত হইয়াছে। উপবাস দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করিলে, শুক্রশোণিতের শ্লেষ্ম-প্রধান দোষ নিরাকৃত হইয়া, পিত্তপ্রধান (সত্ত্বভাবাপন্ন) হইয়া থাকে। তাদৃশ শুক্রশোণিতোৎপন্ন সন্তানকে অবশ্যই দীর্ঘজীবী, বুদ্ধিমান ও দেব-দ্বিজে ভক্তিশালী হইতে হইবে, এই বিবেচনায় গর্ভাধান সংস্কারে উপবাস বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আরও এক কথা। গর্ভাধানে দেবপূজার বিশেষ আবশ্যক। ইহার বিশেষ বিবরণ দেবপূজা অংশে দ্রষ্টব্য। একাগ্রতা বা তন্ময়ত্ব না হইলে, দেবপূজায় বিশেষ কোনও ফল হয় না। উপবাস করিলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদয়, অন্যান্য সকল বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হইয়া একমাত্র আরব্ধ বিষয়েই সংযত থাকে। সুতরাং দেবপূজায় একাগ্রতা লাভ করিবার জন্যও উপবাস আবশ্যক।

২য় দেবপূজা। ভাবপ্রকাশের গর্ভাবতার ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"আহারাচার চেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
দম্পতী সমুপেযাতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ।"

কোনও কোনও পুস্তকে "দম্পতী" এই স্থলে "স্ত্রীপুংসৌ" এইরূপ পাঠ লিখিত আছে।

স্ত্রীপুরুষ যেরূপ আহার আচার ও চেষ্টার সহিত সঙ্গত হয়, তাহাদের পুত্রও ঠিক সেইরূপ আহার আচার ও চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। *

---

* গর্ভধানে যেরূপ সদাচারের আবশ্যক, সেইরূপ সদাহারেরও প্রয়োজন। এই জন্য প্রাচীনা স্ত্রীগণ স্ত্রীপুরুষকে পায়স ভোজন করাইয়া থাকেন।

পায়সের গুণপর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পায়স ভোজনের আরও উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। ভাব প্রকাশে পায়স প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও তাহার গুণ লিখিত হইয়াছে ;—

পায়সং পরমান্নং স্যাৎক্ষীরিকা পি তদুচ্যতে।
শুদ্ধেঽর্দ্ধপক্বে দুগ্ধে তু ঘৃতাক্তাং স্তণ্ডুলান্ পচেৎ।
তে সিদ্ধা ক্ষীরিকা খ্যাতা সসিতাজ্য যুতোত্তমা।
ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা প্রোক্তা বৃংহণী বলবর্দ্ধিনী।
বিষ্টম্ভিনী হরেৎ পিত্ত রক্তপিত্তাগ্নি মারুতান্।"

সদাচারী পুত্র লাভ করিতে হইলে, গর্ভাধানকালে সদাচারী হওয়া বিশেষ আবশ্যক। আমরা অনেক সময় অনাচারী ও অশুচি থাকি। কিন্তু দেবপূজার সময় বা নারায়ণাদি স্পর্শ করিতে হইলে 'গরজে গোয়ালার ভেলা বহন' করার ন্যায় মনকে সংযত, আত্মাকে শুদ্ধ ও দেহকে সদাচারী করিয়া থাকি। সুতরাং দেবপূজা আমাদিগকে শুচি ও সদাচারী করিবার উপায় বিশেষ বলিয়া তাহা বিহিত হইয়াছে।

সুশ্রুত সংহিতায় লিখিত আছে ;—

"গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ প্রবৃত্তিঃ স্ত্রীপুংসয়ো যাদৃশভাব মেতি।
তাদৃঙ্মনোভাব যুতস্তু পুত্রো জায়েত তস্মাৎ সুকৃতং স্মরেতাং।"

গর্ভারম্ভকালে স্ত্রীপুরুষের মনোবৃত্তি যেরূপ ভাবাপন্ন থাকে, সন্তানও সেইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। সেই হেতু তৎকালে দম্পতীর পুণ্যস্মরণ করা উচিত।

সুশ্রুতকায় পুণ্যস্মরণ করিতে লিখিলেন কিন্তু তদীয় টীকাকার ডম্বণমিশ্র লিখিলেন, "সুকৃতং লক্ষণয়া পুণ্যবন্তং" অর্থাৎ পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে স্মরণ করিবে।

পায়সকে পরমান্ন ও ক্ষীরিকা বলা যায়। বিশুদ্ধ দুগ্ধ অর্দ্ধপক করতঃ তাহাতে ঘৃতম্রক্ষিত তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া, পাক করিবে। পরে ঐ তণ্ডুল উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে উহাতে ঘৃত ও চিনি সংযোগ করিয়া, নামাইলে যে উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, উহাকে ক্ষীরিকা বলে। ক্ষীরিকা—দুষ্পাচ্যা শরীরের উপচয়কারক, বলবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী, পিত্ত রক্তপিত্ত অগ্নি ও বায়ুনাশক।

উপবাস দ্বারা শরীরের যে অংশ ক্ষয় হয়, তাহার উপচয় পায়স ভোজনের অপর উদ্দেশ্য। এবং ঐ উপবাসদ্বারা বায়ু ও পিত্তের সমধিক প্রকোপ জন্মে। পায়স ভোজনদ্বারা ঐ বায়ু পিত্তের উগ্রতা নিবারণ করিয়া, উহাকে স্বভাবে আনয়ন করাও পায়স ভোজনের অন্যতর কারণ হইতে পারে।

তবে আমরা এক্ষণে পায়স বলিয়া যাহা খাই, তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। একসের দুগ্ধে, তিন সের জল মিশাইয়া তাহাতে দুই সের গুড় দিয়া, এক প্রকার কিম্ভুত-কিমাকার চাবার ক্ষীর প্রস্তুত করি। পাঠক! সমুদ্রের জলে দুইখানি বাতাসা ফেলিয়া দিয়া, তাহার অঞ্জলি দুই জল পান করিয়া, দুই চারিটী উদ্গার তুলিলে, বাতাসার জল পানের উপকার হয় কি?

উদ্দেশ্য বা পরিণাম একই। উভয়তঃই পুণ্যবান্ বা সৎকর্ম্মশীল সন্তান উৎপাদনই উদ্দেশ্য।

তবে স্মৃতিশাস্ত্রকার আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন। অর্থাৎ একেবারে দেবভাবাপন্ন পুত্রলাভাশায় দেবপূজার বা দেবতা স্মরণের ব্যবস্থা দিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু আমরা এক্ষণে শিব গড়িবার ব্যবস্থা লইয়া কেবল বানর গড়িতেছি! তাহাদের দোষ কি?

৩য় যোনিস্পর্শ। অকামাস্ত্রীগমনে মহাপাপ, ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রের মত। আহ্নিকাচার তত্ত্বে লিখিত আছে;—

"ঋতৌ নোপৈতি যো ভার্য্যা মনৃতৌ যশ্চ গচ্ছতি।
তুল্য মাহস্তয়ো দোষ মযোনৌ যশ্চ গচ্ছতি।
ইতি বৌধায়নীয় মনৃতৌ দোষাভিধান মকামা বিষয়ং।"

ইহার ভাবার্থ এইরূপ:—ঋতুকালে ভার্য্যাতে অনভিগমন ও অকামা স্ত্রীগমন সমান পাপজনক।

ভাবপ্রকাশে গর্ভাধানে অনুপযুক্ত স্ত্রীকথন প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে;—

"রজস্বলা ব্যাধিমতী বিশেষাদ্ যোনি রোগিনী।
বয়োঽধিকাচ নিষ্কামা মলিনা গর্ভিণী তথা।
এতাসাং সঙ্গমাদ্ গর্ভ্ভ বৈগুণ্যানি ভবন্তি হি।"

গর্ভাবতরণ ক্রমাধ্যায়।

রজস্বলা, রুগ্না, বিশেষতঃ যোনিরোগাক্রান্তা, বয়োজ্যেষ্ঠা, কামোদ্রেক বিহীনা, মলিনদেহ বিশিষ্টা, এবং গর্ভবতী স্ত্রীরমণে নানাবিধ গর্ভদোষ হইয়া থাকে।

চরকসংহিতায় লিখিত হইয়াছে;—

"মন্দাল্পবীজাববলা বহর্ষৌ ক্লীবৌচ হেতু বিকৃতিদ্বয়স্য।
মাতুর্ব্যবায় প্রতিঘেন বক্রী স্যাদ্বীজ দৌর্ব্বল্যাতয়া পিতুশ্চ।"

শারীর স্থান ২য় অধ্যায়।

যদি পিতামাতা মন্দবীজ, বা অল্পবীজ বিশিষ্ট, দুর্ব্বল, বা অহর্ষ, মৈথুনে যাহাদের হর্ষ নাই হয়, তবে তাহাদের পুত্র নরষণ্ড ও কন্যা নারীষণ্ড হয়। মাতার মৈথুনে অনিচ্ছায় অথবা পিতার বীর্য্যের দৌর্ব্বল্য বশতঃ বক্রীসন্তান জন্মিয়া থাকে।

মৈথুনে উভয়ের সমভাবে স্পৃহা না হইলে, যখন সন্তান বিকলাঙ্গ হয়,

ইহা প্রমাণিত হইল, তখন যেরূপে হয় উহা সাধন করা আবশ্যক এই বিবেচনায় এই বিষম লজ্জাকর যোনিস্পর্শ বিধি, গর্ভধান সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এখন পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পুরুষ কর্ত্তৃক যেমন স্ত্রীযোনি স্পর্শ শাস্ত্রবিহিত, সেইরূপ স্ত্রী কর্ত্তৃক পুংদেহ স্পর্শ শাস্ত্রসম্মত হইল না কেন?

ইহার উত্তর এই যে, একের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে উভয়ের পক্ষে বিধানের আবশ্যকতা নাই।

তবে এরূপ জিজ্ঞাসা অসঙ্গত নহে যে, যদি দুইজনের মধ্যে একজনের দ্বারাই স্পর্শে কার্য্য সমাধা হয়, তাহা হইলে পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীযোনিস্পর্শ বিধি প্রচলিত না হইয়া স্ত্রী কর্ত্তৃক পুংদেহ স্পর্শ বিধিপ্রচলনে কি আপত্তি ছিল?

ইহার কারণ বোধ হয় স্ত্রীগণ সমধিক লজ্জাবতী বলিয়া, আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাদিগকে এই লজ্জাকর কার্য্য হইতে অবসর দিয়াছেন।

৪। ভার্য্যাগমন সংস্কারে যে ভার্য্যাগমনের আবশ্যকতা, তাহা বোধ হয়, আর কোনও প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে না।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা না বলিয়া, উপসংহার করিতে পারিতেছি না।

পাঠক! দুই নৌকায় পা দিলে, আরোহীর দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। তবে যদি উভয় নৌকার মাঝি একযোগে, একমনে, ও সমবেগে স্ব স্ব নৌকা চালনা করে, তাহা হইলে তাহার কোনও বিপদ না হইবার কথা। সন্তান পিতা ও মাতা উভয়ের প্রকৃতির মধ্যবর্ত্তী হইয়া, জন্মগ্রহণ করে। যদি উহাদিগের প্রকৃতি, মানসিক ভাব ও শারীরিক অবস্থা একবিধ না হইয়া বিভিন্ন প্রকার হয়, তাহা হইলে সন্তানের অবস্থা, উক্ত প্রকার আরোহীর ন্যায় হয় না কি?

গাধা ও ঘোড়ার সঙ্গমে খচ্চর উৎপন্ন হয়। যখন বিভিন্নাকৃতি উভয় জন্তুর সঙ্গমে, একপ্রকার নূতনাকৃতি জন্তু জন্মে, তখন বিভিন্ন প্রকৃতি মানব মানবীর সঙ্গমে, এক নূতন প্রকৃতি মানবের উৎপত্তি অবশ্য অসম্ভব নয়। তাই বলি, পাঠক! দৈহিক খচ্চর দেখিতে তুমি অনেক যত্ন করিয়া থাক। কিন্তু প্রাকৃতিক খচ্চর যে ভারতের ঘরে ঘরে জন্মিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

সত্ত্বস্বভাবাপন্ন ব্রাহ্মণের ঔরসে, রজস্তমোমিশ্রভাবাপন্ন বৈশ্যার গর্ভে, জন্মিয়াছিল বলিয়া, অম্বষ্ঠ একটী নূতন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এমন কি, উহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়ও বিভিন্ন প্রকার নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেবভাবাপন্ন মানব ও অসুরভাবাপন্ন মানবীর সংমিশ্রণে, যে কতশত অম্বষ্ঠের আবির্ভাব হইতেছে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন কি? পাঠক! এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন দেখি যে, সন্তানোৎপাদনে পিতামাতার দায়িত্ব কত?

গর্ভাধানের এই সমুদয় কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পরিষ্কার বুঝা যায় যে, স্ত্রীর প্রত্যেক ঋতুতে গর্ভাধান সংস্কার আবশ্যক। শাস্ত্রকারেরও তাহাই অভিমত। কিন্তু—কি আর বলিব!

রজস্বলাকৃত্য, তাহার যুক্তি, এক পিতামাতার নানাপ্রকার আকৃতি প্রকৃতির সন্তান হয় কেন? গর্ভাধান সংস্কারে সাহেব ডাক্তারদিগের মতামত, প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

বিজয়া।

(১)

এসেছিলে মাগো গিরীশ-কুমারি!
ভকতের প্রতি করুণা করি।
দশভুজারূপে সুষমা প্রচারি,—
ঋপুবিনাশিনী মূরতী ধরি॥

(২)

গণা তিন দিন তিন বিভাবরী,
ভকত ভবনে করিয়ে বাস।
প্রতি জনে জনে আনন্দ বিতরি,

(৩)

পূজার দালান রূপে আলো করি,
ছিলে মা শিবানি ! গিরীন্দ্রবালা !
তাপীজনগণে তাপ পরিহরি,
সঁপেছে চরণে কুসুমমালা ॥

(৪)

কি আনন্দ ছিল সেই তিন দিন,
বুঝেছে যাহারা, তাহারা জানে।
দুখের যাতনা ভুলেছিল দীন,
শান্তিসুধানিধি লভিয়ে প্রাণে ॥

(৫)

শরতের চাঁদ, শরতের ফুল,
লোকে ভালবাসে আদর করে
বলে কি সুন্দর, জগতে অতুল,
হেন শোভা কেহ নাহিক ধরে ॥

(৬)

বলে বটে তারা, চর্ম্মচক্ষে চায়,
বিশ্বময়ী শোভা ভাবেনা মনে।
আমি কিন্তু বলি, হৃদয় মাতায়,
শারদা সুন্দরী স্বগণ সনে ॥

(৭)

শরতের মান তব আগমনে,
সারদা সুন্দরী ধরেছ নাম।
সে শোভা হেরে না জ্ঞানহীন জনে,
তবু তুমি দাও পূরায়ে কাম ॥

(৮)

তুমি মা অম্বিকে, জগদম্বে শিবে,
মহিমা তোমার কহিতে নারি।
মহিমা প্রচার অমরে ত্রিদিবে,
মূঢ়ে কি বুঝিবে, চিনির ভারী ॥

(৯)

এসেছিলে দেবি গিরীন্দ্রকুমারি,
আনন্দরূপিনী, আনন্দ দিতে।
চলি গেলে পুন সমস্ত আঁধারি,
নিরানন্দ দিয়ে ভকত চিতে॥

(১০)

পূজার দালান হ'ল অন্ধকার!
দীপ ছটা ঘটা কিছুই নাই!
তুমি যথা নাই কেন রবে আর,
সব অন্ধকার যে দিকে চাই॥

(১১)

হাসি হাসি মুখ সবার মলিন,
ডুবিল আবার বিষাদ-নীরে।
দশমী বিকালে বিজয়ার দিন,
যায় যবে সবে গাঙ্গিনী-তীরে॥

(১২)

সোণার প্রতিমা দিয়ে বিসর্জ্জন,
আসে যবে সবে ফিরিয়ে ঘরে।
বিষন্নবদনে করে দরশন,
শূন্য বেদী তব মণ্ডপ পরে॥

(১৩)

কি যে মনে হয়, দেবী সে সময়
ভাবিয়া কিনারা না মিলে তার,
জ্ঞান হয় যেন বিদরে হৃদয়,
ভালবাসা বাসে থাকেনা আর॥

(১৩)

সংসার-ভাবনা, সংসারের শোক,
সংসারের তাপ, সংসার মায়া।
ফিরে আসে পুন, বিমোহিত লোক,
বুকে পড়ে শুধু তোমারি ছায়া॥

(১৪)

বেশী কি বলিব, বাদ্যযন্ত্রগুলি,
অচেতন যারা, নাহিক জ্ঞান,
তারাও বিষাদে ভাল তাল ভুলি
শোক বাদ্যতালে কাঁদায় প্রাণ॥

(১৫)

গিয়াছ মা অন্নপূর্ণা কৈলাস অচলে,
অন্নকষ্টে রেখনা মা সন্তান সকলে।
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী তুমি, অন্তর যামিনী;
চরাচর সর্ব্বভূতে মঙ্গলদায়িনী॥

(১৬)

সর্ব্বত্র দেখিতে পাও, জানিতেও পার,
তাই বলি ব্রহ্মময়ী, শঙ্কটেতে তার,
ভট্টাচার্য্য আমন্ত্রণ করিয়া স্মরণ,
বর্ষপরে পুনরায় দিও দরশন॥
বলিতে জানিনা কিছু, কি বলিব আর
ভক্তিভরে শ্রীচরণে করি নমস্কার।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এই কি বিজয়া দশমী ?

হায়! এই কি সেই বিজয়া দশমী? যাহাতে সেই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া অরাতিকুল নির্ম্মূল মানসে লক্ষ্মণের সহিত পররাষ্ট্র আক্রমণ পূর্ব্বক দুর্দ্দান্ত দ্বিষৎকুলের কুবৃত্তি সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বিজয় শ্রী অধিকার করিয়াছিলেন, এই কি সেই বিজয়া দশমী?

যাহাতে ভক্তাগ্রণী রামচন্দ্র বিবিধ কুসুমোপহারে ও রক্তচন্দন দ্রবাম্বু-লিপ্ত বিল্বদল ও যবাপুষ্পাঞ্জলি দ্বারা সেই পরমাশক্তির পূজা করিয়া সঙ্কল্পিত সহস্রপদ্মের একটীমাত্র ন্যূন হইলে সমুচ্ছলিত ভক্তির প্রভাবে আপন নয়নপঙ্কজ উৎপাটিত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, এবং যথাবিধি সেই মহাশক্তির পূজা সমাধান্তে ভ্রাতার সহিত মহাবীর রামচন্দ্র বিজয়া-ভিষেক গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কি সেই বিজয়া দশমী?

হায়! যাহাতে বিজয়লক্ষ্মীর সমাকর্ষণকাম রামচন্দ্র ইতস্ততঃ তীব্রভ্রমৎ খরসান কৌক্ষেয়ক বিক্ষেপণে কোথাও শতধা কোথাও বা সহস্রধা ছিন্ন গলরুধিরধার বৈরিশীর্ষ দ্বারা সেই মহাশক্তির প্রীতি সাধন করিয়াছিলেন, এই কি সেই বিজয়া দশমী ?

হায়! অগু দুর্ব্বল ছাগল পালের বিনিপাত করতঃ বঙ্গীয়গণ দুর্গোৎসবের এই কতিপয় দিন ব্যতীত অকৃত প্রাতঃস্নান সন্ধ্যা পূজাসময়ে পূজামন্দিরে মুহুর্মুহু তাম্রকুট ধূমপান পবিত্রীকৃতমুখ পূজার বস্ত্রাদি দ্রব্য সমূহে লোলকটাক্ষ নিঃক্ষেপী দক্ষিণালাভলোলুপ পুরোহিত দ্বারা পূজা সম্পন্ন করিয়া বিজয়াভিষেকে কৃতর্থম্মন্য মনে করে, এই কি সেই বিজয়া দশমী ?

হায়! যাহাতে বিভীষণের সহিত উপচিত শক্তির সাহায্যে লক্ষ্মণ দুর্জ্জয়বীর্য্য ইন্দ্রজিৎকে নির্জ্জিত করিয়া বিজয়াভিষেক গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর দুর্ব্বল বঙ্গীয় বীর একটী মানকচু পত্রে বেষ্টিত পিষ্টময় শত্রু-প্রতিকৃতি ছেদ করিয়া আমরা বিজয়াভিষেক মনে করি, এই কি সেই বিজয়া দশমী ?

হায়! যাহাতে গন্তব্য পথের অন্তরায় বনপ্রবৃদ্ধ প্রাণিকুলবিদ্রাবী দুর্ম্মদ মহিষায়মান কুম্ভকর্ণকে রঘুকেশরী রাম নিষ্পেষিত করিয়া বিজয়াভিষেক গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর বঙ্গীয় বীর আমরা অনেকে একত্র হইয়া পদচতুষ্টয়ে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক আকর্ষণে যন্ত্রে পাতিত মৃণালসদৃশ গ্রীবা করত গৃহপালিত বিশ্বস্ত সাধুশীল মহিষশাবক ছিন্ন করিয়া মহাশত্রু বধ করিয়াছি মনে করিয়া বিজয়াভিষেক গ্রহণ করিতেছি, এই কি সেই বিজয়া দশমী ?

হায় হায়! আমরা কাপুরুষ, আমাদিগকে শত ধিক্, আমরা দুর্ব্বলের সিংহ, আমাদিগকে সহস্র ধিক্। হায়! এই কি আমাদের শক্তিপূজার পরিণতি ? পূর্ব্বকালে রাম ও সুররাজ যে শক্তির অনুকম্পায় ভুবনকম্পন রিপুকুলকে উন্মূলিত করিয়াছিলেন, আর আমরা দুর্ব্বল অনাথ পশু ও কৃত্রিম শত্রুর উপরে কৃপাণপাণি হইয়া—

"বলমাধেহি বলয় সমশত্রূন্ পরাজয়।
তত্কারণাদ্ভবেযুর্ম্মে ধনধান্য সমৃদ্ধয়ঃ॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শক্তির চরিতার্থ করতঃ বিজয় চিহ্ন অপরাজিতার বলয় ধারণ করিতেছি, এই কি সেই শক্তিসেবার পরিণতি ?

হে মাতঃ! দয়াময়ি! অদ্য রাজার অনুগ্রহে আমরা কতিপয় দিনের জন্য দাসত্বশৃঙ্খল বিমুক্ত হইয়া তোমার আরাধনায় তৎপর হইয়া যথাবল যথাসাধ্য যথাবিভব যথাপরিবার যথাসুখ আত্মানুরূপ বস্ত্রাদি বস্তুজাত আহরণ করিয়াছি, আমাদের অন্তর প্রফুল্ল, কয়দিনের জন্য পুত্র কলত্র মিত্রের সহিত স্বাধীনতার সুশীতল ছায়া আশ্রয় করিলাম। এখন পর্ণ-কুটীরে বা হর্ম্ম্যগৃহে আমাদের সংগীত বিরত, নর্ত্তন নিবৃত্ত, তূর্য্যনিনাদ প্রশমিত, দীপাবলী নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, তোমার প্রতিমা বিসর্জ্জিত, হৃদয় দুঃখভারে আক্রান্ত, বন্দন নীলিমায় প্রলিপ্ত, পুনর্ব্বার দাসত্বশৃঙ্খল পায়ে পরিবার সময় উপস্থিত, এই কি মা দুর্গার্চ্চনের ফল পরিণত? অতএব আমরা মনে করি মা! বঙ্গীয় আমাদিগের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উর্দ্ধ করিয়া "ঠন্ ঠনা ঠন্" ঘন্টাবাদন পর্য্যন্তই ফল নিষ্পন্ন হইল।

যাহা হউক, নিজের কর্ম্মফল নিজে ভোগ করিতেছি,—এখন একবার অমরা ঈর্ষা জিগীষা জিঘাংসা অসূয়া ও মহিনকুলতা পরস্পর পরিত্যাগ করিয়া সকলে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আত্মাকে কৃতার্থ করি।

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

জয়ন্তী।

১২৫৯ সালে মহাবিষুব সংক্রান্তি। প্রাতঃকাল; মধুমাসের প্রভাতের মধুসমীরণ সুখস্পর্শ; সহকার শাখে লুক্কায়িত পিকবরের সুমধুর কুহু-রব; পুষ্পকুঞ্জে মধুকরের মধুর গুঞ্জন; দিকে দিকে নানা কুসুম বিকসিত; পুষ্পগন্ধে চতুর্দ্দিক প্রমোদিত; সময় রমণীয়। এই রমণীয় সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী একখানি প্রসিদ্ধ গ্রামের একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে যাইতেছে, সঙ্গে একটি বালিকা।

স্ত্রীলোকটী প্রৌঢ়া, বয়স অনুমান ৩০।৩৫ বৎসর, বালিকাটি দশম বর্ষীয়া। প্রৌঢ়া রমণী দেখিতে সুন্দরী নয়, কিন্তু ঠাট্ ঠমক্ ভঙ্গিতে বোধ হয় অত্যন্ত চটুলা; তাহার প্রত্যেক কটাক্ষে চতুরতা মূর্ত্তিমতী। বালিকাটি সুন্দরী। গঠন মোলায়েম, কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকারা, মুখখানি পদ্ম ফুলের মত ঢল ঢল। উভয়কে দেখিয়া এক জাতীয়া বলিয়া বোধ হয় না; বালিকাকে যেন ব্রাহ্মণ কায়স্থবংশীয়া বলিয়া স্থির হয়; প্রৌঢ়া যেন

কোন নিম্ন শ্রেণী সম্ভূতা। ব্রাহ্মণ কায়স্থ কন্যাগণের বদনের কেমন একটি সুমধুর লাবণ্য, কিঞ্চিৎ কুরূপা হইলেও সেই প্রাকৃতিক লাবণ্যটি লুকায় না, বালিকাবদনে সেই সুন্দর লাবণ্য বিরাজমান; অন্য শ্রেণীতে সে লাবণ্য সম্ভবে না। উভয়েই অলুলায়িতকেশা, সিক্ত বস্ত্র পরিহিতা; উভয়েরই মুখমণ্ডল প্রফুল্ল; অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া উভয়েই গল্প করিতে করিতে উত্তর মুখে চলিয়াছে, বালিকাটি মধ্যে মধ্যে হাসিতেছে, তাহার মস্তকের সুকুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ কর্ণ ললাট অতিক্রম করিয়া নেত্র পার্শ্বে উজ্জ্বল গণ্ড চুম্বন করিতেছে, হাসির সময় বোধ হয়, যেন ঘোর কৃষ্ণ মেঘমালায় চপলা চমকিতেছে। বামদিকে একটি ফুলবাগান। নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়া বাগানখানিকে মোহিনী শোভায় সাজাইয়া রাখিয়াছে। ফুল দেখিয়া বালিকা তাহার সঙ্গিনী প্রৌঢ়াকে হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "পদ্ম দিদি! আমাকে গোটাকতক ফুল তুলিয়া দেনা ভাই?"

প্রৌঢ়ার নাম পদ্মমণি। বালিকার আব্দার শুনিয়া পদ্মমণি বলিল, "না দিদিমণি, ভয় করে! বাবুদের বাগান, কে কোথা দিয়া দেখিবে, তাড়া করিয়া মারিতে আসিবে।" বালিকা হাসিয়া বলিল, "ও কি লো! ভয় করিস্ কেন, কেহ কিছু বলিবে না, তুই যা, গোটাকতক তুলিয়া আন্। রমণ বাবুর বাগান, রমণ বাবু আমার দাদা হয়!"

পদ্মমণি তখন একটু সাহস পাইয়া ফুলবাগানে প্রবেশ করিল, বাছিয়া বাছিয়া গুটিকতক সুবাস পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া বালিকার হস্তে দিল। একবার আঘ্রাণ লইয়া বালিকা সেই ফুলগুলি আপন সিক্ত বসনের অঞ্চলে বাঁধিয়া লইল। আরও কিয়দ্দূর গমন করিয়া পদ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক বালিকা পুনর্ব্বার কহিল, "পদ্ম দিদি! তুই আর এখন তখনকার মতন আমাদের বাড়ীতে যাস্ না কেন ভাই?"

নিশ্বাস ফেলিয়া পদ্মমণি বলিল, "আর ভাই যাওয়া! তোমার দিদি সে দিন আমাকে যে রকম মুখ ঝাম্টা দিয়াছিল, চক্ষু লাল করিয়া যে রকমে আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়াছিল, দেখিয়াছিলে তো? বাকি ছিল কেবল ঝাঁটা! ছি ছি ছি! সেখানে কি আর যেতে আছে?"

বালিকা বলিল, "দিদি আমার তালপাতার আগুন, স্বভাবটা কেমন ঐ এক রকম, কিন্তু যেমন জ্বলে, তেমনি আবার তখনি ফস্ করিয়া নিবিয়া যায়। তুই যাস্, তোরে আমরা সকলেই বড় ভালবাসি। দিদিও

সে দিন দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন, পদ্মদিদি কেন আসে না? আমার কথায় রাগ করিয়াছে বুঝি? মা বলিলেন, তুই যেমন কথায় কথায় লোকের মনে ব্যথা দিস্, তাতে করে কেহই আমাদের বাড়ীতে আসিতে চায় না। অমন খিট্‌খিটে স্বভাব কেন তোর? আগে তো অমন ছিল না, এদানি অমন হইয়াছিস্ কেন?—সত্য পদ্মদিদি, দিদি তখন লজ্জায় মাথাটি হেঁট করিয়া চুপটি করিয়া রহিলেন, একটিও উত্তর করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণের পর মৃদুস্বরে বলিলেন, কৈ, আমি তো পদ্মকে তেমন শক্ত কথা কিছুই বলি নাই। মাইরি পদ্মদিদি, দিদির মুখখানি তখন শুকাইয়া গিয়াছিল। তুই যাস্, এবারে আর দিদি তোরে কক্ষনো কোন কটু কথা বলিবেন না।"

পদ্ম কহিল, "দেখ লক্ষ্মী, আমার ভাই বড় অভিমান; একটু ছোট জাত বলিয়া কি আমাদের মান ইজ্জৎ কিছুই নাই? এমনই বা কি ছোট, তোমাদের কাছেই যেন একটু ছোট, নহিলে সমস্ত ভদ্রলোকের সংসারে আমাদের আদর আছে। পরামাণিকেরা পুঁতি কোলে করিয়া না বসিলে ব্রাহ্মণের ছেলের পৈতা হয় না।"

পদ্মমণি সেই বালিকাকে লক্ষ্মী বলিয়া সম্বোধন করিল, সত্যই বালিকাটির নাম মহালক্ষ্মী। নাপিত কন্যার আক্ষেপের কথা শুনিয়া মহালক্ষ্মী বলিল, "তুই ভাই তোর অভিমানটাকে তাড়াইয়া দে, সে সব কথা ভুলে যা, তোরে দেখিলে সকলেই আমরা খুসী থাকি। তুই যাস্, যাবি? যাবি? যাবি? বল, আমার মাথায় হাত দিয়ে তিন সত্যি করিয়া বল্, যাবি? যাবি? যাবি? আজ বৈকালে তুই নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ীতে যাবি? দেখিস্ ভাই, গঙ্গাস্নান করিয়াছিস, মাথায় গঙ্গাজল, গায়ে গঙ্গাজল, কাপড়ে গঙ্গাজল, কথা যেন মিথ্যা হয় না! যাস্ যাস্, যাস্।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে একখানি বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই বাড়ী মহালক্ষ্মীর পিতৃভবন। মহালক্ষ্মীর পিতার নাম হরকালী চট্টোপাধ্যায়। পদ্মমণিকে পুনর্ব্বার তিন সত্য করাইয়া, চারিদিকে চাহিতে চাহিতে মহালক্ষ্মী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, পদ্ম নাপ্তিনী আপন গৃহে চলিয়া গেল।

গ্রামে সে দিন ঘোর ঘটায় চড়ক পূজা। নাপ্তিনী আসিলে মহালক্ষ্মী

তাহার সঙ্গে চড়ক দেখিতে যাইবে, সেই আশায় বেলাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আহারাদির পর ক্রমশই অপরাহ্ণ উপস্থিত হইল। পদ্মমণি আসিল না, মহালক্ষ্মীর উদ্বেগ বাড়িল। বেলা যায়, সূর্য্যদেবের পাটে বসিবার অধিক বিলম্ব নাই, তখনও পদ্মমণি আসিল না, মহালক্ষ্মীর মন অধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। পদ্মমণির বাড়ী সে বাড়ী হইতে অধিক দূরে ছিল না। তাহার বাড়ীতে যাইয়া ডাকিয়া আনিবার জন্য মহালক্ষ্মী ব্যস্ত হইল; কাপড় ছাড়িতেছে, এমন সময় পদ্মমণি আসিয়া উপস্থিত। বাড়ীর পরিবারেরা অনেকদিনের পর পদ্মকে দেখিয়া মিষ্ট বচনে আদর করিলেন, মহালক্ষ্মীর দিদিও হাসিয়া হাসিয়া পদ্মমণির সহিত কথা কহিল, পদ্মমণি পূর্ব্ব অভিমান ভুলিয়া গেল, অনন্তর মহালক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া চড়ক দেখাইয়া আনিল। চড়কতলা হইতে মহালক্ষ্মী দুটি মাটির পুতুল, একটি টিনের বাঁশী, দুটি চিনির মট, আর কুট্‌কলাই মুড়কির সঙ্গে খানকতক ফেণী বাতাসা কিনিয়া লইয়া আসিল।

ইহার পর পাঁচ দিন অতীত। নূতন বৎসরের—১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ। সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্ব্বে মহালক্ষ্মীর দিদি আপন শয়নকক্ষে বসিয়া, সম্মুখে একখানি দর্পণ রাখিয়া, কেশবিন্যাস করিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে কি যেন মনে করিয়া বসনাঞ্চলে নেত্রনীর মার্জ্জন করিতেছে, সুন্দর মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিতেছে, চক্ষে জল পড়িতেছে।

মহালক্ষ্মীর দিদির নাম সুরেন্দ্রবালা। দেখিতে দিব্য সুন্দরী, বয়স অনুমান চতুর্দ্দশ বর্ষ, সুন্দর শরীরে নবযৌবনের অঙ্কুর। দর্পণ সমক্ষে কেশবিন্যাস করিতে করিতে সুরেন্দ্রবালা কাঁদে কেন, ইহাও তো বিষম সমস্যা। এ সমস্যার পূরণ বড় শোকাবহ। সুরেন্দ্রবালা বিধবা। একাদশ বর্ষ বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, এক বৎসর পরে বিধবা হইয়াছে। পূর্ণ দুই বৎসর এই বালিকা বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। দর্পণে মুখ দেখিয়া সেই দুঃখে সুরেন্দ্রবালা কাঁদিতেছে; পদ্মমণি আসিয়া দেখা দিল। সসম্ভ্রমে নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া সুরেন্দ্রবালা সযত্নে পূর্ব্বভাব লুকাইবার চেষ্টা পাইল; পারিল না। নিকটে বসিয়া পদ্মমণি তাহার একখানি হাত ধরিল; কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, "একি দিদি! চক্ষে তোমার জল কেন? আহা! মুখখানি রাঙা হইয়াছে, চক্ষু দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছে, কেন কেন, অকস্মাৎ কোমল প্রাণে [illegible]ভাবের

উদয় হইয়াছে? বুঝিয়াছি! বুঝিয়াছি। আমি সে দিন তোমার কর্ণে যে কথাটি বলিতেছিলাম, বিপরীত ভাবিয়া তুমি তখন সেই কথায় আমারেই তিরস্কার করিয়াছিলে; এখন ভাব দেখি দিদি, এখন তোমার মনের কিরূপ ভাব?"

সুরেন্দ্রবালার অঙ্গে তখনও দুই একখানি অলঙ্কার ছিল, একে একে সেইগুলি স্পর্শ করিয়া আবার বলিল, "আহা! ইহাতেই বা কি অপরূপ শোভা! সুদিন থাকিলে এই সোণার অঙ্গে কত স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইত, সোণার অঙ্গের কতই শোভা বাড়িত, প্রতিদিন বৈকালে আমি ঐ টুকটুকে পা দুখানিতে আলতা পরাইয়া দিতাম, তুমি যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী সাজিয়া বসিয়া থাকিতে, দেখিয়া সকলের চক্ষু জুড়াইত। হায়! হায়! বিধাতা বাদী, অল্প বয়সে এই দশা, কোমল কলিকায় দুরন্ত কীট! আচ্ছা দিদি! সে কথায় তোমার রাগ হইয়াছিল কেন? সংসারে যাহাতে তুমি সুখে থাকিতে পার, তাহাই আমার সাধ, এমন সুন্দর রূপ যৌবনে এ জন্মে বিফলে না যায়, তাহাই আমি চাই, আমার সে সাধে কেন যে তুমি বিমুখী হও, কিছুই বুঝিতে পারি না।"

পদ্মী নাপ্তিনী আসিয়া সুরেন্দ্রবালার কর্ণে কি ভাবের কি কি কথা বলে, সুচতুর পাঠক মহাশয়েরা, চতুরা পাঠিকা ঠাকুরাণীরা হয় তো অনুভবে তাহা একটু একটু বুঝিতে পারিতেছেন। পদ্মী নাপ্তিনী সেই সব কথাই বলে, সেই সব কথাতেই সুরেন্দ্রবালার রাগ হয়। রাগটা আন্তরিক কি কাল্পনিক, পদ্মী তাহা বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই আজিও পদ্মমণি সুরেন্দ্রবালার কর্ণে সেই সব কথাই তুলিল। কথাগুলির যে কি ভাব, এইখানে তাহা আমরা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিব।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রশ্নের বিচার তখনও এতদ্দেশে পুরাতন হইয়া পড়ে নাই, নূতন নূতন দম্পতীরা সুখী হইতে পারুক আর নাই পারুক, বিদ্যাসাগরের মতে বঙ্গদেশে গুটিকতক বিধবা-বিবাহ সমাধাও হইয়া গিয়াছিল, আর্য্যসমাজ একমত হইয়া তদ্বিষয়ের কর্ত্তব্যতা স্বীকার করেন নাই, সেই কারণে স্রোতোমুখে বাধা। পদ্মমণি নানা প্রলোভন দেখাইয়া সুরেন্দ্রবালাকে নূতন পথে লইয়া যাইবার উপদেশ দিতে লাগিল, সুরেন্দ্রবালা স্থির হইয়া শুনিল, কথা কহিল না। সন্ধ্যা হইল, সে দিনের পরামর্শ সেই পর্য্যন্ত

রাখিয়া পদ্মমণি চলিয়া গেল। সুরেন্দ্রবালার সুকোমল হৃদয়তন্ত্রীতে দুর্জ্জয় বেগে ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইল।

হরকালী চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সন্তান হয় নাই, দুটীমাত্র কন্যা। জ্যেষ্ঠা সুরেন্দ্রবালা, কনিষ্ঠা মহালক্ষ্মী। সুরেন্দ্রবালা দুর্ভাগা, মহালক্ষ্মী অনূঢ়া। সুরেন্দ্রবালাকে সকলেই সুরেন্দ্র বলিয়া ডাকে, কেবল তাহার গর্ভধারিণী একটী নূতন নাম দিয়াছিলেন, জয়ন্তী। মাতার দেখাদেখি পিতাও তাহাকে জয়ন্তী বলিয়া আদর করিতেন। জয়ন্তীর বালবৈধব্যে হরকালী বাবু অন্তরে অন্তরে যেন তুষানলে দগ্ধ হইতেছিলেন, পুত্র সন্তান নাই, সমাজের ভয় না রাখিয়া, মনে মনে তিনি বিদ্যাসাগরের মতে জয়ন্তীকে দ্বিতীয় পাত্রে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, মনোভাবটী কাহারও কাছে প্রকাশ করে নাই, জয়ন্তীর জননী কেবল পতিমুখে সেই সঙ্কল্পের আভাষ পাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বাস্তবিক অসুখী হন নাই।

গঙ্গার ঘাট হইতে স্নান করিয়া বাড়ী আসিবার পথে চড়কের দিন প্রাতঃকালে মহালক্ষ্মী ফুল তুলিবার কথায় পদ্মমণিকে বলিয়াছিল, রমণ-বাবুর ফুলবাগান। রমণবাবু বিংশতি বর্ষীয় যুবাপুরুষ, দেখিতে দিব্য সুশ্রী, ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নূতন মতে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, বিশেষতঃ জয়ন্তীর রূপলাবণ্যদর্শনে তাহার প্রতি তাঁহার প্রেমানুরাগ জন্মিয়াছিল, হরকালী বাবুর সম্মতি পাইবেন কিনা, কেবল সেই সন্দেহে আপন মনের ভাবটী প্রকাশ করিতে পারেন নাই। জয়ন্তীও রমণবাবুকে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে বিচলিতচিত্ত হইত, মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত, বিমর্ষবদনে সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিত। মুখে যদিও জয়ন্তীকুমারী রমণবাবুকে "দাদা দাদা" বলিত, কিন্তু অন্তরের ভাব অন্য প্রকার। পদ্মমণির ধারাবাহিক উপদেশে সুরেন্দ্রবালার মন টলিল, হরকালী বাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পত্নী আরও কিছু বেশী বুঝিলেন; পতি পত্নীর পরামর্শ সুস্থির হইল; ১২৬০ সালের বৈশাখ মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে বিদ্যাসাগরের মতে জয়ন্তীর সহিত রমণবাবুর পরিণয় বিধান সমাধান হইয়া গেল। রমণবাবু ব্রাহ্মণ, এ বিবাহে হরকালী বাবুকে প্রকৃতপক্ষে জাত্যন্তর হইতে হইল না। পদ্মমণি এ বিবাহে একখানি গরদ, আর একছড়া সোণার দানা ঘটকালী পাইল।

শ্রীসতীন্দ্রনাথ দত্ত।

মানবের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যাবলী।

প্রথম অধ্যায়।

বিচার বিবেচনা—কর্ত্তব্যাবধারণা।

মানব! মনোমধ্যে অনুধাবন করিয়া দেখ, ঈশ্বর কি জন্য তোমায় সৃষ্টি করিয়াছেন।

তোমার ক্ষমতা, তোমার অভাব এবং তোমার সম্বন্ধ চিন্তা করিয়া দেখ; তাহা হইলে তুমি তোমার জীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বুঝিতে পারিবে এবং তোমার জীবনকে যাবতীয় বিষয়ে পরিচালিত করিতে পারিবে।

কোন কথা কহিবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্য বিষয় প্রথমে চিন্তা না করিয়া কথা কহিবে না এবং সেইরূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানের অগ্রে পরিণাম বিচার না করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। তাহা হইলে লজ্জা, অবমাননা ও অনুতাপ তোমার সন্নিধানে আসিতে পারিবে না এবং বিষাদের রেখায় তোমার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইবে না।

অপরিণামদর্শী তাহার জিহ্বা সংযত করে না, সে যদৃচ্ছা কথা কহে এবং আপন মূর্খতায় আপনি জড়ীভূত হয়।

যেমন একজন, সম্মুখে একটী গহ্বর আছে, না দেখিয়া দ্রুতবেগে একটী বাধা উল্লঙ্ঘন করিতে ধাবিত হইলে, ঐ গহ্বর মধ্যে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে; সেইরূপ যাহারা অবিবেকী, সহসা তাহারা কোন একটী কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইলে তাহাদের বিপদে পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

অতএব, মানব! বিবেকের কথায় কর্ণপাত কর। তাহার কথাগুলি প্রজ্ঞাদেবীর কথা বলিয়া জানিবে এবং ঐ পথে চলিলে তুমি নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে এবং সত্যে উপনীত হইতে সক্ষম হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিনয়।

মানব! তুমি জ্ঞানী, এই ধারণায় উপনীত হইবার তুমি কে? কেনই বা আত্মগুণাবলী লইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ?

জ্ঞানী হইবার প্রথম সোপান আপনাকে মূর্খ বোধ করা। যদি তুমি সাধারণের নিকট সম্মানিত হইতে ইচ্ছা কর, জ্ঞানী বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিও না; কারণ উহাতে স্বকীয় মূর্খতা প্রকাশ পায়।

যেমন আড়ম্বরশূন্য বস্ত্রালঙ্কার সুন্দরীকামিনীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে, সেইরূপ বিনয় সুধীগণের দেহ অলঙ্কৃত করে।

বিনয়ীর বাক্য সত্যকে উজ্জ্বল করে এবং তাহার কথায় ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলে সকলে ক্ষমা করে। তিনি স্বকীয় জ্ঞানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন না; তিনি বন্ধুবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাহা হইতে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি আত্মপ্রশংসায় কর্ণপাত করেন না, এবং উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। আর তিনি আপন গুণাবলী কখন দেখিতে পান না। বিনয় আবরণে তদীয় গুণগ্রাম সেইরূপ অপরূপ শ্রীধারণ করে।

কিন্তু অবিনয়ী অহঙ্কারীর দিকে নেত্রপাত কর; সে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতঃ পথিমধ্যে বিচরণ করে এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সে ইতস্ততঃ মস্তক সঞ্চালন করে এবং দরিদ্রদিগকে ঘৃণা করে। সে অধস্তন ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি অহঙ্কার ব্যবহার করে এবং পক্ষান্তরে যাহারা উচ্চপদস্থ, তাহারা তাহার ঐরূপ ব্যবহার ও নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

সে অন্যের বিচার অগ্রাহ্য করিয়া স্বমত সমর্থন করে এবং ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না।

সে কাল্পনিক চিন্তা লইয়া গর্ব্বে স্ফীত হয় এবং সমস্ত দিবস আত্মকথা কহিয়া ও শুনিয়া সুখানুভব করে।

সে ব্যগ্র সহকারে আত্ম প্রশংসা শ্রবণ করে এবং চাটুকারগণ তাহার সর্ব্বনাশ করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রয়োগ।

হে মানব! যে হেতু অতীত আর কখন ফিরিয়া আসিবে না এবং ভবিষ্য ও তোমার ভাগ্যে না আসিতে পারে, সেই হেতু যাহা গিয়াছে,

তাহার জন্য অনুতাপ না করিয়া অথবা যাহা আসিবে, তাহার উপর অত্যধিক নির্ভর না করিয়া বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

এই মুহূর্ত্ত তোমার আয়ত্তাধীন, পরমুহূর্ত্ত ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। তুমি জান না, ইহা কি ফল আনয়ন করিবে।

যাহা কিছু করিতে কৃতসংকল্প, তাহা অবিলম্বে সম্পন্ন কর। যাহা প্রাতে অনুষ্ঠেয়, তাহা সন্ধ্যার জন্যে রাখিয়া দিও না।

আলস্য সর্ব্ববিধ অভাব ও দুঃখের, কিন্তু ন্যায়ানুগত পরিশ্রম, সর্ব্ববিধ সুখের কারণস্বরূপ, পরিশ্রমের নিকট অভাব পরাজিত; শ্রীবৃদ্ধি ও সাফল্য উহার অনুগামী ভৃত্য।

সে ব্যক্তি আলস্যকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে এবং উহাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই অর্থ সঞ্চয় করিতে এবং রাজ-সভার সভ্য হইতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই জগতে প্রশংসিত, সম্মানিত ও প্রতিপত্তিশালী হইয়াছে।

যে বিলম্বে শয়ন করে এবং প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে, সে দৈহিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তাদ্বারা উভয়ের স্বাস্থ্যোন্নতি করে।

অলস্যের দেহ ভারস্বরূপ বোধ হয়, সময় সুদীর্ঘ ও কষ্টকর বলিয়া অনুমিত হয়। সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, এবং ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না।

তাহার দিন মেঘের ছায়ার ন্যায় অতিবাহিত হইয়া যায়; সে স্মরণীয় কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না। তাহার দেহযষ্টিখানি রোগে জর্জ্জরিত। সে কাজ করিতে চাহে, কিন্তু চলচ্ছক্তিরহিত। তাহার মন তমসাচ্ছন্ন এবং চিন্তাসূত্র ছিন্ন ভিন্ন। সে জ্ঞানপিপাসু; কিন্তু মনঃ সংযোগ নাই। সে বাতাম্রভক্ষণে অভিলাষী; কিন্তু আবরণমোচনে অসমর্থ।

তাহার গৃহ অশান্তিময় এবং ভৃত্যগণ অপব্যয়ী ও কলহপরায়ণ। সে ধ্বংসাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, সে ইহা স্বচক্ষে অবলোকন এবং স্বকর্ণে শ্রবণ করে। সে প্রতিকার কামনা করে, কিন্তু তন্নিবারণে বদ্ধপরিকর নহে। অবশেষে কালধ্বংস আসিয়া ঘূর্ণি বাতাসের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করে এবং সে লজ্জায় অবনত ও অনুতপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রতিযোগিতা।

যদি তোমার অন্তরাত্মা সম্মানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে এবং শ্রবণযুগল আত্মপ্রশংসা শ্রবণে সুখানুভব করে, কেবল তাহা হইলে স্থূল দেহের ধর্ম্মে ব্যস্ত না থাকিয়া যাহা কিছু প্রশংসার্হ, তদুপার্জ্জনে যত্নবান হও।

সেই ব্যক্তি রাত্রিকালে মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্তনিচয় গুপ্তাবস্থায় অবলোকন করে, এবং দিবাভাগে তাহার অনুসরণ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করে।

সে উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করে এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া সুখানুভব করে। তাহার নাম দিগদিগান্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

কিন্তু খলের হৃদয় কালকূটে ভরা। তাহার জিহ্বা গরল নিক্ষেপ করে এবং প্রতিবেশীর সাফল্যে তাহার শান্তি ভঙ্গ হয়।

সে দুঃখিতান্তঃকরণে নির্জ্জন কুটীর মধ্যে দিনপাত করে এবং অন্যের মঙ্গলে আপনার অমঙ্গল বিবেচনা করে।

হিংসা দ্বেষে তাহার হৃদয় জর্জ্জরিত; সে কখন শান্তিসুখ ভোগ করিতে পায় না।

সে সততার আদর জানে না; সুতরাং অপরকেও আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া থাকে।

সে অন্যের গৌরব খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করে এবং তাহার কর্ম্মের কদর্থ করে।

সে তাহার অমঙ্গল কামনা করে এবং সর্ব্বদা ছিদ্রান্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু ব্যক্তি মাত্রেই তাহাকে ঘৃণা করে এবং সে ঊর্ণনাভের ন্যায় আপন জালে জড়ীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

দিগন্তব্যাপী গগনভেদী বটবৃক্ষ এক সময়ে মৃত্তিকামধ্যে অঙ্কুরাবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। সেইরূপ তুমিও এখন সকলের অপরিজ্ঞাত হইয়া সামান্য জীবন যাপন করিতেছ। কালক্রমে তুমি যে অশেষবিধ শুভানুষ্ঠানদ্বারা ক্ষিতিতলে ধন্য হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

যে কর্ম্মই হউক, তাহা সুসম্পন্ন করিয়া সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার

কর। কাহাকেও অগ্রণী হইতে দিও না। তত্রাচ কাহার প্রতিভার হিংসা করিও না। আপনার বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বিধান কর।

সদুপায় দ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে প্রয়াস পাইও না। সদুপায়ে উচ্চস্থল লাভ করিও। তাহা হইলে তোমার চেষ্টা ফলবতী না হইলেও সাধারণ্যে আদৃত হইবে সংশয় নাই।

এইরূপ ন্যায়ানুগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মার উন্নতি সাধিত হয় এবং ঐ ব্যক্তি যশোলিপ্সু হইয়া সানন্দে গন্তব্যপথে প্রধাবিত হয়।

প্রপীড়ন সত্ত্বেও সে তালবৃক্ষের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গগনবিহারী ঈগলপক্ষী সদৃশ উচ্চস্থান লাভ করিয়া মহাগৌরবান্বিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রজ্ঞা।

দেবী প্রজ্ঞা যাহা বলিতেছেন, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর এবং সেইগুলি হৃদয়-ভাণ্ডারে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দাও। তাঁহার সারগর্ভ বাক্যগুলি বিশ্বজনীন এবং যাবতীয় সদ্‌গুণ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি মানবজীবনের প্রভু ও পরিচালক স্বরূপ।

যদৃচ্ছা বাক্যব্যয় করিও না, জিহ্বা সংযত কর। কারণ তোমার মুখনিঃসৃত বাক্যই তোমার শান্তি নষ্ট করিতে পারে।

যে ব্যক্তি খঞ্জ দেখিয়া বিদ্রূপ করে, সে সাবধান হউক, যেন স্বয়ং বিকলপদ না হয়। যে অকুণ্ঠিত চিত্তে অন্যের দোষ উল্লেখ করে, তাহাকে আত্মকলঙ্কে লজ্জিত হইতে হয়।

বাগাড়ম্বরে নানা বিপদপাতের সম্ভাবনা; কিন্তু মৌনাবলম্বনে সে অনিষ্টপাতের আশঙ্কা থাকে না।

বাচাল সমাজের বড়ই অপ্রীতিকর, তাহার বাগাড়ম্বরে কর্ণপীড়া জন্মায় এবং অন্য প্রসঙ্গ মগ্ন হইয়া যায়।

কদাচ আত্মশ্লাঘা করিও না, কারণ সকলে তোমায় ঘৃণা করিবে; বা কাহাকেও বিদ্রূপ করিও না, যে হেতু উহা বড় বিপজ্জনক।

স্ব স্ব কর্ম্মে মনোনিবেশ কর, কদাচ অন্যের কার্য্যে হস্তার্পণ করিও না।

তোমার অবস্থানুযায়ী দ্রব্যসম্ভারের আয়োজন কর। প্রচুর আছে বলিয়া অত্যধিক ব্যয় করিও না; কারণ যৌবনের সঞ্চয়ে বার্দ্ধক্যে অশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

ধনতৃষ্ণা যাবতীয় অসদনুষ্ঠানের মূল, পক্ষান্তরে পরিমিত ব্যয় সকল গুণের সংরক্ষস্বরূপ।

কোন প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে ব্যয়বাহুল্য করিও না, কারণ ঐরূপ কৌতুকলাভার্থ যে অর্থব্যয় হইবে, তাহা তোমার আনন্দোপভোগের অন্তরায় হইবে।

কদাচ সুখ সমৃদ্ধিতে আত্মহারা হইও না বা অপরিমিত অর্থনাশ করিও না। যে ব্যক্তি অমিতাচারে জীবনের সুখের হিল্লোলে কালাতিপাত করে, তাহাকে পরিণামে অভাব-জনিত বহুকষ্ট ভোগ করিতে হয়।

কাহার চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া বিশ্বাস করিও না; অকারণে কাহাকেও অবিশ্বাস করিও না। কারণ উহা অনুদার প্রকৃতির পরিচায়ক।

কিন্তু যখন তাহাকে অকপট সাধু বলিয়া জানিবে, অমূল্য রত্নের ন্যায় তাহাকে হৃদয় মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিও।

যাহারা অর্থলোলুপ, তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিও না কিম্বা অসাধুর সহিত মিত্রতা করিও না। তাহাদের সহবাসে তোমার চরিত্র কলুষিত হইবে এবং তোমাকে ঘোর দুঃখে পতিত হইতে হইবে।

কাল যাহার অভাব হইবে, আজ তাহা অপব্যয় করিও না। একটু বিবেচনাপূর্ব্বক পরিণাম ভাবিয়া কাজ করিলে যাহা রক্ষা পায়, তাহা অকস্মাৎ নষ্ট করিও না।

অন্যের অভিজ্ঞতায় জ্ঞানলাভ কর এবং তাহার দোষ দেখিয়া আত্মদোষ সংশোধন কর। তথাপি, তুমি যতই জ্ঞানী হও, নিশ্চিত সফলকাম হইবে, এরূপ আশা করিও না। কারণ রাত্রিকালে কি ঘটিবে, তাহা দিবাভাগ আদৌ অবগত নহে।

নির্ব্বোধ যে সদাই অকৃতকার্য্য এবং জ্ঞানী যে সদাই কৃতকার্য্য হইয়া থাকে, এরূপ মনে করিও না। আর কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কাহার অদৃষ্টে সম্পূর্ণ সুখভোগ ঘটে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সহিষ্ণুতা।

মনুষ্যজীবনে দুঃখভোগ নিয়তিনির্দ্দিষ্ট। সেই কারণ বাল্যকাল হইতেই সাহস ও সহিষ্ণুতায় মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তুমি অবিচলিতচিত্তে বিধিনির্দ্দিষ্ট যে কোন দুর্দ্দৈবের সম্মুখীন হইতে পারিবে।

উষ্ট্র যেরূপ বালুকাপূর্ণ মরুপ্রদেশ দিয়া গমনকালে ক্ষুধাতৃষ্ণা ও রৌদ্রতাপ অকাতরে সহ্য করে; সেইরূপ যে ব্যক্তি শ্রমশীল ও সহিষ্ণু, সে সহস্র আপদবিপত্তি অবহেলে সহ্য করিয়া থাকে।

মহানুভব পুরুষ ভাগ্যদেবীর বিদ্বেষ উপেক্ষা করেন। তাঁহার উন্নতচিত্ত কিছুতেই অবসন্ন হইবার নহে।

তাহার হাস্যে তাঁহার সুখভোগ নির্ভর করে না এবং তাহার ব্যঙ্গে তিনি ভীত হয়েন না।

অটল পর্ব্বতের ন্যায় তিনি স্থির থাকেন এবং তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হন না।

শৈলোপরি উন্নতদুর্গ সদৃশ তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকেন এবং অদৃষ্টদেবীর নিক্ষিপ্ত তীরসকল তাঁহার পদতলে নিপতিত হয়।

আপদকালে তিনি হৃদয়ের সাহস ও চিত্তস্থৈর্য্যে অটল থাকেন।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত জয়মাল্যপরিহিত বীরপুরুষের ন্যায় তিনি অসীমসাহসে বিপদের সম্মুখীন হন।

ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাঁহার দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়, চিত্তের স্থিরতাপ্রযুক্ত কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হয়, এবং মানসিক বলে সকল সঙ্কট বিদূরিত হয়।

কিন্তু ভয়বিহ্বল কাপুরুষ সাধারণসমক্ষে বড়ই লজ্জিত হইয়া থাকে। কঠোর দরিদ্রাপীড়নে সে আপন মহত্ত্ব নষ্ট করে, এবং অবমান পরম্পরা সহ্য করিয়া অনিষ্টপাতের সূত্রপাত করে।

বাতাহত তৃণের ন্যায় অমঙ্গলের ছায়াপাতেই সে কম্পিত হইতে থাকে এবং সঙ্কটকালে হতবুদ্ধি হইয়া অবসাদ ও নৈরাশ্যে মগ্ন হইয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

সন্তোষ।

মানব! স্মরণ রাখিও, যে অনাদি অনন্তপুরুষ তোমার হৃদ্‌গত ভাব অবগত আছেন, এবং তোমার সকল অলীক ইচ্ছা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন এবং যিনি দয়াপরবশ হইয়া তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন না, তিনিই তোমার অবস্থার বিধান করিয়াছেন।

তত্রাচ যথায় তিনি সঙ্গত ইচ্ছা এবং সাধু সংকল্প দেখিতে পান, তথায় তিনি সফলকাম হইবার সম্ভবনা রাখিয়া দিয়াছেন।

তুমি যে অসুখ অস্বস্তি ভোগ করিতেছ, এবং আপন দুর্ভাগ্যবশতঃ বিলাপ করিতেছ, ভাবিয়া দেখ তাহার কারণ কি—তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা, অহমিকা ও অলীক কল্পনাই উহার একমাত্র কারণ।

অতএব ঐশ্বরিক ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করিও না, চিত্তশুদ্ধি কর। আর "যদি আমার ধনসম্পত্তি, শক্তিসামর্থ্য বা অবসরকাল থাকিত, তাহা হইলে আমি সুখী হইতাম" ইত্যাকার বিষয় লইয়া মনোমধ্যে আন্দোলন করিও না। কারণ স্থির জানিও, কি ধনবান, কি ক্ষমতাশালী, কি শ্রমবিমুখ প্রত্যেকেই এক একটী বিশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

দরিদ্রে ধনীর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখিতে পায় না, অলসের কষ্টকর জীবন উপলব্ধি করে না, বা ক্ষমতাবানকে যে কত ঝঞ্ঝাবাত ভোগ করিতে হয়, এবং কিরূপ সংশয়ে জীবনযাপন করিতে হয়, তাহা অবগত নহে, সুতরাং সে আপন দুরদৃষ্ট স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করে।

কাহার সুখের বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া হিংসা করিও না, কারণ তাহার অন্তরে কি দারুণ ব্যথা, তাহা তুমি অবগত নহ।

যিনি অল্পে সন্তুষ্ট হন, তিনি মহাজ্ঞানী। আর যে ব্যক্তির ধনতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত না হয়, সে বিপদজালের পরিসর বৃদ্ধি করে মাত্র। কিন্তু সন্তোষ সকল সুখের মূল, উহা গুপ্ত রত্ন সদৃশ এবং বিপদ নিবারণে শান্তিপ্রহরী স্বরূপ।

তত্রাচ যদি তুমি, অশেষ বৈভবসত্ত্বেও, ন্যায়পথ ভ্রষ্ট বা অবিনয়ী, অমিতাচারী, বা অনুদার স্বভাব না হও, তাহা হইলে অর্থে তোমার কখন অনর্থ ঘটাইতে পারিবে না

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, ক্রমাম্বয়ে সুখভোগ এ মরজগতে কাহার ভাগ্যে সম্ভবিতে পারে না।

ন্যায়পথেই ঈশ্বর আমাদিগকে যাইতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং পরিণামে সুখশান্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যাবৎ না কেহ তদীয় দেহত্যাগে সেই অনন্তধামে মুকুটমণ্ডিত হন, তাবৎ তাঁহার সুখাশা দুরাশা মাত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅটলবিহারী মিত্র।

পূর্ব্বস্মৃতি।

নিশার শেষের ভাগে
মনে হল সেই কথা,
জাগিল পুরব স্মৃতি,
পরাণ পাইল ব্যথা।

মৃদুমন্দ সমীরণে
বসি সেই দীঘি-কূলে,
ফুলখেলা খেলেছিল
কত যে পাদপ-মূলে।

কত হাসি হেসে ছিল,
কেঁদে ছিল কত বার;
কতবার বক্ষোপরি
রেখেছিল মাথা তার।

তারাগুলি নিরখিয়া
যেচেছিল বিভুকরে,
রহি যেন আকাশেতে
জনমের পারাবারে।

মরণের কালে তার
কহেছিল সে আমার,
ভুলে যেও মনোব্যথা,
দিয়াছি যে কতবার।

ভ্রমি কত দেশে দেশে
ভুলেছিনু এই কথা,
নিশার স্বপনে জাগি,
পুন দিল মনে ব্যথা।

জাগাইল ঘুম-ঘোর,
গড়াইল আঁখি-জল,
সেই জলে ভেসে গেল
গণ্ড আর বক্ষঃস্থল।

শ্রীচারুচন্দ্র রায়।

জীবতত্ত্ব।

জগদীশ্বরের যে অনন্ত মহিমা এবং অতুলনীয় ক্ষমতা আছে, তাহা আমরা এই চর্ম্মচক্ষে তাঁহার এই বিশাল জীবরাজ্যে, সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দিব্য দেখিতে পাই, একথা কে না স্বীকার করেন? এইটী দেখিতে পাই বলিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করি; নচেৎ কয়জন দিব্যচক্ষে ঈশ্বর দেখিয়াছেন, বলুন দেখি? তাঁহাকে চক্ষে কেহই দেখেন নাই, অথচ তিনি যে নিত্য, সত্য এবং সর্ব্বস্থলে তিনি যে বর্ত্তমান আছেন, কেবল তাঁহার কার্য্য ও সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় অনুধাবন করিয়াই বলা যায় মাত্র। যাহা হউক, এক্ষণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৃথা বাদানুবাদ করা আমার এ স্থলে উদ্দেশ্য নয়, এবং এরূপ অনধিকার চর্চ্চায় আমার আবশ্যক কি? এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর এই বিশাল সৃষ্টিরাজ্যে—জীবরাজ্যে যে সমস্ত জীব, অর্থাৎ বৃহদাকার মত্ত হস্তী হইতে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্য্যন্ত, কিংবা ইহা হইতেও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রজীব, যাহা অনুবীক্ষণ ভিন্ন চর্ম্মচক্ষে দ্রষ্টব্য নহে, এমত জীবের মধ্যে আমাদিগের অর্থাৎ মানব জীবনের শারিরীক উপকারার্থে যাহা সৃজন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে গুলি আমার পরীক্ষিত এবং সংগৃহীত, সেই গুলির বিষয় যথাযথ এ স্থলে বর্ণন করিব এবং পরে নিজে নিজে এক সময় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, উপকার প্রাপ্ত হন কি না এই বক্তব্য। যেমন দ্রব্যগুণে, ধাতুগুণে, উদ্ভিদগুণে আমরা শরীর রক্ষার্থে বহু দ্রব্য পাই, এমন কি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকি, সেইরূপ নিকৃষ্ট অপদার্থ জীব সমূহ দ্বারাও আমরা শারিরীক ব্যাধি হইতে উদ্ধার হইতে পারি, সে গুলি এস্থলে আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য আছে। বৃক্ষ, যেমন মহৌষধি; প্রত্যেক জীবও তদ্রূপ। ঈশ্বর রাজ্যে সকল জীবই সমান, এ ধারণা থাকা যে যুক্তিসঙ্গত, সে বিষয় সন্দেহ নাই। পরম কারুণিক পরমেশ্বর, প্রত্যেক জীবের পরস্পরের উপকারার্থেই সৃজন করিয়াছেন; তাঁহার রাজ্যে তাঁহার নিকট কেহ হীন কি অপদার্থ নহে। তবে আমরা ক্ষুদ্র জীব, ক্ষুদ্র বুদ্ধির দোষে পরস্পর হীন বিবেচনা করি; এবং কাহার দ্বারা কি উপকার পাই সম্যক অবগত নহি। ঈশ্বর সর্ব্বজীব হইতে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং তাহাদের বুদ্ধি ও হিতাহিত

জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা যদি আমরা বুঝিয়া না চলি, তবে মানব এবং পশুতে প্রভেদ কি? ঈশ্বর যদি আমাদের পরস্পরের খাদ্য খাদক সম্বন্ধ না রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা করা বড়ই ভার হইত। সেই জন্যই তিনি পরস্পরের খাদ্য খাদক সম্বন্ধ করিয়া পরস্পরের হিতার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত বলিতে হইবে। নচেৎ সৃষ্টিভারে ধরা টলমল করিত; সৃষ্টি রক্ষা মহাদায় হইত, এ বিষয় পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি। এক্ষণে স্থূল কথা এই, আমরা যে জীবকে হেয় অস্পৃশ্য জ্ঞান করি, তাহা হইতে সময়ে সময়ে কি যে উপকার পাই জানি না, সেই জন্যই না জানিয়া হেয় জ্ঞান করি; কিন্তু যখন জানিতে পারি, এই হেয় প্রাণী আমাদের যখন এত উপকারে আসে, তখন উহা হেয় নয়, বহু উপাদেয় ও উপকারী; তখন আমরা কত মনে মনে আনন্দিত হই তাহা বর্ণনাতীত। এক্ষণে নিম্নলিখিত কতকগুলি পরীক্ষিত হেয় জীবের বিষয় বর্ণন করিব, যাহা হইতে আমরা সময়ে সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই। অতএব পূর্ব্বে যাহার গুণ না জানিয়া হেয় ভাবিতাম, এক্ষণে তাহাদের অমূল্য ও উপকারী জ্ঞান করিব। সে গুলির বিষয় ও নাম শুনিয়া যেন আমাকে গালাগালি কিম্বা ধিক্কার দিবেন না এই অনুরোধ। পরে ক্রমে ক্রমে জীবতত্ত্ব সমস্ত জ্ঞান হইলে অবশ্যই মনে মনে তখন আমায় ধন্যবাদ দিবেন, সে বিষয় সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে জীবগণের মল, মূত্র ও দুগ্ধ হইতে কি কি উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাও জ্ঞান হইবেক।

১ম। ছারপোকা—ইহা হেয়, অস্পৃশ্য, ক্ষুদ্র নর-শোণিতপায়ী কীট বিশেষ। কিন্তু জগদীশ্বরের অপার মহিমায়, আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না, এক্ষণে বিশেষ পরীক্ষায় জ্ঞাত হইয়াছি যে, ইহা মানবের পরমোপকারী, স্বাস্থ্য উন্নতিকারক ক্ষুদ্র পতঙ্গ বিশেষ। কেন না, ইহা দ্বারা মনুষ্যের দুইটী শারিরীক মহাব্যাধি আরোগ্য হয়। ১ম-রক্তপড়া অর্শরোগ; ২য় নাসারোগ। যদি কোন রোগীর বহুকালের রক্তপড়া অর্শরোগ থাকে, তাঁহাকে অজ্ঞাতে কলাখণ্ডের সহিত কিম্বা কোন খাদ্যদ্রব্যের সহিত ৪।৫ দিন বড় বড় ছারপোকা দুই চারিটা পুরিয়া খাওয়াইলে উক্ত রোগের যাতনা ও রক্তপাত আরোগ্য হইবে; ইহা আমার বিশেষ পরীক্ষিত। ঐরূপ যে রোগীর বহুকালের নাসা ব্যাধি আছে, তিনি যদি

প্রত্যহ ৪।৫ দিন অন্ততঃ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে ৪।৫টী করিয়া ছারপোকা মারিয়া তাহার পুতিগন্ধ ঘ্রাণ লয়েন, এক সপ্তাহের মধ্যে নাসার রক্তপাত বন্ধ হইবে ও যাতনা অবশ্য দূর হইবে; যেমন হরিতকীর মাজভাগ কাটিয়া ছিদ্র করিয়া সুতা দ্বারা দক্ষিণ হস্তে তাগা বন্ধন করিলে যেরূপ দ্রব্যগুণে নাসাব্যাধি আরোগ্য হয়; ইহাও সেইরূপ নাসা-রোগের টোট্‌কা ঔষধ। ছারপোকা খাইলে দুদিন অন্তর যে পালাজ্বর হয়, তাহা আরোগ্য হয়।

২য়। **উকুন বা ইকুন**—ইহা মনুষ্যের কেশ ও মস্তকবিহারী ক্ষুদ্র হেয় অস্পৃশ্য নর-শোণিতপায়ী কীট বিশেষ; ছারপোকার শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। জগদীশ্বরের কৃপায় ও বহু গবেষণায় জানিয়াছি, এ নিকৃষ্ট জীব হইতেও আমরা দুইটী শারীরিক ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে পারি। তাহা এই;—১ম, শিরঃরোগ, বা শিরঃব্যাধি। ২য়, মৃগীরোগ। উক্ত ছারপোকা সেবনের ন্যায় ইহাও রোগীর অজ্ঞাতসারে কোন ফলের মধ্যে কিংবা আহারীয় দ্রব্যের মধ্য দিয়া ২।৪ দিন সেবন করাইলে উক্ত রোগ দুইটী অবশ্য আরোগ্য হইবে।

৩য়। **পুস্তকের কীট বা বয়ের পোকা**—এ কীট গুলির বর্ণ সাদা সাদা, গাত্রে সাদা ধুলির ন্যায় পদার্থে মিশ্রিত থাকে; হস্ত দিলে সেই সাদা গুঁড়ি হাতে উঠিয়া আসে; ইহার গাত্র বড় নরম তুল্‌তুলে গোছের; এই পোকার শুঁড় দুইটী কিঞ্চিৎ বড় বড়, ছটা কিংবা আটটী পদ বিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ চেপ্টা লম্বাগোছের ক্ষুদ্র জীব। পুরাতন কাগজ ও বয়ের মধ্যে সচরাচর ইহাদের দেখা যায়। ইহাদের চলৎশক্তি খুব শীঘ্র আছে। এই ক্ষুদ্র জীব হইতে আমাদিগের দেশের পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানীরা তাহাদের ছোট ছোট শিশুদিগের ঘুঙ্‌রীবাল্‌সা হইলে অর্থাৎ বুকে শ্লেষ্মা বসিয়া গেলে এই পোকার অর্দ্ধভাগ কাটিয়া খাঁটী মধুর সহিত পেষণ করিয়া সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখের মধ্যে কিম্বা জিহ্বাগ্রে মধ্যে মধ্যে চাকাইলে, ভেদ কিংবা বমি হইয়া শীঘ্র যে প্রকারে হউক সর্দ্দি উঠিয়া শিশু সুস্থ ও আরোগ্য হয়। যে স্থলে ডাক্তার কবিরাজ নাই, সেই স্থলের লোকেরা এই টোট্‌কা ঔষধে শিশুগণের ঐ দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করে। [ক্রমশঃ]

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

সমালোচনা।

ছন্দবোধ শব্দসাগর। এখানি অভিধান। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত, বাঙ্গালা, যাবনীক, ইংরাজী ও রঙ্গপুরী ইত্যাদি শব্দ-নিচয়ের শ্রেণীবদ্ধ উচ্চারণক্রমে ছন্দোবন্দাদি লিখিবার উপযোগী করিয়া এই অভিধানখানি সঙ্কলন করা হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই অভিনব অভিধানের সঙ্কলনকর্ত্তা রঙ্গপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালী-মোহন রায় চৌধুরী। তাঁহার এই অভিনব অভিধান সঙ্কলনে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পরিশ্রম হইয়াছে, পাণ্ডিত্য নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

অলঙ্কার শাস্ত্র বলেন, কবিতায় মিল তিন প্রকার। উত্তম, মধ্যম, অধম। ভাবুন,—বারণ আর ধারণ, এই যে মিল, ইহাই উত্তম মিল, কেন না, তিন অক্ষরে মিল আছে। বারণ আর নয়ন,—ইহার নাম মধ্যম মিল; কেন না, শেষের দুই অক্ষরে মিল আছে, বারণ আর বরুণ ইহাই অধম মিল;—কেন না কেবল শেষের একটি অক্ষরে মিলন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহারা কাব্য কবিতা রচনা করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই কবিতার মিলের প্রতি আদৌ দৃষ্টি রাখেন না; কেবল ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিতে চান; ভাবের সহিত মিলের যে কতদূর নিকট সম্পর্ক, সেটাও তাঁহারা মনে করেন না, মিল শুদ্ধ না থাকিলে সহসা ভাব গ্রহণের ইচ্ছা হয় না; কবিতায় অমিল থাকিলেই যার পর নাই শ্রুতিকটু হয়; শ্রুতিকটু হইলেই মন অন্য দিকে যায়; সুতরাং ভাব গ্রহণের ইচ্ছা পলায়ন করে। ভাবপরিপূর্ণ কবিতা পাঠে আনন্দ প্রকাশের অবসর থাকে না।

দেশ প্রচলিত সাধারণ শব্দ ইহাতে অনেক পাওয়া যায়, বৃহৎ বৃহৎ তিন খণ্ডে দুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য ৬৲ ছয় টাকা। এই অভিধান সাহায্যে শব্দার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে এতদ্দ্বারা কাব্যানুরাগী নূতন কবি-গণের কবিতা রচনায় সবিশেষ সহায়তা করিবে। উপসংহারে উক্ত অভিধানের ২০০১ পৃষ্ঠায় এক স্থলে লিখিত আছে,—

"একে সুখপাঠ্য আর সুখবোধ্য তায়।
তাহাতে কবিত্ব শক্তি জন্মিবে ত্বরায়॥
দুর্লভ কবির জন্ম যেরূপ প্রবাদ।
ইহাতে তাহার কিছু হবে অবসাদ॥"

এইটুকু লেখার উদ্দেশ্য এই যে, অভিধানখানির সতত আলোচনা করিলে সহজে কবিত্ব শক্তি আয়ত্বাধীন হইতে পারে। সঙ্কলন কর্ত্তার ইহাই মনোভাব, সর্ব্বমঙ্গলার কৃপায় সঙ্কলনকর্ত্তার মনোভাব সফল হইয়াছে।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা।)

দশম বর্ষ। } ১৩০৮ সাল, অগ্রহায়ণ। { ৫ম সংখ্যা।

থিয়সফি বা জ্ঞানধর্ম্ম।

থিয়সফির নাম আজকাল খুবই জাহির হইয়াছে; ইংরেজিনবীশ ভারতসন্তানদিগের ভিতর অনেকে থিয়সফিদলে যোগ দিয়াছেন। সভা-সমিতিও অনেক স্থানে হইয়াছে। নিজ ভারতের সভাতালিকা বা সভ্য-তালিকা আমাদের হাতে উপস্থিত নাই। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ড এবং ভারত প্রভৃতি ইংরেজি-নবীশরাজ্যে এখন সভা ও সভ্যের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে ৩০০ সভার তালিকা দেখিয়াছিলাম। গড়ে প্রত্যেক সভায় ১০০ জন সভ্য ধরিলেও দশ বৎসর পূর্ব্বে ৩০ হাজার সভ্য থিয়সফি-দলে নাম লেখাইয়াছিলেন। দশ বৎসরে সভার সংখ্যা বাড়িয়াছে, সভ্যের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দেও অনেকে ৫০ হাজার সভ্যের হিসাব দিয়াছিলেন, আমরা একলক্ষ সভ্যকেও তালিকাভুক্ত করিতে প্রস্তুত আছি।

গণনায় সভ্যসংখ্যা অধিক হইলেও, থিয়সফির রীতি প্রকৃতি মত সূত্রাদির প্রকৃত এবং গূঢ়রহস্য বুঝিতে যতটুকু বিদ্যা বুদ্ধি আবশ্যক, ততটুকু যাঁহাদের আছে, এরূপ সভ্যের সংখ্যা খুব অধিক হইবে না। সকল রহস্যে প্রবেশ করা ত আর যাহার তাহার কর্ম্ম নহে। আমরা থিয়সফির পাণ্ডা নহি। কর্ত্তাভজার দলে ভুক্ত না হইলে যেমন কর্ত্তা-ভজাদলের রহস্য বুঝা দুঃসাধ্য, থিয়সফির দলে না ঢুকিলেও সেইরূপ থিয়সফিদলের রহস্য বুঝা দুঃসাধ্য।

থিয়সফিদলের স্থষ্টি হইয়াছে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে। রুষিয়ার মাদম ব্লাবাট্স্কী বা বলবৎসখী, আমেরিকার কর্ণেল অলকট এবং জজ সাহেবকে লইয়া, দলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৯ অব্দে দলের বড় আখড়া নিউইয়র্ক হইতে মাদ্রাজের আদিয়ারে উঠিয়া আসে; আদিয়ারই থিয়সফির "ঘোষ পাড়ায়" পরিণত হয়। সেই আদিয়ারই থিয়সফি-ধর্ম্মের প্রধান শ্রীপাট বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উপপাট বসিয়াছে, কিন্তু প্রধান পাটের যেরূপ মান, উপপাটের সেরূপ নহে।

আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়া বলবৎসখী এবং অলকট থিয়সফি মতের প্রচার করেন। ধর্ম্মভক্ত ভারতে তাঁহাদের শিষ্যলাভও সহজেই হইতে থাকে। ১৮৮৭ সালে বিলাতের নূতন আখড়ায় বলবৎসখী থিয়সফিধর্ম্মের ঘোরতর প্রচার করিয়াছেন; থিয়সফিও ঐ সময়ে বিলাতে খুব জাহির হইয়া উঠে। ১৮৯৪ অব্দে অন্যতম হেড পাণ্ডা বা দলপতি জজসাহেবের সহিত বিবাদ হয়। অভিযোগ, "জজসাহেব মহাত্মা বা দেবাংশীভূত, কামচর, সাধারণের অদৃশ্য, জ্ঞানাবতার, সিদ্ধমহাপুরুষদিগের নামে বার্ত্তা ও পত্রাদি জাল করিয়া, নিজের পত্রাদিই মহাত্মাদিগের নামে জাহির করিয়াছিলেন। আসল বলিয়া জাল পত্রাদির প্রচার করিয়াছিলেন।"

এই বিবাদের পূর্ব্বেই বিলাতের শ্রীমতী বেশান্ত, নাস্তিক ব্রাড্‌লোর দল ছাড়িয়া, বলবৎসখীর থিয়সফিদলে যোগ দিয়াছিলেন, স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি বাগ্মিতা বাক্‌পটুতা অধ্যবসায় অভিনিবেশের গুণে অল্পদিনের ভিতরই দলের একটী প্রধানা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজ্ঞী বিদুষী সর্ব্বরাজ্যেষু।"

বেশান্তের যেমন বিদ্যা, তেমনই বুদ্ধি, তেমনই অধ্যবসায়, তেমনই জিদ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে জাহির হওয়া শক্ত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত জজ-বিবাদ উপলক্ষে বেশান্তও অনেক বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, অনেক প্রবন্ধ রচিয়াছিলেন, অনেক প্রবন্ধ প্রচারিয়াছিলেন। জজসাহেবও বেশান্তের উপর বলবৎসখী এবং অলকটের উপর নানারূপ দোষের আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দিনকতক কেলেঙ্কারীর একশেষই হইয়াছিল। কিন্তু শেষে মূলদলে জজেরই পরাজয় হইয়াছিল। তিনি আমেরিকায় এক নূতন দল বাঁধিয়া ছিলেন; সেই

দলের তিনি "কর্ত্তা"ও হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাঙ্গাদল আবার যোড়া লাগিয়াছে, দুই দলে আবার মিলন হইয়াছে। অলকটের দলে আর জজের দলে যোগ হইয়াছে; ঘোষপাড়ার দলে আর বাঁশবেড়ের দলে আর বিবাদ নাই। কিন্তু কুলের পাট এখন কাশীধামে।

বলবৎসখীর তিরোভাব হইয়াছে, এখন কর্ণেল অলকটই থিয়সফিষ্টদের প্রধান দলপতি; এই দলের এখন তিনিই "কর্ত্তা।" বলবৎসখীকে কর্ত্রী না বলিয়া "আউলেচাঁদ" বলিতে হয়। পানের বরজে আবিষ্কৃত হন নাই বটে, কিন্তু রুষরাজ্যের এক নিভৃত নিকেতন হইতে আমেরিকায় গিয়া তিনি থিয়সফি ধর্ম্মের প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন।

অলকট এখন দলের কর্ত্তা, কিন্তু বিবি বেশান্তও বড় কেও কেটা নহেন; ভারতে এখন অলকট অপেক্ষাও বরং বেশান্তের নাম ডাক অধিক। অষ্ট্রিয়ার কার্ডণ্টমহিলা ওয়াকমীস্তার, মিস এজার প্রভৃতি কয়েকটী জ্ঞান-ধর্ম্মভক্তাও শ্রীমতী বেশান্তের সহযোগিনী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের বৈষ্ণবদলে, শ্রীমতী জাহ্নবী গোস্বামিনী এবং শ্রীমতী গঙ্গা গোস্বামিনী, শ্রীমান্ শ্যামানন্দ গোস্বামী, গোপালভট্ট গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, বলরাম গোস্বামী, রামচন্দ্র গোস্বামী, বল্লভীকান্ত গোস্বামী, অভিরাম গোস্বামী প্রভৃতি সহযোগিতা এবং সমকক্ষতা করিয়াছিলেন। গোস্বামিনীদিগের মাহাত্ম্য গোস্বামীদিগের অপেক্ষা কম ছিল না, পুরুষের অপেক্ষা রমণীর ত কোন বিষয়েই মাহাত্ম্য অল্প নহে। সপ্তর্ষি মধ্যেও অরুন্ধতীর আদর, গার্গী আত্রেয়ী প্রভৃতির মান ত গার্গ আত্রেয়াদি অপেক্ষা কম ছিল না। এখনও হিন্দুবাবুরা কথায় কথায় ইহাঁদিগের দোহাই দিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে এখন বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈষ্ণবীর আদর, নেড়ানেড়ীর দলেও নেড়ীর প্রাধান্য। পূর্ব্বতন খৃষ্টানসম্প্রদায়ে খোঁজ, পুং-সেণ্টের পার্শ্বেই স্ত্রী-সেণ্টের দর্শন পাইবে। আমেরিকার নূতন "ক্রিশ্চান সায়েন্স" দলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এক রমণী। অনেক পণ্ডিত পুরুষ তাঁহার চেলা হইয়াছেন। বিলাতেও মধ্যে মধ্যে মহিলামুখো নবধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। একবার এক নারী এক নব খৃষ্টানীর প্রচার করিয়া বলিয়া-ছিলেন, "প্রভু একযুগে পুরুষরূপে খৃষ্ট হইয়াছিলেন। এবার নারীরূপে খৃষ্টা হইয়াছেন। আমিই সেই খৃষ্টা।" এই খৃষ্টার দল দিনকতক খুব

জাহির হইয়াছিল। দলের এখনও ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আউলেচাঁদের কর্ত্তাভজাদলেও কর্ত্রীর প্রাধান্য কম নহে। অনেক আখড়ায় কর্ত্তা নাই, কর্ত্রীই কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। সুতরাং বলবৎসথীর থিয়সফি-দলে কর্ত্রীর প্রভুত্ব বলবৎ দেখিয়া আমরা বিস্মিত নহি।

থিয়সফিসম্প্রদায়ের পুস্তক পুস্তিকা কম নহে। বলবৎসথী, অলকট, বেশান্ত প্রভৃতির পুস্তক অনেক। প্রয়াগের পাইয়োনীয়র পত্রে সম্পাদকতা করিবার সময়ে বিলাতের সিনেট সাহেব যে থিয়সফিধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সে ধর্ম্মের তিনি এখনও পরম ভক্ত। তিনিও একজন প্রধান থিয়সফিষ্ট, থিয়সফি সম্বন্ধে তিনিও গ্রন্থ লিখিয়াছেন। "সীক্রেট ডক্‌ট্রিণ বা গুপ্তমত" "আইসিস অন্‌ভেল্ড বা আবৃতের অনাবৃতি," "কী-টু-থিয়সফি বা জ্ঞানধর্ম্মের প্রবেশ-পথ" বলবৎসথার কৃতি; এসোটারিক বুদ্ধিসম্ বা আধ্যাত্মিক বৌদ্ধধর্ম্ম, "অকল্ট ওয়ারল্ড বা অদৃষ্ট লোক", "গ্রোথ অব দি সোল্ বা আত্মার পরিণতি" সিনেট সাহেবের প্রকটিত; বেশান্তের পুস্তক পুস্তিকা অনেক, ক্রমেই অসংখ্য হইয়া উঠিতেছে। লেডবীটার একজন গণ্যমান্য থিয়সফিষ্ট এবং গ্রন্থকর্ত্তা। আছেন অনেক। দলের সাময়িক পত্র আছে। "থিয়সফিষ্ট" পত্রের গ্রাহক-সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। অনেকে সখ মিটাইবার জন্যও কাগজ লইয়া থাকেন।

দলের বড় বড় সভা আছে, ছোট ছোট সভাও আছে। ছোট ছোট সভায় ছোক্‌রার ছড়াছড়ি। নূতন অনুষ্ঠানে চিরদিনই ছোকরার ছড়াছড়ি। ব্রাহ্মদলেও ছোকরা-ব্রাহ্মের সংখ্যা অধিক, এখনকার বাবু-হিন্দু-সম্প্রদায়েও ছোকরা-বাবুদের পোহাবারো! থিয়সফির ছোকরা-সভার ছোকরা সভ্য; ছোকরা সভ্যদের জন্য "ছোকরা কাগজ।" বালসভার বালসভ্যদিগের জন্য "বালবোধিনী" পত্রিকারও প্রচার হইয়া থাকে। সভার প্রায় সর্ব্বত্রই পুস্তকালয়ে আছে, পুস্তকালয়ে থিয়সফি-অঙ্গের পুস্তক আদৃত হইয়া থাকে; সুতরাং যোগশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিরও আদর না আছে এমন নহে। আমাদের দর্শনশাস্ত্রের রহস্য থিয়সফিষ্টদিগের পক্ষে জ্ঞেয়, অনেকের পক্ষে ধ্যেয়ও বটে; সাংখ্য পাতঞ্জল এবং বেদান্তের অধিক আদর। কিন্তু থিয়সফির সকল কথা কহিতে পারিব না, দলে

করা চলে না। থিয়সফির একটু পরিচয় দেওয়া, একটু আবছায়ার আভাস দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। সে সামান্য উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হইলেই আমাদের শ্রম সফল হইবে।

থিয়সফির তথ্য।

"গভীর নিগূঢ় বিশ্বরহস্য এবং মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রাচীনতম জ্ঞানের, মহাত্মা মহাপুরুষেরা, পরম্পরাক্রমে অনুবৃত্তিসহকারে—অতি প্রাচীনকাল হইতে, অনুগত এবং অনুগৃহীত শিষ্যগণের ভিতর, প্রচার করিয়া আসিতেছেন; তাহার অনুসন্ধান এবং লাভ করাই এখনকার "থিয়সফি বা জ্ঞানধর্ম্মের" মুখ্য উদ্দেশ্য।" থিয়সফির রহস্যজ্ঞ শিষ্যেরাই এই কথা বলিয়া থাকেন। আর তাঁহারাই বলেন,—

"সকল ধর্ম্ম, সকল বিজ্ঞান এবং সকল দর্শনের মূলে যে আদি সনাতন সত্য নিহিত আছে, তাহাই থিয়সফির বা জ্ঞানধর্ম্মের বিষয়ীভূত। প্রাচীনকালে এই সনাতন সত্যের যেরূপ প্রচার ছিল, এখন সেরূপ নাই। তখন ছিল—জ্ঞানের যুগ, এখন যাইতেছে—ইতিহাসের যুগ। এ যুগে মানবজাতির স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে; মানুষ, পরমতত্ত্ব ভুলিয়া, কেবল ঐহিক বাহ্য লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছেন। সুতরাং সেই আদি সনাতন সত্য, আর এখন মানবের মনে ও মস্তিষ্কে স্থান পায় না। তবে যে, সত্যের একেবারেই তিরোভাব হয় নাই, তাহা কেবল কতকগুলি মহাত্মার কৃপায়; তাঁহারাই ঐ জ্ঞানধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছেন; আদি ও সনাতন সত্যের একেবারে লোপ তাঁহারাই হইতে দেন নাই।"

থিয়সফিষ্টেরা বলিয়া থাকেন, "জগতে যত ধর্ম্ম, যত দর্শন, যত গূঢ় যোগশাস্ত্র, প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান থাকিয়া, ইহকালেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তৎসমস্তের নিরপেক্ষ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে, সকল ধর্ম্ম, সকল দর্শন এবং সকল গূঢ়যোগের মূল এক—সমস্তই এক ঐশজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আর ঐ সমস্তের যাহা সারভূত—যাহাই বিশুদ্ধ—তাহা একই রূপ। অর্থাৎ মূলে সকল ধর্ম্ম, সকল দর্শন এবং সকল যোগেই একতা। এই যে একীভূত—একরূপ—মূল সত্য, ইহাই নানাযুগে, নানা নামে, অভিহিত হইয়াছে। অত্রযুগে ইহাই থিয়সফি বা জ্ঞানধর্ম্ম;—জ্ঞানই যাহার প্রধানতম উপাদান, তাহাই জ্ঞানধর্ম্ম। জগতের

মত ধর্ম্মই এই মূল জ্ঞানধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। যে সকল মহাপুরুষ এই সকল ধর্ম্মের প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা মূল জ্ঞানধর্ম্মেই নির্ভর করিয়াছিলেন। আর তাঁহারা স্ব স্ব প্রচারিত ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ করিয়াই রাখিয়াছিলেন; চেলাদের দোষেই সকল ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাই এখন নানাধর্ম্মে নানামত; তাই এখন চারিদিকে "জগা খিচুড়ী।" আর চেলারাই সকল ধর্ম্মে নানারূপ ক্রিয়াকলাপ, আচার অনুষ্ঠান ঢোকাইয়া ধর্ম্মটাকে মাটী করিয়া দিয়াছে। আদি সনাতন সত্য যে জ্ঞানধর্ম্ম, তাহাকে একেবারেই জাহান্নবে দিয়াছে।"

থিয়সফিদলের রহস্তজ্ঞ ভক্ত শিষ্যেরাই এই কথা কহিয়া থাকেন। তাহারাই বলেন,—"এখনকার এই ঐতিহাসিক বা পুরাণপ্রধান যুগে সত্য সনাতন জ্ঞানধর্ম্ম অধিকাংশ সময়েই তমসাবৃত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে মেঘমুক্তি হয়—মধ্যে মধ্যে সত্য-সূর্য্যের বিকাশ হয়। দেবী বলবৎসখীর কৃপায় সম্প্রতি বিকাশ হইয়াছে। অল্‌কট বেশান্ত প্রভৃতির কৃপায় ক্রমে অধিকতর বিকাশ হইতেছে। বিকাশ হইতেছে, প্রচার হইতেছে, শিক্ষাও হইতেছে। সম্প্রতি অন্ধকার ঠেলিয়া আলোক বাহির হইতেছে, নির্জীবতার স্থলে সজীবতা হইতেছে। ঐতিহাসিকতার ঘোর কাটিতেছে, জড়বাদের পসার কমিতেছে; পরমতত্ত্বের আদর হইতেছে, জ্ঞানবাদের পসার বাড়িতেছে। কিন্তু ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, এই আলোকের যুগ আবার হয়ত কিছু দিন পরে অন্ধকারের যুগে পরিণত হইয়া যাইবে। কেননা, মধ্যে মধ্যে এরূপ আলোকের আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া গিয়াছে। অতএব এইবেলা আলোকের ভিতর প্রবেশ করা উচিত। জ্ঞানতরুর সুধাফল এইবেলা পেট ভরিয়া খাইয়া লওয়া উচিত। যাহাতে "মহাত্মাদিগের" দলে যাইতে পারা যায়, তাহারও চেষ্টা করা উচিত। কেননা, এই সনাতন জ্ঞানধর্ম্মের একেবারেই লোপ হয় নাই, মহাত্মাদিগের অধিকারেই রক্ষিত হইতেছে। সনাতন সত্য জ্ঞানধর্ম্ম এইরূপে বজায় থাকে এবং মধ্যে মধ্যে যুগে যুগে প্রকাশ পাইয়া প্রচারিত হয়, তাই একেবারে তিরোহিত হয় না। আর সেই জন্যই মানব-সমাজেরও একেবারে প্রলয় হইয়া যায় না।"

শিক্ষিত, দীক্ষিত থিয়সফিভক্ত মহাশয় মহাশয়াদিগের এইরূপ ব্যাখ্যাতেই পাঠক, রহস্য-বোধ করিতে হইবে; এখনকার "জ্ঞানধর্ম্মের"

স্বরূপ ও মাহাত্ম্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই একটু হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে; এখনকার থিয়সফি-সভার উদ্দেশ্যও সকলকেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে হইবে।

সভার উদ্দেশ্য।

১। ইউরোপীয়, এশীয় প্রভৃতির ভিতর তারতম্য না রাখিয়া, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির ধর্ম্মভেদ না করিয়া, স্ত্রী-পুরুষের ইতরবিশেষ না মানিয়া, ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির ভিন্নভাব মনে না আনিয়া এবং শ্বেতকৃষ্ণাদির স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য না করিয়া, সকলকে লইয়া, একটী ভ্রাতৃসমাজের অর্থাৎ ভগিনীমিশ্রিত ভ্রাতৃসমাজের মূলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা, থিয়সফি-সভার উদ্দেশ্য।

২। ভারতের আর্য্য এবং অন্যান্য প্রাচ্যদিগের সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও আলোচনা করা এবং আলোচনার উপযোগিতা লোককে বুঝাইয়া দেওয়া, থিয়সফি-সভার উদ্দেশ্য।

৩। প্রকৃতির যত গুপ্ত রহস্যের ভেদ-চেষ্টা করা, আর যে যোগশক্তি অর্থাৎ পরমযোগী মহর্ষিদিগের প্রদত্ত সঞ্চারিত দৈবশক্তি এখনকার মানবেও নিহত আছে, তাহারই অনুসন্ধান এবং প্রকাশ করা থিয়সফি-সভার উদ্দেশ্য।

থিয়সফি-দলে কোনরূপ ভেদজ্ঞান নাই। থিয়সফি-ধর্ম্মে জাতিবর্ণাদি বিভেদ জ্ঞানের কোনরূপ আধিপত্য নাই। থিয়সফির মতে—

"সর্ব্বত্র বিরাজমান, অনন্ত, অসীম, অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানশক্তিই পরমেশ্বর। ইহাঁর স্বরূপ-নির্ণয় করা একেবারেই অসাধ্য।"

থিয়সফির মতে মানুষের পার্থিব ক্রমোন্নতি হইতেছে। অর্থাৎ দার্ব্বীণের মতে যেরূপ তির্য্যগ্‌জীবের উচ্চ পরিণতিই মানব, থিয়সফির মতেও সেইরূপ। কিন্তু এই পার্থিব পরিণতির উপর আবার জ্ঞানগত পরিণতি আছে। অধিভৌতিক পরিণতির উপর ক্রমেই আধ্যাত্মিক পরিণতি হইতেছে। মানুষ ক্রমশঃ জন্মান্তর-পরিগ্রহ করিতেছে; মানুষ কর্ম্ম করিতেছে, কর্ম্ম-ফলের ভোগ করিতেছে। কর্ম্মগুণেই পরজন্মের উন্নতি, কর্ম্মগুণের অভাবেই উন্নতির অভাব।

দার্ব্বীণের মতে একরূপ ক্রমবিকাশ, থিয়সফির মতে দ্বিরূপ। দার্ব্বীণের

মতে শুদ্ধ আধিভৌতিক, থিয়সফির মতে আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক; থিয়সফির মতে জড়াত্মক এবং জ্ঞানাত্মক।

মহাত্মাদিগের সত্তা থিয়সফির মতে অবশ্য-শিরোধার্য্য। যাঁহাদের উক্তরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতির একশেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মগুণে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর জন্মলাভ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমে উঠিয়াছেন, তাঁহারাই "মহাত্মা"। ইহাঁরা স্বার্থপরতার অতীত, কেবল পরের মঙ্গলেই ব্যস্ত। মানবসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনই ইহাঁদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাঁরা সকলের দৃশ্য নহেন, প্রাপ্যও নহেন। যাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাঁহারা সহজেই দেখিতে পান।

থিয়সফি ধর্ম্মের কর্ম্ম অনেক। এই জ্ঞানধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ হইলে ক্রমেই কর্ম্মের উন্নতি হইয়া থাকে। কর্ম্মের উন্নতি হইলেই, ক্রমে আধ্যাত্মিক শক্তিরও উন্নতি হয়। এক জন্মেই সব হয় না। ক্রমে ক্রমে জন্মে জন্মে হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তির আধিক্য হইলেই যোগবলেরও বৃদ্ধি হয়; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান জ্ঞানগোচর হইয়া পড়ে; বহু-দূরস্থ লোকের সহিতও যোগবলে কথাবার্ত্তা কহা যায়; অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে ত্রিকালদর্শী এবং ত্রিলোকদর্শী হওয়া চলে। থিয়সফির "মহাত্মারা ত্রিকালদর্শী এবং ত্রিলোকদর্শী।

সংক্ষেপে ইহাই থিয়সফি বা বলবৎসথীর জ্ঞানধর্ম্ম। আমাদের এই সামান্য ব্যাখানেই পাঠককে অদ্যকার মত তৃপ্ত হইতে হইবে। বুঝিতে হইবে, এই ধর্ম্ম বা এই মত কিম্বা এই জ্ঞান হিন্দু-সমাজের পক্ষে হিতকর কি না; এই মতই শিরোধার্য্য হইলে বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে অহিন্দুভাব আসিয়া পড়িবে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। এই মতের আধিপত্য হইলে জাতি বর্ণভেদের ব্যতিক্রম হইবে কিনা, দেখিতে হইবে। আর জাতি-বর্ণাদি-ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত বা দুর্ব্বল, হইলে হিন্দু সমাজেরও ব্যতিক্রম হইবে কি না, তাহাও বেশ করিয়া দেখিতে হইবে। থিয়সফি মতের আদর বাড়িলে, হিন্দুর পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতাদিগত বিশ্বাস বিচলিত হইবে কি না, পুরাণাদি-সম্মত আচার অনুষ্ঠানে হিন্দুর অভক্তি হইবে কি না, স্ত্রী-পুরুষের একত্র সমবায় বাসনা বাড়িবে কি না, শুচি অশুচির সমবায় ও সংমিশ্রণ হইবে কিনা; ফলতঃ। থিয়সফির আধিপত্য প্রতিপত্তি বাড়িলে নানারূপ

বিবেচ্যও অনেক। হিন্দুসমাজের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। যাঁহারা আমাদের কাছে প্রকৃত হিন্দু বলিয়া পরিচিত, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিত হইল তাঁহাদিগেরই জন্য। তাঁহাদের তৃপ্তি হইলেই আমাদের তৃপ্তি হইবে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

৺রিও-ডি-জেনিরো। *

৺রিও-ডি-জেনিরো শুনিলে অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল, তিনি এখন ইহলোক ত্যাগ করতঃ অমরধামে অবস্থিত। বাস্তবিক তাহা নহে। উক্ত নামে একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ ছিল, উহা এখন জলমগ্ন, সুতরাং উহার প্রকৃত সত্তার ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইয়াছে, শবদেহ সমুদ্রগর্ভে সমাহিত। ঐ জাহাজে আমরা আমেরিকা হইতে আসিয়া, আসিবার সময় প্রশান্ত মহাসাগর পার হই। তজ্জন্য উহার সহিত এক সময়ে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।

বেলা দুইটার সময় সান্‌-ফ্রান্‌সিস্কো নগরের পালেস-হোটেল হইতে লগেজাদি লইয়া ঘাটে পহুছিলাম। জাহাজে তখন প্রায় সকল যাত্রীই উঠিয়াছেন। তাঁহাদের বন্ধু বান্ধবগণ জেটীতে দাঁড়াইয়া জাহাজ ছাড়িবার অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ দলে বিস্তর খৃষ্টান-মিশনরি ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন দণ্ডায়মান। তিব্বত-যাত্রী কয়জন মিশনরি নর-নারী জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া জেটীস্থ বন্ধুগণের সহিত সুর মিলাইয়া—

Onward Christian soldiers ! Marching as to war,
Looking unto Jesus Who is gone before. *　*

এই গানটী গাইতেছেন। গায়কদিগের অনেকের নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জিত হইতেছে। পাশ্চাত্য জগতে এরূপ দৃশ্য আর কখন দেখি নাই বলিয়া একটু চমকিত হইলাম। †

---

* RIO-DE-JANEIRO. দক্ষিণ আমেরিকান্তর্গত সুবিশাল ব্রাজিল রাজ্যের রাজধানী।

† ভক্তি রসামৃতসিন্ধুতে যে ভক্তের অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক বিকারের কথা উল্লিখিত ঃ—

"তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথবেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা স্মৃতাঃ॥"

জাহাজে উঠিয়া কেবিন ঠিক করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কোন ব্যক্তি আমার জন্য কতকগুলি জিনিস ও পুস্তক দিয়া গিয়াছে কি না। মূল্যাদি সমস্ত দিয়া একখানি ওয়েবেষ্টর-ডিক্সনারি ও কয়েকটী জিনিস ক্রয় করতঃ দোকানেই রাখিয়া আসি, দোকানদার তাহার লোক দিয়া যথাসময়ে জাহাজে পঁহুছাইয়া দিবে, কথা ছিল; তখন পর্য্যন্ত না আসাতে একটু উদ্বিগ্ন হইতে হইল। অতি ছোট দোকানদার বলিয়াই আশঙ্কা। কেবিনে সদা প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি রাখিয়া জাহাজের ধারে মিশনরিদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র দেখি, দোকানদারের লোক দ্রব্যাদি সহ আসিতেছে। চিন্তা দূর হইল, জিনিস-পত্র লইয়া লগেজ-ঘরে কর্ম্মচারীর জিম্মা দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম! তখন মিশনরিগণ ও তাঁহাদের সঙ্গীতের কথা ভাবিতে লাগিলাম।—পাশ্চাত্য জাতির ধর্ম্মসঙ্গীতগুলির মধ্যেও বীররস প্রবেশ করিতে ছাড়ে নাই; "খৃষ্টীয় সৈন্যগণ! যুদ্ধযাত্রার ন্যায় অগ্রসর হও। যীশু অগ্রে গিয়াছেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সম্মুখে পাদ নিক্ষেপ কর। ইত্যাদি", খৃষ্টান ধর্ম্মে "জেহাদ" নাই, কিন্তু সাংসারিক যুদ্ধ বিগ্রহাদির ভাব এ প্রকারে এ জাতির অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে যে, প্রেমাবতার খৃষ্টের * ধর্ম্ম সঙ্গীতেও উহা অলক্ষিতে সন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়

ভগবৎ প্রসঙ্গে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় যাহা হরি-সংকীর্ত্তনাদির সময় আমাদের দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টীয় জগতে আদৌ লক্ষিত হয় না। প্রকৃত ভক্তি ত প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে নাই, বলিলেই চলে, অল্প বিস্তর যাহা কিছু দেখা যায়, রোমান-কাথলিক সম্প্রদায়ে।

* বাস্তবিক খৃষ্টের খৃষ্টানীধর্ম্ম সংসার হইতে বহুকাল তিরোহিত। রোমান, গ্রীক ও সিরীয় সম্প্রদায়ে এখনও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট জগতের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এক অতি অদ্ভুত ইউরোপীয় সংস্করণ। প্রভুর ভোজের (লর্ডস্ সপার) ছবিতে টেবিল চেয়ার সাজান দেখা যায়, অথচ যীশুর চৌদ্দপুরুষ স্বপ্নেও কখন ঐ সকল বিলাসী সরঞ্জাম দেখেন নাই। লণ্ডনে একটী মেম সবিস্ময়ে একদিন আমাকে

চিন্তা ;—প্রেম ভক্তিতে চক্ষের জল ফেলিতে ইহাঁদিগকে কথন দেখা যায় না। কঠিন দেশে কঠিনভাবে দারুণ জীবন-সংগ্রামের মধ্যে লালিত পালিত বলিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাসব্যঞ্জক বৃত্তি সমূহ ইংরাজীতে যাহাকে মানুষের "ইমোশনাল সাইড্" বলে, সে দিক্‌টাকে দুর্ব্বলাংশ বোধে উহাঁরা বিকসিত হইতে দেন নাই। * তৃতীয় চিন্তা ;—খৃষ্টান মিশনরি-

---

একটী রমণী চেয়ারে বসিয়া নিজ কেশ দ্বারা খৃষ্টের চরণযুগল মুছাইয়াছিলেন।" তদুত্তরে যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, আশিয়াখণ্ডে সেকালে আদৌ টেবিল চেয়ারের ব্যবহার ছিল না; বোধ হয় পালেস্তিন অঞ্চলে এখনও অধিকাংশ লোক টেবিল চেয়ার চক্ষে দেখে নাই; ঐ সকল দেশের অধিবাসীগণ মেজেতে কোনপ্রকার বিছানা বিছাইয়া তদুপরি উপবেশন করতঃ ভোজন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। তখন তিনি বুঝিয়া প্রীত হইলেন।—আর একদিন লণ্ডনের ৭০ বৎসর বয়সের জনৈক বৃদ্ধ পাদ্‌রীকে বুঝাইতে আমাকে বেগ পাইতে হইয়াছিল যে, যীশু তাঁহার মত লম্বা লম্বা হ্যাট কোট ভূষিত হইয়া লণ্ডনের রাজপথের ন্যায় স্থানসমূহে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন না; তিনি একজন গৃহদ্বারবিহীন প্রাচ্য ফকির ছিলেন; তাঁহার দেহ একখানিমাত্র দীর্ঘ চাদর দ্বারা আবৃত থাকিত, পরিধানে স্বতন্ত্র বস্ত্র ছিল কি না সন্দেহ; তিনি শূন্য পদে অনাবৃত মস্তকে পথে-ঘাটে-মাঠে বিচরণ করিতেন। প্রচণ্ড ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ইহা সহজে কি প্রকারে বুঝিবেন ? হায়! হায়! ওরূপ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শিষ্যবৃন্দ আজ কিরূপ মোহাচ্ছন্ন, সংসারাসক্ত, বিষয়বিমূঢ় !!!

* একটা গল্প আছে !—নিশাযোগে কোন বাটী হইতে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া পলায়মান চোরের এক পা গৃহস্থ ধরিয়া ফেলে। চোর নিরুপায় দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি দ্বারা স্থির করতঃ তৎক্ষণাৎ "ঘা!" "ঘা!" বলিয়া সকাতরে চীৎকার করায়, গৃহস্থ ত্বরিত তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। যে শ্রেণীর পরদুঃখকাতরতার বশীভূত হইয়া, উক্ত গৃহস্থ ধৃত চোরকে হঠাৎ নিষ্কৃতি দিতে বাধ্য হয়, (এক প্রকার অজ্ঞাতসারে বলিলেও চলে, ইংরাজীতে Antomatically) তাহা পাশ্চাত্যভূমে দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। ওরূপ সমবেদনায় অনুভূতি হৃদয়ের যে সকল বৃত্তির দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে,

দিগের অদম্য উদ্যম, উৎসাহ ও বীরত্ব। প্রাণ হাতে করিয়া দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে অজ্ঞাত, অপরিচিত দূর দেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। কোথায় কালিফর্ণিয়ার রাজধানী সুসভ্য সুসজ্জিত সুন্দর গ্যাস-বিদ্যুতালোকে প্রদীপ্ত সান্‌-ফ্রান্‌সিস্কো নগরী, আর কোথায় ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সমাকীর্ণ নিবিড় পর্ব্বতারণ্যময় ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন তিব্বত-দেশ। কেবলমাত্র ধর্ম্মের দোহাই দিবার উদ্দেশে এরূপ অসম-সাহসিক দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হওয়া বিশেষ প্রশংসাযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ কি?

দোকানদারের লোকটী বিদায় লইবার সময় কথায় কথায় বলিলেন,

তাহাদের কর্ষণ খৃষ্টীয় জগতে এক প্রকার নিষিদ্ধ;—সুবিখ্যাত "দম্ দম্ বুলেট" তাহার বিশেষ প্রমাণ। ইউরোপ আমেরিকার লোকে অকাতরে সেবা সাহায্য করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই; এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অপেক্ষা বহুগুণ বেশী কাজও করিতে দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি (অন্য কোন প্রকার অভিপ্রায় না থাকিলে) কঠোর কর্ত্তব্যানুরোধেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, ভিতরকার গভীর "আহা" জনিত সমবেদনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া নহে, এইরূপ ত আমার ধারণা। যে জ্বালাতে যীশুর প্রাণ ছট্‌ফট্ করিত, যে জ্বালা বুদ্ধদেবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার লক্ষাংশের সামান্য আভাসমাত্র উপলব্ধি করাও বর্ত্তমান খৃষ্টানদের ক্ষমতার অতীত। কি প্রকারে সম্ভব? শিক্ষা যে সম্পূর্ণ বিপরীত! দুঃখীও যে জীব, আমিও সেই জীব, দুঃখীতে আমাতে কোনই প্রভেদ নাই, একই আত্মা সকল প্রাণীতে বিদ্যমান, সুতরাং দুঃখীর দুঃখ আমারই দুঃখ; দুঃখী ও আমি এক,—ঐ যে পথপ্রান্তে বসিয়া অন্নাভাবে কাতর জীব ভিক্ষা করিতেছে, ও ব্যক্তি আমিই; জীবে জীবে ভিন্নভাব অবিদ্যাজনিত; জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে ভিন্নতা (Seperateness) নষ্ট হইয়া সবাই এক হই। এ শিক্ষা, বোধ হয়, কার্লাইল ও এমার্সন পাশ্চাত্য জগতে প্রথম প্রচার করেন। অদ্বৈতবাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে এ উপদেশ বহুকাল হইতে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। এই দারুণ অবনতির

"আপনাদের দেশের একজন ব্রাহ্মণ একবার আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন; তিনি জাহাজে কাজ করিতেন।" নাম জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—"ডিসোজা"। আমি বুঝিলাম, তিনি কিরূপ ব্রাহ্মণ। বোধ হয় গোয়াবাসী কোন পোর্ত্তুগিজ ফিরিঙ্গি জাহাজের খান্‌সামা হইয়া গিয়াছিল; ভারতের ব্রাহ্মণ ও সব দেশে সম্মানার্হ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয় দেয়।

দুই ঘণ্টা পরে জাহাজ ছাড়িল। কেবিনে যাইবার পথে এক ঘরে জনৈক যুবক অপরকে বলিতেছেন, "Well Oldman! we are off." কথাগুলি এরূপ ভাবে বলা হইল, যাহাতে সহজে বুঝিতে পারা যায়, ইহাঁরা প্রথম গৃহের বাহির হইয়া প্রবাসে চলিতেছেন। আমার পর্য্যটন যেন প্রায় শেষ হইল, এই পাড়ি জমাইতে পারিলেই যেন স্বদেশে পঁহুছিব, এইরূপ আরামের ভাব আমার মনে, আর ইঁহাদের এই আরম্ভ, ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলাম। দুই বন্ধু * মিলিয়া ভূ-প্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছেন, জানিয়া বিশেষ সহানুভূতি হইল।

সান্‌-ফ্রান্‌সিস্কো নগরের তিন দিকে জল;—পশ্চিম ও উত্তরাংশের অনেকটা সান্‌-ফ্রান্‌সিস্কো-বে (উপসাগর) দ্বারা বিধৌত, অবশিষ্ট উত্তরাংশে ও উত্তর পূর্ব্বে গোল্ডেন্‌-গেট-ষ্ট্রেট (স্বর্ণ-দ্বার প্রাণলী), পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর। ডক্‌ হইতে বাহির হইয়া আমাদিগকে উক্ত স্বর্ণ-দ্বার দিয়া মহাসমুদ্রে পড়িতে হইল। প্রণালী ৫ মাইল দীর্ঘ, ১ মাইল প্রস্থ; মুখে ৩০ ফুট গভীর, ভিতরের গভীরতা স্থানে স্থানে ১০০ ফুট। মুখের নিকট কয়েকটী ছোট ছোট পাহাড়।

* Philps ও Blynn নামক এই দুই কালিফর্ণীয় বণিক কলিকাতায় আসিয়া কয়দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদিগকে দেশীয় ব্যাপার অনেক দেখাইয়াছিলাম। অপরাপর আরোহীদের সহিত জাহাজে ইহাঁরা ভারতবর্ষের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, স্বচক্ষে ভারত দেখিয়া সে ভাব অনেক কমিয়া গিয়াছিল। যাইবার সময় বলিলেন,—"আপনাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যেরূপ দুরবস্থাপন্ন ও পশ্চাৎপদ, ইউরোপীয় ও দেশীয়ের মধ্যে যে পরিমাণ দূরতা এবং প্রজার প্রতি রাজজাতির যে প্রকার ব্যবহার, তাহাতে কি আশা করা যাইতে পারে?"

আমাদের জাহাজখানি অক্‌সিডেন্ট্যাল এবং ওরিএন্ট্যাল কোম্পানির মেল ষ্টীমার। বেশ বড়, ডেকের উপরটা প্রদক্ষিণ করিয়া পাইচারী করিতে প্রায় ৪ মিনিট লাগিত। অর্ণবপোত অতি সুসজ্জিত এবং আহার, বিহার, নৃত্যগীত প্রভৃতি সকল প্রকার ভোগবিলাসের সুন্দর ব্যবস্থা-বিশিষ্ট। ডেকের উপরে কয়েকটী কেবিন; পাসিফিক্ ব্যতীত আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না। আহারের আয়োজন বিপুল,—চর্ব্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ দ্রব্যাদি দিনে ছয়বার দেওয়া হইত; মহাসাগরের উভয় পারে যে সময়ে যে সকল সুমিষ্ট ফল প্রাপ্তব্য, জাহাজে তৎসমুদয় হাজির; সুখসচ্ছলতার সীমা নাই। আমি ক্ষুদ্রাকায় অল্পাহারী বাঙ্গালী, কাজেই তিনবারকার আহার বাদ দিয়া চলিতাম। এজন্য কাপ্তেন বলিতেন,—"যাহা কিছু লাভ আপনার নিকটেই করিলাম; আর সবাই ষোল-আনা আদায় করিল।" প্রত্যহ বৈকালে কাপ্তেন আমার সহিত পাইচারী করিতেন, আর ভারতের কথা শুনিতেন। প্রায়ই বলিতেন,—"যে সব দেশে আপনাদের মত লোক, এবং রমা বাইয়ের মত স্ত্রীলোক জন্মে (কোন সময় রমাবাই ঐ জাহাজে আরোহী ছিলেন) সে সব দেশে আমাদের খৃষ্টান মিশনরিরা কি করিতে যায়?" এক একদিন বৈকালিক ভোজনের পর মিশনরিদের সহিত আমাকে ভিড়াইয়া দিয়া তামাসা দেখিতেন; এবং তর্কবিতর্কের পর বলিতেন,—"ধর্ম্ম সম্বন্ধে মিষ্টার সেনের যে জ্ঞান আছে, আপনাদের সকল মিশনরির একত্র করিলে তাহার সমান হইবে না।" হং কং নগরে রমাবাইকে নানাপ্রকারে সাহায্য করা হেতু অন্যায় অপবাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সে গল্পও করিতেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ডিনার-সেলুনের (ভোজনাগার) প্রবেশ দ্বারে বুলেটীন (বিজ্ঞাপনী) প্রচারিত হইত; তাহা দ্বারা আমরা জাহাজের গতিবেগ, সাগরবারির তাপ, বায়ুর তাপ প্রভৃতি দৈনিক সম্বাদ সমূহ জানিতে পারিতাম। প্রাতঃকাল হইতে বাজী লাগিত, আজ জাহাজ কি হিসাবে চলিয়াছে। খানার সময় বাজীর টাকা আদায় হইয়া স্মোকিংসেলুনে (ধূমপানের কামরা) শাম্পেন সেবন হইত।

১৮০ ডিগ্রীতে এক তারিখ বাদ দেওয়ার পর (১২ তারিখের পরদিন ১৪ গণা হইয়াছিল। আমেরিকা ফিরিয়া যাইবার সময় এক তারিখ দুই দিন গণা হয়। এরূপ না করিলে তীরে পঁহুছিয়া এক দিনের তফাৎ

দেখা যায়।) একদিন জনৈক আরোহী তাহার জন্মদিন উপলক্ষে বন্ধুগণকে শাম্পেন পানে পরিতুষ্ট করেন। তৎপরদিবস অনেকে আপত্তি উত্থাপন করিলেন,—"গতকল্য জন্মদিন গণনা ভুল হইয়াছে, প্রকৃত জন্মদিন অদ্য, কারণ গৃহে তোমার পরিবারবর্গ আজ উৎসব করিতেছেন।" কথাও ঠিক, তাঁহারা ত একদিন বাদ দেন নাই। কাজেই বেচারা কি করেন, সে দিনও ততোধিক ব্যয়ে শাম্পেন প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন।

এবম্প্রকার আমোদ আহ্লাদে ১৭ দিন কাটাইয়া আমরা জাপানে উত্তীর্ণ হই। "রিও" জাহাজ ও তাহার কাপ্তেন ওয়ার্ড্ সাহেব, কখন ভুলিবার নয়। কিন্তু হায়! কাল সকলেরই সংহারক, আজ কোথায় সেই "রিও", কোথায় কাপ্তেন ওয়ার্ড! ইয়োকোহামা বন্দরে শাম্পান নৌকায় উঠিয়া যাত্রীগণ টুপি খুলিয়া সমস্বরে "Three cheers for the Rio" বলিয়া আপ্যায়িত করতঃ যখন বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন কল্পনাতেও কেহ ভাবেন নাই যে, এত শীঘ্র "রিও" বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। যে ঘটনায় দ্বারা সুশোভনা আনন্দদায়িনী "রিও"সহ বিনয়ী, মিষ্টভাষী, সদালাপী, বিজ্ঞ কাপ্তেন ওয়ার্ড্ তিরোহিত, সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখে জাপান হইতে সন্ধ্যাকালে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর সম্মুখে পঁহুছিয়া দেখা গেল, উপকূল ঘোর কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন; কাজেই প্রাতঃকালে পরিষ্কার হইবার অপেক্ষায় জাহাজ বাহির-সমুদ্রেই নঙ্গর করা হয়। রাত্রি পোহাইল, অথচ কুয়াসা গেল না, সুতরাং ধীরে ধীরে বন্দরে প্রবেশ করাই স্থির হইল। কিছুদূর গেলে, আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নহে, দেখিয়া পাইলট্ কাপ্তেনকে নঙ্গর করিতে বারম্বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি শুনিলেন না। কাল নিকট, কেন শুনিবেন? তথা হইতে দুইশত হস্ত যাইতে না যাইতে চোরা পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া জাহাজ ফাঁসিয়া গেল। আঘাতের বিকট শব্দে নাবিকগণ চমকিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে কলঘরে জল প্রবেশ করিল, এবং তজ্জন্য আর একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইয়া আরোহীগণ মধ্যে বিষম কোলাহল উপস্থিত হইল। কোন কোন আরোহী তখনও নিদ্রিত ছিলেন, ডেকের উপরকার গোলমালে জাগরিত হইলেন। নিম্নশ্রেণীর চীনেম্যান যাত্রীও

প্রথম শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ মহিলাগণ ব্যাকুলভাবে রোদন ও চীৎকার আরম্ভ করিলেন। সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ না করিলে কল্পনায় অনুভব করা কঠিন। এই দারুণ সময়ে, এই ভীষণ পরীক্ষার কালে কাপ্তেন ওয়ার্ড যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি ও ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় উচ্চ প্রশান্ত হৃদয়েরই উপযুক্ত। সেই ভীষণ কোলাহল ছাড়াইয়া ভীমরবে অবলাগণকে রক্ষা করিবার আদেশ প্রচার ও তদুপযোগী ব্যবস্থা করিলেন। সমস্ত আরোহীর মধ্যে কেবল যাহারা আতঙ্কে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল, তাহারাই মারা গেল;—জাহাজ ধীরে ধীরে জলমগ্ন হইবার সময় তাহার চতুর্দ্দিকের ভয়ানক সতেজ ঘূর্ণীপাক সমূহ তাহাদিগকে ডুবাইয়া অতল-তলে লইয়া যায়। অবশিষ্ট সকলকে ক্রমে ক্রমে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া মহাবীর কাপ্তেন ওয়ার্ড আপন কেবিনে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করতঃ সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কালের জীবন সঙ্গিনী প্রিয় "রিও"র সহিত সমুদ্রগর্ভে প্রাণ আহুতি দিয়া নিজের ভয়ঙ্কর অবিমৃষ্যকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সকলই ফুরাইল, থাকিল কেবল মহাত্মা ওয়ার্ডের গুণরাশির স্মৃতি।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন Bar-at-Law.

সমাজে নারীজাতি।

সমাজের সহিত প্রত্যেক নর-নারীর প্রগাঢ় সম্বন্ধ। সুতরাং সমাজের মঙ্গলের জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রতিই সমান কর্ত্তব্য নিহিত আছে।

সমষ্টিগত মনুষ্যের সম্মিলনে সমাজ গঠিত হয়। ব্যক্তিগত মানুষের উন্নতি বা অবনতির সহিত সমাজের উন্নতি বা অবনতি অতি নৈকট্য। ব্যক্তিগত মনুষ্যে যে নিয়ম খাটে, সমষ্টীগত সমাজেও সেই নিয়ম খাটে। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য (duty) প্রতিপালিত হইলে সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং স্ত্রীজাতি দুর্ব্বলা পরমুখাপেক্ষী, তাহাদের কোনরূপ কর্ত্তব্য নাই, এরূপ বিবেচনা করা ভ্রান্ততার ফল। পুরুষজাতি যেমন সমাজের অন্তর্ভুক্ত, নারীজাতিও সেইরূপ। তবে অবস্থাভেদে কর্ত্তব্য (duty) ভেদ আছে, এইমাত্র। কিন্তু হিন্দুসমাজ তাহা বুঝেন না, এই জন্যই স্ত্রীজাতির

সমাজের এক পক্ষগণ চাহেন, তাহাদের হস্তে স্বাধীনতার জয়-পতাকা তুলিয়া দিয়া, আলোকে উড়াইতে। অপর পক্ষ চাহেন, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিনীবৎ করিয়া রাখিতে, তাহাদের সমস্ত মানসিক বৃত্তিগুলির মুখে কুঠারাঘাত করিতে। এই উভয়বিধ নীতিই স্ত্রীজাতির পক্ষে অনিষ্টকর।

মানসিক বৃত্তিগুলির যথোচিত অনুশীলনাভাবে স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল ও ভ্রান্তা এবং সর্ব্ববিষয়েই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছেন। স্ত্রীজাতি অশিক্ষীতা হইবার উহাই প্রধান কারণ। অশিক্ষিত মূর্খের দ্বারাই সমাজে অধিক অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সমাজ বোধ হয় তাহা স্মরণ করেন না। আবার পক্ষান্তরে যে সকল রমণীর হস্তে স্বাধীনতার জয়পতাকা তুলিয়া দেওয়া হয়, তাঁহারা রমণীসুলভ প্রকৃতি হারাইয়া, আপনাদিগকে কিম্ভূত-কিমাকার করিয়া ফেলেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য (Duty) বিস্মৃত হন। সুতরাং আমরা এই উভয় শ্রেণীর রমণীর নিকট কুফল ও কর্ত্তব্যশূন্যতা ব্যতীত অধিক কিছু আশা করিতে পারি না। সুতরাং নারীজাতির এ অবস্থা বিদূরিত না হইলে সামাজিক উন্নতির আশা বড়ই অল্প।

ভারতের জন সংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। সমাজের সেই অর্দ্ধাংশের অধিক যদি অশিক্ষিত বর্ব্বর হইয়া রহিল, তবে আর সমাজে উন্নতি কোথায়!! অতএব সামাজিক উন্নতিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন করিতে হইবে, ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে; প্রাচীন ও আধুনিক নীতির সামঞ্জস্যে স্ত্রী-শিক্ষার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন হইতে পারে। মানসিক বৃত্তিগুলি সম্যক অনুশীলিত হইলেই মানুষ মানুষ নামের যোগ্য হয়, প্রাচীনকালে স্ত্রীজাতির এই কর্ত্তব্য (Duty) সাধিত হইত, এই জন্যই আধুনিক স্ত্রীজাতি অপেক্ষা প্রাচীনকালের স্ত্রীজাতিকে বহু উন্নতাবস্থায় দেখিতে পাই। মধ্যকালের সামাজিক নিয়মবশতঃ স্ত্রীজাতির মানসিক বৃত্তিগুলি একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্যই মধ্যকালে আমরা যে স্ত্রী-চরিত্র দেখিতে পাই, তাহা রমণীনামের অযোগ্য। এই সময় হইতেই স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সমাজের নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে! অধুনা সম্যকরূপ না হউক, সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে নারীজাতির মানসিক বৃত্তিগুলির অনুশীলন জন্য যত্নবান হইয়াছেন। সুতরাং মধ্যকালাপেক্ষা আধুনিক নারীজাতিকে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নীত দেখিতে পাইতেছি, ইহা স্বীকার করিতে

হয়। কিন্তু রমণী জাতির প্রকৃত উন্নতির দিন এখনও বহু পশ্চাতে অবস্থিত। অধুনা রমণীজাতির মানসিক বৃত্তির কিয়দুন্নতির সহিত তাঁহাদের কাব্যশক্তিমত্তা বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতেও সমাজের একপক্ষ আনন্দিত, অপর পক্ষ বিষাদিত। ক্ষুণ্ণপক্ষগণ প্রাচীন মহিলা চরিত্র সম্মুখে ধরিয়া দেখাইতে চাহেন যে, কাব্যশক্তি রমণীজনোচিত নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের ঐ বাক্য অভ্রান্ত নহে, আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন স্ত্রীহৃদয় কাব্যের আবাসভূমি-স্বরূপ ছিল। তবে তখন মুদ্রাঙ্কণকাব্য এত সুলভ ছিল না বলিয়াই তাঁহাদের কাব্যকাহিনী বিজ্ঞাপন দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইত না। অতএব প্রাচীনা রমণী জাতির দোহাই দিয়া রমণী জাতির এই পবিত্র বৃত্তিটিকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কবিত্ব দেবত্বের সহিত জড়িত *। মাননীয় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কবিত্বকে ঋষিত্বের সহিত তুলনা করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। যে বৃত্তি হইতে ঋষিত্ব প্রস্ফুটিত হয়, সে বৃত্তি দ্বারা সমাজের উন্নতি ব্যতীত অবনতির সম্ভব নাই, তাহাও কি বলিতে হইবে! ফলকথা, মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যকানুশীলনেই মনুষ্যত্বের উৎপত্তি, তাহাতে বাধা দিলে মনুষ্যত্বে আঘাত পড়ে। তাহাতে কুফলেরই সম্ভব অধিক। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মানসিকবৃত্তির অন্তর্গত এমন অনেকগুলি বৃত্তি আছে, যাহা সম্যকরূপ অনুশীলিত হইলে অধিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভব; যেমন ক্রোধ প্রভৃতি। এস্থলে সহজ কথা এই যে, অসৎ বৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া সৎবৃত্তিগুলির অধিক স্ফুরণ করা। তাহা হইলেই সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া মানুষের মত করে।

এক্ষণে কথা হইতে পারে, কোন্‌টি সৎ, কোন্‌টি অসৎ, তাহা বিবেচনা করা অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। নিজের বৃত্তিগুলির সদাসৎবিচার করা অনেক সময় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের পক্ষে দুরূহ হওয়া অসম্ভব নহে, এইজন্য মানুষের শিক্ষক Teacher আবশ্যক। তথাচ কথা এই যে, যে বৃত্তি দ্বারা অন্যের কোনরূপ ক্ষতি বা মনঃপীড়া উপস্থিত হয়, সেই বৃত্তি স্বতঃই পরিহার্য্য। অথবা নিজের শারীরিক বা অন্য কোনও প্রকার

ক্ষতি হয়, তাহাও পরিত্যজ্য। কিন্তু এস্থলে কথা এই যে, নিজের মঙ্গল সাধন করিতে গেলে যে স্থলে অন্যের কোনওরূপ অনিষ্ট সাধিত হয়, সে স্থলে সে প্রবৃত্তিটি অবশ্য ত্যজ্য হইবে।

শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে মানুষ আপনাকে আপনি চালাইয়া আদর্শরূপে জগতে দাঁড়াইতে পারে। এই সকল অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া নারীজাতিকে শিক্ষিতা করিলে আমাদের সামাজিক উন্নতি অনিবার্য্য। নচেৎ সে আশা পূরণ হওয়া দুরাশামাত্র। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নারীজাতির সহিত সমাজ প্রগাঢ় সম্বন্ধযুক্ত। এক ঘরের অর্দ্ধেক পঙ্খের কায করিলে বাকি অর্দ্ধাংশ যেমন সংস্কার হয় না—সমাজে তদ্রূপ নারীজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল পুরুষদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সমাজ পরিচালিত করিলে সমাজের কেবল অর্দ্ধ সংস্কার হইবার আশা করা যায়মাত্র।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী মুস্তফী।

মানবের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যাবলী।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

অষ্টম অধ্যায়।

মিতাচার।

এই সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও মানসিক শান্তিলাভ করিতে পারিলেই যথাসম্ভব সুখভোগ করা হইল।

যদি এই সুখের তুমি অধিকারী হও এবং তাহা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে বাসনা থাকে; তাহা হইলে দানবী আসক্তির প্রলোভনে পতিত হইও না,—তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিও।

যখন সে তাহার উপাদেয় বস্তু সকল সম্মুখে ধারণ করিবে, যখন সে মৃদুহাস্যে তোমাকে সুখের আশায় প্রলুব্ধ করিবে, তখনই বিপদ সন্নিকট জানিবে,—তখনই বিচারণশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

কারণ যদি তুমি তোমার শত্রুর বাক্য শ্রবণ কর, তুমি প্রতারিত হইবে এবং তোমার দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

তাহা মত্ততায় পরিণত হইয়া তোমাকে রুগ্নশয্যায় শায়িত ও মৃত্যুমুখে পতিত করিবে।

তাহার খাদ্যসামগ্রীর দিকে দৃষ্টিপাত কর, আর তাহার অতিথি অভ্যাগতগণের প্রতি ও যাহারা তাহার হাস্যে মুগ্ধ হইয়া প্রলোভনে পতিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি নয়ন ফিরাইয়া দেখ, তাহারা কিরূপ দুর্ব্বল ক্ষীণকায়, কিরূপ রুগ্ন ও নিরুৎসাহ!

তাহারা যে অল্পক্ষণ আমোদ আহ্লাদে মাতোয়ারা হইয়া থাকে, তাহার পরক্ষণেই হতাশ-হৃদয়ে দারুণ দুঃখ ভোগ করে। পাপীয়সী তাহাদের রুচির বিকার জন্মাইয়া দিয়াছে, সুতরাং তাহার অতি উপাদেয় বস্তুতেও তাহাদের আর তৃপ্তিসাধন হয় না। তাহার সেবকমণ্ডলী এইরূপে তাহার বধ্য হইয়া উঠে এবং সেই বিধিদত্ত দানের অপব্যবহার করিবার স্বভাবসিদ্ধ ফলস্বরূপ অশেষ দুঃখ ভোগ করে।

কিন্তু ঐ যে একটী কামিনী সুন্দর মন্থরগতিতে প্রফুল্লবদনে বিচরণ করিতেছেন, উনি কে?

উহাঁর গণ্ডদেশ রক্তাভ, ওষ্ঠে প্রাতঃরাগ পরিস্ফুট, নয়নযুগল সুবিমল আনন্দে উজ্জল এবং মুখে সুমধুর সঙ্গীত।

উনি স্বাস্থ্য। উহাঁর পিতা ব্যায়াম, মাতা মিতাচার।

তাঁহাদের সন্তানগণ সাহসী, শ্রমশীল ও প্রফুল্লচিত্ত এবং ভগিনীর গুণে গুণান্বিত, তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলী শক্তিসম্পন্ন অস্থিসমূহ বলশালী এবং শ্রমে তাহাদের অপার আনন্দ।

পিতৃকার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং মাতার আহারে বলাধান প্রাপ্ত হয়।

রিপুগণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহারা আনন্দ অনুভব করে এবং কুঅভ্যাস দমন করিয়া বিজয়োল্লাস প্রকাশ করে।

তাহাদের আনন্দ পরিমিত, সুতরাং তাহা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। তাহাদের নিদ্রা অল্প কিন্তু দুশ্চিন্তাশূন্য।

তাহাদের রক্ত বিশুদ্ধ, মন শান্তিময় এবং শরীর নীরোগ।

কিন্তু মানব একেবারেই আপদশূন্য নহে। দেখ, সে নূতন নূতন বহিবিপদে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে এবং বিশ্বাসঘাতিনী অন্তরে থাকিয়া তাহার

ঐ দেখ, তাহার রূপরাশি, সুন্দরকান্তি ও বলবীর্য্য দেখিয়া কামমুগ্ধা লম্পটতা তাহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়া কুঞ্জবন মধ্য হইতে মোহজাল বিস্তার করতঃ প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

তাহার দেহখানি ক্ষীণ ও কোমল এবং পরিধানে শিথিল বসন। দৃষ্টি কুটীল ও স্বেচ্ছাচারিতাব্যঞ্জক। সে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছে, দৃষ্টিনিক্ষেপে মনপ্রাণ হরণ করিতেছে এবং মধুর বাক্যে প্রলুব্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

হায়! তাহার প্রলোভনে মুগ্ধ হইওনা, দূরে পলায়ন কর। যদি তুমি তাহার কোমল দৃষ্টি ও মধুর বাক্যে বিমুগ্ধ হও, যদি সে তোমাকে তাহার বাহুযুগলে আলিঙ্গন করে; তাহা হইলে তুমি তাহার প্রেমনিগড়ে চির-কালের জন্য আবদ্ধ রহিলে।

পরে লজ্জায় ম্রিয়মান ও অনুতাপে দগ্ধ হইবে এবং দুশ্চিন্তা ও দারিদ্র্যে নিস্পেষিত হইবে।

এইরূপে বিলাস বিভ্রমে মত্ত ও ইন্দ্রিয় সেবায় রত হইয়া আলস্যে বৃথা সময়ক্ষেপ করিলে তোমার দেহ শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে এবং তুমি অল্পায়ু হইয়া অশেষ দুঃখে জীবন যাপন করিবে; অথচ তোমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কেহ থাকিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মনোবৃত্তি নিচয়।

প্রথম অধ্যায়।

আশা ও ভয়।

আশার মধুরবাণী গোলাবমুকুল অপেক্ষা মনোমদ; কিন্তু ত্রাসের ভীতিপূর্ণ বাক্য বড়ই ভয়াবহ।

তত্রাচ কদাপি আশায় প্রলুব্ধ হইও না বা ভয়প্রযুক্ত যাহা ন্যায়ানু-মোদিত, তাহা সম্পাদনে বিমুখ হইওনা! তাহা হইলে তুমি অবিচলিত চিত্তে, সকল কর্ম্মই সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে।

সাধু কখন মৃত্যুভয়ে ভীত হন না; পাপানুষ্ঠানে বিরত থাকিও, তাহা হইলে ভয়ের কোন কারণই থাকিবে না।

সকল কর্ম্মেই নিশ্চিন্ত সফলকাম হইবে, এইরূপ আশায় আশান্বিত হইও, তাহা বলিয়া অসঙ্গত আশায় মুগ্ধ হইওনা, যদি হতাশ হও, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

বৃথা ভয়ে ভীত বা অবাস্তব কল্পনায় নিরুৎসাহ হইও না।

ভয়েই বিপদ সমুপস্থিত হয়, আর আশায় বলসঞ্চার হইয়া সকল সঙ্কট দূরীভূত হয়।

উষ্ট্রপক্ষী যেরূপ ব্যাধভয়ে কেবল মস্তকটী লুক্কায়িত রাখিয়া আরও বিপদগ্রস্ত হয়, সেইরূপ ভীরু ভয়বিহ্বল হইয়া বিপদ্‌জালে জড়ীভূত হয় মাত্র!

যদি তুমি কোন কাজ সাধ্যাতীত বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে নৈরাশ্য প্রকৃতই উহাকে অসাধ্য করিয়া তুলিবে; কিন্তু যদি তুমি অধ্যবসায় সহকারে উহাতে প্রবৃত্ত হও, উহা আর দুরূহ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

নির্ব্বোধ অলীক কল্পনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে; কিন্তু জ্ঞানী কল্পিত বাসনায় হৃদয়ে স্থান দেয় না।

কোন বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিবার অগ্রে উহা সঙ্গত কি না তাহা বিচার করিয়া দেখিবে, আর অসম্ভব কখন আশা করিবে না; তাহা হইলে তুমি সকল কর্ম্মেই সফল-মনোরথ হইবে, কদাচ কোন কর্ম্মে হতাশ হইতে হইবে না।

শ্রীঅটলবিহারী মিত্র।

শিশুর হাসি।

(১)

হাস শিশু হাস একবার,
তোর আধ আধ হাসি,
আধফোটা ফুলরাশি,
হাসিলে বরষে যেন সৌরভের ধার।
সুধাংশুর কণা খসি,
তোর ওই ঠোঁটে পশি,
করিয়াছে ধরা কিবা সুধার আধার;
হাস শিশু হাস একবার!

(২)

হেরি নাই হাসি ত এমন,
চুমে তোর ওই হাসি,
কত ফুল ঝরা বাসি,
ওই দেখ মরি হেসে উঠেছে কেমন।
ওই কচি হাসি তোর,
কি ভাবে করেছে ভোর,
কি এক মদিরা ঘোর ধাতার সৃজন,
হেরি নাই হাসি ত এমন!

(৩)

হাসি দিয়ে গড়া তোর কায়,
তা না হলে যথা চাই,
ও হাসি দেখিতে পাই ;
কচি চোকে কচিমুখে কি হাসি বিলায়
অনুভব হয় হেন,
উথলিয়ে হাসি যেন,
ঢেকেছে জননী কোল লহরীমালায় ;
হাসি দিয়ে গড়া তোর কায় !

(৪)

বল মোরে সত্য করে বল,
মরি মরি কি অতুল,
কোন্ পারিজাত ফুল,
নন্দনকানন কোন্ করিয়ে উজল,
আছিলিরে কোন দেশে,
ঝরে পড়ে হেথা এসে,
মোহিত করিলি ওরে এই ধরাতল ;
বল মোরে সত্য করে বল !

(৫)

বল মোরে সত্য করে বল,
কোথা কোন শশী তোরে,
লুকাইয়ে বুকে ধরে
ছিল, জুড়াইতে তার দগ্ধ অন্তস্তল,
নিশায় নিদ্রায় ভুলে,
ছিল বুঝি হাত খুলে,
খসে পড়িলিরে হেথা হইয়ে চঞ্চল,
বল মোরে সত্য করে বল !

(৬)

কোন্ জগতের তুই সুধা ?
যাদুমণি হাসিখানি,
দেখ তোরে শুভ মানি,
সুজলা শ্যামলা আজ হয়েছে বসুধা,
বর্ষায় বসন্ত জ্ঞান,
কোকিল তুলেছে তান,
ফুলে ফুলে চুমি মিটাইছে প্রেম-ক্ষুধা,
কোন্ জগতের তুই সুধা।

(৭)

কিবা কোন্ জগতের মণি,
দেখাইতে পুত হাসি,
কত বিশ্বে পরকাশি,
পাপ তম হরিবারে এসেছ অবনী।
বৃথা হেথা আলো করা,
এ ধরা নিরয় ভরা,
অন্ধকার অন্ধকার পাপতাপ খনি।
কোন্ জগতের তুই মণি !

(৮)

ছাড়িব না তোরে যাদুধন,
থাক এই ধরা ঘেরি,
তোর ওই হাসি হেরি,
এ ধরা শিখুক হাসি পবিত্র কেমন।
সুধার প্রবাহ হায়,
হাসি দিয়ে বহে যায়,
এমন অমূল্যধন বিধি নিদর্শন।
ছাড়িব না তোরে যাদুধন !

(৯)

হায় শৈশবের কালে,
মনে পড়ে পাঠশালে,
পাঠে ঠিকে ভুলে সেকি ভীষণ তফাৎ
কভু আনন্দের রোল,
কভু ক্রন্দনের গোল,
মনে পড়ে গুরুর সে গুরু বেত্রাঘাত।

(১০)
কোথায় নির্ম্মল হাস্য,
শুরু চড়ে বক্র আস্য,
ঔদাস্য আলস্যময় শৈশব জীবন।
পুনরায় গুরু সাজা,
ঘন সে গুড়ক সাজা,
টিকা কালি পূর্ণ সব সুধাংশুবদন।

(১১)
যৌবনের সমাগমে,
কাচ-কাঞ্চনের ভ্রমে,
মজিয়াছি কত শত যুবতীর হাসে।
বিলোল কটাক্ষ ছটা,
মুচকি হাসির ঘটা,
নেচেছিল রিপু ছটা বিভ্রম বিলাসে।

(১২)
বিষে ভরা সমুদায়,
এখন বুঝেছি হায়,
ফুল ত্যজি কণ্টকেরে করি আলিঙ্গন।
সর্ব্বাঙ্গে হয়েছে ক্ষত,
জ্বালা তায় অবিরত,
আরো জলে করি যদি চন্দন লেপন।

(১৩)
সে সুখ-মরীচিকায়,
ছুটোছুটি করি হায়,
তিয়াস ত মিটিল না রহিল পিয়াস।
আপন লজ্জায় চড়
খেয়ে, করি ধড় ফড়,
এখনো বয়স করে শত উপহাস।

(১৪)
বৃদ্ধের লোলিত চর্ম্ম,
ভ্রান্তিময় সব কর্ম্ম,
মর্ম্মশূন্য ধর্ম্মভান শঠের প্রধান।
একেবারে দন্তহীন,
সজল নয়ন দীন,
সে বদনে হাস্য শুধু বিকট ব্যাদান।

(১৫)
তাহা না দেখিতে সাধ,
দেখে যদি—যে উন্মাদ,
তারো কিবা মতিভ্রমে ঘটে পুন ভ্রম।
সে হাসির ঘটা স্মরি,
দূরে প্রণিপাত করি,
বাঁধাদাঁতে দেঁতোহাসি তাহতে উত্তম।

(১৬)
খল খল অট্টহাস,
উঃ, কি ভীষণ ত্রাস,
হেরিলে সজারু সম কণ্টকিত কায়।
শত অশনীর শব্দ,
তবু বিশ্ব যেন স্তব্ধ,
প্রলয় গহ্বরে যেন লুকাইতে চায়।

(১৭)
রুধির তরঙ্গ বয়,
কঙ্কাল ভূপৃষ্ঠময়—
ছিন্ন নরমুণ্ডে হাস্য নৃত্য থিয়া থিয়া।
তাহা না দেখিতে চাই—
আঁধিয়া ধাঁধিয়া যাই—
স্মরিলে তা গুরু গুরু কাঁপে ক্ষীণহিয়া

(১৮)
তাই বলি শিশু তোরে,
বেঁধেছিস্ হাসি ডোরে,
হাসিতে বাঁধিতে পারে হেন কোনজন

হাসিতে বাঁশরী তান,
কালিন্দী বহে উজান,
ফিরে ফিরে এলি পুন মুরলীমোহন ?

(১৯)

আয় তোরে কোলে ধরি,
আয় তোরে বুকে করি,
তোর ঐ কচিঠোঁটে মোর ঠোঁট দিয়ে,
পিয়ে ও অধর-সুধা,
মিটাই প্রাণের ক্ষুধা,
আসি যাই জন্ম জন্ম যেই ক্ষুধা নিয়ে।

(২০)

ও অধরে মুখ দিতে,
কি যে ত্রাস মম চিতে,
কি কহিব তোরে শিশু কি বুঝিবি তুই
বিষে ভরা এই কায়—
অনন্ত অশনি ধায়—
তখনি মরিবে সেই আমি যারে ছুঁই।

(২১)

ভস্মীভূত হও পাছে,
এসোনা আমার কাছে,
দূরে থেকে দেখো সে এই মম আশ।
তাহা হলে সন্তাপের,
শান্তি বুঝি হয় ঢের,
তাহা হলে ত্যজি সুখে অন্তিমের শ্বাস

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।

চিন্তাকণিকা।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

বুক চিরিয়া ফেল, বুকের মধ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান দেখিতে পাইবে। কোথায় যাচ্ছ ? তোমাতেই যে ভগবান। ৩৫।

দেখতে গিয়ে তাঁকে আড়াল কর, তাইতে তাঁকে দেখতে পাও না। সহজ চোকে দেখ। দেখ্‌তে গিয়ে দেখ কি ? ৩৬।

মনে যতই ছবি আসিয়া পড়ে, ততই তুমি মুছিতে থাক। যেখানে ছবির শেষ, সেখানে বিভুর বেশ। ৩৭।

এই ত তিনি সব হ'তে ভিন্ন। এমন সুন্দর আর কি অন্য ! ৩৮।

মুক্তি বলিলেই মুক্তি হয় না। যিনি আপনার মুক্তি বুঝিয়াছেন, তিনিই মুক্ত-পুরুষ। যখন জীবের মুক্তি হয়, জীব তখন স্পষ্ট দেখিতে পায়। ৩৯।

ব্রহ্মের উপাসনা করিলে জীবের মুক্তি হয়, কেবল এই কথা শুনিয়া উপাসনায় বসিলে কিছুই হইবে না। প্রথমে ব্রহ্ম কি পদার্থ ও তাঁহার উপাসনাই বা কি, তাহা ভালরূপে উপলব্ধি কর, সেই মত কার্য্য করিলেই জীবের মুক্তি হয়। ৪০।

লোকে যাহাকে উপাসনা বলিয়া উপাসনা করে, সে উপাসনা উপাসনাই নয়। তাহা যদি উপাসনা হইত, তাহা হইলে এতদিনে আমরা আমাদিগের চারি দিকে কত শত মুক্ত-পুরুষ দেখিতে পাইতাম, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারে ও তাঁহাদিগের আদর্শে কত অসাধু-জীবন সাধু আকারে পরিবর্ত্তিত হইত। ৪১।

ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া চিৎকার করাকেই উপাসনা বলে না। কতকগুলি মন্ত্র বা কতকগুলি কথা বলিলেই উপাসনা হয় না। উপাসনা সাধনসাপেক্ষ। সাধন নিরপেক্ষ উপাসনা উপাসনা নামেরই যোগ্য নহে। তবে আমরা ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকেই উপাসনা বলিয়া মানিয়া লই। যত দিন আমরা উপাসনার প্রকৃত ভাব সাধনের দ্বারা জীবনে স্থায়ী করিতে অভ্যস্ত না হইব, ততদিন আমাদিগকে মুক্তি হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকিতে হইবে। ৪২।

যিনি আপনাকে পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত দেখিয়া শরীর ত্যাগ করেন, তিনিই কেবল মৃত্যুর পর মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করেন। ৪৩।

মানুষ যখন কামিনী-কাঞ্চনের বশীভূত হয়, তখন সে তাহার সুখ-সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে। যেখানে রিপুর জয়, সেইখানে রূপের ক্ষয়। ৪৪।

সংসারে আবদ্ধ হইলেই মুক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। ৪৫।

সংসারকে আত্মীয় ভাবিয়া বসিলেই মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়। ৪৬।

সংসার-কারাগারে প্রবিষ্ট হইয়া লোকে হায় হায় করিয়া মরিতেছে। ৪৭।

সুখ আশে কূপে পড়ে, শেষে যায় প্রাণ,
দেখে শুনে তবুও ত হয় না'ক জ্ঞান।
আজ কাল ক'রে যদি দিন কেটে গেল,
তবে জীব বলে আর কি করিবে বল।
মায়া ছাড়ি দেখ দেখি কেহ কারো নয়,
বুঝিবেক এ সংসার কি রহস্যময়। ৪৮।
জীবনে না পেলে, বচনে কি ফল,
বাক্য ছেড়ে মন ধর্ম্মপথে চল। ৪৯।

তাঁরে পেলে মানুষের গতি মতি ফিরে দিয়ে, মানুষ আর এক রকম হয়েদাঁড়ায়। ৫০।

ত্যাগী ও বিষয়ী মিশ খায় না। ৫১।

পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া জীব যতই সংসারের পথে ধাবিত হয়, তত সে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে উপনীত হইয়া শেষে ঘোর অন্ধতম প্রদেশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৫২।

নাহিক ক্লেশ, ভাবনা লেশ, অন্তরে বেড়াতে শিখেছি ভাই।
এখানে না পেলে, সেথা যাই চলে, সেথা গিয়া সব দেখিতে পাই॥
কোটী কোটী লোক, কোটী সূর্য্য তারা, দূরে দূরে যাহা রয়েছে জগতে,
সকলি সেথায়, প্রকাশ পায়, ব্যবধান সেথা নাহিক থাকে।
প্রকাণ্ড জগত, তাঁহার ভিতরে, দেখরে কেমন রয়েছে নিহিত,
অভাব কি আছে, এই দেখ তাঁতে, মন প্রাণ আজ হলো সমাহিত। ৫৩।

যে শরীরের স্থিরতা নাই,তাহাতে অভিমান রাখা ঘোর অজ্ঞানতা। ৫৪।

যে মানুষ চিনে, সে কখন মানুষের উপর বিরক্ত হয় না। ৫৫।

পরিণামদর্শীর যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও তাহার খেদ উপস্থিত হয় না। ৫৬।

যে জগতকে অনিত্য বলিয়া জানে, সে জগতের কিছুই চায় না। ৫৭।

আত্মজ্ঞানের প্রভায় মস্তিষ্কের আবরণ উদ্ঘাটিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে এক পরিষ্কার পথ প্রস্তুত হইয়াছে। ৫৮।

যত কেন ধর্ম্মের কথা বল না—কর্ম্ম, ধর্ম্মের অনুগামী না হইলে কেহ কখন ধার্ম্মিক হয় না। ৫৯।

কর্ম্ম দেখিলেই লোকের ধর্ম্ম বুঝা যায়। ৬০।

রাশি রাশি শাস্ত্র তুমি শুধু পড়ে যাও,
চিন্তায় যদি না তাহা বসাইয়া দাও ;
কি ফল সে পাঠে বল শুধু হয় শ্রম,
সে পাঠেতে কোনকালে নাহি যায় ভ্রম। ৬১।

সদা চিন্তা আসে যাহা, ধরে কেবা রাখে তাহা,
ধ'রে যদি রাখা যায়, উদয় তাহাতে হয়,
বেদ পুরাণাদি কত অনন্ত অপার,
মনেতে থাকে না আর কোন অন্ধকার। ৬২।

জীবের আত্মজ্ঞান হইলে জীব আত্মা ব্যতীত আর কিছুই চাহে না। সে আত্মাতে বসিয়া সংসারের সকল রসের অতীত এক পরম তৃপ্তিরস প্রাপ্ত হয়। ৬৩।

পরমাত্মার চরণে পড়িয়া থাকিলে যে সুখ, সে সুখ আর কোথায় পাইবে? ৬৪।

যদি সুখ চাও, তাহলে তাঁতেই থাক। আর যদি দুঃখ চাও, তাহলে সংসারে এস। ৬৫।

যার কিছু আছে, সেই পাইবে। যার কিছু নাই, সে কোথায় পাইবে? ৬৬।

ধর্ম্মের ভানে ধর্ম্মজীবন লাভ হয় না। ৬৭।

পাণ্ডিত্য অভিমানীত পণ্ডিতেরা অভিমান লইয়াই গতাসু হন। ৬৮।

চিন্তায় কি হবে? জীবন নিয়ে কাজ। ৬৯।

লোকে বলে বিষয় হইলে মনুষ্য সুখী হয়। কিন্তু দেখিতেছি, বিষয় মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। ৭০।

সুখ কোথায়? সুখ অন্তরে। বাহিরের কোন বস্তুই মানুষকে সুখী করিতে পারে না। ৭১।

শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

তিনখানি পুস্তক সমালোচনা।

বর্ত্তমানকালে নানা কারণে ভাল পুস্তক পাওয়া বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পাঠকগণের রুচিও অনেকাংশে নীচগামিনী হইয়াছে, এবং অনেক এই দলের গ্রন্থকার ঐ প্রবৃত্তিতে বাতাস দিতেছেন; এই সময় একখানি ভাল পুস্তক হঠাৎ পড়িতে পাইলে প্রাণে বড়ই আনন্দ হয়—গ্রন্থকারের প্রতি স্বতঃই চিত্ত কৃতজ্ঞ হয় এবং তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। আজ আমি সেইরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই সমালোচনা কার্য্যরূপ দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ইহাকে প্রকৃত সমালোচনা বলিতে পারি না, কারণ এই পুস্তকগত বিষয়ের বা ভাষার দোষ গুণ সম্যক্ বিচার এবং ভ্রম ত্রুটী প্রদর্শন করিতে পারি সেরূপ বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, বহুদর্শিতা কিছুই আমার নাই। তবে আমি পুস্তক কয়েকখানি পাঠে তৃপ্ত হইয়াছি এবং আমার ধারণা, ইহারা বঙ্গ-ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং স্থায়িত্ব লাভ করিবে। যে যে

সাহিত্য-সেবক এবং সাহিত্যের উৎসাহ-দাতৃগণকে নিবেদন করিব। তাঁহারা একবার পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করিয়া বিচার করিবেন, আমি ভ্রান্ত কি না!

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় হঠাৎ লেখকদলভুক্ত নহেন, তাহা তাঁহার লেখার যে কোন অংশ, যে কোন ছত্র পড়িলেই জানা যাইবে। এমন লিখন-ভঙ্গী, এমন রচনা-কৌশল, এমন লিপিচাতুর্য্য হাঁম-বড়া দলে পাইবেন না। ইহা দুই একদিন সাধনার ফল নহে।

সুদূর পল্লীগ্রামের সরল কবিত্বময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে অনাবিল স্বর্গীয় মাতৃস্নেহের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া, যুবক জলধর জ্ঞান-বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, ভক্ত, সাধক প্রাতঃস্মরণীয় হরিনাথের গভীর বিদ্যাবারিধি হইতে ঐকান্তিকী ভক্তি ও একাগ্রতার সাহায্যে স্বীয় রক্তকণার বিনিময়ে যে অমৃতবারি বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন, আজ প্রবীণ বয়সে তাহাই পবিত্র সুধাধারারূপে বর্ষণ করিয়া, মাতৃরূপিণী বঙ্গভাষার চরণযুগল ধৌত করিতেছেন; আমরা সেই পবিত্র নিস্রবের মধুর কণ্ঠধ্বনিতে মুগ্ধ এবং তাহার স্বর্গীয় সৌরভে পুলকরেখাঙ্কিত করিতেছি। বাস্তবিকই জলধর বাবুর ভাষা ঠিক জলধর-সম্ভূত ধারার ন্যায় পবিত্র, শীতল, প্রাণের জ্বালা নির্ব্বাণকারী। তাহা পাঠ করিতে করিতে মন যেন স্বতঃই মুগ্ধ হইয়া পড়ে; আর তাঁহার ভাষায় এমন একটি ঝঙ্কার আছে, যাহা প্রাণের উপর একটা স্থায়ীভাব অঙ্কিত করিয়া দেয়। তাঁহার 'প্রবাস চিত্র' এবং 'নৈবেদ্য' ইহার ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে। 'হিমালয়ে' ভাষার চাতুর্য্য সব স্থানে বজায় রাখা হয় নাই—ইচ্ছা করিয়াই তিনি রাখেন নাই—এজন্য অনেকের নিকট তিনি একটু অভিমানের তিরস্কার লাভ করিয়াছেন, আমরা যে কতক পরিমাণ সে তিরস্কার না করি, তাহা নহে—কিন্তু তাহাতে মাধুর্য্যের কোন হানি হইয়াছে বলিয়া আমরা বোধ করি না। বিশেষতঃ 'হিমালয়' গল্পচ্ছলেই যেন বলা হইয়াছে; সে ক্ষেত্রে ইহার ভাষা তদুপযোগী হওয়াই কতকটা ভাল। ইহা পড়িতে পড়িতে আমরা যে পুস্তক পড়িতেছি, তাহা ভুলিয়া যাই, যেন বোধ হয়, জলধর বাবু তাঁহার সদা প্রসন্ন হাস্যোদ্ভাসিত মুখে নিজেই আমাদিগকে এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতেছেন, নিজে হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, আমাদিগকে হাসাইতেছেন, কাঁদাইতেছেন। 'প্রবাস চিত্রের' ভাষা এবং 'হিমালয়ে'র ভাষা অনেক স্থলেই সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং তাহাদিগের তুলনায় সমালোচনা করা সম্ভব

বা কর্ত্তব্য নহে; তবে 'প্রবাস চিত্রের' ভাষায় 'হিমালয়' লিখিত হইলে হয়ত শব্দ ও ভাষাসম্পদে পুস্তকখানি আরও উপাদেয় হইত, কিন্তু এরূপ "বৈঠকী আমোদ" তাহা পাঠ করিয়া পাওয়া যাইত কি না, সে বিষয় সন্দেহ। যাহা হউক 'হিমালয়ের' ভাষার এবং কতকগুলি বাক্যের প্রয়োগের স্থানে স্থানে আমার আপত্তি থাকিলেও মোটের উপর তাহা আমার মন্দ লাগে নাই। তবে 'হিমালয়ে' যে ভাষার চাতুর্য্য নাই তাহা নহে, অলঙ্কার নাই, তাহাও নহে। তবে সে সব অলঙ্কার সোণার, হীরার না হইতে পারে, সে অলঙ্কার প্রাকৃতিক; হৃদয়ের যখন উচ্ছ্বাস হইয়াছে, তখন সে উচ্ছ্বাস জলধরবাবু এমন সুন্দর মুগ্ধকারী অথচ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে তাঁহার আন্তরিকতার ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; ভাষার জড়োয়া অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে সে আন্তরিকতার বিমল প্রাকৃতিক চিত্র ঢাকা পড়ে নাই,—যেখানেই আন্তরিকতা, সেখানেই অন্ত ভাষার সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না। অলঙ্কার খোঁজ করিবার সামর্থ্য বা অবসর তখন থাকে না। কবি Irvingএর কথায় সেগুলিকে "spontanious tributes of unlettered affection" বলা যাইতে পারে। তবে জলধরবাবু "করলুম্" "গেলুম্" ইত্যাদি লুমন্ত ক্রিয়াপদগুলি পরিবর্ত্তন এবং স্থানে স্থানে ভাষাটির একটু আধটু পরিমার্জ্জন করিলে তাঁহার উদ্দেশ্যের কোন হানি না হইয়া বরং ভাষার গৌরব বর্দ্ধিত হইতে পারে বলিয়া আমার বোধ হয়।

সুখপাঠ্য স্থায়ী সাহিত্যের সম্বন্ধে কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। তাহাদের মধ্যে সহৃদয়তা, পবিত্রতা এবং নির্ভীকতা এই তিনটি প্রধান। আমার বোধ হয়, জলধর বাবুর লেখায় এ তিনটিই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এরূপ সহৃদয়তা-পূর্ণ লেখা আমি কমই দেখিয়াছি বোধ হয়, ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাঠক সে পরিচয় পাইবেন। যেখানে দুঃখ, যেখানে শান্তি, যেখানে অত্যাচার, যেখানে অবিচার, যেখানে কলঙ্ক, যেখানে দোষ, সেখানেই দেখি, যেন জলধরের জলভারাক্রান্ত চক্ষু লেখনী-মুখে মুকুতা-ধারা বর্ষণ করিয়া গিয়াছে। এইরূপ সহৃদয় সাহিত্যে হৃদয়ের উদারতা ও উচ্চতা সুসাধিত হইবার পক্ষে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়, সুতরাং ইহার স্থায়িত্ব বাঞ্ছনীয়।

পবিত্রতাও ইহার প্রত্যেক পুস্তকেই পাঠক যথেষ্ট দেখিতে পাইবেন।

জলধর সাধকের শিষ্য, মাতার সেবক, ভগবানের ভক্ত এবং প্রকৃত কবিত্ব-পূর্ণ। তিনি শতবার দোহাই দিয়া 'আমি কবি নয়' বলিলেও তাঁহার স্বহস্তগঠিত পুস্তকাবলীই তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিয়া দিবে, তাহার অনেক স্থল হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের আয়োজন করিবে, সুতরাং তাঁহার এই ঢাক ঢোল বাজাইয়া স্বীয় অকবিত্ব প্রচার অকাতরে দানশীলের কৃপণত্বের দাবীর মত নিবন্ধন হইবে বলিয়াই বোধ হয়; তবে তিনি বলিতে পারেন যে, তিনি 'চৌদ্দয় পদ্য' লিখেন নাই; তাহা লিখেন নাই, সেটা ভালই করিয়াছেন, এবং আমরা অনুরোধ করি, কখন যেন তাহা না করেন। তাঁহার 'প্রবাস চিত্র' এবং 'হিমালয়' যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাকে একজন উচ্চ শ্রেণীর ভাবুক এবং কবি বলিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়াই আমার ধারণা। যেখানেই তিনি প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সেখানেই যে তিনি একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রতি পৃষ্ঠাতেই দেখা যায়। যেখানে তিনি একটু স্নেহ, একটু ভালবাসা পাইয়াছেন, যেখানে তিনি সংসার-জীবনের একটু বিমল ছবির আভাস পাইয়াছেন, সেখানেই তাঁহার প্রাণের পবিত্র সহৃদয়তা ও পবিত্রতা প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। পার্ব্বত্য বালিকাগণের সারল্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, পরিত্যক্ত গৃহভিত্তিতে অঙ্কিত চিত্র সংসার জীবনের মাধুর্য্য তাঁহার স্মৃতিপথে আনিয়া দিয়াছে। দৃষ্টান্ত আমরা কত দিব? তারপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এমন সুন্দর বর্ণনা আমরা অনেক দিন যেন দেখি নাই! সন্ধ্যারাগরঞ্জিত পার্ব্বত্য বনভূমি, নির্ঝরিণীর কলতান, বিহঙ্গের কাকলী, প্রস্তর কঙ্করময় বন্ধুর পার্ব্বত্যপ্রদেশ সকলেই তাঁহার মনে শ্রীভগবানের অসীম কৌশল, অখণ্ড মাহাত্ম্য জাগাইয়া দিয়াছে; তাঁহার লেখা পড়িয়া কবিবর Addisonএর এই উক্তি আমার নিকট সার্থক বোধ হইয়াছে;—

What though, in solemn silence, all
Move round the dark terrestrial ball?
What though no real voice nor sound,
Amid their radiant orbs be found?
In Reason's ear they all rejoice,

For ever singing as they shine,
"The hand that made us is divine."

তার পর ঐকান্তিকতা এবং নির্ভীকতা! এই গুণটি আমরা জলধর বাবুর গ্রন্থে যত অধিক পরিমাণে দেখিয়াছি, এমন অন্য কোন পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। জলধর বাবু একেবারে নিজের হৃদয় খুলিয়া তাহার প্রত্যেক স্তর আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি কোনওরূপ লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি হৃদয়ে দুঃখদাবানল লইয়া শান্তির আশায় হিমালয়ের পাদদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন, শত শত প্রকার মনোহর দৃশ্য তিনি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াও সেই গূঢ় বেদনার জ্বালাময়ী স্মৃতি আমাদিগকে পর্য্যন্ত ব্যথিত করিয়াছে। এই সব সৌন্দর্য্য যেন তিনি সেই বেদনার হৃদয় লইয়া উপভোগে তৃপ্ত হন নাই, প্রাণে যেন একটা গভীর অভাবের দাগ পড়িয়া গিয়াছে, নয়নদ্বয় যেন জলভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের সে দুর্ব্বলতা (?) সে বিষণ্ণভাব, সে অশান্তি তিনি গোপন করেন নাই, নয়নের সে পবিত্র অশ্রু তিনি লোকলজ্জা-ভয়ে মুছিতে চেষ্টা করেন নাই।

হিমালয়ের সে অনুপম সৌন্দর্য্য, সে মহান্‌ভাব তাঁহাকে মুগ্ধ করিলেও তাঁহার যে পূর্ব্বস্মৃতি মুছিয়া দিতে পারে নাই বরং তাহা আরও উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছে—জলধর বাবু তাহা আমাদিগকেও জানাইয়া দিয়াছেন। এই সব মনোরম স্থান দেখিয়া জলধরের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা গভীর বেদনার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। কবি Mooreএর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহার প্রাণ গাহিয়াছে :—

And when, in other cllmes, we meet
Some isle or vale enchanting,
Where all looks flowery, wild and sweet,
And nought but love is wanting ;
We think how great had been we bliss,
If Heaven had but assigned us
To live and in scenes like this,
With some wed left behind us !

[ক্রমশঃ]

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা।)

১০ বর্ষ। } পৌষ, ১৩০৮ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আর্য্যসতী পদার্থ কি ?

পদার্থ অতি সুন্দর। নির্ম্মল, সরল, তেজোময়, অমূল্য পদার্থ। প্রাচীন কবিরা আর্য্যক্ষেত্রের একটি নাম দিয়াছেন—সতীক্ষেত্র। সতীর মহিমা এবং সতীত্বমাহাত্ম্য ভারতবর্ষে যেরূপ জাজ্বল্যমান, তেমন আর পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই। সতী অঙ্গের এত তেজ যে, দগ্ধাঙ্গ হইবার আশঙ্কায় ধর্ম্মরাজও সহসা সাবিত্রী সতীর সমীপস্থ হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। সতীর ধর্ম্ম, সতীর একাগ্রতা, সতীর কার্য্য, সর্ব্ব প্রকারে অতুলনীয়। দক্ষকন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়া, দক্ষমুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া, ভগবতী সতী দক্ষযজ্ঞে জীবন বিসর্জ্জন করেন, সতীমাহাত্ম্যের সেই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সতীত্ব-প্রভাবে সাবিত্রীদেবী মৃত-সত্যবানের পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছিলেন, ইহাও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জনকদুহিতা সীতাদেবী রাক্ষসপুরীর অশোকবনে, বাল্মীকির তপোবনে, বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও অহর্নিশি রামচন্দ্রের চরণ স্মরণ বিস্মৃত হন নাই, ইহাও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতে সতী-মহিমা অনন্ত।

পুরাণশাস্ত্রে সতী-মহিমার শত শত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া, ভারতের জনক-জননীরা গৌরীকাল হইতেই কন্যাগণকে সতীত্বধর্ম্মের উপদেশ দিতেন. কি করিয়া পতিসেবা করিতে হয়, অহরহঃ তাহা শিখাইতেন। মনোমত ভাল পতি লাভ করিবার সঙ্কল্পে কন্যারাও বালিকাকাল হইতেই অশেষ প্রকার ব্রতাচরণ করিত। পতিপ্রাণা, পতিরতা, পতিব্রতা, সতী স্ত্রীর এই সকল বিশেষণ তদ্বিষয়ের সবিশেষ প্রমাণ।

পতি ভিন্ন সতী স্ত্রীরা সংসারে আর অন্য কিছু জানিতেন না, পতি-সেবা ভিন্ন সংসারে সতী স্ত্রীর আর কিছু প্রধান কার্য্য ছিল না। পতিই মুক্তি, পতিই ভক্তি, পতিই একমাত্র গতি, এই বিশ্বাসে ভারতের সতী কন্যারা পতিচরণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া রাখিতেন; আপনারা পতি-দেহের বামার্দ্ধভাগিনী, ইহাই স্থির জানিয়া, অহরহঃ পতিসঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতেন। এই কারণেই পত্নীর নাম সহধর্ম্মিণী।

যোগিনী, তপস্বিনী, ঋষিপত্নী, রাজরাণী, গৃহস্থকামিনী; অধিক কি, ভারতের ইতরজাতীয়া রমণীগণের হৃদয়েও সতীত্বের আদর নিবদ্ধ ছিল। গৃহস্থগণের সধবা রমণীগণকে দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করুন। পতিসেবা ভিন্ন সধবা সতী স্ত্রীর অপর ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই, ইহাই শাস্ত্র; সধবা স্ত্রী একাকিনী তীর্থযাত্রা করিবে না, একাকিনী কোন দেবদেবীর পূজা করিবে না, পতিসমীপে ইষ্টমন্ত্রদাতা গুরুদেব উপবিষ্ট থাকিলে সধবা সতী অগ্রে পতিকে প্রণাম না করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিবে না, পতির অনুমতি ব্যতিরেকে সতী স্ত্রীর কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার নাই, ইহাও শাস্ত্র।

এই সতীত্ব-গৌরব এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে বহুকাল পর্য্যন্ত অক্ষত ছিল। পতির জীবনান্তে সতী স্ত্রীকে সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে নাই, এই বিশ্বাসে সতী স্ত্রীরা পতির জলচ্চিতায় ঝম্ফপ্রদান পূর্ব্বক জীবন আহুতি দিতেন।

জীবনে মরণে পতিই সতীর একমাত্র গতি। পতির মরণে সতী স্ত্রীরা সহমৃতা হইতেন, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মোগলকুলকেশরী আকবর শাহ এই সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরাজ অধিকারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) লর্ড বেণ্টিক বাহাদুর যখন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল, সেই সময় রাজা রামমোহন রায় হিন্দুরমণীর অনুমরণ-প্রথা অশাস্ত্রীয় বলিয়া, তাহা রহিতকরণের প্রস্তাব করেন; ভাল ভাল পণ্ডিতের ব্যবস্থা লইয়া, লর্ড বেণ্টিক তদনুসারে ঐ প্রথাটি উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা দেন। তদবধি সতীদাহ নিবারণের শক্ত আইন হইয়াছে। সেই প্রতাপে এতদ্দেশে

গৃহের একটি হাস্যমুখী সতীকামিনী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা ও সিন্দূরচন্দনচর্চ্চিতা হইয়া পতির চিতায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকিয়াও নিবারণ করিতে পারেন নাই, তিনি নিজেই বরং মহাবিস্মিত হইয়া, আর্য্যসতীর পতিভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, হতাশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সতী বাস্তবিক কি, এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে অনেক ইংরাজ লোকে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিতাভিমানী, তাঁহারাও নির্লজ্জের ন্যায় অম্লানবদনে বলেন, কেহ কেহ পুস্তকেও লেখেন, "অমুক স্থানের অমুক হিন্দুরমণী সতী হইতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার তিন মাস মেয়াদ হইয়াছে, যাহারা তাহার সেই কার্য্যে সহায় হইতে গিয়াছিল, তাহারা এক এক বৎসরের জন্য কারাগারে গিয়াছে।"

অপূর্ব্ব সংস্কার! অতি অপরূপ ধারণা! সতী হওয়াটা কি, কাহাকে বলে সতী, সে জ্ঞান যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কদাচ ঐরূপ হাস্যকর কথা ওষ্ঠাগ্রে আনিতে পারেন না। তাঁহারা হয় ত মনে করেন, পতির সহিত চিতানলে দগ্ধ হওয়াই সতী হওয়া; তাহা না হইলে সতী হওয়াকে ফৌজদারী অপরাধ মধ্যে গণ্য করিতে তাঁহাদের সাহস হইত না।—"Committed Sati-rite" ইংরাজী ভাষায় এইরূপ লেখা অর্ব্বাচীনের কার্য্য। সত্যই যেন সতী হওয়াটা মহাপাপ, সেই কারণে ইংরাজীতে Commit ক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়! দূর হউক, যাঁহাদের এরূপ অদ্ভুত জ্ঞান, তাঁহাদের সহিত এই গুরুপ্রসঙ্গের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

আজিও এতদ্দেশে আর্য্যপরিবার মধ্যে অনেক সতী স্ত্রী বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা অকপটে পতিপরায়ণা, যথাশক্তি তাঁহারা পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, ইহা অস্বীকার করা যাইবে না, কিন্তু দারুণ আক্ষেপের বিষয়, স্বদেশীয় যুবকেরা আজকাল অনেকেই এই পবিত্র ধর্ম্ম গ্রন্থিটি শিথিল করিয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছেন,—অসম্ভব স্ত্রী বাধ্য হইয়া অন্তঃপুরবাসিনীগণকে স্বাধীনতা দানে উন্মত্ত হইয়া, পবিত্র সতীত্বধর্ম্মে সাঙ্ঘাতিক আঘাত করিতে উদ্যত হইতেছেন! নবসভ্যতার দাস, সুতরাং সভ্যতা শিক্ষার গুরুমহাশয়েরা হাস্য করিয়া বাহাদুরী দিতেছেন, সেই বাহাদুরী লাভের প্রত্যাশাতেই ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদলের এই

বাড়ুক মতিভ্রম, তথাপি কিন্তু ভারতে এখন সতী স্ত্রী অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না, কূটবুদ্ধি থাকিলে বরং দুটি পাঁচটি দিগ্‌ভ্রান্তা অসতী খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। হুজুর কাউন্সিলের একজন মিলিটারী মেম্বর, মিলিটারী কর্ণেল সাহেব এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষের বিধবা হিন্দুকামিনীরা সকলেই প্রায় ব্যভিচারিণী।" কর্ণেল সাহেবের এই সাংঘাতিক ধর্ম্মনাশক মিথ্যাকথার পোষকতা করিবার জন্য গুটিকতক দিগভ্রান্ত বাঙ্গালী যুবাও কটিবন্ধন করিয়াছিলেন। হায় হায়! কি লজ্জা, কি ঘৃণা, কি ভয়ানক কলঙ্ক!!!

পৃথিবীর অন্য দেশে সতী নাই, মূর্খের ন্যায় এমন কথা আমরা বলি না, অবশ্যই আছেন; কিন্তু ভারতের আর্য্যসংসারে যেমন দুই একটী অসতী খুঁজিতে হয়, সতী খুঁজিতে হয় না, অন্য দেশের এক এক স্থলে সেইরূপ দুই একটি আদর্শ সতী বাছিয়া লইতে হয়, অসতী খুঁজিয়া লইতে হয় না। প্রাচীন গ্রীস, রোম এবং আধুনিক ফরাসী ও ইংলণ্ডের নভেল নাটকে এক একটি সতী নায়িকার যে উচ্চ গৌরব—উচ্চ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহারও ঐ কারণ। যেখানে ভাল জিনিস কম, সেখানে দুই একটি ভাল জিনিসের বেশী আদর, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

আর্য্যবর্ষের আর্য্য-রমণীর তুল্য পতিপ্রাণা সতী জগতে আর নাই, গর্ব্ব করিয়া আমরা বার বার সহস্রবার এই সত্যকথা বলিতে পারি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের সুপবিত্র ধর্ম্মভাব দিন দিন মলিন হইয়া আসিতেছে, ইহাতে আমরা মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইতেছি; আর্য্য রমণীর আদর্শ সতীত্ব পুনর্ব্বার আর্য্য-সংসারে পূর্ব্ববৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, নবসভ্যতার ছায়া অথবা বাতাস আমাদের কোমলাঙ্গীগণের কোমলাঙ্গ স্পর্শ না করে, ইহাই আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়—একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীতে ভক্তহৃদয়।

প্রায় সার্দ্ধচতুঃশত বৎসর হইতে চলিল, যে মধুস্রাবী সঙ্গীত সমগ্র বঙ্গদেশকে উন্মত্ত করিয়াছিল; যাহার মাধুর্য্যে ন্যায়শাস্ত্রের কূটতর্ক এবং রাজাধিরাজের শাণিত অস্ত্রও পরাভূত হইয়াছিল, যে সঙ্গীতের বলে শ্রীচৈতন্যদেব সমগ্র ভারতবর্ষকে স্ববশে আনিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অদ্য সেই ভক্তকবি চণ্ডীদাসের একটী পদ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

হে বিশ্বরূপ! সংসারে যা কিছু প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হয়, যাহা কিছু আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়, তাহাতেই তুমি বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমা ছাড়া জগতে আনন্দ থাকিতে পারে না। হে মধুময়! প্রস্ফুটিত প্রসূন, আবেশময় চন্দ্রকর, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, ঘনশ্যামল বৃক্ষপত্র, আর উপরে অনন্তনীল সুশ্যামল নভোমণ্ডল, এ সকলই তোমার মধুময়রূপের আংশিক বিকাশমাত্র। দশদিকের যে দিকেই চাই, দেখিতে পাই, তোমার নয়ন-মন-তৃপ্তিকর সুমধুর শ্যামরূপ। শ্যামরূপ তোমার মাধুর্য্যের পূর্ণাবতার। হে শ্যামসুন্দর! তাই তোমার ভক্ত, তোমার শ্যামরূপে এত মজিয়া থাকে। পুরাণে আছে, তোমার এই দশদিক্‌ব্যাপী ঘনশ্যামল প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়াই লোক-পিতামহ আদিপুরুষ ব্রহ্মা সসম্ভ্রমে মধুর গাথায় গাহিয়াছিলেন,— "নৌমীড্যতেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়" অর্থাৎ হে মেঘবরণ বিদ্যুৎবসন, তোমাকে নমস্কার।

ভক্তহৃদয় বালকের মত উদার, নারীর মত সুকোমল ও প্রীতিময়। তাই তোমার ভক্ত তোমাকে বালক অথবা নারী হইয়া ডাকিতে ভালবাসে। পুরুষ চায় স্বাতন্ত্র্য; কিন্তু তুমি তোমা হইতে স্বতন্ত্র, অহঙ্কারাভিমানী পুরুষের দিকে ফিরিয়াও চাও না। হে ভক্তপ্রাণ! নারীর মত আত্মসমর্পণ কে করিতে পারে? নারীর সুখ দুঃখ, আশা উল্লাস সকলই পুরুষে সমর্পিত। তাই ভক্ত, নারীর মত আপনার সুখ দুঃখ তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিশ্চেষ্ট হইয়া তন্মনে তোমাকেই সেবা করিতে ভালবাসে। তোমাকে পাইয়াও ভক্তের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। ভক্ত চায়—অবিরত তোমার ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদন করিতে। ভক্তের চিত্ত তোমার অসীম মাধুর্য্যসাগরে ডুবিয়া থাকিতে সততই অভিলাষী। ভক্তের ভয়, পাছে তুমি তাহার হৃদয় হইতে একতিলের জন্যও অপসৃত হও।

ভক্ত তখন তোমাকে পাইয়াও তোমার জন্য উন্মত্ত হয়। তুমি তাহার প্রাণের প্রাণ; তোমাকে একান্তে, চিরতরে, গোপনে রাখিতে ইচ্ছা করে। ভক্তের এই অবস্থার নাম গোপিকা। হে দয়াময়! তুমিই বলিতে পার, তোমার এই সমবেত ভক্তগণ গোপিকা হইয়া কতদিনে তোমার জন্য উন্মত্ত হইবে?

তোমার ভক্ত যখন ধর্ম্মপিপাসু হইয়া দীনের মত, পরিত্যক্তের মত, সংসার-মরুর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; তোমাকে পাইয়াও তোমার স্বরূপ অবগত না হইয়া, লক্ষ্যহারা হইয়াছিল; ভক্ত যখন ভাবিতেছিল, যিনি তাহার জীবনে মরণে বন্ধু, যাঁহার অসীম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শ্যামল সৌন্দর্য্য তাঁহার চিত্তকে এতদূর বিমুগ্ধ করিয়াছে, তিনি কে, তাঁহার স্বরূপ কি? ভক্ত যখন তাঁহাকে জানিবার জন্য, মাধুর্য্যময়ের মধুর নামটী শুনিবার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, সেই সময় পরম দয়াল কে একজন বলিয়া দিল, যিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, যাঁহার শ্যামরূপে তোমাকে এতই উন্মত্ত করিয়াছে, যিনি তোমার চির-আকাঙ্ক্ষার বিষয়, চিত্ত চোর, তাঁহার নাম শ্যামসুন্দর। ভক্ত চিরবাঞ্ছিতের নাম শুনিয়া আপনাকে আর স্থির রাখিতে পারিলেন না; সুখের সহিত, আশার সহিত, আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।"

যেন কাহার অভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া পদ্ম ফুটিতে পাইতেছিল না, প্রাতঃ সূর্য্যের সুবর্ণময় করস্পর্শমাত্রই শতদল একেবারে ফুটিয়া উঠিল। যেন বহুবর্ষের নীরব বীণা-বাদকের একবার মাত্র তর্জ্জনী আঘাতে এককালে সহস্র তারে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। যেন বহুকালের অন্ধতমোগৃহে একবারমাত্র দীপশলাকাঘাতে একেবারে আলোকিত হইয়া উঠিল। যেন কণ্ঠস্থিত রত্ন, অপহৃতবোধে ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডময় অন্বেষণ করিতেছিলেন; কে যেন বলিয়া দিল, ওহে, দেখ তোমার কণ্ঠমণি কণ্ঠেই রহিয়াছে। ভক্ত তখন ভাববিভোরচিত্তে উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার চিরকাঙ্ক্ষিতের নামদাতার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। ভক্ত ভাবিলেন, যিনি আমার কর্ণে এই সুধাবর্ষণ করিলেন; যাঁহার নাম শ্রবণ করিয়া আমার এই মরুর মত বহুকালের শুষ্ক হৃদয়ে সুধার স্রোত বহিয়া গেল; আমার হৃদয়-শতদল একেবারেই ফুটিয়া উঠিল, হৃদয়ের সহস্র তার যুগপৎ বাজিয়া উঠিল, যিনি

আমার এই অন্ধতমো হৃদয় দীপশলাকার ন্যায় আলোকিত করিলেন, তিনি মানুষ না দেবতা? ভক্ত তখন প্রেমময়ের নামের সহিত নামদাতার তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। যাঁহার কৃপায় হৃদয়ে এমন দেবভাব আসিয়াছে, তাঁহাকে মানুষ বলিতে ভক্তহৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল। ভক্ত দেবতাবোধে বলিলেন,—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকেই গুরুকরণ বলে। যিনি জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করেন, সেই মহাপুরুষই গুরু। রাশি রাশি গ্রন্থ দেখিয়া যাহা না হয়, কাহারও একটীমাত্র কথাতেই তাহা হইয়া যায়। সহস্র চেষ্টাতেও যে ঘড়ি চলিতেছে না, ধ্রুবস্থানে একবারমাত্র ক্ষুদ্র হাতুড়ীর মৃদু আঘাতে হয় ত তাহা আবার চলিতে আরম্ভ করে। অনন্ত প্রকার ভেষজেও যে রোগ আরোগ্য হইতেছে না, উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে একটী ফোঁটাতেই হয় ত তাহা আরোগ্য হয়। সে রোগ বুঝিতে পারেন গুরু, ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেনও গুরু। শিষ্যের হৃদয় যখন এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে, শিষ্য যখন জ্ঞানপিপাসু হইয়া আপনার আকাঙ্ক্ষিত আপনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না, গুরু তখন বলিয়া দেন, শুন শুন, ইহাই তোমার আকাঙ্ক্ষিতের নাম, ইহাই তোমার আরাধ্য বস্তু। তুমি বিশ্বরূপের অসীম সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ; কিন্তু তোমার সে সামর্থ্য কৈ? যাহাতে তুমি সেই অসীম সৌন্দর্য্যময়—অনন্ত জ্ঞানময়—অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় বিরাট পুরুষের অনন্তরূপকে তোমার শান্তহৃদয়ে ধারণা কর? এইরূপ ধারণা করিতে গিয়াই একদিন ভক্তহৃদয় অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, সম্বর প্রভো বিরাট রূপ! তোমার ঐ সীমাহীন দেশ-কাল-পরিচ্ছদরহিত বিশ্বরূপ ধারণা করিতে পারিতেছি না প্রভো! "ইচ্ছামিতে দ্রষ্টুমহং তথৈব",

তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।

তেমন করিয়া আবার আমার মনোরথরথরজ্জু ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াও দেখি প্রভো!

ভক্ত! তুমি সেরূপ ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়াই গুরু বলিলেন, তোমাকে অসীমের মধ্যে সসীম করিয়া লইতে হইবে। অনন্তকে

তোমার হৃদয়ের অনুরূপ শান্ত করিয়া লইতে হইবে। তোমার হৃদয়স্থিত শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিই বিশ্বব্যাপী শ্যামসুন্দর। তোমার হৃদয়স্থিত শ্যামসুন্দরই মাতৃভক্তের জগন্মাতা, পিতৃভক্তের জগৎপিতা, গোপবালকের প্রিয়সখা ও গোপিকার প্রাণেশ্বর।

ভক্ত এখনও সেই অসীম সৌন্দর্য্যকে সসীম করিয়া অন্তরের ভিতর রাখিতে পারেন নাই; এখনও নিভৃতে সেই ব্রহ্মানন্দরস অনুভব করিতে পারেন নাই; শুদ্ধ সেই গ্রহতারকামণ্ডিত অনন্তের বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিয়া অভিলষিতের মধুস্রাবী নামমাত্র শ্রবণ করিয়া ভক্ত বিভোর হইয়া বলিতেছেন,

"কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো।"

তুমি আমি ঈশ্বরের নাম সহস্রবার বলিতেছি শুনিতেছি; কিন্তু "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" কয়জনের? বাসনার দাস আমরা, আমাদের হৃদয়-কবাট বাসনায় রুদ্ধ; প্রেমময়ের নাম শ্রবণবিবর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে কৈ? তুচ্ছ ভালমন্দ কথায় শ্রবণ ভরিয়া আছে,—মধুময়ের নামের মাধুর্য্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কৈ? কটুতিক্ত খাইয়া উদর পূর্ণ করিয়াছি, মিষ্টরসাস্বাদ গ্রহণ করিতে পারি কৈ?

আমরা এমন অনেক সাংসারিক কথাও শুনি, যাহা হৃদয়স্পর্শী হয় না। তাহার কারণ অন্যমনস্কতা। যাহা শুনিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হই, তাহা অর্দ্ধোচ্চারিত হইবামাত্রই বর্ণে বর্ণে বুঝিয়া লই। ভক্ত তাঁহার প্রাণেশ্বরের নাম শুনিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাই প্রভো! তোমার ঐ নামটী তোমার ভক্তের কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। ভক্ত পূর্ণিমার চন্দ্রকরসংপৃক্ত সমুদ্রের মত উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিতেছেন,—

"আকুল করিল মোর প্রাণ।"

বিশ্বাত্মার পবিত্র নামে হৃদয়ে সমুদ্রতরঙ্গ খেলিতেছে, একদিকে সুখ ও আশা, অপরদিকে ভয় ও বিস্ময়ে হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে। যেন কি এক মদিরা পান করিতে করিতে ভক্ত বিভোর হইয়া বলিতেছেন,—

"না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

ভক্তের শত প্রকার লৌকিক বাক্যাড়ম্বর তিরোহিত হইল। ভক্তের

নামই ভক্তের অনুরাগ—অভিলাষের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। ভক্ত ইচ্ছা-পূর্ব্বক স্বতন্ত্র হইতে চাহিলেও নাম-মাধুর্য্য ভক্তহৃদয় ত্যাগ করিবে না। ভক্ত এক্ষণে নাম-মাদকতায় ঘোর উন্মত্ত, সম্পূর্ণ পরাধীন। কোন মদ্য-পায়ী বলিয়াছিল,—"আমি তো মদ খাই নাই, মদে আমাকে খাইয়াছে।" ভক্তকেও সেইরূপ নাম-মদিরায় একেবারে গ্রাস করিয়াছে, ভক্তের সাধ্য কি যে, তাহা ছাড়িয়া আসেন? ভক্ত যতই নাম-সুধা পান করিতেছেন, ততই তাঁহার মাধুর্য্যানুভূতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ভক্ত সে মাধুর্য্য ত্যাগ করিতে পারেন না। দোষশূন্য শুদ্ধসত্ত্বের সহিত নিয়ত সংসর্গে তাঁহার প্রতি অনুরাগেরই বৃদ্ধি করে। তখন শতমুখেও তাঁহার গুণানুবাদ করিলে, ভক্তের মনে হয়, কৈ, তাঁহার সকল গুণ বলিতে পারিলাম কৈ? ভক্ত হরিনাম-সাগরে ডুবিয়া শেষ না পাইয়া বলিতেছেন,—নামে কত সুধা আছে, জানি না প্রভো! তবে এইমাত্র জানি, তোমার নামামৃত পান করিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না, যত বলি, ততই বলিতে ইচ্ছা করে।

আর গুরু শিখাইলেন, প্রথম সাধনার অঙ্গ নাম জপ।

কিন্তু—"জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সখি তারে?"

গুরু বলিলেন, "জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধি র্নসংশয়ঃ" তোমার অভীষ্টের নাম একাগ্রচিত্তে জপ কর, পাইবে তাঁহাকে। গুরুর কথা, নিজ জনের কথা, প্রাণে লাগিল, তাই জপ করিতে বসিলাম। কিন্তু দেখিতেছি, হিতে বিপরীত ঘটিল। জপ করিতে করিতে হৃদয়ে কেমন এক অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। এ অবসাদ চিন্তার বা দুঃখের নহে; সুখের পূর্ণতায় এমনই অবসাদ আসিয়া থাকে। যোগ-শাস্ত্রে ইহাকেই সবিকল্প সমাধির ও ভক্তিশাস্ত্রে ইহাকেই দশাভোগের প্রাক্কাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একাগ্রতার সহিত নাম জপেই এইরূপ অবসাদ আসিয়া থাকে; তখন আপন শরীরও আপন বলিয়া বোধ হয় না। এই পবিত্র ভাবের উদয় হইলে ভক্ত ভাবেন, মনের সহিত এই পাঞ্চভৌতিক শরীরও সেই প্রেমময়ের চরণে বিক্রীত। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবের এইরূপ মহাভাব ক্ষণে ক্ষণেই হইত। ভক্ত এই মহাভাবের সময় বড়ই প্রেমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। এই ভাব তিরোহিত হইলেই

ভক্তের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই ভাবের অপস্থিতিতেই ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া উঠিলেন ;—

"অমূল্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরেত্বদালোকন মন্তরেণ।
অনাথবন্ধো ! করুণৈকসিন্ধো ! হাহন্ত হাহন্ত কথং নয়ামি ॥"

দয়াময় বড়ই সুখে ছিলাম, আজ তোমার অদর্শনে কেমন করিয়া দিন কাটাইব প্রভো! ভাগবতে আছে, এই মহাভাবের তিরোধানেই ভক্তপ্রাণ গোপিকা বলিয়াছিলেন,—

"হা নাথ ! রমণ ! প্রেষ্ঠ ! কাসি কাসি মহাভুজ !
দাস্যাস্তে কৃপয়া নাথ সখে দর্শয় সন্নিধিং ॥"

এই মহাভাবের অন্তর্ধানেই যোগী বলেন,—"সুখমহমস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্।"

অর্থাৎ আমি এইমাত্র জানি যে, আমার সমাধিস্বরূপ নিদ্রাবস্থায় কেবল সুখই পাইয়াছিলাম,—আর কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই। ভক্তের এক্ষণে এই মহাভাবেরই পূর্ব্বাবস্থা, নাম-জপ করিতে করিতে অন্তরেন্দ্রিয় সকল সবে মাত্র অবশ হইয়া আসিতেছে। ভক্তের ভয়, ইন্দ্রিয় অবশ হইলে, পাছে তাঁহাকে ডাকিতে না পারে,—পাছে তিনি না আসেন। এই ভয়েই কাতর হইয়া ভক্ত বলিতেছেন,—

"কেমনে পাইব সখি তারে ?"

যাঁহার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা, এত কাতরতা, তাঁহাকে না পাইলে কি আর ভক্তপ্রাণ বাঁচে ? ভক্ত সর্ব্বদাই ভাবিতেছেন,—তাঁহাকে কেমনে পাইব ? শতবার গুরুর নিকট পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন! নাম শুনিয়া অবধি যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া আছেন। ভক্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে, আমার এ কি হইল ? অথচ জানিতেছেন যে, আমাতে আর আমি নাই। তাই ভক্ত বলিতেছেন ঃ—

"নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
স্বরূপ হেরিলে কিবা হয় ?"

পাঠান্তরে আছে,—"অঙ্গের পরশে কিবা হয় ?"

দুইটীই ভক্তের প্রাণের কথা। সুতরাং আমরা এ দুইটীই বুঝিবার

বিশ্বেশ্বরের নামের অসীম প্রতাপ, ভক্ত এখন কিছু কিছু অনুভব করিতে পারিতেছেন। এখন বুঝিতে পারিতেছেন,—নামে এমন একটী হৃদয়োন্মাদিনী অবিজ্ঞাত মহাশক্তি নিহিত আছে, যাহা স্বয়ং অনুভব না করিলে বুঝা যায় না। পূর্ব্বে যে প্রেমোন্মত্ততাকে পাগলামি বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, এখন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া স্বয়ংই বুঝিতে পারিতেছেন। ভক্ত এখন বুঝিতেছেন, নামের প্রতাপে পর্ব্বত বিচলিত হয়, শুষ্ক মরুভূমিতে মন্দাকিনী বহিয়া থাকে। নামের প্রতাপে জলে পাষাণ ভাসে; নামের শাসনে উত্তাল সমুদ্র স্তম্ভিত হয়; পাষাণ ফাটিয়া জল নির্গত হয়;—যাহা কিছু অসম্ভব, নামের প্রতাপে সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ভক্ত বুঝিতেছেন, নামের মহিমায় সহস্র সহস্র পুষ্প ফুটিয়া উঠে, শত শত বিহঙ্গ কলনাদে গান করিয়া উঠে, পূর্ণিমার চন্দ্র সুস্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ করে। ভক্ত বুঝিয়াছেন,—প্রেমময়ের নামে প্রেমের চুরি হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে এমনি ভাবে লুণ্ঠন হইয়াছে যে, তাঁহার ধ্যান ধ্যেয় ধ্যাতার একেবারেই ঠিক নাই। নামে যাঁহার এতই প্রতাপ, না জানি, তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয়ে কেমন ভাব উপস্থিত হয়? জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যাঁহার দিক্‌দিগন্তব্যাপী অসীম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি, সেই অনন্তের মোহন মূর্ত্তিকে ভক্তিকুসুমের মালা পরাইয়া, হৃদয়ের মত করিয়া হৃদয়ে বসাইলে সুখের আবাসে অন্তর কিরূপ হইয়া যাইবে,—সেই ভাবী ভাবনাতেই ভক্ত বলিতেছেন, স্বরূপ হেরিলে কিবা হয়? আরো একটু অগ্রসর হইয়া ভক্ত ভাবিতেছেন,—"অঙ্গের পরশে কিবা হয়!" কথা দুইটীই একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার; শ্রাবণ, রাসন, চাক্ষুষ, ঘ্রাণ, ত্বাচ্‌ ও মানস। নাম মাত্র শুনিয়া শ্রবণ দ্বারা যে বিষয় জ্ঞান, তাহার নাম শ্রাবণ প্রত্যক্ষ; আপনিই নামোচ্চারণে রসাস্বাদন করিয়া রসনাদ্বারা যে মাধুর্য্যানুভূতি, তাহার নাম রাসন প্রত্যক্ষ; নয়ন দ্বারা রূপ দেখিয়া যে প্রত্যক্ষ, তাহার নাম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; গন্ধানুভূতি দ্বারা যে বিষয় জ্ঞান, তাহার নাম ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ; অঙ্গ সংস্পর্শে যে বিষয় নিরূপণ, তাহার নাম ত্বাচ্‌ প্রত্যক্ষ; আর নৈরায়িকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ, তাহাই মানস প্রত্যক্ষ। *

সেই অতীন্দ্রিয় পরমাণু মূল পরমাত্মা বিজ্ঞানচক্ষে ষড়বিধ প্রত্যক্ষের মধ্যে কোনটীর বিষয় নহেন। কিন্তু ভক্তের কাছে ইচ্ছাময় সর্বেন্দ্রিয়-গোচর। সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরম কারণ পরমাত্মাই, ভক্তের নিকট স্থূল মূর্ত্তিতে শ্যামসুন্দররূপে প্রকটিত। সেই বৃহৎ হইতেও বৃহৎ সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাৎ বিরাট্ পুরুষই,—নবনীতস্বরূপ সুকোমল ভক্তচিত্তহারী ননীচোরা।

ভক্ত তাঁহাকে দুই প্রকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র; অনন্তের নাম শ্রবণ করিয়া শ্রাবণ প্রত্যক্ষ; আর স্বজিহ্বায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চারণ করিয়া রাসন প্রত্যক্ষের মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছেন। না চাহিলেও এবার আপনা হইতেই ভক্তের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটিবেই। যেমন দুইয়ের সহিত তিন যোগ করিলে যোগফল পাঁচ হইবেই, ও যেমন অম্লজান ও যবক্ষরজানের মিশ্রণের ফল জল হইবেই; সেইরূপ নাম-শ্রবণ ও নাম-কীর্ত্তনের ফলে ভগবদ্দর্শন ঘটিবেই। "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোস্মি", ইহা ভগবদ্বাক্য; সেই যজ্ঞ যখন করা হইয়াছে, যজ্ঞেশ্বরের দর্শন কেন মিলিবে না! অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে মাত্র, তাই ভক্ত বলিতেছেন—"স্বরূপ হেরিলে কিবা হয়?" সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহাতে নিবিষ্ট করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহার মাধুর্য্যানুভব না করিলে ভক্তের তৃপ্তি হয় না। ভক্তের গূঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রাণে প্রাণে মিশিবে, তাই ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের সময় ভক্ত আবার বলিতেছেন—"অঙ্গের পরশে কিবা হয়।" ভক্ত আবার ভাবিতেছেন;—

যেখানে বসতি তার, নয়নে নিরখি গো,
কুলের ধরম কৈছে রয়?

মনোমোহনের রূপ দেখিয়া ভক্ত আর কুলের ধরম রাখিতে পারিতেছেন না—সত্য সত্য। অবাধ্য চিত্তের সহিত অহর্নিশি যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু হায়, কুলাচার লোকাচার সব ভাসিয়া গেল; ভক্ত সম্পূর্ণ অবশ।

প্রেম বলিতেছে, ভাঙ্গিয়া ফেল তোমার কুলাচার লোকাচারের বাঁধ। প্রেমের বন্যায় তোমার শুষ্ক হৃদয় ভাসিয়া যাউক। দূর কর তোমার হৃদয়ের-কৌটিল্যস্বরূপা কুটিলাকে। হৃদয়ে কৌটিল্য থাকিলে, হরি কৃপা করেন না। দূরে থাক জটিলা কুটিলার সংসর্গ হইতে। মুছিয়া ফেল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সঙ্কোচকে। হৃদয়ের লজ্জাবসন ফেলিয়া দিয়া, প্রেম-সলিলা যমনা পুলিনে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট একবার দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াও

হরি তোমার লজ্জা রক্ষা করিবেনই। পশুর মত জঘন্য পাশবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লজ্জা বোধ কর না? জড়ের মত বৃথা সময় নষ্ট করিতে লজ্জা বোধ কর না? আর তোমার কুলের ধরম কৌলিকাচার থাকিবে না বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে এত লজ্জা কেন? দুই হাত তুলিয়া ডাকিতে এত সঙ্কোচ কেন? অখিলেশ্বরের নিকট তৃণাদপি লঘু তুমি,—তোমার কিসের অভিমান? ধনমদ বিদ্যামদ ভাসাইয়া দিয়া, লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়া, বীর-ভক্ত হও দেখি; দেখিবে, নরের একমাত্র আশ্রয়-স্থান—নারায়ণের সহস্র বাহু,—তোমার লজ্জা রক্ষা করিবে। তখন ভক্তের ন্যায় আবেগভরে বলিবে,—যায় যাউক কুলের ধর্ম্ম; কিন্তু আমি:—

"পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়?"

ভক্ত-প্রাণ বলিয়া উঠিল, জানিনা প্রভো, তোমার নামে কি এক মোহিনী শক্তি আছে, আমি সংসারের মধ্যে সহস্র বাধাবিঘ্নে বেষ্টিত থাকিয়াও তোমার সুধামাখা নাম ভুলিতে পারিতেছি না। তোমার নাম করিলে সংসারের আর কোন কার্য্যই ভাল লাগে না। পুত্র প্রিয়জন তোমার কাছে তুচ্ছ বোধ হয়, তাই প্রাকৃত মানুষের মত কখন কখন ভাবি, তোমার নাম ভুলিয়া যাই। কিন্তু কৈ? তোমার মধুময় নাম ভুলিতে তো পারি না। বলিয়া দাও প্রভো, ইহার উপায় কি?

এইটুকু ভক্ত সখার নিকট ভক্তের অভিমান-বাক্য বা আত্ম-নিবেদন। হে ভক্তপ্রাণ! তোমা ছাড়া আর কাহার নিকট ভক্ত অভিমান প্রকাশ করিবে? প্রাণের কবাট খুলিয়া আপনার প্রাণের কথা কাহাকে জানাইবে, ভক্তকে তুমি সংসার-সঙ্কটে ফেলিয়া প্রায়ই পরীক্ষা কর; তাই ভক্তের অভিমান! ভক্ত পরীক্ষা দিতে চাহেন না। ভক্ত চাহেন—কেবল তোমার নাম গান করিতে। তুমি মধ্যে মধ্যে বিষম পরীক্ষায় ফেলিয়া, তাহার নামামৃত পানের বাধা জন্মাইয়া দাও, তাই ভক্তের অভিমান।

অবশেষে ভক্ত কবির অনন্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস সঙ্গীতের সারাংশ এক কথায় কেমন প্রস্ফুটিত রহিয়াছে দেখুন। প্রেমময়ের অপার প্রেমসাগরে ডুবিয়া ডুবিয়া:—

যথার্থ কথাই, ভক্ত তখন লজ্জা সরম কুলাচার বিসর্জ্জন দিয়া, আপনিই কুলের বন্ধন, সংসার-বন্ধন কাটিয়া ফেলেন। যতক্ষণ চিত্তে সংশয় থাকে, ভক্তের ততক্ষণ বড়ই ক্লেশ। ভক্ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না,—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। কুলধর্ম্মে থাকিলে পাছে কেহ ভক্তিপথের বিঘ্ন হয়, তাই ভক্ত গোপনে গোপনে—

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ গৃহীত মানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো যবলোলকুন্তলাঃ ॥

পাছে কেহ দেখিতে পায়, পাছে পতি-পুত্র ভক্তিপথের বাধা জন্মায়, তাই গোপনে গোপিকার কৃষ্ণদর্শনে যাইবার উদ্যম। কিন্তু যখন সংশয় তিরোহিত হইল, প্রেমময়ের কাছে আর সব তুচ্ছ বোধ হইল, সহস্র বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও যখন ভক্তের ঐকান্তিকতা বিচ্ছিন্ন হইল না, যখন ভক্ত ভাবিলেন, কুল-শীল যায় যাউক, আমার শ্যামসুন্দরকে রাখিতেই হইবে; তখন ভক্ত :—

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥"

তখন পতি-পুত্র ভাই বন্ধু ভক্তিপথে কণ্টকস্বরূপ হইলেও, ভক্ত-হৃদয়ের খরস্রোত কিছুতেই ফিরাইতে পারে না। ভক্তবীরের অদম্য উৎসাহকে কিছুতেই কমাইতে পারে না। ভক্ত-সিংহকে কিছুতেই তাহার লক্ষ্যস্থলচ্যুত করিতে পারে না। ভক্ত তখন আপনার প্রাণ-মন-যৌবন সর্ব্বস্বই প্রাণেশ্বরের কাছে স্ব ইচ্ছায় সমর্পণ করিয়াছেন। ভক্ত আপনার সর্ব্বপ্রকার গুণ দোষের সহিত কৃষ্ণপদে যাচিয়া বিক্রীত হইয়াছেন। ভক্ত বলিতেছেন,—হে মাধুর্য্যময়! পরম পুরুষ হরি! হে আরাধ্য-ধন! আমার এই নবীন যৌবনোচিত যাবতীয় সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি তোমারই পদে সমর্পণ করিলাম। আমার আশা তুমি, আমার সুখ তুমি, আমার আনন্দ তুমি,—তোমাকেই আমি একমাত্র ভালবাসার বস্তু বলিয়া জানি। হে জগন্নিবাস বাসুদেব! তুমি ছাড়া আমার আশ্রয়স্থান কোথায়? হে সত্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।

শ্রীদেবব্রত কবিরত্ন।

গণক পক্ষী।

এক রাজার প্রসাদ সমীপে একটি প্রাচীন বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষশাখে একটি শুকপক্ষী। বৃক্ষের একধারে আটাকাটি পাতিয়া একজন ব্যাধ লুক্কায়িত, অপরধারে ফাঁসদড়ি লইয়া কতিপয় বালক দণ্ডায়মান। বালকেরা ভাবিল, আটাকাটিটা শক্ত ফাঁদ, ব্যাধের ভাগ্যেই জয়লাভ দেখিতেছি; ব্যাধ থাকিতে এ পক্ষী আমরা ধরিতে পারিব না, তবে আর কাজ কি, উড়াইয়া দিই, ব্যাধও পাইবে না, আমরাও পাইব না, উৎপাত চুকিয়া যাউক।

এই স্থির করিয়া, বালকেরা ঘন ঘন করতালি দিয়া চিৎকার করিল, ভয় পাইয়া শুকপক্ষী উড়িয়া গেল, উড়িয়া আর যাইবে কোথা? ব্যাধের আটাকাটিতেই জড়াইয়া পড়িল।

ব্যাধের পরমানন্দ। পক্ষী লইয়া ব্যাধ প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বালকেরা আসিয়া বলিল, এ পাখি আমাদের, আমরা তাড়া দিয়া না উড়াইলে তুমি ধরিতে পারিতে না, অতএব এ পাখি আমাদের। ব্যাধ বলিল, আমার আটাকাটিতে পড়িয়াছে, এ পাখি আমার।

রাজকার্য্য সমাধা করিয়া রাজা তখন বিরামকক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন, কথাগুলি তাঁহার কর্ণে গেল। পদাতিকের দ্বারা উভয়পক্ষকে নিকটে ডাকাইলেন, পক্ষী লইয়া ব্যাধ রাজসমীপে আসিয়া দাঁড়াইল, ফাঁসদড়ি হস্তে বালকেরাও রাজসমীপে আসিল।

পক্ষীটি কোন্ পক্ষের হইবে, বিচার করিয়া রাজা বলিলেন, ন্যায় পক্ষে এ পক্ষী এই বালকদিগেরই প্রাপ্য, বালকেরা উড়াইয়া না দিলে পক্ষী কদাচ ব্যাধের আয়ত্ত হইত না।

পক্ষী এই সময় কথা কহিল, ঠিক, যেন মনুষ্যকণ্ঠশব্দ। পক্ষী বলিল, মহারাজ! আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, ত্রিকালের ফলাফল বর্ণনা করিতে পারি, দুইদিকে বিপদ, উপায় কি হইবে, ঠিক্ জানিয়াছিলাম, সেইজন্য উড়ি নাই, এখন ধরা পড়িয়াছি, মহারাজের অধিকারেই থাকি, ইহাই আমার বাসনা।

পক্ষীর কথা শুনিয়া, রাজার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল, শীকারিগণকে তিনি বলিলেন, বালক চারিজন, ব্যাধ একজন, পাঁচজনে পক্ষী লইয়া

বিরোধ করিয়া কি ফল, জীবন্ত পক্ষী পাঁচভাগ করিয়া লইতে পারিবে না, আমি তোমাদের পাঁচ জনকে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি, পক্ষীটি আমার কাছে বিক্রয় কর।

স্বর্ণ মুদ্রার লোভে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া পাঁচ জনেই রাজাজ্ঞা পালন করিল, শুকের বিনিময়ে পঞ্চ স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। রাজা আপনার সভাগৃহে সেই শুকপক্ষীকে পরমযত্নে ঝুলাইয়া রাখিলেন, উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ হইল, সেবার জন্য একজন চাকর নিযুক্ত হইল, আধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়াও, পক্ষী সেখানে এক প্রকার সুখে রহিল, রাজার সঙ্গে কথা হয়, রাজা প্রশ্ন দেন, পক্ষী উত্তর দেয়, পক্ষী নূতন নূতন কথা বলে, রাজা তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিবার চেষ্টা পান।

পাঁচ সাত দিন যায়, সভার পূর্ণমজলিসে পক্ষী একদিন আপনা আপনি বলিল, দাওয়ানজী দুই টাকা, বাজার সরকার এক টাকা। রাজা সে কথার তাৎপর্য্য বুঝিলেন না, কথা দুটি চাপা পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় দিবসে ঠিক সেইরূপ অবসরে পক্ষী বলিল, দেওয়ানজী আজ পাঁচ টাকা, বাজার সরকার দুই টাকা। সে দিনও সে কথা লইয়া কোন প্রকার তর্ক বিতর্ক হইল না।

তৃতীয় দিবসে আবার ঐরূপ। সে দিন আবার শুকপক্ষী বলিল, উঃ! ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি! দেওয়ানজী আজ পঁচিশ টাকা, বাজার সরকার দশ টাকা।

নিত্য নিত্য শুক পক্ষী মাত্রা বাড়াইয়া বাড়াইয়া ঐ রকম কথা কয়, রাজা কিছুই বুঝিতে পারেন না। কেহই কি বুঝিতে পারে না? এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় রাজার দেওয়ানজী মহাশয় প্রদান করিতে পারেন। প্রথম দিন হইতেই তিনি বুঝিয়া আসিতেছেন। বিরলে বাজার সরকারের সঙ্গে সভায় পরামর্শ হয়, পক্ষীটা বলে কি? যাহা আমরা করি, ঠিক্ ঠিক্ বলে! রাজা বুঝিতে পারেন না, ইহাই মঙ্গল। কিন্তু আর বাড়াবাড়ি হইতে দেওয়া উচিত হয় না। পাখিটাকে মারিয়া ফেলা যা'ক। কল্যই মারিব, নিশ্চয় মারিব, নিশ্চয় মারিব।

কল্য আসিল রাজসভা বসিল, স্বর্ণপিঞ্জরে শুকপক্ষী সভামধ্যে ঝুলিল। এককালে ভাবান্তর। একটিও মিষ্ট কথা না বলিয়া, শুকপক্ষী সে দিন যেন

আতঙ্কে পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক সচঞ্চল কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! মহারাজ! প্রাণ গেল—প্রাণ গেল! মরিলাম, মরিলাম, মরিলাম! মারিল! মারিল! নিস্তার—নিস্তার!"

সবিস্ময়ে রাজা তৎক্ষণাৎ চমকিয়া উঠিলেন; কেন শুকপক্ষী অমন করে, কেন অমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের মরণের কথা বলে, আমি জানিব; পিঞ্জরটি শীঘ্র আমার কাছে আনয়ন কর! রাজমুখে এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া একজন উচ্চপদস্থ প্রহরী চঞ্চল শুকের সুবর্ণ পিঞ্জর রাজপদতলে আনিয়া স্থাপন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন শুক! আজ তুমি এমন কাতর হইতেছ কেন? মরণের কথাই বা কেন বলিতেছ? মানুষের মত তোমাদেরও কি স্বপ্ন আছে?"

শুক উত্তর করিল, "না মহারাজ, আমাদের স্বপ্ন হয় না। সত্য কথাই বলিতেছি। প্রথমেই মহারাজকে বলিয়া রাখিয়াছি, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, তিন কালের তত্ত্ব বলিতে পারি। ঈশ্বরের কৃপায় সেই বিদ্যার প্রভাবে জানিতে পারিয়াছি, মহারাজের দাওয়ানজী কল্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আজ আমাকে মারিবেন।"

রোমাঞ্চিত কলেবরে গম্ভীরবদনে চঞ্চলস্বরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? কি অপরাধে দেওয়ানজী তোমার উপর এতদূর রুষ্ট!"

শুক বলিল, "অপরাধ আছে মহারাজ। দেওয়ান মহাশয় যে দিন মহারাজের তহবিলের যত টাকা চুরি করেন, বাজার সরকারকে যতটুকু ভাগ দেন, সব আমি জানিতে পারি; জানিয়াই ক্রমাগত সভামধ্যে এক একটা হিসাব দিতেছি। মহারাজ বুঝিতে পারেন না, কিন্তু দেওয়ানজী মহাশয় বেশ পরিষ্কার বুঝিয়া আসিতেছেন। বুঝিয়াই শীঘ্র আমার প্রাণসংহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দেওয়ানজীকে নিকটে আহ্বান করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ত্রিকালজ্ঞ শুকপক্ষী যাহা বলিতেছে, তাহার উত্তরে আপনি কি প্রকার সাফাই দিতে ইচ্ছা করেন?" কিছুই যেন জানা নাই, এইরূপ সন্দিগ্ধ শান্তবদনে দেওয়ানজী বলিলেন, "মহারাজের সম্মুখে হাস্য করা যদি বিধিনিষিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে সুন্দর পুতুলপ্রাপ্ত বালকের মত আমি মনের সাধে হাস্য করিতাম। পাখির কথায় কি বিশ্বাস করিতে

আছে? ভাবুন দেখি মহারাজ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, তিন কাল যাহার জানা আছে, সে কি কখন মনুষ্য ব্যাধের আটাকাটীতে ধরা পড়ে? খেয়াল মহারাজ! পক্ষীর খেয়াল! কথার মধ্যে ইহা ধর্ত্তব্য নয়। পক্ষী বলিতেছে, উহাদের স্বপ্ন নাই; আমি দেখিতেছি, আমাদের অপেক্ষাও পাখিদের বেশী বেশী স্বপ্ন—বড় বড় স্বপ্ন! কথাগুলাও কেবল স্বপ্নের খেয়াল।

মস্তক সঞ্চালন করিয়া রাজা কহিলেন, "সমস্তই খেয়াল হইতে পারে না। ভবিষ্যৎ গণনায় শুকের নৈপুণ্য আছে, পরীক্ষা করিয়া তিন-বার আমি সুন্দর ফল পাইয়াছি।"

এই কথার উপর শুকপক্ষী কোন কথা কহিল না! দেওয়ানজী দম্ভ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এই পক্ষী যদি তিনকাল গণিতে জানে, তবে বলুক, ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে কি আছে?"

পক্ষীও বিলক্ষণ তৎপর। প্রশ্নমাত্রেই উত্তর করিল, "তোমার ভাগ্যে বিস্তর কষ্ট আছে; সে সব একটু দূরের কথা, সম্প্রতি এই সপ্তাহের মধ্যে আগামী শুক্রবার বেলা ১ প্রহর থাকিতে তোমার একটি ছেলে বাড়ী চাপা পড়িয়া মরিবে।"

কথাটা শ্রবণ করিয়া সভার সকলেই ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সোমবারের কথা, শুক্রবারে বিপদ, দেওয়ানজী সুতরাং সেই দিন হইতেই বাড়ীর অদূরস্থ এক ময়দানে তাঁবু ফেলিবার আয়োজনে ব্যস্ত রহিলেন। বাড়ী ছাড়িয়া শুক্রবারটা সেই তাঁবুতেই সপরিবারে বাস করিবেন। কার্য্যেও তাহাই হইল। বরং এক দিবস অগ্রে বৃহস্পতিবারে সেই তাঁবুতেই নিশা যাপন করিলেন।

কি একটা বিশেষ দরকারী জিনিষ বাড়ীতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, দেওয়ানজীর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় সেই জিনিষ আনিতে বাড়ী যান। যে ঘরে জিনিষ, সেই ঘরের দ্বারের চাবি খুলিয়া যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তখন দ্বারের চৌকাটখানা অল্প অল্প কাঁপিয়াছিল, তিনি ততটা ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। জিনিষটি সংগ্রহ করিয়া যখন বাহিরে আসেন, তখন প্রবেশ দ্বারের খিলানের দিকে নজর পড়িল। খিলানের মাথাটা অনেক দিন হইতে ফাটা ছিল, আর্‌সুলা, মাকড়সা, বিছা, চাম্‌চিকা ইত্যাদি জন্তু সেই ফাটালে বাসা করিয়া থাকিত, দেওয়ান-পুত্র সে দিন দেখিলেন, ফাটালটা যেন অনেক বড়, ভিত ভেদ করিয়া

দুই মুখে আলো দেখা যাইতেছে, সামান্য ভূমিকম্পে জীর্ণ গৃহভিত্তি যেমন অল্প অল্প কম্পিত হয়, সমস্ত খিলানটা সেইরূপ অল্প অল্প কাঁপিতেছে, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত; দেওয়ান-পুত্র আর বেশীক্ষণ বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না, দুর্ভাগ্য তাঁহাকে যেন তাড়া দিয়া দ্বারের নিকটে আনিল। চৌকাট হইতে নামিবার অগ্রেই দুইধারের অর্দ্ধেকটা দেওয়াল শুদ্ধ সমস্ত খিলান হুড়মুড় শব্দে পতিত হইল। চতুর্দ্দশবর্ষীয় দেওয়ান শিশুর কোমল অঙ্গ তৎক্ষণাৎ ইষ্টকস্তূপে চূর্ণ হইয়া গেল, বেলা তখন ঠিক্ এক প্রহর বাকি!

শুকপক্ষীর গণনা সত্য হইল, দেওয়ানজীর তাঁবু গাড়া বৃথা হইল, নিয়তির যাহা ফল, তাহাই ফলিল; শেষ কার্য্য চুকিতে যত দিন বিলম্ব হওয়া সম্ভব, বিচার কার্য্যটা ততদিন বন্ধ থাকিল। দুই মাস পরে বিচার। ফরিয়াদি শুকপক্ষী, প্রধান আসামী দাওয়ানজী, সহচর আসামী বাজার সরকার। সভামধ্যে দেওয়ানজীকে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন, "কেমন, এখন এই শুকপক্ষীর ভূত ভবিষ্যৎ গণনায় বিশ্বাস হয়?"

দেওয়ানজী নিস্তব্ধ!

"রাজা এই স্থলে মৌনং সম্মতি লক্ষণং" স্থির করিয়া দেওয়ানকে কহিলেন, "আক্ষেপের বিষয় হইলেও তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিধনে শুক পক্ষীর ভবিষ্যৎ গণনা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইয়াছে। এটা যদি সত্য হইল, তবে তোমাদের নামে হিসাবের যে অভিযোগ, সেটা সত্য হইবে না কি জন্য? তোমরা চুরী কর, তাহা আমি জানি, কিন্তু এমন উঞ্ছবৃত্তি কর, বাজারের অঙ্ক বাড়াইয়া দুইজনে চুরি কর, এটা জানিতাম না। শুক পক্ষীকে প্রাণে মারিতে তোমরা পরামর্শ করিয়াছিলে, আমার চক্ষে সে অপরাধও তোমাদের পক্ষে বড় সামান্য দৃষ্ট হয় না। রাজসংসারে পদস্থ থাকা তোমাদের আর উচিত হয় না। দুটি চোর সমান, একটি চোর তুমি, অপরটি তোমার সহচর বাজার সরকার। উভয়েই তোমরা বিদায় প্রাপ্ত হও। অপরাধের অন্য দণ্ড হইতে তোমাদের উভয়কেই অব্যাহতি দেওয়া গেল।"

দেওয়ানজী কর্ম্মচ্যুত হইলেন, বাজার সরকারের কর্ম্ম গেল, শুক পক্ষীর আদর বাড়িল। এই প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে অনেক প্রকার নীতি

অবহেলা না করেন, এই আমাদের নিবেদন। পক্ষীরা কথা কহিতে পারে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। তাহাদের মধ্যে যাহারা জাতিস্মর, তাহারা পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কথা স্মরণ রাখিতে পারে। বাণভট্টের কাদম্বরী পুস্তকে জাতিস্মর শুকপক্ষীর ইতিহাস আছে, তাহা যেমন দীর্ঘ, এ গল্প সেরূপ সুদীর্ঘ নহে, কিন্তু সেই শুকে আর এই শুকে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে শতকরা যেমন একটি প্রতিভাও জন্মে, পক্ষীজাতির মধ্যে তেমনি অবশ্যই শতকরা একটি না একটি বচনশক্তিসম্পন্ন জাতিস্মর শুক পক্ষী আবির্ভূত হইতে পারে। পক্ষীর মুখে উপদেশ অতি মিষ্ট।

পক্ষীকে যদি আর একবার কথা কহাইতে পারি, বিশেষরূপে চেষ্টা করিব। এ অংশ যদি পাঠক পাঠিকাগণের মনোগত হয়, তাহা হইলে শুকমুখে তত্ত্ব লইয়া অবিলম্বেই বিশেষ ফলাফল তাঁহাদিগকে জানাইতে যত্ন করিব, আজ এই পর্য্যন্ত বিদায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ইতিহাসের একটী কথা।

কহিনূর সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল বহুমূল্যবান হীরক বিশেষ। এই হীরক সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এই হীরক যে, বহু শতাব্দীর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কহিনূর হীরকের সহিত বহু শতাব্দী হইতে রাজাদিগের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভাগ্যবিপর্য্যয়ের চিত্র বিজড়িত। সুতরাং ইহার বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না। কিন্তু ইহার প্রথমাবস্থার বিবরণ বড়ই তমসাচ্ছন্ন। অনুমানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন ইহার প্রথমাবস্থার বিবরণ জানিবার কোনই উপায় নাই। অনুমান সব সময় ঠিক হয় না, অনেক সময় কিছুই ঠিক হয় না। তবে যে একেবারে হয় না তাহাও বলা যায় না। যাহা হউক, যখন অনুমানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন অন্য গতি নাই, তখন আমাদিগকেও এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন পথের অনুসরণ করিতে হইবে। যতদূর অনুমানে বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এই হীরক প্রথমে হিন্দুরাজাদিগের নিকট ছিল। কত কাল

পরাক্রান্ত যবনগণ কর্ত্তৃক দুর্ব্বল হিন্দুরাজগণ পরাজিত হওয়াতে হিন্দুরাজাদিগের অন্যান্য বহুমূল্যবান দ্রব্যসমূহ যেমন বিজয়ী যবনদিগের করতলগত হয়, সেই সঙ্গে এই সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল বহুমূল্যবান হীরকও তাহাদিগের করতলগত হয়। কারণ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমানদিগের কোন গ্রন্থে কহিনূর নামীয় কোন হীরকের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভারত-আক্রমণকারী বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া হিন্দুরাজাদিগকে এবং পাঠানদিগকে পরাজিত করেন এবং অনেক বহুমূল্যবান দ্রব্যসমূহ প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে একখানি অত্যুজ্জ্বল সুবৃহৎ বহুমূল্যবান হীরকও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই হীরকের বিষয় তাঁহার লিখিত "রোজনামা" বা ডাইরিতে (Diary) লিখিয়া রাখেন। এই সময় হইতেই সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল বহুমূল্যবান হীরকের কথা সর্ব্বপ্রথম মুসলমান গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই আমরা এই অনুমান করিতে পারি যে, এই হীরক সর্ব্বপ্রথম হিন্দুরাজাদিগের নিকট ছিল, কিন্তু ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগলেরা হিন্দুরাজাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে এই হীরক প্রাপ্ত হইয়া ইহার ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের পারস্যভাষানুযায়ী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন; এবং তদবধি সেই নামেই চলিয়া আসিতেছে। পারস্য ভাষায় "কোয়া" শব্দে পর্ব্বত "নূর" শব্দে আলোক বুঝায়। কোয়ানূরের অর্থ "আলোকের পর্ব্বত"। কোয়ানূর হইতে ক্রমে ক্রমে "কোয়িনূর" "কোহিনূর" এবং অবশেষে "কহিনূর" হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। কোন্ স্থানে, কি অবস্থায়, কি প্রকারে এবং কাহা কর্ত্তৃক এই সুপ্রসিদ্ধ সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল হীরক সর্ব্ব প্রথম পাওয়া গিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রচলিত নানাবিধ গল্প ব্যতিরেকে জানিবার কোনই উপায় নাই। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ এস্থলে দুইটী গল্পের উল্লেখ করিলাম। গল্প অধিকাংশ সময়েই সত্য হয় না। শত সহস্র গল্পের মধ্যে দুই একটী গল্প আংশীক সত্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু সেই সকল গল্পের সত্যের ভাগ নদীতীরস্থিত বালুকাস্তুপরাশির মধ্যস্থিত স্বর্ণরেণু-কণাপেক্ষাও সামান্য। সুতরাং অধিক গল্পের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নিম্নলিখিত গল্প দুইটীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার পাঠকদিগের উপর অর্পিত হইল। তাঁহাদিগের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় করিবেন, না করেন তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই।

এইরূপ কিম্বদন্তি, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একজন অতিশয় নিঃস্ব ব্রাহ্মণ উজ্জয়িনীতে বসতি করিতেন। একমাত্র ব্রাহ্মণী ভিন্ন সুখ, দুঃখ, আশা নৈরাশ, সম্পদ বিপদ, হর্ষ বিষাদরূপ তরঙ্গাবলী সমন্বিত সংসার-সমুদ্রের তাঁহার আর দ্বিতীয় সহচর বা সহচরী ছিল না। নিরতিশয় দরিদ্রতানিবন্ধন দৈনন্দিন সংসারযাত্রানির্ব্বাহ হওয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে সাতিশয় কষ্টকর ছিল। বহু আয়াসে সুখ দুঃখময় উত্তাল তরঙ্গাবলী সমন্বিত সংসার-সমুদ্রে পাপ তাপ দুঃখদুর্দ্দশা দূরকারী বিপদভঞ্জন, অগতির গতি, অনাথের সহায়, দীনবন্ধু. নর-নারায়ণকে কাণ্ডারি করিয়া জীবন-তরী ভাসাইয়া দুইটী প্রাণী ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণার্থ, এক, দুই, তিন, চারি করিয়া, দিন গণনা করিতে করিতে জীবনের সুদীর্ঘ বৎসরগুলি অতিবাহিত করিতেন। দরিদ্র হইলেও ব্রাহ্মণ ধার্ম্মিক ছিলেন। বহু আয়াস স্বীকারের পর ব্রাহ্মণ পিশাচসিদ্ধ হন। পিশাচসিদ্ধ হইবার পর পিশাচ ব্রাহ্মণকে একটি বর লইতে বলে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আগামী কল্য ব্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ করিয়া ইপ্সিত বর প্রার্থনা করিব। পিশাচ তাহাতে সম্মত হইল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিবস যথাসময়ে পিশাচ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমরা যাবৎ জীবন কেবল দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে জীবনের এতগুলি দিন অহিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে আর দারিদ্রতা সহ্য হয় না। অতএব এরূপ একটি বর প্রদান কর, যাহাতে আমাদিগের দারিদ্রতা ঘুচিয়া যায়। পিশাচ তথাস্তু বলিয়া ব্রাহ্মণকে একটি রত্ন প্রদান .করিল। ব্রাহ্মণ পিশাচ-প্রদত্ত রত্ন গ্রহণানন্তর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তদনন্তর পরদিবস ব্রাহ্মণ রাজা বিক্রমাদিত্যের সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, গত কল্য পিশাচসিদ্ধ হইয়া পিশাচ কর্ত্তৃক এই রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। রত্নাদি ভবদীয় রাজগণেরই উপযুক্ত। দরিদ্রদিগের অর্থের প্রয়োজন, রত্নের প্রয়োজন নাই! সুতরাং এই রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক কৃপা করিয়া উপযুক্ত মূল্য প্রদান করুন।" রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণ প্রমুখাৎ আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা শ্রবণ করিয়া রত্নের মূল্য নিরূপণার্থ নগরস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণিকারকে আহ্বান করিয়া রত্নের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ করিলেন। মণিকার রত্ন দেখিয়া বলিল "মহারাজ! এরূপ রত্ন এ যাবৎ কাল পর্য্যন্তআমার নয়নগোচর হয়

নাই।" তৎশ্রবণে বিক্রমাদিত্য কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, এই ব্রাহ্মণকে কোষস্থিত যাবতীয় ধন প্রদান কর। ব্রাহ্মণ রাজপ্রদত্ত সেই অগাধ ধনের অধিকারী হইয়া পরমানন্দে জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিলেন, এবং তদবধি হইতে সেই রত্ন উজ্জয়িণীর রাজাদিগের নিকট ছিল। পরে বাবর এই রত্ন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার "রোজনামা" বা ডাইরিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

আবার এইরূপ কিম্বদন্তি আছে যে, পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই হীরক গোদাবরী-নদীতীরস্থিত বালুকাস্তূপ রাশি মধ্যে সর্ব্ব প্রথম পাওয়া গিয়াছিল। মহাভারত বর্ণিত অঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর দাতৃশ্রেষ্ঠ নরপতি কর্ণ ইহার অধিকারী ছিলেন। তৎপরে উজ্জয়িণীর ভুবন-বিখ্যাত মহীপাল বিক্রমাদিত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কিম্বদন্তি বা গল্পের উপর নির্ভর করা ভিন্ন ইহার প্রথমাবস্থার বিবরণ সম্বন্ধে এমন কোন ঐতিহাসিক সন্তোষজনক প্রমাণ বর্ত্তমান নাই যদ্দারা আমরা ইহার সত্য নির্দ্ধারণে সুনিশ্চিত হইতে পারি। পাঠান সম্রাজ্য-ধ্বংসকারী এবং ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনকারী মোগল সম্রাট্ ওমর-সেখ মির্জ্জাপুত্র বাবরের সময় হইতে এই হীরক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ অতি সামান্য রূপ জানিতে পারা যায়। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদী এবং ফরগণাধিপতি বাবরের সহিত পাণিপথে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে গোয়ালিওরের হীনবীর্য্য হিন্দুরাজা বিক্রমার জিৎ ইব্রাহিম লোদীর পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত হন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে পাণিপথের যুদ্ধের দ্বাদশ দিবসের পর বিজয়ী বাবর তাঁহার "রোজনামা" বা ডাইরিতে নিম্নলিখিত মত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; যাহা হইতে কহিনুর হীরক সম্বন্ধে অনুমান অনেকটা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাবর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বিক্রমার জিতের পরিবার এবং দলস্থ অনেক লোক আগ্রায় ছিল, কিন্তু সেখানে হুমায়ুণ উপস্থিত হইলে পর বিক্রমার জিতের লোকেরা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু হুমায়ুণ নিযুক্ত লোকদিগের কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া করাগারে বন্দীভাবে নিক্ষিপ্ত হয়।

হইতে নিবৃত্ত করায়, বিক্রমার জিতের দলের নেতা সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় হুমায়ুণকে নানাবিধ বহু মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকন দিয়াছিল। ঐ উপঢৌকন নানাবিধ আভরণাদি এবং নানা প্রকার বহু মূল্যবান হীরা, মুক্তা, পান্না প্রভৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ঐ সকল রত্নাদির ভিতর সুলতান আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক লব্ধ একটি হীরকও ছিল। ঐ হীরকখানি এরূপ বহু মূল্যবান ছিল যে, একজন প্রসিদ্ধ তৎকালিন মণিকার উহার মূল্য নিরূপণ করিয়াছিল সমগ্র পৃথিবীর দৈনিক ব্যয়ের অর্দ্ধেক। ঐ হীরক পরিমাণে ৮ মিস্থালস (Miskhals) ছিল।

ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, টাভার নিয়ার (Tavernier) সাহেব বর্ণিত "গ্রেট মোগল" নামক হীরকই আধুনিক সভ্য জগতে বহুমূল্যবান, মহাদ্যুতিশালী, হীরক মধ্যে অদ্বিতীয় কহি-নুর রূপে আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া স্মৃতিপথে এক অননুমেয়, অভিনব, ঘটনাযুক্ত কত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কহিনুর এবং গ্রেট মোগল পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার হীরক। যাহা হউক, এ বিষয়ের সঠিক সিদ্ধান্ত বড়ই জটিল। আমাদিগের শেষোক্ত মতই সমধিক সমীচিন বলিয়া বোধ হয়।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৩২ বৎসর পর্য্যন্ত আমরা এই হীরক সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ জানিতে পারি নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় যে, ইহা শাহজাহানের নিকট ছিল, তবে তিনি কোথায় বা কোন সময়ে কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। আলোচনার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ভূতপূর্ব্ব ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীর বিলাস-প্রিয় সম্রাটগণের রত্নাদি এবং অন্যান্য সৌখিন পদার্থ সমূহ যেরূপ প্রিয় ছিল, তাহাতে যে তাঁহারা এই অমূল্য পদার্থ অপরকে সহজে প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের পর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর মোগল সম্রাটগণ কোন পরাক্রান্ত শত্রুর নিকট এরূপ ভাবে পরাজিত হন নাই, যাহাতে তাঁহাদিগের ভারত সাম্রাজ্যের রত্ন-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সেই বিজয়ী শত্রুর অধীনতা

করিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু তাঁহারা উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ পূর্ব্বক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমগ্র ভারতভূমি প্রকম্পিত করিয়া, সদর্পে রাজাধিরাজ সম্রাটস্বরূপ স্বীয় রাজত্ব শাসন করিয়াছিলেন। সুতরাং সে অলীক আশঙ্কারও কোন বিশেষ কারণ নাই। অতএব বিশেষ কোনরূপ ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া না যাওয়া সত্বেও, সামান্য সাধারণ জ্ঞানের দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে, এই হীরক দিল্লীর সম্রাটগণেরই নিকট ছিল।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে মোগল-কলঙ্ক, হিন্দুদ্বেষী, কূটবুদ্ধি, নিষ্ঠুর, হীনচরিত্র আরঙ্গজেব রাজ্যলোভ মুগ্ধ হইয়া সহোদরত্রয়ের উষ্ণশোণিতে স্বীয় সুনাম প্রক্ষালন করিয়া এবং বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, শোকার্ত্ত, মনকষ্টে ক্লিষ্ট, পূজ্য পিতা সম্রাট শাহজাহানকে রাজ্যচ্যুত এবং কারারুদ্ধ করিয়া, "আলমগীর" অর্থাৎ জগজ্জয়ী উপাধি গ্রহণ করিয়া, ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করেন। কালের সর্ব্বগ্রাসী, অপরিবর্ত্তনীয়, চির তমিস্রাময় গভীরতম অন্তস্তলে কতদিন, কত রাত্রি, কত মাস, কত বৎসর, কত শতাব্দী, শতাব্দীর উপর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে ;—শোকোচ্ছ্বাস, হাহাকার, দীর্ঘনিশ্বাস, দুঃখ দুর্দ্দশার দারুণ নৈরাশ্য সকলি মহাকালের মহাকবলে পতিত হইয়াছে। তৎকালীন দুঃখ কষ্ট, তদনুষ্ঠিত দারুণ পৈশাচিক ব্যাপার, হৃদয়-বিদারক ঘটনানিচয়, হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন এখন বর্ত্তমান নাই সত্য, কিন্তু সেই সকল দুঃখকষ্ট, সেই সকল অমানুষিক রোমাঞ্চকর ব্যাপারের স্মৃতি ইতিহাসের পত্রে পত্রে জলন্তোজ্জ্বল রক্তিম অমরাক্ষরে রঞ্জিত থাকিয়া, বংশপরম্পরায় মানবগণকে যুগপৎ ভয়ে এবং বিস্ময়ে কখনও রোমাঞ্চিত, কখনও বা স্তম্ভিত করিয়া ফেলিতেছে। সে আরঙ্গজেব নাই, সে অত্যাচারও আর নাই। রাজ্যভোগে যদি কিছু সুখ বা শান্তি থাকে, তাহাও জীবনদীপের সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের তরে নিবিয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়! যে দুর্নাম তিনি জীবদ্দশায় ক্রয় করিয়া গিয়াছেন, বুঝি তাহা যতদিন জ্যোতিষ্মান্ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহখচিত এই সসাগরাম্বরা ভূমণ্ডল বর্ত্তমান থাকিবে, আর তদুপরি যতদিন সভ্যজাতি সমুদয় বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাঁহার এ কলঙ্ক দুরপনেয়। যখন শাহজাহান স্বীয় পুত্রের নিকট হইতে এবংবিধ অভাবনীয়, অস্বাভাবিকাচারণ পাইতেছিলেন, তখন অসীম স্নেহপরায়ণা অতুল সৌন্দর্য্যময়ী কোমলহৃদয়া সম্রাটদুহিতা জাহানারা

চারিণীরূপে অবশিষ্টকাল কাটাইতেন, তাহা হইলে তিনি দিগ্বিজয়ী মহাবীর হইতেন কি না সন্দেহ। কৌরবেরা সূচ্যগ্র ভূমিদানে অস্বীকৃত হইবার পরিণাম যদি জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে কখনই পাণ্ডবদিগের সহিত মহাযুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেন না। যুদ্ধবিশারদ দ্রোণাচার্য্য যদি স্বীয় শোচনীয় পরিণাম জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে কখনই পাণ্ডবদিগকে অস্ত্র-শিক্ষা দিতেন না। এণ্টনি যদি ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে ক্লিওপেট্রার নিকট সুবিস্তৃত রোম সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব বিসর্জ্জন দিতেন না। শাহজাহানও যদি বুঝিতে পারিতেন, তাহাকে নিয়তির কুলিশ-কঠিন-কর-পেষণে বৃদ্ধাবস্থায় লোভনীয় সম্রাটগিরির সুখের, শান্তির, স্বস্তির পরিবর্ত্তে লাঞ্ছিত, অপমানিতাবস্থায় জীবনের অবসান করিতে হইবে, তাহা হইলে ময়ূর-সিংহাসনে কখনই উপবেশন করিতেন না। [ক্রমশঃ]

শ্রীঅজিতপ্রসাদ সান্ন্যাল।

বিধবা প্রকৃতি।

প্রকৃতি চঞ্চলপলে, কানন-অঞ্চল তা'র,
সমীর-তাড়নে যেন প্রেমের পতাকা উড়ে,
বিরস বদনে ওই ঘনাই'ছে অন্ধকার,
জলদ-কুন্তলদাম ছড়া'য়ে গগন-চূড়ে ;
সে কালো অলক হ'তে খসিয়াছে রত্নরাজী,
কানন-অঞ্চলে নাহি খদ্যোত-হীরক ঝলে,
অঙ্গের কুসুম-সাজ ছড়া'য়ে পড়েছে আজি,
ছিন্ন ভিন্ন ভূষা-বেশ, ছিন্ন ফুল-মালা গলে !
নিদাঘ-বসন্তে গেছে পোহা'য়ে সুখের নিশা,
বরিষা তাড়নে আজি বিধবা প্রকৃতি-বালা,
ধূর্জ্জটির-শাপে যেন পাগলিনী ছিন্নবেশা,
পতিহীনা কাম-প্রিয়া, মরমে বিরহ জ্বালা !
প্রকৃতি গো, জীয়ে স্বামী, পুনঃ সে যৌবন য'বে,
ফুল্ল আঁখি-কোণে পুনঃ মরমের কথা কবে।

কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

প্রভারে আমার।

প্রভা! প্রভারে আমার!
হয়ে প্রভা, কিবা কাজে,
পশেছ এ হৃদিমাঝে,
বুঝিতে নারিনু হায়,
কি আশা তোমার।
প্রভা! প্রভারে আমার!
একদিন এ পরাণে,
ছিল অতি সঙ্গোপনে,
ভুবনমোহিনী বালা,
সুন্দর সুঠাম।
গুণে ছিল নিরূপমা,
সৌন্দর্য্যেতে তিলোত্তমা,
জগত-জুড়ান ছবি
ভুলে যেত কাম!
না জানি কি সুখ আশে,
অভাগায় ভালবেসে,
কেঁদে চলে গেছে ছবি,
শমন-আগার।
কি জানি কি আশা ক'রে,
ভালবেসে ছিল মোরে,
জানিত না ভালবাসা
এমনি অসার।
প্রভা! প্রভারে আমার!
আমি কিন্তু সেই আছি,
সে কাহিনী ভু'লে গেছি,
ভু'লেগেছি সুধামাখা
সেই নাম গান।
যে নাম বাঁশরী শুনে,
একদিন এ পরাণে,
ফুটিত অমৃতধারা
সিঞ্চিত বয়ান।
সে গান ত মনে নাই,
সকলি ভু'লেছি ভাই,
ভু'লেছি সে চন্দ্রানন
নয়ন-আশার।
ভু'লেছি সে সুধাহাসি,
ভু'লেছি যাতনারাশী,
আঁধারে মিলায়ে গেছে
নামটী তাঁহার।
প্রভা! প্রভারে আমার!

শ্রীচিন্তাহরণ গুহ।

তিনখানি পুস্তক সমালোচনা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

জলধরের বাঙ্গালীত্ব তাঁহার গ্রন্থের বহু স্থলেই পরিস্ফুট! একজন স্বদেশী দেখিলেই তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী সেই সুদূর পল্লীর স্মৃতিতে বাজিয়া উঠে। গৃহের সারভূত বস্তুগুলি যদিও ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়া তিনি শূন্য গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্যহৃদয়ে শান্তির আশায় এত 'চড়াই' 'উৎরাই' সহ্য করিয়াছে, তথাপি সেই গৃহের স্নেহময়ী স্মৃতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই; তাঁহার সেই বাহ্য সন্ন্যাসীর গৈরিক বসনের এবং কমণ্ডলুর মধ্য হইতে সে সংসারাসক্তি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাও তিনি গোপন করেন নাই। তিনি যেখানেই যাউক না কেন, যত সৌন্দর্য্যই দেখুন না কেন, তথাপি সেই বৃক্ষকুঞ্জপরিবেষ্টিত পল্লীর কুটীরখানির দিকে ছুটিয়া যাইতে তাঁহার প্রাণ-বিহঙ্গ সর্ব্বদা ব্যাকুল;—

"In every clime the magnet of his soul,
Touched by remembrance turns to that pole".

কিন্তু তথায় কি আছে?—কেবল শ্মশান-চিতার ভস্মরাশি—আর তাহাদের প্রত্যেক কণা হইতে উৎপন্ন শত শত মর্ম্মন্তুদ জ্বালাময় স্মৃতি! তথাপি তাহাও যেন পবিত্র, তাহাও যেন মধুর, তাহাও যেন স্পৃহণীয়,—সে বেদনাতেও যেন আরাম আছে, সে বেদনার মধ্যেও যেন সুখ আছে, নতুবা প্রাণের এ ব্যাকুলতা কেন?

"The sorrow for the dead is the only sorrow from which we refuse to be divorced, Every other wound we seek to heal, every other affliction to forget: but this wound we consider it a duty to keep open—this affliction we cherish and brood over in solitude. * * * Though it may sometimes throw a passing cloud over the bright hour of gaiety or spread a deeper sadness over the hour of gloom, yet who would exchange it, even for a song of pleasure or the burst of revelry. No, there is a voice from the tomb sweeter than song. There is a remembrance of the dead to which we turn evenfrom the charms of the living.

জলধরের বাঙ্গালিত্ব এখানেই পরিস্ফুট! কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালির দোষ পাইলে তিনি তাহা গোপন করিবার লোক নহেন, সেই সুদূর হিমালয়ের ক্রোড়ে বাঙ্গালির যে কলঙ্কলেপ রহিয়াছে, তাহাও তিনি সাশ্রু-নয়নে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। সন্ন্যাসীজীবনের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ হইলেও ভণ্ডের ভণ্ডামি প্রচার করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই—আবার সাধুর মহত্ত্বের নিম্নে তাঁহার মস্তক সর্ব্বদাই ভক্তিভরাবনত!

জলধর বাবু কেমন স্বদেশপ্রেমিক, তাঁহার হৃদয়ে ফল্গুর স্রোতের ন্যায় নীরবে যে কেমন স্বদেশভক্তি মন্দাকিনী প্রবাহিতা, তাহারও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাঠকগণ তাঁহার পুস্তকে পাইবেন; তাহার "গুরুদ্বার" "নালা-পাণি" "কলুঙ্গার যুদ্ধ", তাঁহার "যোশীমঠ" ইত্যাদিতে তাঁহার স্বদেশ-প্রেম পরিস্ফুট।

তাঁহার ভগবৎ প্রেম, তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ ও তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা, তাঁহার অকৃত্রিম সহৃদয়তা, তাঁহার নির্ভীক সমা-লোচনা-কৌশল ইত্যাদির পরিচয় পাঠক 'প্রবাস চিত্র' এবং 'হিমালয়ে' সর্ব্বত্র পাইবেন। তাঁহার 'সহস্রধারা', তাঁহার 'বিষ্ণু প্রয়াগ', তাঁহার 'বদরী নারায়ণ', তাঁহার 'কেদারনাথ', তাঁহার 'প্রত্যাবর্ত্তন', ইত্যাদি সর্ব্বত্রই এই সবের ভূরি পরিচয় পাঠক পাইবেন। এই সব কারণেই আমি তাঁহার পুস্তককে স্থায়ী ও উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলিয়াছি। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এরূপভাবে লেখার তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক, এ ভ্রমণ বৃত্তান্তে মানবচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে, ভগবানের চরণের দিকে মনকে একটুও অন্ততঃ আকৃষ্ট করে, স্বদেশ প্রীতি জাগাইয়া তোলে, সুতরাং ইহাকে আদর্শ সাহিত্য বলিব না কেন?

আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি, পুস্তক দুখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন, আমি বৃথা যশোগান করি কি না!

তার পর নৈবেদ্য! এখানি একখানি ক্ষুদ্র গল্পের পুস্তক। ইহার রচনা-চাতুর্য্য প্রবাস চিত্রের লেখকের সম্পূর্ণ উপযোগী।

ইহাতেও একটি সুমধুর ঝঙ্কার আছে, যাহাতে প্রাণ পুলকিত হয়। ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়া কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন ব্যাপার, তাহাতে লোক-চরিত্র-জ্ঞান, ভূয়োদর্শন, এবং প্রতিভার প্রয়োজন, ব্যবহারবিৎ হওয়ারও আবশ্যকতা আছে, কিন্তু জলধর বাবু তাঁহার গল্পগুলিতে বেশ কৃতকার্য্য

হইয়াছেন বলিয়াই আমার মনে হয়। বিশেষতঃ এই সব গল্প আমাদের হিন্দু-সংসারের আদর্শের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লিখিত হওয়ায়, ইহা আমাদের নিকট আরও মনোরম বলিয়া বোধ হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা পাঠক পাঠিকাগণের চরিত্র অবনত না হইয়া উন্নত হওয়ারই বিশেষ আশা করা যায়। প্রত্যেক গল্পেই এক একটি মনোবৃত্তির স্ফূরণ বেশ সুন্দর-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, অথচ লেখক সর্ব্বদা মনে রাখিয়াছেন, তিনি হিন্দু, তিনি হিন্দুর দেশে, হিন্দুর ভাষায় হিন্দু, নর-নারীগণের চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন; আমরা কোন স্থলেই তাঁহাকে এটা বিস্মৃত হইতে দেখি নাই।

তিনি 'নিবেদনে' আশঙ্কা করিয়াছেন যে, দীনেন্দ্র বাবু তাঁহাকে সাধারণ্যে হাস্যাস্পদ করিতে সংকল্প করিয়াছেন, সে আশঙ্কার কোনও কারণ দেখা গেল না! আর একথাও তাঁহার মনে করা উচিত যে, দীনেন্দ্র বাবু গল্পে সিদ্ধহস্ত। তিনি যখন ইহা পুস্তকাকারে বাহির করিতে চেষ্টমান হইয়াছেন, তখন তাহার মধ্যে হাস্যাস্পদ করিবার উপযোগী বস্তু ভিন্ন আরও কিছু না কিছু আছে! তবে স্বয়ং কালিদাসই যখন বলিয়াছেন,—

"আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্।
বলদবপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

তখন তাঁহার এ আশঙ্কা স্বাভাবিকী!

তাঁহার গল্পগুলির সবই আমাদের ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও 'পাগল', 'ব্রহ্মচারিণী', 'প্রতীক্ষা', এবং 'সন্ন্যাসী', যেন আরও বেশী, মধুর বোধ হইয়াছে। পাগলের বালবিধবা 'ইন্দুর' যে সুন্দর চরিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা একদিকে যেমন স্বাভাবিক, অন্য দিকে তেমনই অতি উচ্চ আদর্শস্থানীয়, পাগল 'আমীরের' প্রেম বিকারে তাহার প্রতি রাগ হয় না, বড়ই সহানুভূতি হয়। এই গল্পে লেখক কয়েকটি দার্শনিক তত্ত্ব বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহাতে গল্পের স্বাভাবিকত্ব বেশ উজ্জ্বল হইয়াছে। 'ব্রহ্মচারিণী', গল্প পড়িবার সময় প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, বুঝি শেষকালে এইরূপ অগণিত গল্পের ন্যায় কতক-গুলি গুপ্ত প্রেমলিপি, এবং পরে প্রাণ সমর্পণ বা elopementএ ইহার অবসান হইবে, কিন্তু জলধর হিন্দু, জলধর ভাবুক, জলধর সাধকের শিষ্য—তিনি ইহা অতি স্বাভাবিক এবং সুন্দরভাবে পরিণত করিয়াছেন।

প্রভার পত্রখানি পড়িয়াই আমরা বুঝিলাম, হিন্দুর মেয়ে তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত হিন্দুর ছেলেকেই পত্র লিখিতেছে। মেয়েটির মনও ঠিক্ হিন্দু-ভাবে পরিপূর্ণ! ছেলেটি যুবক হইলেও শিক্ষিত, প্রকৃত হৃদয়বান্, তিনিও স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ব বেশ রক্ষা করিয়াছেন।

'প্রতীক্ষা' ও 'সন্ন্যাসী' পড়িয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই! দৈবের আশ্চর্য্য ঘটনায়, অবিমৃষ্যকারিতার বিষময় পরিণামে প্রাণ ব্যথিত হইয়া পড়ে।

তাঁহার 'অন্ধের কাহিনী'তে দৃঢ় আত্মসংযম এবং অধ্যবসায় স্পষ্ট দেদীপ্যমান। তাঁহার 'মা কোথায়'তে রামকুমারের হৃদয় দেখিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়, সে যে নীচজাতীয় ধীবর, তাহা আমরা তাহার হৃদয়ের মহত্বে ভুলিয়া যাই।

গল্পগুলি সাধরণ গল্প হইতে অনেক বিষয়ে বিশেষত্ব আছে এবং এ গুলিও আদর্শ সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী, সাহিত্যসেবক মাত্রই যদি আদর্শ সাহিত্যের লক্ষ্য যে পবিত্রতা, এবং ভগবৎসান্নিধ্য চেষ্টা তাহা মনে রাখেন, তবে বড়ই সুখের হয়। সুলেখক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত এ বিষয় যথেষ্ট শ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন, সে জন্য তাঁহার সঙ্গে পরিচিত না হইলেও তাঁহাকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। জলধর বাবুর পুস্তকে সেই গুণ আমি যথেষ্ট পাইয়াছি বলিয়াই মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছি। নতুবা জলধর বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং আদৃত হইয়াছেন, তাহাতে মাদৃশ ক্ষীণজীবী ব্যক্তির তাঁহার যশোঢক্কা শত শব্দায়মান করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

'প্রবাস চিত্র' পাঠের পূর্ব্বে 'জলধর' আমার শ্রুতমাত্র ছিলেন, কিন্তু তখন হইতেই এবং তৎপর নানা মাসিক পত্রে তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়াই তাঁহার প্রতি আমি অনুরক্ত হইয়াছিলাম। তার পর তাঁহার সহিত পরিচয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া, সে অনুরক্তি বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। তাঁহার সহৃদয়তার গুণে তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার পুস্তককেও সেই জন্যই ভালবাসি। নতুবা আমার কোন বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধুরও কোন মন্দ পুস্তক থাকিলে তাঁহার খাতিরে তাহার যশোগান করিতে আমি সর্ব্বদা পরাঙ্মুখ; বন্ধুর খাতিরে সাহিত্যের পবিত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করা, বা লোকচক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টা, আমি পাপ

বলিয়া মনে করি। তবে মানুষের মন একরূপ নহে, জ্ঞান, বুদ্ধি, সমালোচনার ক্ষমতাও একরূপ নহে—আমি তো সে সব বিষয় অতি হীন, মাতৃভাষার সেবা করা জীবনের একটা ব্রত হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রের এক প্রান্তে দাঁড়াইবার সাহস ও স্পর্দ্ধা আমার একটুও নাই, সুতরাং আমি ভুল বুঝিতে পারি! সেটা এখন পাঠকবর্গের এবং অন্যান্য সাহিত্যরথীগণের বিবেচ্য। তাঁহারা পুস্তকগুলি পড়িয়া দেখুন, ইহারা আদর্শ সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না? আমি যে সব কথা বলিলাম, ইহা সমীচীন কি না? যদি তাহা হয়, তবে তাহা আদৃত হইবার যোগ্য নহে কি?

জলধর বাবুর ভাষায় ব্যাকরণবিরুদ্ধ পদ প্রভৃতি নাই, তাহা আমি বলি না; তাহা অনেক স্থলে আমি দেখিয়াছি, দুই এক স্থলে ভাষার একটু আধটু অসাবধানতাও বোধ হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে এত গুণ আছে, তাহার ঐ সব সামান্য দোষ না ধরিলে মক্ষিকাবৃত্তির প্রতি অবিচার করা হয় বটে, কিন্তু সাধুগণের মতে তাহাতে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পায়।

বৈয়াকরণগণ পুস্তক পাঠকালে স্থানে স্থানে শিহরিয়া উঠিতে ও নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহারও শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া লেখকের গুণপণায় মুগ্ধ হইবেন এবং দোষ দর্শনে বিস্মৃত হইবেন।

বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গে কয়েকখানি খাঁটি অলঙ্কার সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া কার প্রাণে আনন্দ উপস্থিত না হয়?

ভগবানের নিকট প্রার্থনা, জলধর বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া, স্বীয় পবিত্র ব্রত পালন করিয়া, চিরজীবী হউন, বঙ্গসাহিত্য তাঁহার কৃত অলঙ্কার পরিয়া আরও সুশোভিতা হউন।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা।)

১০ বর্ষ। } মাঘ, ১৩০৮ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

ভারত-রত্নসার।

(বনপর্ব্ব, ১২শ অধ্যায়)

বনবাসক্লেশে ও বৈরনির্য্যাতনে বিক্লবচিত্ত অর্জ্জুনকে ভগবান্ কৃষ্ণ প্রীতিপূর্ণ উত্তেজক ও বন্ধুত্বের সমুচিত এই বাক্য কহিয়াছিলেন,—

৩১। "মমৈবত্বং তবৈবাহং যে মদীয়া স্তবৈব তে।
য স্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি য স্ত্বামনু সমামনু ॥ ৪৫ ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি নিশ্চয় জানিবে, তুমি আমারই এবং আমিও তোমারই; যাহারা আমার আশ্রিত, তাহারাও তোমারই আশ্রিত। যে তোমাকে দ্বেষ করে, সে আমাকেই দ্বেষ করে, এবং যে তোমায় ভাল-বাসে, সেও আমাকেই ভালবাসে ॥ ৩১ ॥

৩২। অনন্যঃ পার্থ! মত্তস্ত্বং ত্বত্তশ্চাহং তথৈব চ।
নাবয়োরন্তরং শক্যং বেদিতুং ভরতর্ষভ! ॥ ৪৭ ॥

হে ভরতর্ষভ! পার্থ! আমা হইতে তুমি অভিন্ন এবং তোমা হই-তেও আমি অভিন্ন—এক, আমাদের দুই জনের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে কোন মতেই শক্য নহে ॥ ৩২ ॥

দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অপমানিতা, বনবাসে ক্লিষ্টা মানিনী দ্রৌপদী কৃষ্ণের সমীপে এই মর্ম্মভেদী বাক্য কহিয়াছিলেন,—

৩৩। ধিগ্বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ গাণ্ডিবং।
যৌ মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈ র্ম্মর্ষয়েতাং জনার্দ্দনং! ॥ ৬৭ ॥

হে জনার্দ্দন! যখন অতিনিকৃষ্ট দুঃশাসন সভামধ্যে আমাকে ওরূপ লাঞ্ছনা করিতেছে দেখিয়াও নীরবের যে ভীম ও অর্জ্জুন সহিতে পারিয়াছিল, তখন সেই ভীমসেনের বলের ধিক্ এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধনুরও ধিক্॥ ৩৩॥

৩৪। শাশ্বতোঽয়ং ধর্ম্মপথঃ সদ্ভিরাচরিতঃ সদা।
যদ্ভার্য্যাং পরিরক্ষন্তি ভর্ত্তারোঽল্পবলা অপি॥ ৬৮॥

হে কৃষ্ণ! ভর্ত্তা দুর্ব্বল হইলেও আপন আপন পত্নীকে রক্ষা সকলেই করিয়া থাকে, এইরূপ ধর্ম্মপথ চিরদিন হইতেই স্থাপিত এবং সাধু-জনেরাও সেই পথের অনুগমন করিতেন॥ ৩৪॥

৩৫। ধিগ্বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ পৌরুষং।
যত্র দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্ত্তমপি জীবতি॥ ৭৮॥

হে কৃষ্ণ! আমাকে ওরূপ অপমানিত করিয়া দুর্য্যোধন ক্ষণকালও জীবিত আছে, সেহেতু ভীমের সেই বলে ধিক্ ও অর্জ্জুনের পুরুষকারেও ধিক্॥ ৩৫॥

৩৬। কুলে মহতি জাতাস্মি দিব্যেন বিধিনা কিল।
পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভার্য্যা স্নুষা পাণ্ডোর্ম্মহাত্মনঃ॥ ১২০॥

হে কৃষ্ণ! যজ্ঞিয়বিধি অনুসারে আমি অত্যন্ত সৎকুলে জন্মিয়াছি, আমি পঞ্চ পাণ্ডবের অতীব প্রিয়ভার্য্যা, আর বিশেষতঃ আমি সেই মহাত্মা পাণ্ডুরাজার পুত্রবধূ॥ ৩৬॥

৩৭। কচগ্রহমনুপ্রাপ্তা সাস্মি কৃষ্ণ! বরা সতী।
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং প্রেক্ষতাং মধুসূদন॥ ১২১॥

হে কৃষ্ণ! হায়, সেই আমি পাঁচটী ভর্ত্তার চক্ষুর সম্মুখে কেশাকর্ষণে অপমানিতা হইলাম?॥ ৩৭॥

৩৮। নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা নচ বান্ধবাঃ।
ন ভ্রাতরো নচ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন!॥ ১২৫॥

হে মধুসূদন! অতএব আমি জানিলাম, আমার পতি নাই, আমার পুত্র নাই, আমার বন্ধু বান্ধব নাই এবং আমার ভ্রাতা নাই, পিতা নাই, অধিক কি বলিব, আমার সম্বন্ধে তুমিও নাই॥ ৩৮॥

৩৯। যে মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈরুপেক্ষধ্বং বিশোকবৎ।
নচ মে শাম্যতে দুঃখং কর্ণো যৎপ্রাহসত্তদা॥ ১২৬॥

হে কৃষ্ণ! আমাকে ওরূপ লাঞ্ছিতা অপমানিতা দেখিয়াও তোমরা তাহা উপেক্ষা করিয়া ত বেশ আছ, কৈ তোমাদের ত কিছুই কষ্ট

দেখিতেছি না, কিন্তু সেই সময় কর্ণ যে হাসিয়াছিল, সেই দুঃখ ত আমার কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না ॥ ৩৯ ॥

৪০। চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ! ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ।
সম্বন্ধাদ্গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেনৈব কেশব ॥ ১২৭ ॥

হে কৃষ্ণ! আমি তোমার পিতৃস্বস্রীয়ের ভার্য্যা (পিস্তুত ভাইয়ের স্ত্রী) অথচ সামান্য স্ত্রী নহি, যজ্ঞকুণ্ড হইতে উৎপন্না, অথচ আমায় বিশেষ শ্রদ্ধাও কর এবং তোমার অসাধারণ শক্তিও আছে, আর কিছুতে না হউক, উক্ত চারি কারণেও ত আমাকে তোমার রক্ষা করা উচিত ॥ ৪০ ॥

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

৺কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ যোগী ভাস্করানন্দ সরস্বতীর নাম বোধ হয় সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার যোগনিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং অলৌকিক ক্রিয়াবলীর বিষয় বহুদূর ব্যাপ্ত। এতাদৃশ সাধু মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না।

১৮৯০ সম্বতের আশ্বিন মাসে শুক্লাসপ্তমী তিথিতে শুক্রবাসরে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে কানপুরের অন্তর্গত মৈথেলালপুর গ্রামে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়, ১৯৫৬ সম্বতের আষাঢ় মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে রবিবাসরে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে ইহাঁর তিরোভাব হইয়াছে, ইহাঁর পিতার নাম মিশ্রলাল মিশ্র, গোত্র সাণ্ডিল্য। ইহাঁরা সামবেদী কণোজ ব্রাহ্মণ; শৈশব নাম মতিরাম।

অষ্টমবর্ষ বয়সে মতিরামের উপনয়ন হয়। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, ৺কাশীধামে আগমন। সেই সময় পাণিনী-ব্যাকরণের পাঠ আরম্ভ। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সমগ্র পাণিনী পাঠ সমাপ্ত হয়। ব্রহ্মচর্য্যের অবসান। মতিরাম তৎপরে গৃহাশ্রমে প্রবেশ করেন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ, অষ্টাদশবর্ষ বয়সে একটি পুত্র সন্তানলাভ। সেই পুত্রটি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হয়।

রামের দুই কার্য্যই হইয়া গেল, তবে আর গৃহাশ্রমে কি প্রয়োজন? তাঁহার সংসারবিতৃষ্ণ চিত্ত তখন বৈরাগ্যপথে ধাবিত হইল। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ তিনি উজ্জয়িনীনগরে গমন করেন; সেইস্থানে যোগমার্গ-নিদর্শক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন। উজ্জয়িনী হইতে দ্বারকা গুজরাট মালব এবং অপরাপর পুণ্যক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া মতিরাম বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন।

উজ্জয়িনীনগরে পণ্ডিতপ্রবর পূর্ণানন্দ স্বামী তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সন্ন্যাসাশ্রমে মতিরামের নাম হয়—ভাস্করানন্দ সরস্বতী। আশ্রমে কিছুদিন বাস করিয়া, ভাস্করানন্দ সরস্বতী কাশীধামে উপস্থিত হন।

দুর্গাবাড়ীর নিকটস্থ আনন্দবাগে তাঁহার আশ্রম হয়; কাশী হইতে তিনি একবার ফতেপুরের অন্তর্গত অশনীপুরে যাত্রা করেন। অশনীপুরের গঙ্গাতীরে অল্পদিন অবস্থান করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের দণ্ড পর্য্যন্ত ফেলিয়া দেন।

অশনীপুর হইতে আবার কানপুরে। তথা হইতে দুইজন শিষ্য সঙ্গে লইয়া কৌপীনধারী ভাস্করানন্দ একবার জন্মভূমি দর্শনে যান। তদনন্তর পুনরায় কাণপুর। তাহার পর গঙ্গোত্রী হইতে সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত গঙ্গাতটবর্ত্তী সমস্ত বিশেষ বিশেষ তীর্থক্ষেত্র সন্দর্শন করেন। অবশেষে অপরাপর সমস্ত পুণ্যতীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক ৺কাশীধামে আসিয়া সেই আনন্দবাগে আসন পাতেন। কথিত আছে, ভারতের কোন তীর্থ দর্শন তাঁহার বাকি ছিল না।

এইবার আনন্দবাগে আসিয়া ভাস্করানন্দ স্বামী কৌপিন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক উলঙ্গ হন। এই সময় নানাদিক্‌দেশাগত ধর্ম্মপিপাসু বহুতরলোক আনন্দবাগে সমাগত হইয়া স্বামীজীর সহিত সম্ভাষণ করিয়া গিয়াছেন। অনেক বড় বড় রাজা মহারাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মপিপাসায় আকুল হইয়াছিলেন। অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন। ভারতের কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজগৃহে ভাস্করানন্দের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে, নিত্য নিত্য

জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভাস্করানন্দ স্বামীর লক্ষাধিক শিষ্য হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজা মহারাজা, রায় বাহাদুর, জমিদার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ আর সবজজ প্রায় এক সহস্র।

কেবল দেশস্থ ভক্তজনেরাই যে, ভাস্করানন্দ স্বামীর মহিমা বুঝিয়াছিলেন, এমন নহে, নব্য সভ্যতম উচ্চতম শিখরারূঢ় ইয়োরোপ এবং আমেরিকার মহৎ মহৎ লোকেরাও ভাস্করানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। জর্ম্মণসম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম একদা একখানি চিত্রপটে ৺কাশীর ভাস্করানন্দ সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিতে অভিলাষী হন; স্বামীজীকে জর্ম্মণীতে লইয়া যাইবার অভিলাষে প্রিন্স-বিসমার্কের একটি পুত্রকে তিনি ৺কাশীর আনন্দবাগে প্রেরণ করিয়াছিলেন; উলঙ্গযোগী হইলেও আর্য্য-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ আচার বিচারের প্রতি ভাস্করানন্দ স্বামীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, জর্ম্মণীতে যাইতে তিনি অসম্মত হইলেন। সম্রাট উইলিয়ামের আশা পূর্ণ হয় নাই; তথাপি, স্বামীজী কেমন আছেন, সম্রাট স্বহস্তে পত্র লিখিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার তত্ত্ব লইতেন। রুষিয়ার সম্রাটও মধ্যে মধ্যে স্বামীজীকে পত্রাদি লিখিয়া কুশলবার্তা জানিবার প্রার্থনা করিতেন।

যাঁহাদের কথা বলিলে, সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতেরা চমকিত হইবেন, তাঁহাদের কথা বলিলেই কিন্তু স্বামীজীর উপর অনেক লোকের অনেক প্রকার ভাব উদয় হইবে। তাঁহারা হইতেছেন—ভারতের গবর্ণর জেনারল বাহাদুর, ভারতের প্রধান সেনাপতি বাহাদুর, বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট বাহাদুর। প্রমান স্থলে বলিতে হইল, স্বামীজীর দেহরক্ষার অল্পদিন পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমের সহৃদয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এবং মহামান্য কমাণ্ডার-ইন্ চিপ্, বারাণশীধামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন; সাধুর সাধুসম্ভাষণে তাঁহারা উভয়েই যে, পরিতৃপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, মহৎলোকের সম্বন্ধে সে কথা বলাই বাহুল্য।

মুসলমান এবং খৃষ্টান, এই দুই শ্রেণীর অনেকগুলি লোক স্বামীজীর শিষ্যত্ব স্বীকারে অভিলাষী হইয়াছিলেন। স্বামীজীর উত্তর—"বিধর্ম্মীকে দীক্ষিত করিব না। মুসলমান আছ, মহম্মদের প্রতি সমধিক ভক্তি বিশ্বাস স্থাপন কর; খৃষ্টান আছ, যীশুখৃষ্টের প্রতি অধিক ভক্তিমান হও,

ধর্ম্মবিশ্বাস অটল রাখাই ভাল। ধর্ম্মবিশেষের কিছু কিছু খুঁৎ থাকিলেও চিরাচরিত ধর্ম্ম ত্যাগ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভাস্করানন্দ স্বামীর বদননিঃসৃত ঐ কয়েকটী সংক্ষিপ্ত শব্দের কতদূর নিগূঢ় অর্থ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই অতি সহজে বক্তার মনের ভাব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

যোগবলে ভাস্করানন্দ স্বামী ত্রিকালজ্ঞ ঋষির ন্যায় লোকের মনের কথা—দূরন্ত ঘটনার কথা জানিবার কিছু কিছু ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তও ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি আছে; আজ কেবল একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই উপসংহার করিব।

একদা আমাদের পূর্ব্বদেশস্থ গুটিকতক বাবু (লোকে যাহাদিগকে বাঙাল বাবু বলে, সেই রকম যুবাপুরুষ, কৌতূহলবশে ৺কাশীধামে যাত্রা করিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন; সকলে প্রণাম করিলেন. সকলেই সমভাবে আশীর্ব্বাদ পাইলেন। শেষের লোকটী যখন প্রণাম করিতে যায়, স্বামীজী বাধা দিলেন; হস্ত সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "তুমি প্রণাম করিও না, তোমার এখন অধিকার নাই; গতকল্য বিদেশে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে।"

লোকটির—আর লোকটিই বা কেন বলি! বাবুটির আর প্রণাম করা হইল না, গোঁভরে চলিয়া গেলেন, স্বামীজীর উপর কিছু কিছু বিরাগও জন্মিয়া গেল। বাবুটি কেমন একপ্রকার ভগ্ন উৎসাহে বাসায় আসিয়া পোঁছিলেন। প্রবেশ দ্বারেই তার-হরকরা। সে ব্যক্তি সেলাম করিয়া বাবুর হস্তে একখানি টেলিগ্রাম দিল। বাবু তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই পিতার মৃত্যু সংবাদ। টেলিগ্রামে লেখা ছিল, "গত কল্য পিতার মৃত্যু, তুমি শীঘ্র আইস।"

তার হরকরাকে একটি সিকি দিয়া বাবু সেই টেলিগ্রাম হস্তে পুনর্ব্বার স্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী সহ সাক্ষাৎ হইল। স্বামীজী হাস্য করিয়া কহিলেন, "সাক্ষী আনিয়াছ? উহাও আমি জানি।"—বাবু ভাবিলেন, সত্যই ইনি সর্ব্বজ্ঞ। আমি ইতিপূর্ব্বে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছি; অবিশ্বাস করিয়াছি, ভেকধারী মনে করিয়াছি, তাহাও ত তবে ইনি জানিতে পারিয়াছেন? উপায় কি! পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব, তাহা দূরে থাকুক, দূর হইতে প্রণাম করিব, সম্মুখে একবার

বাবুর মনের ভাব জানিতে পারিয়া ভাস্করানন্দ স্বামী সহাস্ত বদনে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, "কেন তুমি ভয় পাইতেছ? বালক তুমি, মতি চঞ্চলা, কখন কিসে বিশ্বাস, কখন কিসে বিরাগ, সে ভাবটা তোমার মত যুবকেরা ঠিক রাখিতে পারে না, তোমাকে আমি ভাল বাসি, অপরাধ তোমার কিছুই নাই। যেখানে ভক্তি বসিবে, সেইখানে বসাইও; যেখানে মন উড়ু উড়ু হইবে, সেখানে থাকিও না; মনকে যদি আবার অটলতার রজ্জুতে আর্য্যপথে আকর্ষণ করিতে পার, তবে আবার তোমার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিবে।

পূর্ব্ববঙ্গের বাবুটির সহিত ভাস্করানন্দ স্বামীর তাহার পর আর একবারও কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। বাবু তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে এমনই নহে, আপন গৃহে অন্তরে বাহিরে সেই নামের পূজা করেন, ভক্তি অন্তরে যথেষ্ট আছে, কেবল সম্মুখে আসিতে ভয় হয়। সেই মানসিক বিকৃত ভাবের প্রায়শ্চিত্ত হইল না, তবে আর সরলভাবের গৌরব রহিল কই !!!

বাঙাল বাবুর কথা এই পর্য্যন্তই ভাল। এখন শেষবার একবার আরব্ধ কাহিনীর সূত্র ধারণ করি। কথা আর বেশী নাই। "সোঽহং" জ্ঞানে অধিকারী হইয়া ভাস্করস্বামী আর পৃথিবীতে বেশী দিন বাস করেন নাই। হঠাৎ উদরাময়রোগে (কেহ কেহ বলেন, বিসূচিকা রোগে) সজ্ঞানে তাঁহার প্রাণপক্ষী যজ্ঞধামে উড়িয়া যায়। মৃত্যুটি এক প্রকার ইচ্ছা মৃত্যু। যে রাত্রে তিনি দেহ রক্ষা করেন, সেইদিন মধ্যাহ্নে তৃপ্তিপূর্ব্বক প্রচুর অন্নব্যঞ্জন * ভোজন করিয়াছিলেন। ভোজনান্তে দুটী শিষ্যকে বলেন, "এজন্মে আর খাইব না! ইহাই আমার শেষ ভোজন।"

সেইরাত্রে স্বামীজী একবার পদ্মাসনে সমাধিতে বসিয়াছিলেন, সমাধি ভঙ্গের পর শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "আর আমি সমাধিতে বসিব না; এই আমার শেষ সমাধি।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, অল্পক্ষণ চিন্তা

* এবিষয়ে মতান্তর আছে। কেহ কেহ বলেন, অন্নব্যঞ্জনের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। একজন প্রত্যক্ষকারী বলিয়াছেন, দেহত্যাগের দিবসে বেলা দুই প্রহরের পর স্বামীজী কেবল একটি ডাব খাইয়াছিলেন, আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই। শেষ কথাটিই অধিক সম্ভব।

করিয়া স্বামীজী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "আমার সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে, আমি চলিলাম, তোমরা বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আমি তোমাদিগকে প্রাণের সঙ্গে ভাল বাসিয়াছি, তোমরা আমার একটি কথা রাখিও;—এই নশ্বর ছাড়িয়া প্রাণ-বিহঙ্গ যখন উড়িয়া যাইবে, শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া থাকিবে, তখন তোমরা দেহটিকে অনলে দগ্ধ করিও না, ভূগর্ভে সমাধি দিও না, একটা উচ্চ মঞ্চের উপর তুলিয়া রাখিও। ক্ষুধাতুর পক্ষীকুল সেই দেহের মাংস ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে।"

শিষ্যেরা ঐ শক্ত অনুরোধটি রক্ষা করিতে পারেন নাই। জীবনান্তে দেহটি তাঁহারা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া, গঙ্গাতীরে দাহ করিয়া, অবশিষ্টাংশ অস্থি ভস্মাদি একটি প্রস্তর পাত্রে সংস্থাপন পূর্ব্বক আনন্দবাগে সমাধি দিয়াছেন। ইহাতেও মতভেদ। নিজ বারাণসীধামের কোন কোন বিজ্ঞলোকের মুখে শুনা হইয়াছে, দাহ করা হয় নাই। শিষ্যেরা দেহটিকে গঙ্গাজলে ধুইয়া, দধি ঘৃত মাখাইয়া, সুন্দর প্রস্তর আধারে সংস্থাপন পূর্ব্বক আনন্দবাগে আধারসহ সমাধি দিয়াছেন।

দুটি কথার মধ্যে কোনটিতে অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, তাহা আমরা এখানে বসিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। ৺কাশীবাসী মহাত্মারাই বিচার করিবেন। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ভাস্করানন্দ সরস্বতী একজন অসাধারণ মহাপুরুষ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য—বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। যিনি ব্রহ্ম, তিনি আমি; যিনি আমি, তিনিই ব্রহ্ম; এই চরমজ্ঞান লাভ করিয়া ভাস্করানন্দ স্বামী যোগ্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। স্বামীভক্ত কোন রাজা কিংবা মহারাজা কৃপা করিয়া আনন্দবাগে যদি একটি ভালরকম স্মরণস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, স্তম্ভগাত্রে যদি স্বামীজীর অবিকল প্রতিরূপ ক্ষোদিত করাইয়া রাখেন, তাহা হইলে ধনবান ভক্তের উপযুক্ত কার্য্য হয়।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চিন্তা-কণিকা।

যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনি ছোট বড় সকলকেই সমান ভাল বাসেন। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম, সেখানে আত্মজ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে। ৭২।

যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, তুমি কিন্তু তাঁকে ছেড়ো না। তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাবে? যেখানে যাবে, সেইখানেই দুঃখ। ৭৩।

ধ্যানের সাগরে মন ডুবে দেখ না,
কত শান্তি আছে সেথা নাহি তুলনা। ৭৪।
ক্ষেপা মন কোথা যাস, শান্তি তোর কাছে,
শান্তি ছেড়ে বল শান্তি আর কোথা আছে। ৭৫।
কেন ভাই দ্বন্দ্ব কর, একজন তরে,
সকলেই নিজ পথে ঘুরে ঘুরে মরে। ৭৬।
কালে কালে যুগে যুগে পড়ে থাক পার,
এ ছাড়া, ত আর কিছু না দেখি উপায়। ৭৭।
ইন্দ্রিয়পরতায় সুখ নাই, ইন্দ্রিয় দমনেই সুখ। ৭৮।
যাহার মনের ঠিক নাই, তাহার কিছুতেই সুখ নাই। ৭৯।
নারীতে আসক্ত হয় মরিবার তরে,
প্রথমে বুঝিতে নারে, শেষে হা হা করে।
যৌবনেতে মনে হয় সুখের সংসার,
বলবীর্য্য গেলে হয় দুঃখের আগার। ৮০।
না ভাবে নিজের কিছু এমনি চঞ্চল,
পরেরই ভাবনা ভেবে সকলই পাগল। ৮১।
দেহে না থাকিলে বল, সকলই বিফল। ৮২।
মূঢ়েরা বালকের মত, সংসারের এটা ওটা চায়। ৮৩।
যে যা ভাবে, সে তা হয়, এ কভু অন্যথা নয়। ৮৪।
কে চায় আনন্দ ছাড়ি সুখ লভিবারে?
আনন্দে বিগলিত করেনিকো যারে।
সুখ ত ক্ষণেক আছে, ক্ষণে চলে যায়,
দুঃখ আসি সুখস্থান পূর্ণ করি লয়।

আসে যায় সুখ দুঃখ কেবা রাখে ধরে,
এ হেন সুখের আশে কেন লোকে মরে।
প্রশান্ত সাগরসম সমভাবে রয়,
মহান্ প্রকাণ্ড ভাব গভীরতাময়।
উচ্ছ্বাস বিনাশ কভু হ্রাস নাই যায়,
এমন আনন্দ লোকে কেন নাহি চায়। ৮৫।
কেন পিতা ভবে এত দুঃখ পাই আমি,
থাকিতে তুমি হে প্রভু জগতের স্বামী।
হৃদয়ের হাহাকার আর কি ঘুচিবে না,
তোমার করুণাদৃষ্টি আর কি পড়িবে না।
দীন হীন চিরদিন রব কিগো এই ভাবে,
এ ভবে কি এই ভাবে জীবন কাটাতে হবে। ৮৬।
দিন গেল কেবা তুমি দেখিলে না ভেবে,
এসেছ জনম লয়ে বিফলে কি যাবে।
কোথায় নিবাস তব কোথা হতে গতি,
চলেছ কোথায় তুমি কোন পথে ব্রতী। ৮৭।

তোমার পরিশ্রমের মূল্য যাহা অপরে প্রদান করে, তাহাতে কেমন তৃপ্তি হয়। আর তোমার অন্যায়োপার্জ্জিত ধনে কি তুমি এমন তৃপ্তি পাও? ৮৮।

মনে করি লভিবারে ধরম জীবন,
করমেতে করিতেছি সময় যাপন। ৮৯।
জীবন রয়েছে কিন্তু মৃত বলি তারে,
হরি বিনা যেই জন সদা কাল হরে॥
অতি কৃপাপাত্র সেই এ ভব-সংসারে,
আসে যায় নানা দেহ ধরে বারে বারে।
কত কষ্ট পায় তবু না করে সন্ধান,
কি কাজ সাধিলে তার হইবে নির্ব্বাণ।
এইরূপ মূর্খ জীবে পরিপূর্ণ ধরা,
জ্ঞানী মানী গণি তবু হয় আত্মহারা।
ধিক্ রে মূরখ জীব ভাল বুঝ না,
কে তুমি তা একবার ভেবে দেখ না। ৯০।

এসেছি জনম লয়ে এ ভব-সংসারে,
থাকিতে হইবে হেথা দুদিনের তরে।
চিরদিন নহে তবু কেন আমি মরি,
ভবের বিষয় লাগি বিসম্বাদ করি। ৯১।
মরণ হইবে ব'লে রয়েছি জীবিত,
একদিন হবে দেহ ধরায় শায়িত।
এই যা' রয়েছে সব কালে মিশে যাবে,
নামগন্ধ নাহি মম সংসারেতে রবে।
অসার বিষয়ে তবে কেন মুগ্ধ রব,
ইথে বিজড়িত হ'য়ে কোথা চলে যাব।
এই যে আনন্দময় ব্রহ্মধাম হ'তে,
কে চায় বিনষ্ট হতে বিনাশের পথে ? ৯২ ॥
একি ! এক গণ্ডগোল বেধেছে সংসারে,
চারিদিকে হাহাকার উঠিছে সবলে।
পথহারা পথিকের মত সবে ধায়,
প্রবাসে পড়িয়া শুধু ঘুরিয়া বেড়ায়।
শোকে তাপে জর জর, আয়ু হলো শেষ,
তথাপি আপনা প্রতি নাহি দৃষ্টি লেশ।
সংসারের পরিণাম কিছুই না ভাবে,
দেখা দেখি মাতিতেছে বিষয় বৈভবে।
চৈতন্য ত্যজিয়া করে জড়েতে বসতি,
তাহাতে হ'তেছে এই অশেষ দুর্গতি।
প্রবল এ স্রোত মাঝে থাকা বড় দায়,
মোদিগে লইয়া যায় ভাসায়ে কোথায়।
উঠিবারে যদি কেহ মাথা তুলে চায়,
সবারে ডুবিতে দেখি মাথাটি নোওয়ায়।
দেখা দেখি মজিতেছে এ ভব-সংসার,
দেখা দেখি করে সবে নাস্তিক বিচার।
সুদৃষ্টান্ত এ সংসারে বড়ই বিরল,
কুদৃষ্টান্তে পড়ি লোক যায় রসাতল

বিবেক-বৈরাগ্যহীন শক্তিহীন নরে,
যাহা দেখে করে তাহা পশু ব্যবহারে।
খায় দায় পড়ে থাকে পশুর মতন,
নিজের স্বরূপ চিন্তা না করে কখন।
কে আমরা কোথা হতে আসিয়াছি ভবে,
কোথায় চলিয়া যাব বারেক না ভাবে।
শরীরের মাঝে মোরা কোথায় রয়েছি,
কোথায় থাকিয়া সব কাজ করিতেছি।
কাল কি পিঙ্গল মোরা শ্বেত কি লোহিত,
ভাবিতে এ সব তত্ত্ব না গণে উচিত।
অনিত্য দেহেতে সদা করি আত্মজ্ঞান,
শরীরের দুঃখ কষ্টে হয়ে মুহ্যমান।
নিজের স্বরূপ ছেড়ে মন বশে ধায়,
পড়িয়া সংসার-কূপে কত কষ্ট পায়।
কখন হাসায় মন কখন কাঁদায়,
করে ফেলে মানবেরে পুতুলের প্রায়।
একে একে বিচারিয়া কে তুমি তা দেখ,
বিষয়ে বিমুগ্ধ হয়ে আর কেন থাক? ৯৩।

শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

ইতিহাসের একটী কথা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শাহজাহানের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই আরঙ্গজেব পিতৃ-পরিত্যক্ত অবশিষ্ট ধনরত্নাদি পাইবার আশায়, আগ্রাভিমুখে ঝটিতি যাত্রা করিলেন। আগ্রায় উপস্থিত হইবার পর, সর্ব্বপ্রথমেই জ্যেষ্ঠা সহোদরা জাহানারার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতী জাহানারা ভ্রাতার অ[ভিস]ন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করণার্থ নানাবিধ বহুমূল্যবান রত্নাদি এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন। সেই উপঢৌকনের মূল্যবান রত্নরাজি মধ্যে একখানি অতিশয় দ্যুতিময় হীরক ছিল, অনেকে অনুমান করেন, সেই হীরকই বর্ত্তমান

কহিনূর। আবার কাহারও কাহারও মত, আরঙ্গজেব যে হীরকখানি জাহানারার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেখানি কহিনূর নহে। তাঁহারা বলেন, শাহজাহান এই হীরকখানি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূরের একচক্ষে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ভারতাক্রমণকারী কান্দাহারাধিপতি নাদির শাহ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি একলক্ষ পঞ্চবিংশ সহস্র শ্রমপটু, কষ্টসহিষ্ণু সাহসী রণদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীর ৫০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কার্ণাল নামক সমতলক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, সম্রাট মহম্মদশাহের দুর্ব্বল বিলাসী রণকৌশল অনভিজ্ঞ একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছিলেন, মহম্মদশাহ বিজয়ী নাদির শাহের নিকট কৃপাভিখারী হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার পটমণ্ডপে আগমন করিয়াছিলেন।

কহিনূর এবং অন্যান্য বহুমূল্যবান মণিমুক্তাদিরত্নখচিত উষ্ণিষ মহম্মদ শাহের মস্তকের সেই সময় শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। নাদিরশাহের লোলুপ দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমেই মহম্মদের উষ্ণিষস্থিত হীরকের উপর পতিত হয়। সুচতুর নাদির কৌশলে মহম্মদশাহের নিকট হইতে কহিনূর হীরক এবং অন্যান্য রত্নাদি লইবার মানসে বলিলেন, পারস্যদেশের রীত্যনুসারে সন্ধির সময় পরস্পরের মধ্যে উষ্ণিষ বিনিময় করিতে হয়। হতভাগ্য, অনন্যোপায় মহম্মদশাহ নাদিরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, বাহ্যিক আহ্লাদসহকারে স্বহস্তে দ্যুতিময় বহুমূল্যবান হীরক এবং অন্যান্য রত্নরাজিখচিত স্বীয় উষ্ণিষ নাদির শাহের মস্তকোপরি স্থাপিত করিলেন। নাদিরও স্বীয় উষ্ণিষ সম্রাটের মস্তকে স্থাপিত করিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত হীরকের কহিনূর আখ্যা নাদির কর্ত্তৃক পারস্যভাষায় এই সময়েই প্রদত্ত হইয়াছিল। মহম্মদশাহের সহিত নাদিরের সন্ধি হইবার কয়েকদিন পর কোন কারণবশতঃ নাদির ক্রোধান্ধ হইয়া শস্ত্রশালাগার রাজকোষ, রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া অপর্য্যাপ্ত ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লুণ্ঠনলব্ধ বহুমূল্যবান দ্রব্যসমূহ এবং ভারতবর্ষের শিল্পকারগণের চিরগৌরবস্থল সুপ্রসিদ্ধ অমূল্য ময়ূর-সিংহাসন পারস্যদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং কেহ কেহ অনুমান করেন, ময়ূর-সিংহাসনের সহিতই কহিনূর হীরক পারস্যদেশে নীত হয়। আমাদিগের প্রথমোক্ত মতই অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ এরূপ মূল্যবান হীরক শাহজাহানের ন্যায় বিলাসী সম্রাট যে স্বয়ং ব্যবহার না করিয়া

কেবল ময়ূরের চক্ষে সন্নিবিষ্ট করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, ইহা বোধ হয় না। শাহজাহান এবং তাঁহার বংশধরগণের দ্বারা যে রূপেই এই হীরক ব্যবহৃত হউক না কেন, ইহা যে নাদির কর্তৃক পারস্যদেশে নীত হইয়াছিল, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নাদিরের মৃত্যুর পর তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া নানাব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং তাঁহার লুণ্ঠন লব্ধ অপরিমিত ধনরাশি দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নাদিরের পুত্র রাজ্যভ্রষ্ট হইবার পর নাদির কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে আনিত কহিনূর এবং অন্যান্য বহুমূল্যবান প্রস্তর সমূহ সযত্নে সংগোপনে সবিশেষ সাবধানতার সহিত লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। শত্রুগণ নাদিরের পুত্রের নিকট তখন পর্য্যন্ত নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তর সমূহ আছে জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য নাদির-পুত্র নানাপ্রকার যন্ত্রণা পাওয়া সত্ত্বেও কহিনূর এবং অন্যান্য মূল্যবান রত্নাদি শত্রুদিগকে প্রদান করিলেন না, শত্রুগণ তাঁহার নিকট হইতে হতাশ হইয়া তাঁহাকে মেসেদস্থ ইমাম রেহার মস্জিদে বন্দী করিয়া রাখেন। উক্ত সুপ্রসিদ্ধ মস্জিদে সর্ব্বদাই সিয়া ধর্ম্মাবলম্বী বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। কোইণের সর্দ্দার আগা মহম্মদ নাদির পুত্রের চির শত্রু ছিলেন। তিনি হীরকের লোভ সংবরণে অসমর্থ হইয়া এবং কতক পরিমাণে শত্রুপীড়ন মানসেও মস্জিদ দেখিবার ভাণ করিয়া বহুসংখ্যক ছদ্মবেশী সৈন্য সমভিব্যাহারে মস্জিদ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। মস্জিদে আগা মহম্মদ উপস্থিত হইয়াই স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নাদিরের পুত্রকে অমানুষিক যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নাদিরের পুত্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তর আগা মহম্মদকে প্রদান করেন। কিন্তু আগা মহম্মদ কহিনূর এবং পদ্মরাগ মণি না পাইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির পুত্রের মস্তক মুণ্ডিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থের দ্বারা বাঁধ দিয়া তাহাকে পাত্রাকৃতিতে পরিণত করিয়া, তদুপরি অত্যুষ্ণ-তৈল্য বর্ষণ করিয়াছিলেন। এবংবিধ অভিনব, লোমাঞ্চকর অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণাধীনে অস্থির হইয়া আরঙ্গজেবের প্রিয়তম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ সুবৃহৎ পদ্মরাগমণি আগা মহম্মদকে প্রদান করেন। কিন্তু কহিনূর না পাওয়ায়, আগা মহম্মদ অতিশয় ক্রোধান্ধ

পুত্রের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া ফেলেন। পিশাচ-প্রকৃতি আগা মহম্মদের উদ্দেশ্য সফল হইল না। উৎপীড়িত, নেত্রদ্বয়বিহীন নাদিরের পুত্র কোন প্রকারেই কহিনুর প্রদান করিলেন না। নাদিরের পুত্রের উপর আগা মহম্মদের অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী দ্রুত-পবনসঞ্চারের ন্যায় ভারতের নানা দেশ দেশান্তরে সালঙ্কারে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। সকলেই নাদিরের লুণ্ঠিত অপর্য্যাপ্ত ধনরাশির বিষয় বিশেষরূপ অবগত ছিল, আগা মহম্মদকে এইরূপে সৌভাগ্যবান হইতে দেখিয়া, অনেকেরই ক্রোধানল এবং হিংসবৃত্তি যুগপৎ বলবতী হইয়া উঠিল। সুতরাং সকলেই আগাকে জব্দ করিবার জন্য মানস করিলেন। ইত্যবসরে আগা মহম্মদের চিরশত্রু আফগানিস্থানের আহাম্মদ শাহা দুরাণী সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, চিরশত্রুকে জব্দ করিবার জন্য নাদিরের হতভাগ্য পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া ত্বরায় উক্ত মস্‌জিদে বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া সংগ্রামে আগাকে পরাজিত করিয়া অত্যধিক যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করেন। এবং হতভাগ্য নাদির পুত্রের উদ্ধারসাধন করেন। আহম্মদ শাহের এই প্রকার অযাচিত সুসময়োচিত সহায়তায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আহাম্মদ শাকে নাদিরের পুত্র অত্যুজ্জ্বল সুপ্রসিদ্ধ কহিনূর হীরক প্রদান করেন। ইহার অল্পদিন পরেই নাদিরের পুত্র পরম শান্তি নিকেতনে পরম পিতার নিকট গমন করিয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই আহাম্মদ শাহা দুরাণীও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তদীয় পুত্র তৈমুর শাকে উক্ত বহুমূল্যবান কহিনূর হীরক প্রদান করিয়া যান। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তৈমুর শাহাও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পর, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র সাজামান উক্ত হীরক প্রাপ্ত হন। তদীয় অনুজ সাসুজা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত এবং চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। সা সুজা কহিনূর হীরক না পাইয়া বহু অনুসন্ধান করেন কিন্তু উক্ত হীরক কোথাও পাওয়া গেল না, উৎপীড়িত, নেত্রদ্বয় বিহীন, রাজ্যচ্যুত মৃত্যুভয় বিরহিত মন্দভাগ্য সাজামান হীরক সম্বন্ধীয় কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না। সকলে ভাবিয়াছিলেন, সাজামান ইহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, অথবা সাজামান কর্ত্তৃক নষ্ট না হইলেও এই পৃথিবী হইতে কহিনূরের অস্তিত্ব চিরকালের নিমিত্ত লোপ পাইয়াছে, কিন্তু এইরূপ ভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে পর একদিন দৈবাৎক্রমে সে

বশতঃ একজন কর্ম্মচারি গমন করেন; এবং দৈবক্রমে তাঁহার হস্ত দেওয়াল মধ্যস্থিত কোনও কঠিন পদার্থের সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগে আঁচড়াইয়া যায়। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কাঁকরে Gravel তাঁহার হস্ত আঁচড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিশেষরূপ মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া দেখায়, কোন উজ্জ্বল বস্তু দেখিতে পান। তিনি দেওয়ালের সেই অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলায় দেখিতে পাইলেন, ইহা সেই দীর্ঘকাল লুপ্ত সুপ্রসিদ্ধ সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল কহিনুর হীরক। অনেকে অনুমান করেন, সাজামানই উক্ত হীরক যাহাতে পরম শত্রু সা সুজার হস্তে পতিত না হয়, তজ্জন্য তথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে এবং শুভাদৃষ্ট ফলে সা সুজা উক্ত লুপ্তপ্রায় কহিনূর হীরক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এলফিন্‌ষ্টোন Elphinstone সাহেব বলেন, সা সুজা রাজ্যসংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যাপারেই কহিনূর হীরক স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেন। অতঃপর তদীয় অনুজ সা মামুদ প্রথমতঃ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত পরে তাঁহাকে চিরকালের মত দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত করেন। সা সুজা পাঞ্জাবে পলায়ন করিয়া বীর-কেশরী রণজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় পঞ্জাবের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ স্বনামধন্য নরপতি রণজিৎ সিংহ অসাধারণ বীরত্বে সমগ্র ভারতভূমি চমকিত করিতেছিলেন। রণজিৎ সিংহ সা সুজার নিকট কহিনূর হীরক আছে জানিতে পারিয়া, উক্ত হীরক পাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। প্রথমতঃ কৌশলাবলম্বন করিয়া কোন প্রকার ফল হইল না দেখিয়া, ক্রমে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কাবুলের হতভাগ্য সম্রাটের নিকট বা অন্য কোথায়ও না পাইয়া, তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঐ হীরক তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের নিকট থাকিতে পারে। রণজিৎ সিংহ প্রথমেই সা সুজার স্ত্রী উওফো Woffo Begam বেগমের নিকট অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু উওফো বেগম সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন। এবং যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিলেন, তাহাতে কোন প্রকার ফল হইল না। সুতরাং রণজিৎ সিংহ অনন্যোপায় হইয়া ঐ সকল রমণীদিগকে ঘোর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় কাতর হইলে হীরক বাহির করিয়া দিবে ভাবিয়া, ঐ সকল রমণীগণের আহার বন্ধ করিয়া দিলেন। অবশেষে সা সুজা রমণীগণকে মৃতপ্রায় দেখিয়া অগত্যা কহিনূর রণজিৎ সিংহকে প্রদান করিলেন। রণজিৎ উক্ত কহিনূর হীরক বলয়ে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং রাজ্যসংক্রান্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারেই উক্ত বলয় পরিধান করিতেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলে তদীয় অমাত্য-বর্গ তাঁহাকে এই হীরক পুরীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ জিউকে প্রদান করিতে পরামর্শ দেন। কারণ তাহা হইলে উক্ত হীরক প্রাপ্ত হইয়া জগন্নাথজিউ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহার জীবন রক্ষা না করিলেও তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল এবং তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন। এই পরামর্শে রণজিৎ প্রথমতঃ স্বীকৃত হইয়াছিলেন না। কিন্তু অমাত্যবর্গের নিরতিশয় আগ্রহাতিশয্যে এবং মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া অবশেষে শিরশ্চালন দ্বারা তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু কোষাধ্যক্ষ রণজিৎ সিংহের স্বহস্তে লিখিত আদেশ কিংবা মৌখিক আজ্ঞা ব্যতিত উক্ত অমূল্য হীরক প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহের তখন অজ্ঞানাবস্থা সুতরাং তিনি স্বয়ং লিখিতে কিংবা অপরে লিখিলেও সেই লিখিত বিষয় বুঝিয়া সম্মতি প্রদান করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। অনেকে আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার পুনর্ব্বার জ্ঞান হইলে তাঁহারা এই বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবেন, কিন্তু ইহার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অজ্ঞানাবস্থায় রণজিৎ সিংহ ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। সুতরাং উক্ত হীরক শিক রাজ্যেই থাকিয়া যায়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই ইংরাজদিগের সহিত শিকদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করেন। তখন অন্যান্য বহুমুল্যবান লুণ্ঠিত সামগ্রীর সহিত এই হীরকও ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ মাসের ঘোষণা পত্রের দ্বারা সন্ধি স্থাপিত হইলে পর দীলিপ সিংহের কি প্রকার শোচনীয় অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা বোধ হয় ইতিহাসপাঠকগণের কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং সেই শোচনীয় ঘটনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তৎকালীন গবর্ণর জেনারল লর্ড (পরে দ্বিতীয় শিক যুদ্ধের অবসানে ইনি মারকুইস্ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন) ডালহৌসি দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজকর্ম্মচারির দ্বারা ঐ হীরক ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে নীত হইয়া ঐ হীরক ওজন করিলে প্রায় ১৮৬ কারাট হইয়াছিল। উক্ত হীরকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র এবং অন্যান্য দোষও ছিল, সেই সকল দোষ সংশোধন করণার্থ ভূতপূর্ব্ব ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্বামী আলবার্ট স্যর ডেভিড ব্রুস্টারের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, স্যর ডেভিড ব্রুস্টার বলেন, এই হীরক কাটান

উচিত নয়, কেন না, এইরূপ মূল্যবান হীরক কাটিলে অত্যধিক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাইবে। এবং তদ্দারা বিশেষ কোনরূপ উপকারও হইবে না। কিন্তু আলবর্ট তাঁহার কথা না শুনিয়া আমস্টার ডমের কস্টার কোম্পানিকে (Messrs Coster of Amsterdom) এই কার্য্যের ভারার্পণ করেন। কস্টার কোম্পানি উক্ত হীরক কাটিবার জন্য চারিটী অশ্বশক্তিসম্পন্ন মিনিটে চারি সহস্রবার ঘুরিতে পারে এইরূপ একটী যন্ত্র প্রস্তুত করেন। হীরক কাটিবার পর দেখা গেল, ৮০ ক্যারাট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান ওজন প্রায় ১০৬ ক্যারাট। হীরক কাটাইবার ব্যয় পড়ে, ৮০০০ হাজার পাউণ্ড। এত ব্যয় এবং শ্রম করিয়াও কার্য্যফল আশানুরূপ হয় নাই। ইদানিং আসল কহিনূর "উইণ্ডসর কাসেলে" আছে। কিন্তু উক্ত হীরকের আদর্শ "টাওয়ার অব লণ্ডনে (Tower of London) এবং কলিকাতার যাদুঘরে Museum আছে।

শ্রীঅজিতপ্রসাদ সান্ন্যাল।

একটী বৈদিক ঋষি।

যে যে গ্রন্থের অনুকূলতা-বলে "গৃৎসমদ" ঋষি-প্রবরের বিবরণ, আমাদের জ্ঞানগোচরে উপস্থিত হইয়াছে—তত্তাবতের যাবৎ বৃত্তান্ত, আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, পশ্চাৎ তৎসমস্ত বৃত্তান্ত প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে ও সুপ্রথানুসারে আদ্যোপান্ত বিবৃত হইতেছে।

১। ঋগ্বেদসংহিতা।

২। "শ্রীমৎসদ্গুরুশিষ্য"-কৃত গৃৎসমদ ঋষির বিরচিত গ্রন্থাবলীর ভাষ্য।

৩। সজনীয় সূক্ত।

৪। বৈদিক আখ্যায়িকা।

৫। মহাভারত।

৬। শ্রীমদ্ভাগবত।

৭। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

৮। বিষ্ণুপুরাণ।

৯। অন্যান্য পুরাণ।

১০। শ্রীধর স্বামীর টীকা। ইত্যাদি।

মহর্ষি শুনক, "গৃৎসমদ" মুনির গোত্রোৎপন্ন। তিনি সুহাত্রের অপত্য। তাঁহার প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের কত বৃত্তান্তই যে, বিদিত হইয়াছি, তাহা এক প্রকার বর্ণনাতীত বিরাট বিষয় বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিলে, অত্যুক্তি হয় না।

সুপ্রাচীন আর্য্য-সমাজ-রজনী, যখন নিশীথিনী-পদ-বাচ্যা নয়—যখন তাহা, প্রভাত-কল্পা হয় নাই, প্রভাতা হওয়া তো দূরে থাকুক, বরং তাহার প্রদোষাবস্থা,—তখন এতদ্দেশের সামাজিক বা শাস্ত্রিক অবস্থার কীদৃশী ব্যবস্থা ছিল—তাহা বীভৎস, বিভীষিকাময় বা সু-সদৃশ ছিল, কে তাহার নির্ণয়ে সমর্থ হয়? সত্য বটে,—বৈদিক ক্রিয়ায়োজন ও বৈদিক ব্যবহারিক অনুষ্ঠান, প্রকৃষ্টরূপেই পুরাতন অথচ তৃপ্তিবিধান,—তথাপি অভ্রান্ত ভাবে তাহার নিরূপণ কি নিতান্তই কঠিন নয়? তাহার পর কত শত শতাব্দীই যে, অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার গণনাই হয় না। যৎকালে বৈদিকী কার্য্যাবলী ও অপরাপর ব্যাপার-মূলক ক্রিয়া-কলাপাদি, নানাপ্রকারে ও প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে পৃথক্ পৃথক্ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া বিলয়-দশা-গ্রস্ত হইতেছিল, শ্রুতি শাস্ত্র, ঋষিদিগের স্মৃতি-পথ হইতে প্রলোপ পাইবার উপক্রম ও সম্ভাবনা হইয়াছিল, তৎকালে কুলপতি শৌনক ঋষিবর, উক্ত বেদশাস্ত্রের সমুদ্ধারার্থে ইহ সংসারে অবতীর্ণ হয়েন।

এতৎ-সম্বন্ধে অব্দ-গণনা ও তাহার নিরূপণ, খুব অসম্ভব; কিন্তু কাল-নির্ণয়-বিষয়ে আবার বিবিধ মত-ভেদের একান্তই অভাব। আর্য্য সমাজের সভ্যতা-ঊষার প্রাক্কালে জটা-চীর-কৌপীন-বল্কল-ধারী ঋষি-পুঙ্গব-বর্গ-কর্তৃক তত্তৎ কালে স্ব স্ব পরিদৃষ্ট মন্ত্রাদি প্রণীত হইত। তখন তাঁহারা ঐ সকল মন্ত্র-গানান্তে অমরত্ব লাভ করিতেন; কিন্তু কাল-বশে ক্রমশঃই ঐ সকল মন্ত্রাদি, নানা ঘটনা-চক্রে যাগযজ্ঞাদি-সূত্রে ব্যবহৃত হইতে থাকে। উত্তর কালে ইহাই, লোকের জ্ঞানগম্য হইয়া যায় যে, পরম পূজ্য—অতীব আরাধ্য—অশেষ শ্রদ্ধেয়—বিশেষ বন্দনীয়—আর্য্যসমাজ, লক্ষভ্রষ্ট হইয়া যজ্ঞ-জালে বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। তদানীং যাজ্ঞিক-কুলের প্রযত্নে ও চেষ্টায় প্রাচীন মন্ত্রাদির অর্থ, বিকৃত ভাবে কোথাও উচ্চারিত—আর, স্থলে স্থলে আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়া পড়ে! সেই সঙ্গে সঙ্গেই নব-প্রণীত মন্ত্র-সমস্তও, বিরচিত হইয়া প্রচারিত হওয়াতে, যজ্ঞাঙ্গের পরিপুষ্টি, সম্যক্ সংসাধিত হইতে লাগিল। তৎপরেই বেদ বিভাগ মন্ত্র ভাগের অর্থ প্রতিপাদন

সমস্ত মন্ত্র "ব্রাহ্মণ" সংজ্ঞায় পরিজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে। "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ-গুলির রচনার পূর্ব্বে সেই সময় যাগ-যজ্ঞাদির বাহুল্য হেতু মন্ত্রাদিকে স্মৃতিপথে রক্ষা করা, একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। তন্নিবন্ধন বিপ্রবর্গকে বিশেষ বিপদে নিপতিত হইতে হয়। সেই সময় মহর্ষি "গৃৎসমদের" সমাজের সমক্ষে আবির্ভাব। তাহার পর তদীয় প্রভাব ও প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

মোক্ষমূলর্ সাহেব, তদবস্থায় "সূত্রযুগ" (Sutra Period) নামকরণ করিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

১।—"গৃৎসমদ" ঋষি, নানা-জাতীয় বহুল গ্রন্থ-প্রণেতা। বাস্তবিক তিনি বেদশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ও শৃঙ্খলা সাধন করিয়া দেন। তাঁহার ভাষ্যকার "শ্রীমৎসদ্গুরুশিষ্য" তাঁহার জন্ম-সম্বন্ধে এক আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ ও প্রবন্ধাকারে নিবদ্ধ করেন। সেটীকে সর্ব্বাংশেই বিশ্বাস করা মানবের পক্ষে অসম্ভব ও সাধ্যাতীত। বিশেষতঃ—এই প্রবন্ধে, সেই নিবন্ধ, অপ্রাসঙ্গিক-বৎ প্রতীত হইবার কথা।

২।—শৌনহোত্রের (*) যজ্ঞে ইন্দ্রদেব, একক উপস্থিত হয়েন। তাঁহার শুভাগমন-সন্দর্শনে অসুরগণ, তাঁহাকে নিঃসহায় বুঝিয়া, তাঁহাকে হনন করিতে উদ্যত ও প্রস্তুত হয়। তাহারা সকলেই, যজ্ঞস্থল অবরোধ করিল; কিন্তু ইন্দ্র, ঋষির বেশ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন-পরায়ণ হন। তৎপরে অসুরগণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাবে ইন্দ্র-বোধে শৌনহোত্রকে নিরীক্ষণ-মাত্রেই তাঁহাকে আক্রমণ করে। তখন তিনি ইন্দ্রের স্তুতি-পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রদেব, আকাশ-স্থলে প্রত্যক্ষ হইলে, তিনি বলিলেন,—

"রে মূঢ়গণ! অবলোকন কর—ঐ ইন্দ্র দেবতা, নভোস্থলে বিরাজমান। আমি "ইন্দ্র নহি।"

ইন্দ্র, এই বাক্যে প্রীত হইলেন। তিনি নিম্নের বচন উচ্চারণে অভিনিবিষ্ট হইয়া তদ্গত চিত্তে পাঠ করিলেন,—

"গৃণন্মাদয়সে যস্মাত্তস্মাদ্ গৃৎসমদ ঋষে!।
ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ন্মিত্যেতন্নাম্না সূক্তং ভবিষ্যতি ॥

(*) 'শৌনহোত্র' ঋষি, "শুনহোত্র" ঋষির পুত্র। "শৌনহোত্র"—

ত্বং তু ভূত্বা ভৃগুকুলে শুনকাচ্ছৌনকো ভব।
এতৎ সূক্তং যুতং পশ্য "দ্বিতীয়ং মণ্ডল" পুনঃ ॥"

৩।—ইন্দ্রের বর-বল-প্রভাবে "গৃৎসমদ" ঋষি, পুনর্ব্বার ভৃগু-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখনই তিনি "ঋগ্বেদীয়" দ্বিতীয় মণ্ডল এবং সজনীয় সূক্তটীর দর্শনে সামর্থ্য প্রাপ্ত। আখ্যায়িকার যথার্থতা-বিষয়ে পুরাণ-শাস্ত্রে প্রমাণের নিদর্শন, এখনও পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান হইয়া বিদ্যমান। "গৃৎসমদের" পুত্রের নাম 'শুনক'।

শুনক-সন্তান শৌনক, একটী খ্যাতিমান্ বৈদিক ঋষি। ইনি তাৎকালিক সমাজের দুর্দ্দশা-দর্শনের পর দণ্ড, পল, বিলম্ব না করিয়া তন্মোচনে যত্নবান্ ও চেষ্টান্বিত হন। বিশেষ বিবেচনায় ও বিচারে সে চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইতে দেখা যায় কি? কদাচই নহে। তিনি তাৎকালিক সকল বিদ্যারই অধিকতর অধিকারী।

৪।—তাৎকালিক কি বৈদিক—কি পৌরাণিক—আর, কি দার্শনিক—সকল সমাজেই ঐ ঋষিপ্রবর যথেষ্ট ও যথোপযুক্ত সম্মান অর্জন পুরঃসর প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়া সুখ সমৃদ্ধি সম্ভোগ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার জ্ঞান, বিজ্ঞান-জ্ঞানের সমান অক্ষুণ্ণরূপেই জাজ্জ্বল্যমান ও বর্ত্তমান দর্শন করিতেছি। তিনি, অনেক গ্রন্থেরই রচয়িতা। কিন্তু তন্মধ্যে অতি অল্পমাত্রই (কতিপয় মাত্রই) ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্য্যোলোকে উদ্ভাসিত ও প্রকটিত। এই গ্রন্থগুলির নাম জ্ঞাত আছি। যথা;—

(১) ঋগ্বিধান-ব্রাহ্মণ।
(২) বার্হদ্দৈবত।
(৩) শাকল-প্রাতিশাখ্য।
(৪) বাস্কল-প্রাতিশাখ্য।
(৫) অনুবাক্-অনুক্রমণী
(৬) আর্যানুক্রমণী।
(৭) ছন্দোঽনুক্রমণী।
(৮) সেবানুক্রমণী।
(৯) শৌনকীয় "শিক্ষা"-গ্রন্থ।
(১০) কল্প-সূত্র। প্রভৃতি।

এই গ্রন্থগুলির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত, কথঞ্চিৎ ভাবেও অন্ততঃ দেওয়া আবশ্যক।

(১ ও ২) ঋগ্বিধান ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ। "ব্রাহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানং।"

(৩, ৪) প্রাতিশাখ্য গ্রন্থগুলি, যজ্ঞশিক্ষার জন্য রচিত। সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিনা আড়ম্বরে প্রকৃত কৃতকার্য্যের শিক্ষা প্রদানই, এই সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য উত্তম। উন্নতিশালি-সমাজ-মাত্রেই স্বল্প সময়ের অন্তরালে বহুল শাখা প্রশাখা দৃষ্ট হয় ও হইবার বিষয়। আর্য্য-সমাজেও—সেই পুরাতন চিরন্তন সনাতন নিয়মের ব্যত্যয় কোথায়? কথাতেই আছে—নানা মুনির মত;—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। সুতরাং শাস্ত্র-সমূহের প্রতি শাখার প্রণয়ন জন্য এক একখানি "প্রাতিশাখ্য" গ্রন্থের অতিশয় প্রয়োজনীয় প্রয়োজনের প্রাধান্য। এই সমস্ত গ্রন্থের বহুল স্থলে প্রাচীনতম আচার্য্য-ব্রজের মত, শতশঃ ও সহস্রশঃ খণ্ডিত ও পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত ও পরিশোধিত, অধিক কি—সংশোধিত ও সম্মার্জ্জিত। তাঁহারই যত্নের সংগৃহীত রত্ন-সমস্তে শাস্ত্র-সমূহের নিরন্তর বিসংবাদ-পরিপূরিত সূক্তের ঐক্য, প্রতিপাদিত, সামঞ্জস্য বিহিত—না, অধিক কি, সারবত্তা প্রদর্শিত হইতে আরব্ধ হয়। ঋষি শৌনক শাকল-শাখীয় মানব-নিচয়ের সহায়তার নিমিত্ত খণ্ড "প্রাতিশাখ্য"-নামক এক খণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহারই শাকল "প্রাতিশাখ্য" এই সংজ্ঞা। এ স্থলে ইহাও বলিতে বা বাধা কি? যে, শৌনক কর্ত্তৃকই শাকল ও বাস্কল প্রাতি-শাখ্যের সঙ্কলন-ক্রিয়া সুসমাহিত হইয়াছে। শৌনক একখানি "শিক্ষা" গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। কুমারিল ভট্টও, তদ্বিষয়ে লেখনীধারণান্তর বলিতে অগ্রসর হইলেন—জগতের আচার্য্যপদে আপনাকে আপনি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অত আচার্য্যো ভগবান্ শৌনকো বেদার্থবিৎ সুহৃদ্ ভূত্বা ব্রাহ্মণেভ্যোঽর্থবাদানুৎসৃজ্য বিধিং সমাহৃত্য পুরুষহিতার্থ-মৃগ্বেদস্য শিক্ষাশাস্ত্রং কৃতবানিতি ॥

তিনি একখানি কল্প-সূত্রেরও প্রণয়ন-কর্ত্তা। কিন্তু একটি আখ্যায়িকা প্রচারিত আছে যে, তাঁহা কর্ত্তৃকই ঐ গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছিল। "সদ্গুরু-শিষ্যের" মতে সেই গ্রন্থ, সহস্র খণ্ডে বিভক্ত :—

"সহস্রঋগুং সক্লুত্তং সূত্রং ব্রাহ্মণসন্নিভং।"

তিনি এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া যে কোন্ কারণের সুগুণে কি অগুণে উহার বিনাশ সংসাধন করিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

৫।—মহর্ষি-প্রবর শৌনক-প্রণীত কতকগুলি অনুক্রমণীর অস্তিত্ব অবলোকিত হইয়াছে। ঐ শব্দটির অর্থ সূচীপত্র (নির্ঘণ্ট।) উহার ইংরাজীতে প্রতিশব্দ দিতে গেলে বলিতে হয় ইন্‌ডেক্স (Index)। আধুনিক কালে আখ্যায়িকার প্রচার, যতটা সুবিধা, সঙ্গত—অনুক্রমণিকা প্রস্তুত করিবার ততটা সুবিধার সংঘটনই ঘটিয়াছে। তৎকালে তাদৃশী সুবিধার অসদ্ভাব ছিল বলিয়াই বাস্তবিক সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতাকে কণ্ঠস্থ রাখিবার দরকার হয়। তৎকালে শ্রুতিশাস্ত্র সমস্ত মুখস্থ না করিয়া অনুক্রমণিকা প্রস্তুত করিবার অপর কোনও উপায় বা পন্থার অস্তিত্ব কোথায় বল দেখি ? বৈদিক-সাহিত্য-মধ্যে শৌনকের অপর কতিপয় পরিচয় পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার যে অসীম যশোরাশি কি কারণে—কি উপায়ে পৌরাণিক কালেও বিলুপ্ত হইতে পারে, ইহা বলিতে পারিবার কাহার অধিকার ছিল না। কেন না, তদ্বিষয়ক প্রমাণের অভাব নাই।

৬।—মহাভারত গ্রন্থে ইহাঁর প্রসঙ্গ, সগৌরবে সংকীর্ত্তিত। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও ইহাঁর নাম স্থান পাইয়াছে।

এই সকল গ্রন্থে কবিগণ তাঁহার নাম দিয়াও তাঁহারই উপযুক্ত বাক্য বলিয়া অনেক মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ভিন্ন পুরাণ-শাস্ত্রেও ইহাঁর পরিচয় পাইবার অভাব নাই। বংশ-বর্ণন-সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহর্ষি বাদরায়ণি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, "ভাগবত" গ্রন্থে যাহা কিছু সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎ-প্রসঙ্গও, এই সন্দর্ভে প্রাসঙ্গিকরূপে নির্দ্দেশিত হইলে, কোনই হানি না হইয়া বরং তত্ত্ববিৎ লোকের অনুসন্ধিৎসা উদ্রিক্ত করিবে, এই বিশ্বাসে অশেষ আয়াসে উক্ত বৃত্তান্ত, এই স্থলে উল্লিখিত হইল। কারণ, উহা উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

"যঃ পুরূরবসঃ পুত্র আয়ুস্তস্যাভবন্ সুতাঃ।
নহুষঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রাভশ্চ বীর্য্যবান্॥
অনেনা ইতি রাজেন্দ্র ! শৃণু ক্ষত্রবৃধোঽন্বয়ম্।
ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাত্মজাস্ত্রয়ঃ॥

কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ।
শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ ॥”

“পুরূরবার” “আয়ু” নামক এক আত্মজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চ পুত্রের উৎপাদক। সেই পুত্র-পঞ্চকের নাম—

(১) নহুষ,
(২) ক্ষত্রবৃদ্ধ,
(৩) রজি,
(৪) রাভ,
(৫) অনেনা।

তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র। সুহোত্রের তিন পুত্র—কাশ্যঃ কুশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক। শুনকের সন্তান—শৌনক।

যে ভাবে নিম্নে বংশ-তালিকাটী, বিনিবেশিত হইতেছে, তাহাতে বলিতে পারি—দেখিবামাত্রই পাঠকের সহজেই ঐ বিষয়ে বোধাধিকার জন্মিবে।

(ভৃগুবংশ)

পুরূরবা
|
আয়ু
|
নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রাভ, অনেনা
ক্ষত্রবৃদ্ধ
|
সুহোত্র
|
কাশ্য, কুশ, গৃৎসমদ
গৃৎসমদ
|
শুনক
|
শৌনক

এই শৌনকই—“বহ্বৃচ-”-শ্রেষ্ঠ। সুতরাং “সদ্‌গুরু শিষ্যের” উল্লিখিত শৌনক ও পৌরাণিক শৌনক একই ব্যক্তি, না হইয়া যান না। সুতরাং তদ্বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কোথায়?

“বিষ্ণু-পুরাণের” সহায়তায় আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে না। তাহাতেও আমাদের প্রস্তাবিত মতামত, অ-সমর্থিত অথবা অপ্রমাণিত হইতেছে না। যথা,—

* * * ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুহোত্রঃ পুত্রোঽভূৎ।
কাল-লেশ-গৃৎসমদাস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়োঽভবন্।
গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ ॥”

মহর্ষি-শৌনকের অপরাপর পরিচয় ও তৎসংক্রান্ত কথা, পাঠক-কুলের শ্রবণ-যুগলের মূলে ধরিতে পারিলে, আমরাই যে, কেবল প্রীতিপ্রাপ্ত হইব,—তাহা নয়; অধিকন্তু আমাদের এই প্রবন্ধের যাঁহারা বিচার ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও আমাদিগকে অধিকতর মাত্রায় অতিমাত্র পবিত্র পুণ্যের ভাগী করিবেন, এই জন্যও আমাদের এতই আগ্রহাধিক্য! তিনি কেবলই যে, রাশীকৃত পুস্তক-প্রণেতা—নামমাত্র গ্রন্থকর্ত্তা,—তাহা নয়। কেবলই তাঁহাকে আমরা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ-সমস্তের ও প্রভূত-পরিমিত মন্ত্রের উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া যেন সিদ্ধান্ত করিয়া ক্ষান্ত ও নিশ্চিন্ত না হই। তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞানমূলক শব্দবিদ্যার ভিত্তি-সংস্থাপন-কর্ত্তাও বলিতে হইবে। এই তত্ত্ব, যদি কাহারও কর্ত্তৃক অস্বীকৃত হয়, তবেই বুঝিব—তিনি ন্যায়ের মর্য্যাদা, সমাজের সংরক্ষণ ও সংস্কার-ক্রিয়ায় তদীয় অদ্বিতীয় কর্তৃত্ব ও অদ্যাবধি অব্যাহত কৃতিত্ব প্রদানে পরম পরমাঙ্মুখ—সুতরাং গণ্ডমূর্খ। তাঁহাকে “মূক” বলিলেও বলা যায়। মুখের কার্য্য কি অসত্য-ঘোষণা? প্রকৃত তত্ত্বালোচনাই, কি বদনের প্রয়োজন সংসাধন করে না?

যে সময় আর্য্যসমাজ, বিশৃঙ্খল হইয়া যায়,—যখন ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন বৈদিক ভাষার অর্থ ও জ্ঞানের প্রচারে বিভ্রান্ত ও মোহান্ধ, যৎকালে তাঁহারা সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট কতিপয় মন্ত্র, স্বরূপ অর্থ গ্রহণ ব্যতীত তাহাদের প্রয়োগে ও ব্যবহারে অভ্যস্ত, সেই সময়ে মহর্ষি শৌনক, অত্যুন্নত ও প্রশস্ত চিত্তে প্রীতিপ্রসন্নতা ও সাহস সহকারে সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে অত্যাশ্চর্য্য গণনাতিরিক্ত গুণপনা দেখাইলেন! ধন্য গৃৎসমদ! তুমি অগণ্য ধন্যবাদের ভাজন মহা-সুজন! তোমার মত অসাধারণ মহাজনের চরণ-রেণু-স্পর্শে আমরাও কতই সুধন্য! কতই কৃতকার্য! বিষ্ণুপুরাণের অগণিত বচন হইতে তাঁহার জীবনের উন্নত উদ্দেশ্য হৃদ্‌গত করা যাইতে পারে না কি? এই এক মহোদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, শাস্ত্রজ্ঞেরা কত শত অভিজ্ঞতামন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত! সমাজের কল্যাণ-সাধনেই তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়া অমরত্বলাভে অধিকারী হইয়াছেন।

উক্ত উদ্দেশ্যের সাধনোদ্দেশের জন্য তাঁহাকে "প্রাতিশাখ্য" ও "অনুক্রমণিকা" রচনায় ব্যাপৃত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এখনও একটি কথা বলিতে বাকী থাকিতেছে। তাহাই বা বলিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? কোন্ কারণেই বা তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব! তার-স্বরে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :—

"চাতুর্ব্বণ্য-প্রবর্ত্তয়িতাহভূৎ।"

এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থই বা কি? "প্রবর্ত্তয়িতা" অর্থাৎ প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা। ঐ শব্দের অর্থ 'জাত'। উক্ত অর্থেই উল্লিখিত শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। কেননা, সর্ব্বত্রই উহা উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। সুতরাং শৌনককে চাতুর্বণ্যের "প্রবর্ত্তয়িতা" বলিলে ইহাই বুঝিতে হইতেছে যে,—তিনিই চাতুর্বণ্যের স্রষ্টা বা প্রণেতা। এই অর্থই, সর্ব্বথা-সঙ্গত অর্থ। এই স্থলেই কিন্তু শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন,—

চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তয়িতা। তদ্বংশে চত্বারোবর্ণা অভবন্নিত্যর্থঃ।

এই অর্থ, তাদৃশ সুসঙ্গত বলিতে কাহার প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হইবে, বল দেখি? যেহেতু, এই ব্যাখ্যাটী, "প্রবর্ত্তন" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের সহিত সুসঙ্গত অথবা অনুকূল হইল কৈ?

প্রথমতঃ।—প্রবর্ত্তন তাঁহার স্বকৃত, স্বীকৃত ও পরিগৃহীত কর্ম্ম। তাঁহার বংশীয়গণ, চারি ভাগে বিভক্ত,—এই অর্থ ব্যক্ত করিতে হইলে, মহর্ষি ব্যাস, অন্য শব্দের আশ্রয় লইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় কি? কথনই না।

দ্বিতীয়তঃ।—একজন মহর্ষির বংশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের উৎপত্তি অসম্ভব, ইহা বলাও অসম্ভব নয়। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যাকে এখানে যদি সুব্যাখ্যা বলিয়া ব্যাখ্যান করিতে হয়, তাহা হইলে একেবারেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, একই বংশে উদ্ভব হওয়াতে বিভিন্ন-বর্ণাবলম্বী লোক ও বিভিন্ন জাতি হওয়া সম্ভব। এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিলে ক্ষত্রিয় মহর্ষির বংশোদ্ভবগণ, চারি বর্ণে বিভক্ত হইলেন, এই বাক্য, অনেকের নিকট অনৈক্যমূলক, এইরূপ কথা প্রচারিত করিতে হইবে। অতএব শ্রীধর স্বামীর টীকার অর্থ অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত মতই, সুসঙ্গত প্রতীত হইতেছে। তদীয় টীকায় (ব্যাখ্যায়) উপেক্ষা করিবার কারণ এই যে, বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য-বিধানই—এক-বাক্যতা-প্রতিপাদনই—সর্ব্বশাস্ত্রের

সার-ভূত মত। ব্যাকরণানুসারিণী ব্যুৎপত্তি-বাণী, জ্ঞানি-গণের জননীর (বাগ্‌বাণীর) অভিপ্রেত। আমরা শাস্ত্রের অনুগত ভৃত্য; সুতরাং তাহাতে যবে অবাধ্য হইব, তবেই আমাদিগকে বধ্য হইতে হইবে।

শৌনক-মুনি-পুঙ্গবের চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তন-ব্যাপার, অনুসন্ধিৎসু মনস্বী মনুষ্যের অগোচর বিষয় বা ভয়ঙ্কর কাণ্ড বলিয়া পরিগণ্য নয়। এমন যথার্থ তথ্য, কোন ক্রমেও অস্বীকৃত হইলে, কর্ত্তব্যকার্য্যে দোষ স্পর্শিবে। বস্তুতঃ, বাস্তবিক বিষয়, কোন মতেই সংগুপ্ত হওয়া উচিত নহে। যিনি প্রকৃত তত্ত্বকে কল্পিত, গুপ্ত অথবা বিকৃত করিতে প্রয়াসী—তাঁহার অসাধ্য কি থাকিতে পারে? তাঁহার তাবৎ বস্তুই, বিনষ্ট হইবার কথা। আমাদের এতাদৃশ বিসদৃশ বিষয়ে বিষম বিতৃষ্ণা—বিজাতীয় বিদ্বেষ। ফলতঃ, পাঠক! যুগ-যুগান্তর-ব্যাপক কালেও আপনারা আমাদিগকে সত্য তত্ত্বের অকৃত্রিম—সুতরাং অকপট ও বিশ্বস্ত ভৃত্যশ্রেণীতে অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাইবেন। যাহারা প্রকৃত তথ্য-বস্তুর মর্য্যাদা বা সম্মাননাদির অক্ষুণ্ণতা-রক্ষণে অপ্রয়াসী—কি অবিশ্বাসী, তাহারা যতটা অসংসাহসী—অতএব অ-যশস্বী—ততটা অবিশ্বাসী, অ-মনস্বী মনুষ্যের সংখ্যা, গণনায় শেষ হয় কি? শৌনক মহর্ষি চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তক—অন্য দিকে আবার ঐতিহাসিক লোকও বটেন।

উপরি-লিখিত মতামত, সমর্থিত করিবার নিমিত্তই কতিপয় প্রমাণীকৃত অভিমতি, অতিমাত্রই সতর্কতা-সহকারে এই স্থলেই উল্লিখিত এবং বিধিমত প্রকারে প্রমাণ-পরম্পরা-সহকারে অত্র পত্রেই নিবদ্ধ হইল। উল্লিখিত মতের বিপক্ষ পক্ষে বিরুদ্ধ অথবা বিপরীত প্রমাণ-প্রয়োগের নিদর্শন নিরীক্ষণ করিতে না পাওয়া পর্য্যন্ত এই মতই, আদ্যোপান্ত অক্ষুণ্ণভাবেই সত্য বলিয়া বিবেচিত ও বিচারিত করা উচিত। মহর্ষি-শৌনক-প্রণীত গ্রন্থ-সমস্ত পরীক্ষিত হইলেই, প্রতীত হইবে, এতদ্বিষয়ক বিশেষ বিরুদ্ধ প্রমাণের পরিচয় প্রদর্শন করা একান্ত আবশ্যক।

এই প্রবন্ধে গৃৎসমদ, তাঁহার পুত্র শুনক ও পৌত্র শৌনকের কথাও, যথাসাধ্য বিবৃত হইল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

শকুন্তলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

তিনি রাজা; তিনি ইচ্ছা করিলে যে শকুন্তলা লাভ অন্য উপায়ে সাধন করিতে পারিতেন না, একথা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মাথার উপরে রাজা থাকিলেও অনেক পাষণ্ড প্রজা এই ক্ষমতার মাঝে মাঝে পরিচয় দিয়া থাকে। দুষ্যন্তের ত আর মাথার উপর কেহ ছিল না। সুতরাং পত্নীভাবে শকুন্তলাকে লাভ করিবার বাসনা রাজার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। রাজা সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়া গলিয়া গেলেও একবারে অপদার্থ হইয়া পড়িতেন না।

তিনি শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু শকুন্তলা যদি ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর জাতীয়া হয়েন, তবে উপায়? অসবর্ণ বিবাহ বিধান করিয়া মহারাজ চক্রবর্ত্তী বেণের দুর্দ্দশা তাঁহার মনে ছিল। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ বাসনাও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। তখন, শকুন্তলা কোন্ জাতীয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারা যায় কিনা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। একবার মনে করেন, "বিবাহের কোন বাধা, বোধ হয়, নাই।" আবার পরক্ষণেই বিঘ্নব্যাকুল যুক্তি সমূহ মনে উদিত হয়। তাঁহার চিত্ত সংশয়-দোলায় দুলিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার মন যেন বলিল, "ব্যাকুল হইও না" শকুন্তলা লাভ অসম্ভব নহে।" তিনি আশান্বিত হইলেন। তিনি জানিতেন, "মন নারায়ণ"; তিনি জানিতেন, মন কখন কখন ভবিষ্যৎ ঠিক বলিতে পারে। আশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া রাজা কতকটা সুস্থ হইলেন।

এদিকে, নবমল্লিকা ফুলে একটী ভ্রমর বসিয়াছিল, গাছটিতে জল দেওয়ায়, সে নাড়া পাইয়া উড়িয়া শকুন্তলার দিকে আসিল। শকুন্তলার একটু ভয় হইল—পাছে দংশন করে। ভয়ে তিনি মুখ বাঁকাইয়া কর সঞ্চালনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুষ্ট শুনিল না। বোঁ-ও-ও, বোঁ-ও-ও, গুণ্ গুণ্ শব্দে তাঁহার মুখের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হতভাগা মুখখানিকে হয় ত একটী ফুটন্ত পদ্ম ভাবিয়া ছিল।

সে চিত্র দেখিয়া রাজার বড় আমোদ হইল। সসাগরা জম্বুদ্বীপের

অধীশ্বর একটা সামান্য মধুকরকে "বাহবা" না দিয়া থাকিতে পারিলেন না, উপরন্তু তাহার সহিত স্বীয় অবস্থার বিনিময় করিতে ইচ্ছা করিলেন। মদনবিধুর রোমিয়োও একদিন প্রিয়তমার গণ্ডদেশে স্থাপিত এক জোড়া হাতের "দস্তানার" সহিত আপনার অবস্থার বিনিময় করিতে চাহিয়াছিলেন। মধুকরের উদ্দেশে প্রযুক্ত রাজার মুখ-নিঃসৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা এখানে সম্বরণ করিতে পারিলাম না। রাজা বলিলেন,—

"চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপমুথতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিক—চরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্ব মধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥"

[হে ভ্রমর! তুমি ইহার কম্পমান, চঞ্চল নয়নপ্রান্ত বহুবার স্পর্শ করিতেছ; কোন গোপনীয় কথা বলিবে বলিয়াই যেন কাণের নিকট উড়িয়া উড়িয়া মৃদু গুঞ্জন করিতেছ; হস্তাসঞ্চালন করিলেও ইহার অধর পান করিতেছ, সে অধর পান অন্য সকল কার্য্য অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ—; আর আমরা তত্ত্বান্বেষণ করিতে গিয়াই মারা যাইলাম। তুমিই বাহাদুর"।]

উক্ত দৃশ্য রাজার পক্ষে খুব মজার হইলেও, শকুন্তলার পক্ষে নহে। তিনি ভ্রমরের ধৃষ্টতা দেখিয়া, দু'এক পা পিছাইয়া গেলেন, কিন্তু তথাপি দুর্বৃত্ত নিরস্ত হইল না দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হে সখিগণ, আমায় রক্ষা কর।" সখীরাও মজা দেখিতেছিল, তাহারা আরও মজা করিবার জন্য বলিল, "আমরা রক্ষা করিবার কে বোন? দুষ্টের হাত হইতে রমণীর মান সম্ভ্রম রক্ষা করা রাজার ধর্ম্ম। অতএব তুমি মহারাজ দুষ্যন্তকে তোমায় রক্ষা করিতে বল।"

কি দৈব-সমাবেশ! রাজা যে নিকটেই আছেন এবং তিনিও যে তাহাদেরই ন্যায় মজা দেখিতেছেন, তাহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাহারা শুধু একটু মজা করিবার জন্য ঐরূপ বলিল।

যাহা হউক, তাহাতে কিন্তু রাজার একটু সুবিধা হইল—তিনি আত্ম প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দুষ্যন্ত রাজা থাকিতে কে স্ত্রীলোকের উপর অবিনয়াচরণ করিতে সাহস করিতেছে?" এই বলিয়া তিনি সম্মুখীন হইলেন।

কি বীরপুরুষ! একটা ভ্রমর মারিতে আসিয়া খুব লম্বা চৌড়া মারিয়া বসিলেন, যাহা হউক।

রাজহংস দর্শনে হংসীর মস্তক যেমন চঞ্চল হয়, রাজাকে দেখিয়া যুবতীত্রয় সেইরূপ একটু সন্ত্রস্তা হইয়া পড়িলেন। অনসূয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "না, মহাশয়, এমন কিছু ব্যাপার হয় নাই, আমাদের এই সখীকে একটা ভ্রমর বড় জ্বালাতন করিতেছে।"

রাজা অপ্রস্তুত! তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বাহাদুরী দেখাইয়া উহাদের বিস্ময়োৎপাদন করিবেন; কিন্তু ব্যঙ্গ স্বর শুনিয়াই অপ্রস্তুতের প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "কেমন, আপনাদের তপস্যা বেশ নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে ত!" প্রশ্নটা শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইল। শকুন্তলার গলা, কাণ, গাল সব একবার লজ্জায় লাল হইয়া গেল, তিনি মুখ অবনত করিলেন।

শকুন্তলা "ব্যাকুব" বনিয়া গিয়াছেন দেখিয়া, অনসূয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শকুন্তলা, তুমি কুটীরে গিয়া অতিথির জন্য কিছু ফল মূল এবং অর্ঘ্য লইয়া আইস, জল আনিবার প্রয়োজন নাই, গাছে দিবার জলেই ইনি পা ধুইবেন এখন।" রাজা প্রায় পারণা করিতে শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন! পা ধুইয়া জলযোগের জন্য ত তাঁর ঘুম হইতেছে না। তিনি বলিলেন, "থাক্ থাক্, ফলমূল আনিয়া আর কষ্ট করিতে হইবে না। আপনাদের মিষ্ট কথাতেই আমার পেট ভরিয়াছে।" কি বেল্লিক!

এইবার প্রিয়ংবদা বলিলেন, তবে এই গাছের-তলায় একটু বসিয়া বিশ্রাম করুন।" রাজা হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, বিলম্ব করিবার কোন ছলনা পাইলে তাঁহাকে সদ্য বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি" দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া সেখানে বসিলেন এবং তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতিথির অনুরোধ রক্ষা না করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহারা তিন জনেই সেখানে বসিলেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

উভয়-সঙ্কট।

কত কাল জ্বলি আর চিন্তার জ্বালায়,
কত কাল দুলি আর সন্দেহ-দোলায়,—
উভয় সঙ্কটে মরি
বল সখি! কিবা করি'
কারে ছাড়ি' কারে ধরি কি করি উপায়
কে বা দিবে উপদেশ, ঠেকিয়াছি দায়।
আমার একটী প্রাণ আমি দিব কায়,
তুল্য মূল্য দুই জনে কিনিবারে চায়,
কারে ছাড়ি' কারে রাখি
উপদেশ দেও সখি!
বিষম বিপদে আজি পড়িয়াছি হায়!
বিপদ্‌ভঞ্জন কোথা রাখ অবলায়।
দু' জনেই ভালবাসে
দু' জনে আমার আশে
নিত্য নিত্য আসে মোর আবাসের দ্বারে—
আমার একটী প্রাণ আমি দিব কারে?
বর-মাল্য কার গলে
দিব সখি! কৌতূহলে
প্রত্যাখ্যান-ছলে কারে দিব তাড়াইয়া
দেহ আজি প্রাণসখি! মোরে শিখাইয়া
দু'জনে অশ্বাস দিয়া,
রাখিয়াছি বুঝাইয়া
এবে সখি! আসিয়াছে নির্দ্ধারিত দিন
ভবিষ্যৎ ভাবি' মোর বদন মলিন—
আজি চিত চিন্তাকুল
শ্যাম কিম্বা রাখি কুল
অকূল পাথারে পড়ি যথা রাধারাণী

হায়, স্বয়ম্বর-স্থলে
দময়ন্তী পঞ্চ নলে
হেরি দহে চিন্তানলে—ভাবিয়া আকুল
তুমি মাগো সরস্বতী দিয়াছিলে কূল।
বল আজি প্রাণসখি
কারে ছাড়ি, কারে রাখি
আগে না বুঝিয়া মহা করিয়াছি ভুল।
দু'জনে আশ্বাস দিয়া হয়েছি ব্যাকুল।
কি আছে কপালে হায়,
আজি বড় নিরুপায়—
উপায় বলিয়া দিয়া বাঁচাও জীবন—
চারি দিক অন্ধকার করি নিরীক্ষণ॥

শ্রীমন্মথনাথ মৈত্র।

সমালোচনা।

নিকুঞ্জ-বিহার।—বিবিধ নাটক ও গ্রন্থাদি প্রণেতা শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য।০ আনা। ইহা একখানি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গীতিনাট্য, আদিরসে পূর্ণ, প্রেমরসের বিকার; নাটকের সাধারণতঃ যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক,—"নিকুঞ্জবিহারে" তৎসমস্তই আছে।

নাট্যকবির মেলা।—উপরোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা। ভূমিকায় গ্রন্থকার যাহাই লিখুন, এই প্রহসনখানি সমাজ ও ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। এরূপ প্রহসনের আমরা কখনই পক্ষপাতী নহি। "নাট্যকবির মেলায়" গ্রন্থকারের প্রহসন লেখায় লিপি-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রেরিত ইংরাজী নববর্ষের দুই প্রকারের দুইখানি পঞ্জিকা সমেত সুন্দর চিত্র উপহার পাইয়াছি। মহামান্যা ভারতেশ্বরীর পরিবারবর্গের চিত্রখানি বাঁধাইয়া গৃহে টাঙ্গাইবার উপযোগী হইয়াছে, একবার দেখিলে বার বার দেখিবার আগ্রহ হয়।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা।)

১০ বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩০৮ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

বিষম বাল্যপ্রেম।

ফরাসিরাজ্যের "লা রিবিউ" পত্রের বিখ্যাত ফরাসিলেখক মুশো লাইনো ফেরিয়াণী এক ভয়ঙ্কর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিলাতী "রিবিউ রিবিউ" পত্রের ষ্টেড সাহেব সেই প্রবন্ধের আভাস দিবার সময়ে বলিতেছেন ;—

"মুশো ফেরিয়াণীর "বাল্যপ্রেম" নামক প্রবন্ধে বিবিধ বিচিত্র রহস্যের বিকাশ হইয়াছে। প্রেমের আবর্ত্তে পড়িলে রমণী যাহা করে, বালক বালিকারাও তাহাই করিয়া থাকে। বালক বালিকারা যখন প্রবল প্রেম-প্রবাহে ভাসমান হয়, তখন দ্বেষ-হিংসার প্রবল স্রোত তাহাদিগকে মহাবেগে টানিয়া লইয়া যায়। প্রেমঘটিত বিদ্বেষে প্রণোদিত হইয়া তাহারা কোনরূপ ভীষণ লোমহর্ষণ দুষ্কর্ম্ম করিতেই কুণ্ঠিত হয় না। মুশো ফেরিয়াণী সমাজতত্ত্বে অদ্বিতীয়। যাহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া কারাগারে বাস করিতেছে, তাহাদিগের স্বভাব-চরিত্রাদি সম্বন্ধে ইঁহার মত অনুসন্ধান অল্প লোকেই করিতে পারিয়াছেন। তাহা-দিগের স্বভাব-চরিত্রাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভও ইঁহার মত আর কেহ করিতে পারেন নাই। ফেরিয়াণীই বলিতেছেন, পিরীতের প্রতিহিংসায় রমণী যেরূপ অদ্ভুত কৌশল-সংকল্পাদির পরাকাষ্ঠা দেখায়, বালক বালিকারাও সেইরূপ পরাকাষ্ঠাই দেখাইয়া থাকে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উপায়-পন্থা বালক বালিকারাও ...

রাখে। তাহাদের বিচিত্র জটিল কুটিল সাধন-প্রণালী দেখিলে, দেশ-বিখ্যাত পাপ-পারদর্শী বদমাইস-দিগ্‌গজদিগকেও বিস্মিত হইতে হয়। বা[illegible]কাদিগের প্রতিহিংসার ভীমপরাক্রম দেখিয়া, স[illegible] [illegible]-বুদ্ধি [illegible]তে হয়। রমণীরা স্বভাবতঃ অবলা, তাই তাহাদের প্রতি-হিংসায় কৌটিল্যেরই পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে; দৈহিক বলের অভাব, তাহারা মানসিক কৌশলে পূর্ণ করিয়া লয়। এ পক্ষে বালক-বালিকারাও ঠিক রমণীর পন্থা ধরিয়া থাকে। ইহারাও বলের অভাব কৌশলে পূরাইয়া লয়। মুশো ফেরিয়াণী তালিকা দিয়াছেন। তালিকায় অনেক পিশাচপ্রকৃতি বালক এবং রাক্ষসভাবাপন্না বালিকার নাম উঠিয়াছে। তালিকায় দশমবর্ষীয়া বালিকা এবং নবমবর্ষীয় বালকেরও অভাব হয় নাই। দেখা যায়, সম্ভ্রান্ত ধনবানের সংসারেই বাল্যপ্রেমের একাধিপত্য। প্রেমের ভয়ঙ্কর আবর্তে পড়িয়া, ইহারাই দিশাহারা হইয়া থাকে। জননী ও শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি অভিভাবিকাদিগকে সাবধান করিবার জন্যই ফেরিয়াণী বিচিত্র বাল্য-বিদ্যাসুন্দরের আলোচনা করিয়াছেন; বালক বালিকাদিগের গুপ্তপ্রেমের পক্ষে সকলকেই দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন। বালক বালিকারা যখন বিদ্যালয়ে আবদ্ধ থাকে, পিরীত করিবার অবসরটা তখনই তাহাদের পক্ষে অধিকতর অনুকূল হয়। বালক বালিকারা স্কুলে পড়িবার সময়েই ইঁচড়ে-পাকা হইয়া, প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিয়া থাকে।”

পাশ্চত্য-সমাজের প্রকৃতি কিরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাঠক পাইলেন। ছোকরা ছুকরীর প্রেমের কথা পাঠকেরও নিতান্ত অবিদিত নহে। লামার্ট একটন প্রভৃতির গ্রন্থে—“সোশাল সায়েন্সের” পুস্তকে——বাল্যপ্রেমের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকস্থলে দাস দাসীদিগকেও অপরাধের ভাগ লইতে হয়। কিন্তু ফেরিয়াণী বলিয়াছেন, বিদ্যালয়েই প্রেম-শিক্ষার পথ মুক্ত হইয়া থাকে। আবার আমেরিকার ন্যায় ইউরোপেও মিশ্র বিদ্যালয়ের আদর বাড়িতেছে। আমরিকার অধিকাংশ বিদ্যালয়েই বালক বালিকাদিগের একত্র অধ্যয়নাদি হইয়া থাকে। ইউরোপেও এই প্রকার হইতেছে। অমিশ্র বিদ্যালয় অপেক্ষা যে, মিশ্রবিদ্যালয়েই বাল্যপ্রেমের চাষ ভাল হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। মুশো ফেরিয়াণীও তাহা বুঝাইতে ছাড়েন নাই। পাশ্চাত্য সমাজে রমণী একুশ বৎসরেও বালিকা,

অষ্টাদশে ত খাস খুকী। পুরুষও একুশে ছোকরা।' পাশ্চাত্য বাল্যেও আমাদের প্রাচ্য যৌবন। আমরিকায় এরূপ বাল্যেও বালক বালিকার একত্র পড়া শুনা, একত্র থাওয়া দাওয়া প্রভৃতি হইয়া থাকে।

এই মিশ্রবিদ্যালাভের দোষগুণ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে; এখনও অনেক আলোচনা হইতেছে। মধ্যে একবার যত মার্কিণ মাতার মতামত লওয়া হইয়াছিল। মতামতের ফর্দ্দ আমরাও দেখিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম, মেয়ে ছেলের একত্র পড়া-শুনায় অনেক ছেলের মা আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়ের মারা প্রায়ই আপত্তি করেন না। সুবিধা উপযোগিতা দেখাইবার জন্য অধিকাংশ মেয়ের মাই বলিয়াছিলেন,—

"মেয়ে ছেলের এক স্কুলে—এক কলেজে,—একত্র পড়া-শুনা হওয়ায় একটা বড় উপকার হইয়াছে। মেয়েদের বিবাহের জন্য আর আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইতেছে না। বুদ্ধিমতী কন্যারা বিদ্যালয়ে আপনারাই মনের মত বর বাছিয়া লয়। বিবাহের পরও সুখে কালযাপন করে। যেখানে প্রেমের পরিণাম মন্দ হয়—মিলন বিবাহে পরিণত না হয়, সেখানে কিঞ্চিৎ কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এরূপ ঘটনা অল্পই হইয়া থাকে। আর সমাজে এরূপ ব্যতিক্রম চিরকালই আছে—চিরকালই থাকিবে। অতএব, আমাদের মার্কিণ রাজ্যের মিশ্রবিদ্যালয়ে উপকারই হইতেছে।"

ছেলের মারা কিন্তু মিশ্র-বিদ্যালয়ের তাদৃশ গুণগান করিতে পারেন নাই। ছেলে অঘরে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া, অনেক জনক জননী গুরুতর মনঃকষ্ট পাইতেছেন। "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" বলা মুখে যত সহজ, কাজে তত নহে। ফরাসি-লেখক ফেরিয়াণী এবার অনেকের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের বাল্য-বিদ্যাসুন্দর যাঁহারা না দেখিয়াছেন, এবার তাঁহাদেরও অনেকে দেখিতে পাইবেন।

বাল্য-প্রেমের প্রখরতা দেখিয়া ফেরিয়াণী বিস্মিত হন নাই, কিন্তু ষ্টেড সাহেবকে বিস্মিত হইতে হইয়াছে। "পেলমেলে" তিনি যখন "মেডেন ট্রিবিউট" লিখিয়াছিলেন, তখন কেবল পুরুষকেই পাপ-সাগরের হাঙ্গর কুম্ভীর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বালিকাদিগকে নক্রগ্রস্ত নিরীহ প্রোষ্ঠী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। দশমবর্ষীয় পাশ্চাত্য বালিকারাও প্রেম জানে, প্রেম করে, প্রেমের প্রতিহিংসা বুঝে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে, চরিতার্থ

ইহা ষ্টেড সাহেব পূর্ব্বে বুঝেন নাই। তাই এখন তিনিও বিস্ময়-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন।

হাবুডুবু অনেকেই খাইতেছেন। ওদিকে সমাজ পাপের প্লাবনে প্লাবিত, এদিকে সমাজিকেরা হাবুডুবু খাইতেছেন। অনেকেই দিশাহারা, অনেকেই অন্ধকার দেখিতেছেন। হিন্দু দূরে বসিয়া দেখিতেছেন, আর হাসিতেছেন। হিন্দু জানেন,—

"ঘৃতকুম্ভসমা নারী, তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাদ্ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ।"

পাশ্চাত্য সমাজে আগুনের উপর ঘৃত-কলস, তাহাতে আবার অবাধ স্বাধীনতার প্রবল বাতাস। সমাজ যদি ছারখার না হয়, তবে সমাজ অমর!

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

মাতৃভাষা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর ভাব।

আমাদের কোন বন্ধু এক দিবস জনৈক ইংরাজী-শিক্ষিত উচ্চপদস্থ মান্যগণ্য ব্যক্তিকে বাঙ্গালা সাহিত্য-সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ করায়, তিনি অম্লানবদনে বলেন, "আমি কিরূপে উক্ত সভায় যোগ দিতে পারি? আমি ত বাঙ্গালা জানি না।" ঐরূপ আমরাও একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উচ্চোপাধিধারী বাবুকে বলিতে শুনি, "অমুক সভাতে আমাকে বাঙ্গালাতে কিছু বলিতে হয়, আমি ভাল পারি নাই। ইংরাজী হইলে ভাল পারিতাম, বাঙ্গালাতে বলা আমাদের পক্ষে মুস্কিল।" এই ত গেল এক শ্রেণীর বাঙ্গালী। কোন সভাতে দু' কথা বলিবার জন্য আমি নিমন্ত্রিত হই, অবশ্য বাঙ্গালা সভা, কাজেই বাঙ্গালাতে বলিতে হইবে। এই সংবাদ শ্রবণে আমার কতিপয় বন্ধু আসিয়া আমাকে অনুযোগ করেন, "এ কিরূপ কথা! আপনি প্রকাশ্য সভায় বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করিবেন! আপনাকে এরূপ অনুরোধ করাও অন্যায়।" তদুত্তরে আমি আর কি বলিব? আমি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদিগকে বলিলাম, "তা ত বটে। অত্যন্ত অসঙ্গত! এমন কাজ কি মানুষে করে? ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। কোন্ সাহসে, কি বুঝিয়া তাঁহারা আমাকে ওরূপ নিমন্ত্রণ দিয়াছেন, জানি না।" বলা বাহুল্য, বন্ধুগণ একটু অপ্রস্তুত হইলেন।

অধিকাংশ সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণই আমাদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি এবম্বিধ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যাঁহারা বিলাতফেরত, লোকে তাঁহাদিগেরই প্রতি এ সম্বন্ধে বেশী দোষারোপ করে। ঐ সকল ইউরোপীয়ভাবাপন্ন মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করি, পাশ্চত্য জগতে যদি কোন শিক্ষিত সভ্য জর্ম্মণ বা ফরাসী তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে বলেন, তিনি মাতৃভাষাতে ভাল কথাবার্ত্তা—আলাপ আপ্যায়িত করিতে অপটু, তাহা হইলে তাঁহার সমাজের লোক তাঁহাকে কি চক্ষে দেখে? উন্মত্ত বাতুল ভিন্ন আর কোন আখ্যা তিনি প্রাপ্ত হন না। কিন্তু এই বিষয়ে অবনতি যে সুদ্ধ তাঁহাদেরই হইয়াছে, এমত নহে। কি জানি, কোন্ বিভীষিকা আমাদের অসহায় হতভাগা দেশকে আক্রমণ করিয়াছে যে, আপামর সাধারণেরও এই ধারণা যে, যিনি যত মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন, তিনি তত বড় লোক। কিছুকাল পূর্ব্বে এমন ছিল যে, বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানি না বলিলে, গৌরব প্রকাশ পাইত, অর্থাৎ বাবু ইংরাজীতে এতই পরিপক্ব যে, মাতৃভাষা একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে ইংরাজী ভিন্ন বাঙ্গালাতে পত্রাদি লেখা মহাদোষের কথা ছিল। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা কেবলমাত্র বি-এল-এ রে পড়িয়া, কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে উক্ত ব্যাধির বেশী প্রকোপ দেখা যাইত। ঐ শ্রেণীর ইংরাজীনবিস কেরাণী যে এখন আর নাই, এমত নহে, এখনও অনেক কেরাণীবাবুর মাতৃভাষাতে পত্রাদি লেখার অক্ষমতা দৃষ্ট হয়।

দেশের চাপরাসী পেয়াদা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরও এ প্রকার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে যে, বিলাত-ফেরত হ্যাট-কোট-পরিধায়ী বাঙ্গালীবাবুকে কোন ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে দেখিলে, তাহারা মনে মনে ঘৃণা না করিয়া থাকে না, ভাবে যে, বাবু এখনও বাঙ্গালাভাষা একবারে ভুলিতে পারেন নাই, তবে ইনি কি রকম পুরা-সাহেব হইয়াছেন? সাহেবীকৃত বাবুরাও নালিস করিয়া থাকেন, শুনা গিয়াছে যে, কালেভদ্রে কখন বাঙ্গালা কথা ব্যবহার করিলে চাপরাসী পেয়াদা প্রভৃতির নিকট হতমান হইতে হয়।

বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে যাহাদিগকে সর্ব্বদা ইংরাজী ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহারা বলেন যে, বাঙ্গালা কথা মুখে উচ্চারণ করাও তাঁহাদের উচিত

নয়, যদি কার্য্যক্ষেত্রে কখন বাধ্য হইয়া বাঙ্গালীর নাম কি অন্য কোন দেশীয় কথা উল্লেখ করিতে হয়, তাহাও ইংরাজীধরণে করা কর্ত্তব্য। ইহার দুইটী কারণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথম—দেশীয় নাম বা কথা সোজাসুজি উচ্চারণ করিলে শ্রোতৃবর্গ তাঁহাদিগকে নেহাৎ ভোতা বাঙ্গালী মনে করিতে পারে, সেটা ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকর; দ্বিতীয়—বাঙ্গালাভাবে বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণ করিলে অভ্যাস খারাপ হইয়া যায়, ইংরাজীধরণে বাঁটা আসে। হাইকোর্টে এবং তত্রত্য বার-লাইব্রেরিতে * এ সম্বন্ধে অনেক রহস্য প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। †

---

* কলিকাতার বার-লাইব্রেরি (Calcutta Bar-Library) বলিতে কেবলমাত্র ব্যারিষ্টরদিগের আড্ডাই বুঝায়, কলিকাতা বার (Calcutta Bar) বলিতে শুদ্ধ হাইকোর্টের আদিম বিভাগীয় (Original Side) ব্যবহারাজীবগণকেই বুঝাইয়া থাকে। হাইকোর্টের উকীলেরা কেবল মফস্বলের মকর্দ্দমা লইয়া আপীল আদালতেই কার্য্য করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

† বিচারকালীন জজদিগের সমক্ষে এবং উক্ত লাইব্রেরিতে দেশীয় শব্দ সমূহের যেরূপ উচ্চারণ শুনা গিয়াছে, যথাযথ নিম্নে দেওয়া গেল; যদিও দীনহীনা ক্ষীণা বঙ্গভাষায় ঠিকঠাক প্রকাশ করা অসম্ভব, তত্রাচ যথাসাধ্য লিখিত হইল। পাঠক মহোদয়! ইংরাজী কয়দা মোতাবেক সুরটা একটু মোটা করিয়া গুছাইয়া লইবেন;—

ছোক্‌রা!—"চোক্‌রে!" ভৃত্যদিগকে কোন কাজের জন্য ডাকিবার কালীন সম্বোধন। তাহাদের কর্ণও এরূপ সাধা যে, সহজ শব্দে নরম সুরে ডাকিলে শীঘ্র সাড়া পাওয়া দুষ্কর। মিষ্ট বচন অপদার্থের ব্যবহার্য্য বলিয়া বড় গ্রাহ্যও হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্যাধির মূল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত।

দেসালাই—"ডিঅ্যাস্‌লাই"।

চন্দননগর—"শ্যান্ন্যাগোর"।

পূর্ণিয়া—"পাড়্‌নিয়া"।

পাটনা—"প্যাট্‌না"।

অযোধ্যা—"আজুডিয়া"।

কেবর্ত্ত—"ক্যাইভ্যাট্‌"।

দীননাথ ধর—"ডীন্যান্যাট্‌ ঢাএ"।

এই প্রকারে দুর্ব্বলা মাতৃভাষার মস্তকে ক্রমাগত লগুড়াঘাত করিলে তাঁহার প্রাণ কত দিন দেহে থাকিতে পারে? তিনি যদি এতই অপ্রিয় হইয়া থাকেন, দগ্ধিয়া মারিবার প্রয়োজন দেখি না, হাত পা বাঁধিয়া গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করতঃ বীরোচিত ইংরাজীভাষাকে তাঁহার স্থানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেই সব লেঠা চুকিয়া যায়। মাঝামাঝি এরূপ বন্দোবস্ত কোনক্রমেই শুভফলপ্রদ নয়।

একটী গল্প মনে পড়িল। সেকালে গোপালনামীয় একজন পাড়াগেঁয়ে ছোক্‌রা কলিকাতায় আসিয়া সাহেবদের বাড়ী টানাপাখা দেখিয়া গিয়া, তাহার সখ হয়, সেও তদ্রূপ পাখা টাঙ্গাইয়া বিলাস-সুখ-সম্ভোগ করিবে। একখানি ক্ষুদ্র খোড়োঘরে বাস, তাহাতেই বন্দোবস্ত করা চাই। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধা বিধবা পিসি-মা সম্বল, এতদ্ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কেহ নাই। পাখা প্রস্তত করিবার উপকরণেরও অভাব, অগত্যা ঘরের আগড়খানিতে কাপড় জড়াইয়া পাখা তৈয়ার হইল। পাখা ঘরের আড়ায় ঝুলাইয়া তাহার নীচে একখানি ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া গোপাল শয়ন করিল। পিসিমার একমাত্র আদুরে ভাইপো, তিনি তাহার সকল প্রকার আব্দারই অম্লানবদনে সহ্য করিয়া থাকেন, অগত্যা তাঁহারই প্রতি পাখাটানার ভার পড়িল। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই চারিবার টানিতে টানিতে আগড়পাখা রজ্জুচ্যুত হইয়া চক্ষুমুদ্রিত চিৎপাতাবস্থায় শয়ান গোপালের নাসিকার উপরে পতিত, অমনি নাসা হইতে রক্ত প্রবাহিত, গোপাল অচৈতন্য। পিসিমার সে সময়কার অবস্থা পাঠক অনুভব করিয়া লউন, বর্ণনা

ক্ষান্তমণি শাঁখারিণী—"ক্যান্টাম্যানি স্যাংক্যারীণি"।

অবশ্য জিহ্বার স্বাভাবিক আড়্‌বশত সাহেবেরা ত অপার্য্যমানে ঐ প্রকার উচ্চারণ করিয়াই থাকেন, আমি বলিতেছি, তদনুকরণে দেশীয় কৌন্স্‌লীদের কথা। বাঙ্গালীর মুখে সুকোমল কণ্ঠে শ্বেতকায় পুরুষগণের রসনা যেমন স্থূল, স্বরও তেমনি মোটা; সহস্র চেষ্টাতেও সেটা অনুকরণ করিয়া সর্ব্বদা চলা কঠিন, কাজেই কণ্ঠ কোমলই থাকিয়া গিয়াছে। মোলায়েম বাঙ্গালা শব্দসমূহের ওরূপ বিজাতীয় বিকট বিকৃত উচ্চারণ শুনিয়া, বাঙ্গালী জজদের সময়ে সময়ে বুঝিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়, দেখা গিয়াছে।

অনাবশ্যক। প্রচণ্ড দ্বিপ্রহর রৌদ্রে রোরুদ্যমানা বৃদ্ধা চীৎকারস্বরে গ্রামের লোকের দ্বারস্থ হইয়া, সকাতরে সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, "পাখা পড়িয়া আমার গোপালের নাক ভাঙ্গিয়া রক্ত ছুটিতেছে, তোমরা ছেলেকে বাঁচাও।" অজ পল্লীগ্রামের লোক বুড়ীর কথা কিছুই বুঝিতে পারে না, পাখা সম্বন্ধে তাহাদের যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তাহাতে তাহাদের বোধগম্য হওয়াও মুস্কিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, ব্যাপারখানা কি? পাখা অতি ক্ষুদ্র হাল্কা জিনিষ, তাহা পড়িয়া এ প্রকার দারুণ আঘাতের সম্ভাবনা কোথায়? তার পর, উহা উচ্চস্থান হইতে নাকের উপর পড়িল কিরূপে? অবশেষে পিসিমার অনুনয় বিনয়ে এবং কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে সকলে বৃদ্ধার কুটীরে আসিয়া সমস্ত অবস্থা দেখিয়া, বিষয়টা বুঝিলেন। অতঃপর অনেক শুশ্রূষার পর গোপাল ভাল হইয়া আক্কেল লাভ করিল।

এরূপ অযোগ্যতাসত্ত্বে অনুকরণপ্রিয়তার ফলে অনেককে অনেক সময় বিষম বিপদে পড়িতে হইয়াছে। সাধারণ কথায় বলে, "যার কর্ম্ম তারে সাজে, গাধার পিঠে লাঠি বাজে।" তাই বলিতেছি, সাধ করিয়া এরূপ সং সাজিতে গিয়া গোপালের মত আমাদের নাক ভাঙ্গিয়া রক্তপাত না হয়। ইংরাজেরা যে দ, ত, প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে অক্ষম বলিয়া আমাদের শব্দগুলিকে ওরূপ বিকৃত করিয়া ফেলেন, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন। উহাঁরা এ কথা সাধারণে প্রকাশ করিতে লজ্জিত নন যে, উত্তরখণ্ডের ইউরোপীয়গণ উচ্চারণ সম্বন্ধে বিলক্ষণ অপটু, উহা তাঁহাদের রসনার দোষ। দক্ষিণ ইউরোপের অধিবাসিগণ ত আমাদের মত সকল বর্ণ সুন্দররূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন।. আমরা, ক্ষমতাসত্ত্বেও কেন যে এ বিষয়ে ইংরাজদের অনুকরণ করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইব, বুঝি না।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ন—আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রবিগঞ্জ নগরের প্রান্তভাগে সূর্য্যকান্ত উকিলের প্রকাণ্ড উদ্যানবাটিকা। তথায় দুইটী বালিকা পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতেছে। বালিকাদ্বয় গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধাদি ফুল দ্বারা আঁচল পরিপূর্ণ করিতেছে এবং মনের সুখে আপনাপন প্রাণের কথা পরস্পরের নিকট বলিতেছে। সে সময় বসন্তকাল। ঋতুরাজের সম্পূর্ণ বিকাশ প্রভাবে প্রকৃতিদেবী মনোহর সাজে সজ্জিতা হইয়া যেন হাস্য করিতেছেন। তখনও সম্পূর্ণ সন্ধ্যা হয় নাই;—অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেব রক্তাভ সোণার থালারূপে পশ্চিমদিকে চলিয়া পড়িতেছেন—যেন হ্রস্বতেজঃ হইয়া ম্লানমুখে বিদায় লইতেছেন। তাঁহার তিরোধানান্তর নীলাম্বরী সন্ধ্যাসতী যথাসময়ে সংসার আসরে নামিলেন। ঋতুরাজ সন্ধ্যা সম্মিলনে অধিকতর সুন্দর রূপ ধরিলেন। পক্ষিকুল উদ্বেগব্যঞ্জকস্বরে কুলায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কোরককুল সান্ধ্য সমীরস্পর্শে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। বাবুকুল করধৃত যষ্টিসহ বায়ুসেবনার্থ বহির্নির্গত হইলেন; অবস্থা অবস্থাপন্ন সভুঁড়ি বাবু-সাহেবগণ ফিটন টম্‌টম্ বাহনে ধাবমান। আর একদিকে বাঙ্গালীকুলভূষণ শ্বেতাঙ্গচরণক্ষুরানুগৃহীত, কদাচিৎ কর্ণযুগলমর্দ্দনসহিষ্ণু কেরাণীকুল খসিত-ঠুলি, ঘানিমুক্ত বলদদলের ন্যায় উল্লাস বিস্ফারিত তাম্বুলরঞ্জিত দন্তে স্বীয় দুঃখের সুখের গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছেন। এদিকে মহিলামহলে কেহ সলিতা পাকাইতেছেন, কেহ চুল বাঁধাইতেছেন, কেহবা আয়না সম্মুখে রাখিয়া স্বয়ং কেশবিন্যাস করিতেছেন; এবং স্বীয় মুখশ্রী দর্শনে প্রীতা হইয়া অধরে দন্ত টিপিয়া হাস্য চাপিতেছেন। কোনও কোন নিষ্কর্ম্মা সুন্দরীর দল খোসগল্প উপভোগ করিতেছেন।

পুষ্প-চয়ন-ব্যস্তা বালিকা দুইটির মধ্যে একটীর নাম নির্ম্মলা এবং অপরটীর নাম চপলা। নির্ম্মলার বয়স নয় এবং চপলার বয়স আট বৎসর। তাহাদের বালিকাসুলভ কথাবার্ত্তা পাঠক-পাঠিকার তাদৃশ চিত্তাকর্ষক হইবে না বিবেচনা করিয়া, আমরা তাহাদের সমুদয় কথোপকথন বিবৃত করিতে নিরস্ত হইলাম; কিন্তু তাহাদের দুই একটী কথা যাহা পাঠকপাঠিকার আমোদদায়ক হইতে পারে, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

নির্ম্মলা।—ভাই! এইরূপ দুইজনে একসঙ্গে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথা ত আমাদের অদৃষ্টে আর বেশী দিন নাই,—তোমার যে শীঘ্রই বিবাহ হইবে;—তখন কাহার সহিত খেলা করিব? ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। ভাই, তোমাকে কাল যাহারা দেখিতে আসিবে বলিয়াছিল, তাহারা আসিয়াছিল কি?

চপলা।—হাঁ ভাই! কাল তাহারা আমাকে দেখিয়া গিয়াছে। বাবার নিকট না কি বলিয়াছে,—সব স্থির হইয়া গেল, এই মাসের মধ্যেই আমার বিবাহ হইবে।

নির্ম্মলা চপলার কথায় একটু হাসিল; কিন্তু সে হাসি বড় ক্ষণিক, তখনি মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল, যেন সে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ। তাহার কথায় সঙ্গিনীকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া এবং তাহার মুখভাব নিরীক্ষণ করিয়া চপলা বলিল, "কেন ভাই! তুমি কি আমার বিবাহ সংবাদে সুখী হইলে না?"

নির্ম্মলা।—ভাই, তোমার বিবাহ হইবে, তাহা সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তোমার সহিত আর খেলা করিতে পাইব না, তোমায় আর তেমন সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাইব না, ইহা ভাবিয়া বড় কষ্ট হইল। কেন, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে ভাবিয়া কি তোমার কষ্ট হয় না?

চপলা।—ঈষৎ হাস্যযুক্ত প্রফুল্লবদনে উত্তর করিল,—"হাঁ ভাই, তা কষ্ট হয় বৈ কি, কিন্তু ভাই বিয়ের কথা মনে হইলে আর সে কষ্ট থাকে না। বিবাহ হইলে কেমন নিত্য নূতন কাপড় পরিব, সর্ব্বদা গহনা পরিয়া থাকিব, এবং শ্বশুরবাড়ীতে কত সুখেই না দিন কাটাইব, ইহা ভাবিলে ভাই বড় আনন্দ হয়।"

বিবাহিতা বয়স্থা পাঠিকাগণ বুঝি চপলার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাসিয়া ফেলিলেন। নেহাৎ না হাসিবার কথাও নয়। চপলা এখনও নিতান্ত বালিকা, তাই এমন কথা বলিতেছে। সংসার-মরুভূমির একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, অনন্ত উত্তপ্ত বালুকারাশি মধ্যে চপলার বুঝি স্নিগ্ধ জলাশয়ভ্রম হইতেছে। সংসার-মরুতে ভ্রমণকালে পথিককে যে কি পরিমাণে সম্বলের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিতে হয়, চপলার ত সে জ্ঞান আদৌ নাই; কাজেই চপলার দূর হইতে বেচারী আশামরীচিকা দ্বারা প্রলুব্ধ।

হে ক্ষুদ্র বালিকে! তুমি নিতান্ত কোরক, তাই সংসারে বস্ত্রালঙ্কার মাত্রকে সুখদায়ক পদার্থ মনে করিতেছ। যদি তাহাই হইত, তবে রত্নগর্ভা সমুদ্র হইতে সর্ব্বদা ক্রন্দন রোল উঠিবে কেন? আর স্বর্ণখনিরই বা এত ম্লানমুখ কেন?

নির্ম্মলা কিন্তু বন্ধুর কথা শুনিয়া অধিকতর ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"ছি ভাই, তোমার কি পিতা-মাতা ভাই-ভগ্নী অপেক্ষা শ্বশুরবাড়ী গিয়া ভাল গহনা কাপড় পরিয়া, বসিয়া থাকিতে এত ভাল লাগে ?"

নির্ম্মলার কথা শেষ হইতে না হইতে একটী ষোড়শী রূপসী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ষোড়শী সূর্য্যকান্ত বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলার দিদি; নাম সরলা, উভয় ভগ্নীর মুখাবয়বে বিশেষ সৌসাদৃশ্য ছিল। উভয়েরই সুকুঞ্চিত সুদীর্ঘ কেশভার; কেশতলে উভয়েরই ললাট অতি সুগোল, অতি সুঠাম, তপ্তহেমাভনিন্দিত গণ্ডদ্বয়, উভয়েরই মনোহর গোলাপদল সদৃশ ওষ্ঠদ্বয় স্বভাবতঃ তাম্বুলরঞ্জিতবৎ; উভয়েরই অপ্সরাদুর্ল্লভ ঈষদ্বঙ্কিম চক্ষু দুইটী অতি সুদর্শন, অতি মধুময়, অতি আবেশময়, অতি সরলতাময়। পাঠক! সে সর্ব্বদা প্রফুল্ল, সদা হাস্যময়, জ্যোতির্ম্ময় অথচ কোমল চিত্র দুইখানি কেমন করিয়া তোমার সমক্ষে আঁকিয়া ধরিব? সে যে লেখনীশক্তিবহির্ভূত।— বঙ্কিমচন্দ্রের রমণীরূপ লিখনবিজয়ী লেখনী আজ বহুল বর্ণ বৈচিত্র্যে এই বালিকার ও যুবতীর রূপরাশি পটস্থ করিতে উদ্যত হইলেও বুঝি কৃতকার্য্য হইত না। সেই অনুপম কেশমহিমা, সেই সস্মিত বিকশিত মুক্তাপংক্তি তুল্য দন্তসৌন্দর্য্য, সেই সুলিখিত চিত্রবৎ ঈষদ্বক্রিম ওষ্ঠাধর, সেই চারু চিত্রের-সুগঠিত নির্দ্দোষ নাসিকা, সেই পুষ্পমণ্ডিত লতাবৎ বাহুযুগল, সর্ব্বোপরি যুবতীর সেই প্রস্ফুটিত চম্পক পুষ্পভাব এবং বালিকার সেই অবিকশিত কোরকভাব লিখিয়া দেখাইবার নহে। পাঠক-পাঠিকে! সেই চিত্র দুইখানি তোমরা মানসপটে যথাসাধ্য অঙ্কিত করিয়া সন্তুষ্ট হও।

সরলাকে দেখিয়া নির্ম্মলা বলিল, "দিদি! দেখ ত আজ আমরা কেমন সুন্দর মালা গাঁথিতেছি।"

সরলা।—বাহিরে দাঁড়াইয়া আর মালা গাঁথিতে হইবে না, ঠাণ্ডা লাগিয়া যখন অসুখ করিবে,—বাড়ী চল, এস চপলা, তোমাকেও বাড়ী রাখিয়া আসি, আর ঠাণ্ডা লাগাইও না, তুমি সে দিন জ্বর হইতে উঠিয়াছ।

নির্ম্মলা মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সরলা চপলাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতে গেলেন। চপলাদের বাড়ী বড় দূর নহে,—সূর্য্যকান্ত বাবুর বাগানের পশ্চাদ্দিক্ দিয়া একটী ছোট রাস্তা আছে, সেই রাস্তার অপর পার্শ্বে চপলাদের বাড়ী। উক্ত রাস্তার ধারে একটী অত্যন্ত প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। বালক-বালিকা-মহলে এই অশ্বত্থবৃক্ষ সম্বন্ধে অনেকা-

নেক অদ্ভুত ভীতিকর উপাখ্যান প্রচলিত। চতুর্দ্দিকস্থ বালক-বালিকার এবং অনেক প্রৌঢ়ারও মতে এই অশ্বত্থ গাছটী অসংখ্য ভূত-পেত্নীর আবাস এবং লীলাস্থল। ক্বচিৎ-সত্যভাষিণী এবং তিলকে-তালকারিণী ঝি-প্রমুখ প্রৌঢ়া-রমণীগণের কল্পনাকৌশলে ঐ বৃক্ষ সম্বন্ধে নিয়তই নূতন বিস্ময়কর এবং ভয়াবহ সংবাদ সালঙ্কারবাক্যবিন্যাসে প্রচারিত হইত; সুতরাং এরূপ অবস্থায় চপলা কোন্ সাহসে একাকী সেই গাছের পাশ দিয়া যাইবে? সূর্য্যকান্ত বাবুর কোন চাকর বা চাকরাণী এইজন্য প্রতিদিন চপলাকে বাটী রাখিয়া যাইত। [ক্রমশঃ]

শ্রীমতী সেন-গৃহিণী।

মার্কিণ-বাণিজ্য।

ইংরাজী গণনায় আমেরিকার বয়ঃক্রম চারিশত দশবৎসর মাত্র; মহানুভব বীরপ্রবর জর্জ ওয়াসিংটনের মহত্ত্বপ্রভাবে এই মহাদেশের অধিকাংশে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত। রাজ্য অবশ্যই সৌভাগ্যশালী, প্রণালীও সন্তোষ-দায়িনী, সর্ব্বোপরি এতদ্ রাজ্যের বাণিজ্য-ফলাফল শুভ। মার্কিণ-সাধারণ তন্ত্রের কন্সল জেনারল শ্রীযুক্ত আর, এফ প্যাটারসন সাহেব ইঁ প্রতি এতৎনগরীয় চৈতন্য লাইব্রেরীর দ্বাদশবার্ষিক উৎসবে যে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে মার্কিণ বাণিজ্য বিস্তারের অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক সেই বর্ণনা শ্রবণ করিলে জগতের সমগ্র বৈষয়িক সংসার আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। বাণিজ্যলক্ষ্মীর গৌরব যাঁহারা ভালবাসেন, মার্কিণ গৌরবে তাঁহারা অবশ্যই আপনাদিগকে মহাগৌরবান্বিত মনে করিবেন। মহানুভব জেনারেল প্যাটারসনের বর্ণনার সারাংশ সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এই স্থলে বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইল।

অল্পকালের মধ্যে এই রাজ্যের বাণিজ্য শনৈঃ শনৈঃ উন্নত সোপানে আরোহণ করিতেছে। বর্ষে বর্ষে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি। তথাকার ভূমিলক্ষ্মী যাহা প্রসব করেন, প্রজালোকের যত্নে ও অধ্যবসায়ে বর্ষে বর্ষে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, তদ্ব্যতীত কারিকরলোকেরা বিবিধ যন্ত্রাদি সাহায্যে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করেন, সংসারে যাহা শিল্পজাত দ্রব্যনামে অভিহিত, তাহার পরিমাণ আশাতীত, উচ্চ শিল্পজাতের মধ্যে অধিকাংশই মানব-সংসারের নিত্য ব্যবহার উপযোগী, বাহ্য আকারে দেখিতেও অতি সুন্দর। দেশের উদ্বৃত্ত দ্রব্য দেশে রাখিলে

বাণিজ্যের গৌরব রক্ষা হয় না, দেশের অভাব পুরণার্থ অপর দেশের উৎপন্ন দ্রব্য আনয়ন না করিলে বাণিজ্যাঙ্গের পূর্ণতা রক্ষিত হয় না, এই কারণে বাণিজ্য সংসারে আমদানী রপ্তানীর আবশ্যকতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্যাটারসন সাহেব আপন দেশের আমদানী রপ্তানীর উত্তম আলোচনা করিয়া নিরপেক্ষ তুলনা দেখাইয়া দিয়াছেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাখণ্ডের সংযুক্ত রাজ্যের মোট আমদানী দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ ৮৩ কোটী ডলার। ১৮৯৯ অব্দ অপেক্ষা ইহা তিন কোটী ডলার বেশী। আধিক্যের পরিমাণ শতকরা হিসাবে ৩৷৹ সাড়ে তিন ডলার। *

রপ্তানী অতুল্য। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ১৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের বহুবিধ দ্রব্য পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২০ কোটি ২৪ লক্ষ ডলার অধিক; গড়ে শতকরা ১৩ ডলার অপেক্ষাও বেশী। এ প্রকার রপ্তানীর অঙ্ক জগতের অপর কোন রাজ্যের বাণিজ্য বিবরণীতে পরিলক্ষিত হয় না। ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদি এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে শেষোক্ত দ্রব্যের রপ্তানী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মোট রপ্তানীর শতকরা প্রায় সাড়ে ৩১ অংশ, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শতকরা ৩০ দশমিক ৮৯ অংশ। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২৪ দশমিক ৯৬ অংশ ছিল। তিন বৎসর মধ্যে কতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে, বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্যাটারসন বলেন, চীনদেশে অশান্তি উপস্থিত হওয়াতে বৎসরের শেষে আমেরিকা হইতে তথায় অত্যধিক শস্যাদি রপ্তানী করিতে হইয়াছিল, তাহা না হইলে শিল্পজাত দ্রব্যাদির শতকরা পরিমাণ আরও অনেক বেশী হইত। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে শিল্পের উপযোগী দ্রব্য শতকরা ৪৫ অংশ; পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ইহার পরিমাণ শতকরা ৩৫ অংশ বেশী।

বক্তা মহাশয় বলিয়াছেন, আজকাল আমরা আমাদের স্বদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য সমধিক পরিমাণে বিদেশে প্রেরণ করিতেছি, অপরাপর দেশের শিল্পজাত দ্রব্য আমরা অধুনা অল্পই গ্রহণ করিতেছি; এই কারণে আমাদের বাণিজ্য-বাজারে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি অধিক। বিশেষতঃ আমাদের এখানকার লৌহ এবং ইস্পাত যেমন প্রচুর, তেমন উৎকৃষ্ট; লৌহ ইস্পাতে গঠিত যন্ত্রাদিও এখানে খুব ভাল হয়। আমরা আশা করিতে পারি, স্বদেশের ব্যবহার

উপযোগী উপাদান দ্রব্যাদি সঞ্চিত রাখিয়াও ঐ দুই ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আমরা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিতে সক্ষম। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমরা ১৩ কোটী ডলার মূল্যের লৌহ ইস্পাত বিদেশে রপ্তানি করিয়াছি; ১৮৯৫ অব্দে ৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলারের অধিক মূল্যের লৌহ ও ইস্পাত রপ্তানী করা যায় নাই। এই সৌভাগ্যের হেতু আমাদের জাতীয় লোকের শ্রম যত্ন এবং অধ্যবসায়। এখানকার জিনিষগুলি ভাল বলিয়া বিদেশী লোকেরা উহা গ্রহণার্থ সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতঃপর আরো অধিক পরিমাণে রপ্তানী করিতে পারিব, এমন আশা রাখি।

বর্ণনা শ্রবণ করিয়া যথার্থই আমরা বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছি। জেনারল প্যাটারসন শ্লাঘা করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যথার্থই মহা-গৌরব সূচিত হয়। হেতু সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিটিও নিঃসংশয় সমীচীন। দেশীয় লোকের শ্রম যত্ন ও অধ্যবসায় এই অসাধারণ উন্নতির প্রকৃষ্ট কারণ, তাহার উপর কারিকরগণের প্রশংসনীয় নৈপুণ্য। আমরা তাঁহাদিগের শ্রমশীলতার এবং শিল্পনৈপুণ্যতার নামে শত শত সাধুবাদ অর্পণ করিতেছি।

বাণিজ্যেই কমলার বাস, ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির শাস্ত্রসিদ্ধ, প্রমাণসিদ্ধ এবং প্রকৃতি সিদ্ধ। জগতের যে যে জাতি কায়মনোবাক্যে বাণিজ্য লক্ষ্মীর পূজা করেন, নিত্য সৌভাগ্য তাঁহাদের করতলগত। ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যের মুখ্যকেন্দ্র হইলেও ভারতবর্ষীয়েরা তদ্বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, মার্কিণের দৃষ্টান্তে ভারতবাসীগণ সাগ্রহে সজাগ হইয়া উঠেন, ইহাই প্রার্থনীয়। প্যাটারসন বলিয়াছেন, পূর্ব্বে পূর্ব্বে জর্ম্মণী এবং গ্রেট বৃটন রপ্তানী বাণিজ্যে প্রধান ছিলেন, মার্কিণের সহিত তুলনায় ইদানীং তাঁহাদের সে গৌরব অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে। সাধ্যানুসারে বাণিজ্যসিদ্ধিকল্পে কোনদেশের খর্ব্বতা না থাকে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই আমরা প্রত্যাশা করি।

আমাদের ভবিষ্য পুরাণ

এবং

বর্ত্তমান সভ্যতা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাণশাস্ত্রাদিতে সভ্যতা শব্দটীর কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। সভ্যতাকে যদি সজীব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সভ্যতার চলৎশক্তি আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়; স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান সভ্যতাটী পদব্রজে ভারতবর্ষে আগমন করে নাই, একথা আমরা অবশ্যই বলিব; কেননা, এ সভ্যতা জাহাজে চড়িয়া আসিয়া ভারত-ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এই বঙ্গ-দেশেই ইহার আধিপত্য অধিক। যেখানে আধিপত্য, সেইখানেই আদর, সুতরাং বঙ্গদেশে নব-সভ্যতার আদরও অধিক। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী শব্দ উত্থিত হইয়াছে, তাহার নাম উন্নতি। বঙ্গীয় যুবকগণের নবীন মুখে প্রায় সর্ব্বদাই শুনা যায়, নব সভ্যতার আগমনে এতদ্দেশে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইতেছে। পুস্তকে পত্রিকায় বক্তৃতায় সর্ব্বত্রই উন্নতি উন্নতি এই শব্দের ধ্বনি প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়।

গৌরবের কথা বটে। এ গৌরব স্থায়ী হইলে আমরা অবশ্যই একদিন পৃথিবীমধ্যে আধুনিক সভ্যজাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারিব, এমন আশাও করা যায়। আমাদের অভিজ্ঞতার অভাব আছে, জ্ঞানানুসারে বিচার শক্তির অভাব আছে, ভালমন্দ দেখিয়া তুলনা করিবার শক্তিরও অভাব আছে; কিন্তু যদি বর্ত্তমান উন্নতির রূপ ভাল করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে মনে মনে আমরা অনেক বিষয়ে অনেকবার হতাশ হইয়া পড়ি।

প্রথমতঃ ধরুন ধর্ম্ম; প্রাচীন কালাবধি ধর্ম্মজীবন ভারতবর্ষে ধর্ম্মের যে প্রকার সুপবিত্র উদারভাব ছিল, এখন আর সেই আকাঙ্ক্ষনীয় ভাবটী প্রায়ই নয়নগোচর হয় না। তর্ক-বিতর্কে, রুচি প্রভেদে, ইচ্ছা বিশেষে অথবা প্রতিষ্ঠালাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় ইদানীং অনেকে অনেক প্রকার সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। সম্প্রদায় অনেক বাড়িয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; সৌভাগ্যক্রমে যে সভ্যতার দোহাই দিয়া বঙ্গদেশ এখন চলিতেছে, সে সভ্যতা এই সম্প্রদায় বৃদ্ধির তুফানে অনুমোদন করে না। নব সভ্যতার একটী নূতন নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা। এই ঊনবিংশ শতাব্দী

আমাদের নহে। এ জিনিসটি যাঁহাদের, তাঁহারা সমুদ্রপারে অবস্থান করেন। পরমেশ্বরের একটি ঔরস পুত্র কল্পনা করিয়া, তাঁহারা সেই পুত্রটির উপাসক হইয়াছেন। তিনিই গুরু, তিনিই উপদেষ্টা এবং তিনিই জগতের মুক্তিদাতা পরিত্রাণ কর্ত্তা। তাঁহার উপাসনা ভিন্ন অপর দেবদেবীর উপাসনা যাহারা করে, তাহারা বর্ব্বর, নবসভ্যতা মুক্তকণ্ঠে ইহাই কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কেবল সভ্যতার মুখে কীর্ত্তন নহে, পর্ব্বতশিখরে মূর্ত্তিমান ঈশ্বরের মুখে ধর্ম্মাত্মা মুষা যে দশবিধ আজ্ঞা শুনিয়াছিলেন, সেই দশ আজ্ঞার মধ্যে একটি আজ্ঞা এই যে, "আমার নিকট ভিন্ন আর কাহারও নিকটে জানু নত করিও না।" শাস্ত্রে আছে, পুত্র পিতার প্রতিকৃতি স্বরূপ, সুতরাং পুত্রের নিকটে জানু নত করিলে উক্ত আজ্ঞার অবমাননা করা হয় না, এই কারণেই সেটি এক্ষণে ব্যতিরেক উদাহরণ। সভ্যতার স্রোতে যত প্রকার নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারা সকলেই উপ-ধর্ম্মের সেবক, সভ্যতা কেবল সেই কথাই বলে। সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে মস্তকে রাখিয়া আমরা নত মস্তকে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলি, তবে ত উপধর্ম্মের একটিকেও উন্নতিসূচক বলিয়া স্বীকার করিলে পাপ হয়। বিচার অগ্রবর্ত্তী হইয়া সকলের কর্ণেই যেন সমস্বরে বলিয়া দিতেছে, ভারতে ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। ধর্ম্মপথে চিত্তকে অটল রাখিতে হয়। এখনকার সভ্যতা পদে পদে সেই অটলতা টলাইয়া দিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাশিক্ষা। পুরাতনকালে ভারতবর্ষে যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা হইত, মুনিঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহারশাস্ত্রে এবং পুরাণশাস্ত্রাদিতে তাহার প্রমাণ আছে। নবসভ্যতা সেই সকল প্রমাণকে পদে পদে খণ্ডন করে। পূর্ব্বে যখন সভ্যতা শব্দ ছিল না, তখন প্রাচীনকালের লোক মাত্রেই অসভ্য বর্ব্বর ছিল, নবসভ্যতাসেবীরা অবশ্যই তাহা বলেন, সুতরাং অসভ্য বর্ব্বর প্রণীত শাস্ত্রাদিও অসভ্য, বিদ্যাশিক্ষা প্রণালীও অসভ্যতার ফল। এখন ইংরাজেরা আমাদের দেশের রাজা হইয়া, তাঁহাদের মাতৃভাষায় আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে সভ্যপ্রণালীতে সুপণ্ডিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; স্থানে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র যুবাকে বিদ্যারত্নমুকুটে সুশোভিত করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। অন্তর্গত আর একটি ফল এই হইতেছে, অসভ্যদিগের অসভ্যভাষার প্রতি এককালে আদর কমিয়া যাইতেছে। ইংরাজী প্রণালীতে অপর শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি দৃষ্ট হয়,

তাহাতে আমরা এক এক সময়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া থাকি। এক্ষণে ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি কথা এইখানে আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। একদা এক বিবাহ-সভায় অনেকগুলি সুশিক্ষিত (!) যুবক একত্র হইয়াছিলেন। এদেশের বিবাহ-সভায়—বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে, পরস্পরের বিদ্যার বিচার হইত, এখন তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। যখনকার কথা আমরা বলিতেছি, তখনও কিছু কিছু চর্চ্চা ছিল। কন্যাযাত্রপক্ষের একজন গুরুমহাশয়—বরযাত্রপক্ষের একজন যুবাকে একটি অঙ্ক কসিতে বলেন, যুবার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর; তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ উপাধিপ্রাপ্ত। অঙ্কটী এই—৫।৶৹ করিয়া মন হইলে ৶৩৸৶৹ তিন সের তের ছটাক জিনিষের দাম কত হয়? বি, এ বাবুটি শ্লেট চাহিলেন। শ্লেট একখানি আনাইয়া দিলেন; সেই সময়ে গুরুমহাশয়ের একটি দশমবর্ষীয় ছাত্র সেইখানে উপস্থিত ছিল, তাহাকেও ঐ প্রশ্নটি করা হইল। বি-এ বাবু—ত্রৈরাশিক মতে বহু অঙ্কপাত করিয়া শরীর হইতে প্রায় অর্দ্ধসের ঘর্ম্ম বাহির করিয়া উত্তর প্রস্তুত করিতেছেন, বালক এদিকে তিন চারবার মুখ নাড়িয়া অঙ্গুলির পর্ব্ব গণিয়া দশমিনিটের মধ্যে উত্তর বলিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে বি-এ বাবুর ত্রৈরাশিকের ফলেও ঠিক তাহাই মিলিল, কেবল বিভিন্ন এই রহিল যে, উত্তরাঙ্কের শেষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রটি কিছু ভগ্নাংশ রাখিলেন, বালক তাহা অসভ্য রীতিতে গণ্ডা কড়া ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ করিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পুষ্পকাননে নানাপুষ্প চয়ন করিয়া একছড়া মালা প্রস্তুত করেন, অসভ্যরীতির পণ্ডিতেরা সেকালে একটি পূর্ণপুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া পরিতুষ্ট থাকিতেন। এই দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন হয় যে, বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধেও পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উন্নতি কিছুই হয় নাই। বালকগণের বক্তৃতাশক্তি অসম্ভব বাড়িয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

সাংসারিক ব্যাপারেও যে প্রকার উন্নতির স্রোত এখন বহিতেছে, তাহাও যথার্থ উন্নতি বলিয়া, দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যাঁহারা সমাজ দর্শন করেন, তাঁহারা মনে মনে বুঝিয়া দেখিবেন, ক্রমশঃই অধোগতি। আমাদের প্রাচীন ভবিষ্যপুরাণে স্মরণাতীতকালপূর্ব্বে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, ইদানীং পদে পদে, অক্ষরে অক্ষরে—তাহা মিলিয়া আসিতেছে—বিজ্ঞ লোকেরা এক একবার অবকাশকালে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

যুগের কথা উত্থাপন করিলেই আধুনিক সভ্যেরা হাস্য করেন, অথচ

তাঁহাদের গুরু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রকারান্তরে যুগ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাষা স্বতন্ত্র, বাক্য স্বতন্ত্র এই পর্য্যন্ত কথা। এ প্রমাণে যুগের কথা উত্থাপন করিতে আমরা লজ্জিত হইব না। ভবিষ্যপুরাণে আছে, কলিযুগে সংসারের প্রকৃতি বিপর্য্যয় ঘটিবে। ব্রাহ্মণগণ নিরগ্নি হইবেন, গায়ত্রী মন্ত্র পরিত্যাগ করিবেন, সাধারণ নরগণ স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইবে, রমণীগণ প্রবলা হইবে, ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইবে, সত্য দূরাগত হইবে, লোকেরা ধর্ম্ম মানিবে না, ব্রাহ্মণেরা লোভী হইবেন, সমস্ত মানব নারীবশ হইবে, পুত্রগণ পিতার সহিত পিতা-পুত্র সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবেন, পৃথিবী অল্প শস্য প্রসব করিবেন। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইবে, ঋতু বিপর্য্যয় হইয়া ঘন ঘন মারীভয় সমুপস্থিত হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন সকলে মিলাইয়া দেখুন, ভবিষ্য পুরাণের কতগুলি কথা সত্য, কতগুলি মিথ্যা। কতকগুলি যদি সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, অনুমানিক সিদ্ধান্তে কতকের অসত্যতা নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা কখনই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। লোকে যে গুলি প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, সেইগুলি সত্য, আর যেগুলি প্রত্যক্ষীভূত হইবার উপায় নাই, সেইগুলি মিথ্যা এরূপ কল্পনা করা ভুল। ভবিষ্যপুরাণের একস্থানে উল্লেখ আছে, কলিযুগে লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়ই নীচগামিনী হইবেন, এ কথার সত্যাসত্য যাঁহারা বিচার করিতে চাহেন, তাঁহারা ভাল করিয়া বর্ত্তমান সমাজের প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিবেন। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বলিবার রহিল, অবকাশক্রমে সময়ান্তরে পাঠক মহাশয়গণের বিচারে তাহা সমর্পণ করিব।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নীতিসারম্।

(ঘটকর্পর-বিরচিতম্)

(১)

গিরৌ ময়ূরা গগনে পয়োদা
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু-
র্যো যস্য মিত্রং ন হি তস্য দূরম্॥

ময়ূর বসতি করে পর্ব্বত-শিখরে,
কিন্তু তার বন্ধু মেঘ আকাশ উপরে।
লক্ষ যোজনের পথে দেব দিবাকর,
প্রেয়সী পদ্মিনী তাঁর জলের উপর।
দ্বিলক্ষ যোজনে চন্দ্র আকাশের তলে,
প্রণয়িনী কুমুদিনী কিন্তু রহে জলে।
এই সব পরস্পর থাকে কত দূরে,
কিন্তু সবে বাঁধা আছে প্রণয়ের ডোরে।
যার প্রতি রহে যার প্রগাঢ় প্রণয়,
তাহাদের পথ কভু দূর বোধ হয়?

(২)

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতে।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতে সম্ভাষণং বা সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয়স্ব সুমতে হ্যর্থেন সর্ব্বে বশাঃ॥

কত নিন্দা করে মাতা,   আদর না করে পিতা,
নিজ সহোদর নাহি করে সম্ভাষণ!
ভৃত্য বাক্যবাণ হানে,   পুত্র নাহি কভু মানে,
গৃহিণীও নাহি করে প্রেম-আলাপন!
পাছে কিছু দিতে হয়,   এই ভয়ে বন্ধু রয়,
একটী কহিতে কথা করে মুখ ভার!
হও যদি বুদ্ধিমান্,   কর এই অবধান,
অর্থ-উপার্জ্জন করা জগতের সার,

(৩)

ধনৈ নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি
ধনৈ রাপদং মানবা নিস্তরন্তি।
ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবো নাস্তি লোকে

নাই যার কুল, তার কুল হয় ধনে ;
প্রধান উপায় ধন বিপদ্‌-মোচনে ;
ধন হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু না আছে সংসারে ;
প্রাণপণ কর ধন-উপার্জ্জন তরে।

(৪)

ন নরস্য নরো দাসো দাসশ্চার্থস্য সর্ব্বদা।
গৌরবং লাঘবং বাপি ধনাধননিবন্ধনম্ ॥

নরের দাসত্ব নাহি করে কভু নর,
অর্থেরি দাসত্ব নর করে নিরন্তর।
পরম সম্মান তার, ধনী যেই জন,
অতি অপমান তার, যে জন নির্ধন।

(৫)

ত্রিবিক্রমোঽভূদপি বামনোঽসৌ
স শূকরশ্চেতি স বৈ নৃসিংহঃ।
নীচৈরনীচৈরতিনীচনীচৈঃ
সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যম্ ॥

কিবা নীচ, অতি নীচ, অথবা উন্নত,
যে কোন উপায়ে কার্য্য কর সম্পাদিত।
তার সাক্ষ্য দেখ তুমি, দেব নারায়ণ—
শূকর, নৃসিংহ কভু, কভু বা বামন!

(৬)

চলং চিত্তং চলং বিত্তং চলে জীবনযৌবনে।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি ॥

কিবা ধন মান, কিবা জীবন যৌবন,
এ সবার স্থির নয় কিছুই কখন!
কীর্ত্তিই সুস্থির ভাবে থাকে অনিবার,
যথার্থ জীবিত সেই, কীর্ত্তি রহে যার!

(৭)

স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ।
অযশোঽকীর্ত্তিসংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ ॥

সুনাম রহিবে যার শৌর্য্যাদি-জনিত,
এ সংসারে সেই জন যথার্থ জীবিত ।
দানাদি-জনিত যার রহিবে সুনাম,
যথার্থ জীবিত সেই জন অবিরাম ।
যে জনের কীর্ত্তি যশঃ না রহে কখন,
প্রাণ থাকিলেও তার যথার্থ মরণ !

(৮)

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে ।
সর্ব্বত্রৈবং বিচারেণ নাহারে ন চ মৈথুনে ॥

উপস্থিত হয় যবে বিপদ্ সময়,
শুনিবে বৃদ্ধের কথা হইয়া তন্ময় ।
সমস্ত কার্য্যেই রাখ বৃদ্ধের বচন,
ভোজনে মৈথুনে কিন্তু না রেখো কখন !

(৯)

ক্বচিৎ রুষ্টঃ ক্বচিৎ তুষ্টো রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে ।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥

কখনও রুষ্ট হয়, কখনও তুষ্ট রয়,
ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট তুষ্ট যেই জন হয় ?
তার মন এক নয়, ভিন্ন কালে ভিন্ন হয়,
তার প্রসাদেও রহে বিপদের ভয় !

(১০)

নিমিত্তমুদ্দিশ্য হি যঃ প্রকুপ্যতি
ধ্রুবং স তস্যাপগমে প্রসীদতি ।
অকারণদ্বেষি মনস্তু যস্য বৈ

কারণ দেখিলে তবে ক্রোধ যার হয়,
সে কারণ গেলে, তাহা নাহি আর রয়।
নাহি যার কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ,
অথচ যদ্যপি ক্রোধ করে সেই জন,
হেন জন কেবা কোথা রয় এ সংসারে,
সন্তুষ্ট করিতে পারে যে জন তাহারে ?

(১১)

(শূকরের উক্তি)

দশ ব্যাঘ্রা জিতাঃ পূর্ব্বং সপ্ত সিংহা স্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥

দশ ব্যাঘ্র, সপ্ত সিংহ, অষ্ট হস্তী আর,
পরাজিত হইয়াছে নিকটে আমার।
দর্শন করুক যত দেবতা-নিকর,
তোমাতে আমাতে আজ বাঁধিবে সমর!

(১২)

(সিংহের প্রত্যুক্তি)

গচ্ছ শূকর ভদ্রং তে ব্রূহি সিংহো ময়া জিতঃ।
পণ্ডিতা এব জানন্তি সিংহশূকরয়োর্ব্বলম্॥

যাও হে শূকর! তুমি থাক হে কুশলে,
সিংহেরে করেছি জয়, বলিও সকলে।
এ সংসারে বুদ্ধি যার আছে বিলক্ষণ,
সিংহ-শূকরের বল বুঝে সেই জন!

(১৩)

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
র্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং বিহায় কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

উদ্যোগ করিয়া থাকে যেই নিরন্তর,
হইবে লক্ষ্মীর কৃপা তাহার উপর!
দৈববলে সব মিলে, একথা যে বলে,
নিশ্চয় সে কাপুরুষ, জানিও ভূতলে।
দৈবনাম দূর করি, রে অবোধ নর!
উদ্যোগ করহ সদা হইয়া তৎপর।
যত্নও করিলে যদি সিদ্ধি নাহি হয়,
তবে আর কিবা দোষ বল তায় রয়?

(১৪)

একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা বসতিরুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥

এক ভার্য্যা সরস্বতী বড়ই মুখরা,
যাঁহার মুখের চোটে ফেটে যায় ধরা!
আর এক ভার্য্যা রন্, লক্ষ্মী নাম তাঁর,
এবাড়ী ওবাড়ী করা মহারোগ যাঁর!
দিগ্বিজয়ী এক পুত্র দুরন্ত মদন,
পঞ্চ শরে খুঁচে খুঁচে করে জ্বালাতন!
অনন্ত সর্পেতে শয্যা, সমুদ্রে নিবাস,
গরুড়ের কাঁধে উঠি চলা বারমাস!
এই সব মনে মনে তোলাপাড়া করি,
শুকাইয়া কাঠখানি হ'য়েছেন হরি!

(১৫)

অতিদূরপথশ্রান্তা শ্ছায়াং যান্তি চ শীতলাম্।
শীতলাশ্চ পুন র্যান্তি কা কস্য পরিবেদনা॥

বহু-দূর-পথে যদি কেহ কভু যায়,
শ্রান্তি দূর করে বসি শীতল ছায়ায়।

শ্রান্তি দূর করিয়াই কোথা চ'লে যায়,
হায় রে! কাহার কেবা বল এ ধরায় ?

(১৬)

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ।
স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে হি মূর্খতা ॥

যত কিছু অপমান সম্মুখে ধরিয়া,
যত কিছু আছে মান পশ্চাতে রাখিয়া,
স্বকার্য্য সাধন করে বুদ্ধিমান্ জন,
কার্য্যনাশ হইলেই মূর্খের লক্ষণ!

(১৭)

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
ন তেন দৃষ্টং কবিনা সমস্তং
দারিদ্র্যমেকং গুণরাশিনাশি ॥

যাহার অসংখ্য গুণ রহে এ ধরায়,
একমাত্র দোষ তার কে দেখে কোথায় ?
যে কবি একথা বলে, নাই তার জানা—
এই জগতের সব কাণ্ড কারখানা!
থাকুক অসংখ্য গুণ, কিন্তু তবু হায়
একমাত্র দারিদ্র্যেই সব ঢেকে যায়!

(১৮)

কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং তথা।
গতস্য শোচনং নাস্তি হ্যেতদ্বেদবিদাং মতম্ ॥

যে কার্য্য করেছ, তার কি আর করিবে ?
যে জন মরেছে, সে বা কি আর মরিবে ?
গত বিষয়ের শোকে কিবা প্রয়োজন ?
এই কথা বলেছেন বেদবিৎ জন।

(১৯)

নাকালে ম্রিয়তে জন্তু র্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশকণ্টকবিদ্ধোঽপি প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

সময় না হ'লে হায় কেহ নাহি মরে,
সে জন বিদ্ধও যদি হয় শত শরে।
সময় তাহার কিন্তু আসিবে যখন,
কুশের কাঁটায় তার হইবে মরণ।

(২০)

নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্ব্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেনাপি দষ্টস্য আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি॥

সমুদ্রেও মগ্ন যদি হয় কোন জন,
পর্ব্বত হ'তেও যদি হয় বা পতন,
দুরন্ত তক্ষক সর্প ধরিয়া তাহারে
বিষদন্ত দিয়া যদি খান খান করে,
তথাপি তাহার প্রাণ কে করে সংহার,
কিছুমাত্র পরমায়ু থাকে যদি তার ?

(২১)

করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং পুন স্তদেব স্যাৎ যৎ বিধের্ম্মনসি স্থিতম্॥

কার্য্যনীতি বিলক্ষণ জানা আছে যার,
ছুটোছুটি করিলেও সদা চারিধার,
সেই ফল ভিন্ন তার আর গতি নাই,
বিধাতার মনে যাহা রয়েছে সদাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর, বি-এ।

জীবতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২৭ পৃষ্ঠার পর)

৪। বাদ্‌লাপোকা—যে বৎসর বেশী বাদ্‌লা পোকা উড়ে, সে বৎসর জানিবে, শ্লেষ্যঘটিত রোগ খুব কম হয়; যে বৎসর উহা কম উড়ে কিংবা অতি বিরল দেখা যায়, সে বৎসর দেশে শ্লেষ্যঘটিত রোগে অনেক ব্যক্তি মারা যায়। উক্ত পোকাগুলি পৃথিবীর মাটীর নিম্নের শ্লেষ্য-ভাগ ভক্ষণ করে। স্থূল কথা, ঐ বাদ্‌লা পোকাগুলি শ্লেষ্যপায়ী বটে, কিন্তু শ্লেষ্যনাশক ঔষধে লাগে।

৫। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল পিপীলিকা—যাহাকে চলিত কথায় সড়সড়ে ক্ষুদে পিপড়ে বলে। ঐগুলিও শ্লেষ্যনাশক ঔষধে লাগে। মেয়েরা কিন্তু চলিত কথায় বলে, পিপড়ে খেলে ভাল সাঁতার শেখা যায়; কারণ জলে ঐ ক্ষুদ্র জীবকে ফেলিয়া দিলে বেশ সাঁতার কাটে ও সত্বর জল হইতে উপরে উঠিয়া আসে। ঐটুকু ক্ষুদ্র জীব বটে কিন্তু গায়ে অসাধারণ বল; কেননা, উহারা মুখে করিয়া অক্লেশে উহাপেক্ষা বিশগুণ দ্রব্যভার বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহাতেই ঈশ্বরের অচিন্ত কৃপা ও ক্ষমতার বিষয় মনে উদিত হয়। যাহা হউক, কথায় কথায় বহুদূর আসিয়াছি, আর নয়; আসল কথা, ছোট ছোট পিপীলিকাও মানবের শারীরিক উপকারে আসে ও উহা খাইলে শুনা যায় সাঁতার দিতে সক্ষম হওয়া যায় এবং শ্লেষ্যনাশক ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

৬। আর্শলা বা তেলাপোকা—শুদ্ধ ভাষায় এই অপদার্থ ঘৃণ্য জীবকে তৈলপায়িকা কহে। ইহা চীনবাসীগণের উৎকৃষ্ট আহারীয় সামগ্রী। ইহার শুঁড়, পাখা দুটী ও ছয়টী পা ফেলিয়া দিয়া চীনবাসীরা মুখে ফেলিয়া তাহার নাড়িভুঁড়ী শুদ্ধ অম্লান বদনে আনন্দের সহিত ভক্ষণ করে। তাহারা বলে, আর্শোলা কিম্বা উহার নেদি মহৌষধ, যেরূপ করিয়া হউক, খাইলে বা তামাকের সহিত সাজিয়া খাইলে শ্বাসরোগ, হৃদরোগ কিংবা হাঁপানি রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত বটে। স্থূল কথা, ইহাও শ্লেষ্যনাশক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। চীনবাসীরা কখন ঐ রোগে ভুগে না, কেন না, তাহারা উহা আহার করে বলিয়া কিম্বদন্তী আছে, ৺ পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাঁপানীরোগ বহুকালব্যাপী ছিল এবং শীতকালে

বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে বাড়িত। তাঁহার অভ্যাস ছিল, প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দু'বেলা গরম্ গরম্ চা পান করা। ইতিমধ্যে একদিন চা পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ লাভ করিলেন এবং হাঁপানীর টান যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস বোধ করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আজ চা কে তৈয়ারি করিয়াছিল ?" ভৃত্য উত্তর দিল, "আমিই তৈয়ারি করিয়াছি।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন ;—"আচ্ছা আজ উহা পান করে আমার হাঁপানির টান এত কমিল কেমন করিয়া ? উহাতে শুঁট কি আদার রস মিশাইয়া ছিলে কি ?" ভৃত্য কহিল—"না, কিছু না। যেমন প্রত্যেক দিন তৈয়ারী করি, আজও তদ্রূপ করিয়াছি, তবে অন্য দিন অপেক্ষা আজ কিছু তাড়াতাড়ি করে কেট্‌লি না ধুয়ে, অমনি জল চাপাইয়া চা প্রস্তুত করিয়াছি ; এই কেট্‌লি আনি দেখুন না।" তিনি কেট্‌লি আনিতে হুকুম দিলেন এবং পরে কেট্‌লি খুলিয়া যা' দেখিলেন, তাহাতে একেবারে হতভম্ব এবং অবাক্ হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটুকু ঘৃণার উদয় হইল বটে, কিন্তু মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন যে, হাঁপানীর এক উৎকৃষ্ট ঔষধ তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, এক কেট্‌লি জলে যখন ২টা আর্সোলা পড়িয়া তাঁহার হাঁপ অর্দ্ধেক কমাইয়াছে, না জানি, বহু পরিমাণে উহা জলে ফেলিয়া সিদ্ধ করিয়া, পরে এল্‌কোহলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া Dilute করিয়া হোমিওপ্যাথিমতে ঔষধ বানাইয়া লোকের বা রোগীর অজ্ঞাতে সেবন করাইয়া এবং নিজেও ব্যবহার করিয়া দেখিব, হাঁপ কাসি সারে কি না ? পরে তাহার পরীক্ষা, কার্য্যে পরিণত করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিমতে উক্ত ঔষধ তৈয়ারী করিয়া কাহাকেও না জানাইয়া বহু লোকের উক্ত ব্যাধি বিনাব্যয়ে অনেক উপশম করিয়াছিলেন। তবে দেখুন, ঈশ্বর রাজ্যে কেহই হেয় নয়. তুচ্ছ জীব আর্সোলা হইতেও আমরা দুরারোগ্য প্রাণবিনাশক রোগের মহৌষধ প্রাপ্ত হই। ধন্য জগদীশ্বর ! ধন্য তোমার অপার করুণা ! ধন্য তোমার সৃষ্টিশক্তি ! ধন্য তোমার অপার মহিমা ! আমরা ক্ষুদ্রনর, তোমার লীলা খেলা কি বুঝিব !

৭। ভেক্ বা কোলা ব্যাং।—ইহা বিষাক্ত ঘৃণ্যজীব বটে ! কিন্তু উন্মাদ রোগে ইহার মাংসশুদ্ধ ঝোল বড় উপকারক। এই গরম

দস্তানা ও শ্লিপার জুতা প্রভৃতি নানাতর সৌখিন বিবিয়ানা দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ভেকমাংস ঠাণ্ডাকারক ও গরমদেশের আহারীয় সামগ্রী মধ্যে আজ কাল পরিগণিত। বিশেষতঃ সুসভ্য ইংরাজ ও ইউরোপীয়ান্ সমাজে আদৃত হইতেছে। তাঁহারা বলেন এবং আজ কাল হোটেলেখেগো বাবু ভায়ারা বলেন, ইহা অতি মুখরোচক সুখাদ্য সামগ্রী। স্থূল কথা, মনুষ্যের আহারের বিচার কিছু নাই; যা' পায় তাই খায়। এই দেখুন না কেন, মগেরা, চীনেরা, ধাঙ্গড়েরা, বুনোরা কোন কিছু মাংস বাদ দেয় না; ইন্দুর, ছুঁচো, বিড়াল, কুকুর, পেঁচা, কাট বেড়াল, টিক্‌টিকী, বহুরূপী, গির্‌গিটি সব জীবই পচাইয়া পচাইয়া আনন্দে ভক্ষণ করে। তাই বলি, ঈশ্বর জীবের আহার জন্য যা কিছু জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই পরস্পরের খাদ্যখাদকরূপে পরিণত হইয়াছে মাত্র, স্থূল কথা, ঈশ্বররাজ্যে কিছু হেয় বলিয়া ফেলা যায় না। ভেক্ গির্‌গিটী পর্য্যন্ত উপাদেয় হয়।

৮। কাল টিক্‌টিকি।—এই জীবের লাঙ্গুল কলার মধ্যে পুরিয়া হৃদ্‌রোগীগ্রস্থ ব্যক্তিকে কিংবা যাহার অন্তঃকরণ সদা সর্ব্বদা ধড়ফড় করে, তাহাকে খাওয়াইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। ইহা বুকধড়ফড়করাণি ও হৃদ্‌রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

৯। গুগ্লি বা শাঁমুক জাতীয় জীব।—ইহা শিশুদিগের পেটের পীড়া, রক্তামাশয় ও চক্ষু উঠা রোগের অমোঘ ঔষধ। স্থূল কথা, ইহা খুব উপকারী ঠাণ্ডাকারক ঔষধ। চক্ষু জ্বালা করে, কিম্বা রক্তবর্ণ হইলে ইহার জল ২।১ ফোটা চক্ষে দিলে চক্ষু ঠাণ্ডা হয় ও পরিষ্কার হয়। নীচ জাতীরা প্রত্যহ মৎস্য মাংসের ন্যায় ইহার ঝোল রান্ধিয়া ভক্ষণ করে ও তাহাদের পক্ষে মুখরোচক খাদ্য দ্রব্য।

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

সাবিত্রীতত্ত্ব সমালোচনার সমালোচনা।

'কঃ পন্থাঃ' ও 'সাবিত্রীতত্ত্বে'র ন্যায় মনোজ্ঞ প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহোদয় আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বস্তুতঃ পরলোকগত মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সামাজিক' 'পারিবারিক' ও 'আচার'

প্রবন্ধের পর জাতীয় জীবন ও সমাজের উন্নতিকল্পে এরূপ স্বাধীন চিন্তা ও উচ্চ আদর্শের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। রাজকার্য্যের গুরু শ্রমভারে নিপীড়িত হইয়াও লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও হিতৈষণাবৃত্তি বৃদ্ধি ও মনুষ্যত্ব-লাভের প্রকৃষ্ট পথ দেখাইবার জন্য তিনি সেই পুরাণ কথার মধ্যে কত যে নূতন চিন্তা, নূতন তত্ত্ব, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই উপন্যাসপ্লাবিত দেশের যুবক সমক্ষে কত গভীর, পবিত্র ভাবের আদর্শ ধরিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা দূরে থাকুক, তাঁহাকে গালি খাইতে হইতেছে।

এস্থলে কোন পণ্ডিতম্মন্য স্বকল্পিত-উপাধিধারী সম্পাদকের ব্যাকরণ দোষের সমালোচনার কথা বলিতেছি না—কারণ, সেখানে ব্যক্তিগত রাগের কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু নব্যভারতের ন্যায় প্রবীণ সাময়িক পত্রে সাবিত্রীতত্ত্বের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ, "কুৎসিত কথায় কলঙ্কিত" এবং তৎপ্রণেতাকে "অবিবেচক", "ভাট," "সং" "অর্থ ও আদর প্রত্যাশী" ও "তাঁহাকে কেবল উপহাস করাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না"—ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত দেখিলে কষ্টের কারণ হয়। সুখের বিষয়, সমালোচক মহাশয় গ্রন্থকারকে বিজ্ঞ, সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়া শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন ও গ্রন্থের ২।১টী অধ্যায়ে তাঁহার গুণপনার অসদ্ভাব নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী জানি না; কিন্তু গ্রন্থকারের হিন্দু আচার পদ্ধতির পক্ষপাতিত্ব এবং (কষ্টের কারণ হইলেও), লোক-সমাজের অন্ততঃ হিন্দু-সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই, তাঁহার এই তীব্র সমা-লোচনার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ ও গ্রন্থকারের ন্যায় মত পোষণ করিলে সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে গ্রন্থকারের প্রয়াস ও অধিকার আছে এবং সাবিত্রীতত্ত্ব সমাজের মঙ্গলের জন্য রচিত এবং সমাজের দূত বা ভাট ও শিক্ষক এই দুই শ্রেণীর লেখকের আদর ও গৌরবের তুলনা করিয়া এক হইতে অপর সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয় স্বীকার করিয়া আবার পরক্ষণেই কিরূপে অর্থ ও আদর লাভ প্রত্যাশায় গ্রন্থকারকে 'বাজারে লোকের কাছে সং সাজিতে' দেখিতে পাইলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাঁহার মতে, আদর পাইতে হইলে ত তাঁহার বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক বন্ধুর মত, "লোকে যাহা চায়,

মহৎ উদ্দেশ্য তাহাতে থাকে না। তবে চন্দ্রনাথ বাবু কিরূপে "অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের" উদাহরণ দিয়া সমাজের 'মঙ্গলপ্রয়াসী' হইলেন?

সংবাদপত্রে সাবিত্রীতত্ত্বের ভালমন্দ সমালোচনাই সমালোচক মহাশয়ের উক্ত পুস্তক পাঠের আগ্রহ পরিবর্দ্ধক ও তীব্রতাসাধক। ভাল সমালোচনা অবশ্য আগ্রহের বৃদ্ধি ও তীব্রতা সম্পাদনের উপযোগী; কিন্তু উভয়বিধ সমালোচনা কিরূপে তাঁহার "আশা" বৃদ্ধি করিল, এবং সাবিত্রীর বধূত্ব, পাতিব্রত্য প্রভৃতি অধ্যায়ে" গ্রন্থকারের স্বীকৃত গুণপনা সত্ত্বেও তিনি কিরূপে "এত নিরাশ" হইলেন বুঝা কঠিন। অথচ পরিশিষ্টসমেত গ্রন্থের অষ্ট অধ্যায়ের মধ্যে কেবল প্রথম অধ্যায় (সাবিত্রীর জন্ম) লইয়া তাঁহার যাহা কিছু সমালোচনা।

"এখন আর্য্যামির যুগ"; "তাঁহার (গ্রন্থকারের) আর্য্যামি অতি প্রবল" ইত্যাদি মুখবন্ধ দ্বারা সমালোচনা আরম্ভ। এই "আর্য্যামি" শব্দ কোন ভাষা হইতে সংগৃহীত এবং এইরূপ যুগবিভাগ কোন স্মৃতির অনুমোদিত তাহা বুঝিলাম না। বাঙ্গালা বা সংস্কৃত অভিধানে ত এরূপ কোন শব্দ পাইলাম না। তবে ঠাকুরবাড়ীর আবিষ্কৃত বলিয়া অবিচার্য্যভাবে সকল শব্দই যদি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে কথা নাই। কিন্তু এইরূপে "আর্য্যামি" চালাইতে গিয়া জেঠামির কিছু বাহুল্য হয় না কি? অবশ্য সমালোচক মহাশয়ের 'কৈফিয়ৎ' লিখিত 'জেঠামি'র অভিনব সংজ্ঞা মনে করিয়া একথা বলিতেছেন, সাধারণ লোকে যাহা "জেঠামি" বলিলে বুঝে, সেইভাবে বলিতেছি। "আর্য্যামি"র অর্থ আমরা মনে করিয়াছিলাম, আর্য্য ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুরাগ তদনুসারে "গ্রন্থকার আর্য্যামি দেখাইয়া গ্রন্থখানি আরম্ভ করিল" কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সমালোচক মহাশয় জেঠামির ন্যায় তাঁহার কৈফিয়তে "আর্য্যামিরও" ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের ভ্রম অপনোদন করিয়াছেন। তাঁহার মতে "যে স্বদেশানুরাগ দেশীয় সর্ষপকে বিদেশীয় পর্ব্বত অপেক্ষা বৃহত্তর মনে করে, যে স্বজাতিপ্রিয়তা স্বজাতির কুসংস্কারকে 'অমূল্যায়মান' (?) করে, অজ্ঞতাকে প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাকে আর্য্যামি বলে"। সমালোচক মহাশয় অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের স্কন্ধে অমূলক উক্তি চাপাইয়া যেরূপ তাঁহার প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছেন, গ্রন্থমধ্যে এই "আর্য্যামি" রোগের লক্ষণ আবিষ্কার করিতে গিয়া কল্পনার

তেমনি সাহায্য লইয়াছেন। তাহার আলোচনা সবিস্তার করা যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে শশধর, বঙ্কিম প্রভৃতির ধর্ম্মসম্বন্ধে মত সমালোচনা করিবার কি সার্থকতা, তাহা আমাদের স্বল্পবুদ্ধির অগোচর। "ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া" লওয়া চূড়ামণি মহাশয়ের অভিপ্রেত—সমালোচক মহাশয় এরূপ আভাস দিয়াছেন। সম্প্রতি চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তিনি বলেন, সমালোচক মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় নাই। বঙ্কিমবাবুর বাসায় ইন্দ্রবাবু, চন্দ্রনাথ বাবু ও অক্ষয় বাবু প্রভৃতির সহিত তাঁহার তর্কবিতর্ক হইত। তাহাতে প্রাচীন ব্যবস্থা সমস্ত ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ফেলা দূরে থাকুক, সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর সহিত মতভেদ হওয়ায় তাঁহাদের তৎকালীন প্রকাশিত 'নবজীবন' সাময়িক পত্রের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। আর ঐরূপ মত চূড়ামণি দিয়া থাকিলেই বা কি? তাহা কি ঋষি বা আপ্ত বাক্যের ন্যায় গৃহীত হইবে, না চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্কিমবাবুর দলপুষ্ট করিলে গৌরব বা নিগ্রহের আস্পদ হইবেন?

সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন;—প্রথমেই গ্রন্থকার ভণিতা করিয়াছেন যে, "ইউরোপীয়দিগের প্রথম দৃষ্টি শরীরের উপর; হিন্দুর প্রথম দৃষ্টি স্বভাব প্রকৃতির উপর।" উদাহরণ;—সাবিত্রীর জন্ম হইল। ব্যাস বলিলেন, তিনি "রাজীব লোচনাম্" (এখানে সুবন্তপদটী উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারকে উপহাস করা হইয়াছে) অর্থাৎ কমল লোচনা।" এই গ্রন্থকারের মতে কমল লোচনা স্বভাব প্রকৃতির পরিচায়ক। আবার "দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইল, ব্যাস বলিলেন, দুর্য্যোধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই গর্দ্দভ সদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল।"

সমালোচক মহাশয় উদ্ধৃত অংশগুলি গ্রন্থের পর্য্যায়ভঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত করিয়া সিদ্ধান্ত ও উদাহরণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ, গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। কারণ, সিদ্ধান্তটী গ্রন্থের ৪র্থ পৃষ্ঠা এবং উদাহরণ তৎপূর্ব্ব পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। গ্রন্থকার প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পৌরাণিক আখ্যায়িকা এবং ইউরোপীয় জীবনচরিতের বস্তুগত পার্থক্য দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, পুরাণে নবজাত শিশুর শুভাশুভ লক্ষণ ও চিত্রাদির কথা এবং ইউরোপীয় জীবনীতে দেশকালাদির আলোচনা থাকে

পরিচায়ক সুলক্ষণ ও কুলক্ষণের কথা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং জন্মমুহূর্ত্তে মানুষের অন্তঃ প্রকৃতির অন্বেষণ করা হিন্দুরীতির অনুকূল ও ইউরোপীয় প্রথার প্রতিকূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং একাধিক মধ্যে তাহার ২।১টী হেতু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া প্রথমতঃ হিন্দুর জন্মান্তর ও কর্ম্মফলবাদ ও কর্ম্মানুযায়ী প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবিত্ব ও জন্মকালে দেহে তাহার লক্ষণ প্রকাশের কথা আনিয়াছেন এবং পরিশেষে ইউরোপীয়ের প্রথম দৃষ্টি শরীরের উপর হিন্দুর দৃষ্টি স্বভাব ও প্রকৃতির উপর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে কমললোচনা কি ভাবে স্বভাব প্রকৃতির পরিচায়ক বলিয়া প্রয়োজ্য হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেক এবং "যত্রাকৃতি স্তত্রগুণা" প্রভৃতি প্রচলিত কথার সহিত তুলনা করিলেই কমল লোচন সুলক্ষণ কি কুলক্ষণ অর্থাৎ ভাবী শুভাশুভ পরিচায়ক কি না, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সমালোচক মহাশয় বোধ হয়, পাশ্চাত্য ঋষিবাক্য ব্যতীত সন্তুষ্ট হইবেন না, একারণ Kantian ethics হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

The body is only an objectified will, the shape which the will assumes in the material world. Character is theoretically an act of will, living beyond time, of which life in time or character in action is the development. The intellectual character the theoretical physiognomy gives expression to the eyes and forehead. The practical physiognomy, the stamp of will, of moral disposition shows itself in the mouth. (Schopenhauer's Essays.) ফলতঃ গ্রন্থকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা ২৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কথায় স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে ;—"যে অবস্থায় শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি থাকে এবং ধর্ম্মবল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতর বলের প্রতি তদপেক্ষা অধিক দৃষ্টি থাকে, তাহাই মানব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। ধর্ম্মশীলতা, সংযম, মিতাচার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি থাকিলে শরীরের জন্য বড় বেশী ভাবিতে হয় না। যাহাদের চিত্তের স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট, কেবল তাহাদেরই শরীরের স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ এম, এ।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা।)

১০ম বর্ষ। } চৈত্র, ১৩০৮ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

আমরা কি স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত ?

পাঠ্যাবস্থায় আমাদের কোন বন্ধু দিনকতক একটী ব্রাহ্মণের হোটেলে আহার করিতেন। তথাকার আহারাদির ব্যবস্থা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন; "সে কথা আর বলিও না। তিন আনা করিয়া পয়সা লয়, কিন্তু তাহার মত খাওয়া পাই না। যদি চাই—'ঠাকুর! একটু মাছের ঝোল, আর একখানা মাছ দাও।' অমনি ছড়া কাটাইতে আরম্ভ করে—'দিব বৈ কি, ভাত দিব, ডাল দিব, তরকারি দিব, মাছ দিব, আম্বল দিব।' তারপর ক্রমাগত চাহিতে চাহিতে এবং ছড়া শুনিতে শুনিতে হয় ত একগাছা পুঁইডাঁটা ফেলিয়া দিয়া গেল। আবার ঐরূপ অভিনয়ের পর হয় ত আম্বল হইতে তুলিয়া একটা ক্ষুদ্রকায় ঘুসো চিংড়ি দিয়া গেল। এই প্রকারে বিরক্ত হইয়া শেষটা কতকগুলা ভাত গিলিয়া চলিয়া আসিতে হয়।" ঠিক ঐরূপ ব্যবহার কি আমরা রাজনৈতিক জগতের হোটেলওয়ালা ঠাকুরের নিকটই পাইতেছি না? আমরা যত উচ্চস্বরে "দেহি দেহি" চীৎকার করতঃ ভিক্ষা মাগিতেছি, রাজপুরুষগণও ততোধিক মিষ্টস্বরে ছড়া কাটাইয়া কত সুন্দর সুন্দর সামগ্রীর ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিতেছেন; কিন্তু কাজের বেলা পুঁইডাঁটা ভিন্ন আর বড় কিছু পাতে পড়িতেছে না। কোম্পানি বাহাদুরের আমল হইতে এ পর্য্যন্ত কত মধুর মধুর ছড়া শুনিলাম, অথচ পাইলাম কি? খুঁজিয়া দেখি, দুই চারিটা ঘুসো-চিংড়িমাত্র হস্তগত হইয়াছে। এতকালের চীৎকারের পর পাইয়াছি;—

পাঁচ সাত জন কালা সিবিলিয়ান, লাট কৌন্সিলের দুই একজন অতিরিক্ত সভ্য ও একটু স্বায়ত্ত-শাসনের ছায়া, এই ত লাভ দেখিতেছি। শেষোক্ত মাকাল ফল দ্বারা আমরা কতদূর উন্নত হইয়াছি, কি পরিমাণে আমাদের উপকার হইয়াছে, দেখা যাউক।

যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক উক্ত প্রণালী ব্যবস্থাপিত হয়, তিনি চাকরী লইয়া এ দেশের দিকে রওনা হইবার পূর্ব্বে পূজনীয়া ৺ ভিক্টোরিয়া সাম্রাজ্ঞীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে গেলে, তিনি নূতন লাট সাহেবকে বলিয়াছিলেন;—"ভারতের মিউনিসিপাল অন্তর্ব্যবস্থানগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিও; যেহেতু ঐখান হইতে প্রকৃতিবর্গের রাজনীতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা আরম্ভ হয়।" অতি উত্তম উপদেশ, ধর্ম্মপ্রাণা ভারতেশ্বরীর উপযুক্ত কথা। তিনি অবশ্য ভাল ভাবিয়াই ওরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। উদারচেতা রিপণও সেই মহাবাক্য হৃদয়ে লইয়া ঐদিকের কার্য্য আরম্ভ করেন, এবং সহস্র বিঘ্নবাধা অতিক্রম করতঃ অবশেষে নগর ও জেলার আভ্যন্তরিক ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রদান করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এই দীর্ঘকালে তাহার কি ফল হইয়াছে, ভাবিলে আমাদের মাথা হেঁট হয়, এবং বেশ বুঝিতে পারি, আমরা নানাপ্রকারে নিতান্ত অযোগ্য বলিয়াই বিধাতা আমাদিগকে অসহায় শিশুর ন্যায় সম্পূর্ণ পরাধীনাবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। এরূপ উপাদেয় পুষ্টিকর সামগ্রী আমাদের অজীর্ণতাদোষে বিষ বড়ির কার্য্য করিতেছে। এখন বেশ দেখিতে পাইতেছি, কি জন্য ভগবান প্রত্যহ আমাদের মস্তকে সহস্র পাদুকা প্রহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এই বারোয়ারী পঞ্চা'ত প্রভৃতির দেশে দলাদলি গৃহবিচ্ছেদের অগ্নি যে সকল কারণে চিরপ্রধূমিত রহিয়াছে, তাহার সহিত আর একটী নূতন হেতু প্রবলতেজে যুক্ত হইয়াছে মাত্র। ইংরাজ বেশ বুঝেন যে, সাধারণ প্রজার হিতসাধন শাসকের প্রধান কাজ, জন কয়েক কমিশনর বাবুর ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিলে কর্ত্তব্যের ক্রটী হয়। এই জন্য তাঁহারা অনেক জায়গায় মিউনিসিপাল স্বাধীনতা এক প্রকার কাড়িয়া লইতেছেন।

সর্ব্বপ্রকার স্বায়ত্ত-শাসনের প্রধান লীলাক্ষেত্র আমেরিকাদেশে অন্যান্য বিভাগে কর্ম্মক্ষম যশস্বী ব্যক্তিগণ আপন কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, দেশের শাসনকার্য্যে বেগার খাটিতে ইচ্ছা করেন না, এইজন্য ঐ শ্রেণীর

বন্ধ্যা কার্য্যে কতকগুলি বেকার লোক আজন্ম নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা আযৌবন ঐ সকল বিষয়ে খুব তালিম, এবং তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ঐদিকে উন্নতি করিয়া, ক্রমে প্রতিপত্তি ও উচ্চপদ লাভ করেন। সে পথও তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত; একারণ তাঁহাদিগকে বিদ্যা বুদ্ধি মানসিক বল ও নৈতিক প্রভাবে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবীতে উঠিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয়। কিন্তু আমাদের এই ক্ষমতাপ্রিয়দেশে অধিকাংশ অকর্ম্মণ্য বেসরকারী ছোঁড়া লোক কিঞ্চিৎ ক্ষমতা লাভ বা সামান্য স্বার্থসাধনের অভিপ্রায়ে ঐ সকল অবৈতনিক পদের জন্য ধাবমান হইয়া থাকেন। তজ্জন্য প্রথম নম্বরে ভোট সংগ্রহের সময়ে বেনে, বকালী, মুদী, গাড়োয়ান প্রভৃতি নিম্নস্তরের অবিবেচক মূর্খ লোকের মনস্তুষ্টি হেতু যে কি প্রকার হীন ঘৃণিত ব্যাপারের অভিনয় দ্বারা মতি বুদ্ধি নীচ করা হয়, তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করিত বিষম লজ্জা হয়। যখন সদসৎ কোন উপায়ে জয়লাভ করতঃ পদস্থ হইলেন, তখন একেবারে এক নূতন জগতে পতিত;—কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝেন না, কোনকালে ওরূপ কার্য্যের জন্য কোন শিক্ষা পান নাই, কি করিবেন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। এদিকে নিজের যাহা কিছু জীবিকানির্ব্বাহের উপায় আছে, তাহার ধান্দা ছাড়িয়া, শিক্ষানবিসীও করিতে পারেন না। এ অবস্থায় প্রায় সব কাজেই সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ দিয়া চলিয়া যান, কি হইতেছে না হইতেছে, বড় একটা খবর রাখেন না। তবে যখন নিজের ছোট বড় কোনরূপ স্বার্থের কথা উত্থাপন হয়, তখন যেন-তেন প্রকারেণ সেটা সুবিধামত সারিয়া লইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। উহার মধ্যে দুই একজন যাঁহারা একটু বেশী চালাক ও দুনিয়াদার, তাঁহারা বাইশ চেয়ারম্যান, তেইশ মোড়াম্যান, চব্বিশ মাদুরম্যান হইবার প্রয়াসে রাজপুরুষদের সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসিতেই নিবিষ্ট থাকেন। উক্ত পদাদি পাইলে ত কথাই নাই, তখন দিবারাত্রি ধ্যান, কিসে কালেক্টর কমিশনার প্রভৃতি বড় বড় সাহেব-দিগের শুভদৃষ্টিতে পড়িয়া, রায় বাহাদুরী লাভ করিবেন। শুদ্ধ এরূপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে গরিব প্রজাদের বড় ক্ষতি ছিল না, তাহাদের রাস্তা, ঘাট, নর্দ্দামা পরিষ্কার থাকুক আর নাই থাকুক, তাহারা তত ভাবেও না, ভাবিতে জানেও না;—একমাত্র উদরের চিন্তায় তাহারা ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু তাহা কোথায়? চেয়ারম্যান হইতে নবীন কমিশনর

বাবু পর্য্যন্ত প্রাচীন বিদ্বেষ চরিতার্থ এবং নিজেদের স্বার্থসাধন জন্য ছোট-খাটো সিরাজুদ্দৌলার অভিনয়ে ক্রটি করেন না। প্রতিবাসী, রাইয়ত, খাতক, জ্ঞাতি প্রভৃতিকে সরকারী ক্ষমতার দ্বারা জব্দ রাখা প্রধান কাজ মনে করেন।

এই ত গেল সফলকাম ব্যক্তিগণের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া। যাঁহারা ভোটাদি সংগ্রহে অপারগ হইয়া ভগ্নমনে আপন কোটরে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা সেখানে চুপচাপ বসিয়া নাই, নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিঘ্ন বাধা উপস্থিত করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান। কাজ খারাপ হইলে রাজপুরুষগণ সমগ্র জাতিকে অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিবে, তাহা তাঁহাদের খেয়াল নাই; যে কোন প্রকারে পারেন, পদস্থ প্রতিবেশীদিগকে দশের কাছে অপদস্থ করিতে পারিলেই সুখী, কারণ নিজেরা যে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দিতায় বিফল-মনোরথ হইয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার উহাই একমাত্র উপায় মনে করেন।

উক্তরূপ ক্ষেত্রে এই দেখা যাইতেছে যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের নৈতিক জীবন উন্নত না হইতেছে, ততদিন আমরা এ সকল কাজের জন্য অনুপযুক্ত, ওরূপ সামান্য ক্ষমতারও সদ্ব্যবহার করিতে আমরা অক্ষম। সাপুড়ে আপনাকে সুরক্ষিত করিয়া তবে বিষধর গোক্ষুরার মুখে হাত দিতে যায়, এবং নির্ভয়ে দিয়া থাকে; কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপ করিতে গেলে সর্পদংশনে মারা যায়। আমরা আজও হেলেসাপের লেজে হাত বুলাইতে শিখি নাই, কেউটের ফণায় চড় মারিব কি প্রকারে? নিঃস্বার্থভাবে ভ্রাতৃসেবা যখন আমরা শিখিব, ক্ষমতার অপব্যবহার যখন আমাদের দ্বারা অসম্ভব হইবে, যখন উচ্চ চরিত্রলাভে সক্ষম হইব, তখন আমরা স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যের ভার পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব। ঠিক হিসাব ত আমরা এখনও শিখি নাই। এখন আমরা যে হিসাব দেখাইয়া সংসারে চলিতেছি, তাহা বেহিসাব, বিস্তর গলদপূর্ণ; প্রকৃত ঠিক খতাইয়া মিলাইতে গেলে দেখি, কিছুই মিলে না। যাহাদের ভিতরে এত গরমিল, তাহাদের বাহিরের ব্যাপার সমূহে আসল মিল কিরূপে আশা করা যায়? বর্ত্তমানে আমরা কেবল কোন প্রকারে গোঁজামিলন দিয়া সোজা হইয়া চলিতেছি মাত্র; যখন ধাক্কা লাগিয়া আছাড় খাইয়া পড়ি, তখনই ভিতরকার ভুসিমাল বাহির হইয়া পড়ে। শোথগ্রস্ত

ব্যক্তিকে যদি বেশ মোটা সোটা বলা যায়, তাহা হইলে আমরাও কান্তিপুষ্টি কলেবর। আমাদের যাহা কিছু এক আধটুকু বাহিরের চটক দৃষ্ট হয়, তাহা নিতান্ত পাত্‌লা গিল্‌টির পোঁছ বই নয়; সামান্য জলের ছিটা পাইলেই ধুইয়া যায়, ঘষিয়া তুলিতে হয় না। বড় বড় নরেশ হইতে সামান্য মুহুরী পর্য্যন্ত একই ছাঁচে ঢালা। দুঃখের কথা আর কি বলিব, পশ্চিম প্রদেশের লক্ষপতিকে দেখিয়াছি, আট গণ্ডা ন্যায্য দেয় ফাঁকি দিবার জন্য, অনর্গল মিথ্যা কথা কহিতেছে। পাঠক আর কি চান? যে ভারতে এক সময়ে কেহ মিথ্যা কথা মুখে আনিত না, সেই দেশের আজ এই দুর্দ্দশা। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন যে, এ দেশের আট হাত মাটি চাঁচিয়া ফেলিতে পারিলে যদি কোন আশা হয়; নচেৎ এ মাটিতে কিছু হইবার উপায় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

চারু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নববসতি।

চারুবালার বয়স যখন ১১ বৎসর, তখন তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর ২ বৎসরকাল চারুবালা পিতৃগৃহে বাস করিয়াছিল। এই দুই বৎসর চারুর জীবন যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার অদৃষ্টে সেরূপ সুখভোগ আর কখনও ঘটিল না।

চারুর পিতার সাংসারিক অবস্থা তত ভাল ছিল না—সুতরাং মনের মতন পাত্রে চারুর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অনেক অনুসন্ধানের পর একটী দ্বিতীয়পক্ষ পাত্রের সন্ধান পাইয়া কোনওরূপে জাতিরক্ষা করেন। চারুর শ্বশুর শাশুড়ী ছিলেন না,—স্বামী পশ্চিমাঞ্চলে রেলওয়ে ষ্টেসনে সামান্য কর্ম্ম করিতেন।

আজ চারু সেই দূরদেশে স্বামীসংসার করিতে যাইতেছে। ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক তরুণী কেমন করিয়া পিতা, মাতা, ভাই, বোন, আত্মীয়, বন্ধু ত্যাগ

পিতা মাতার করিলে চলে না। চারুর পিতা মাতাও সেরূপ বৃথা চিন্তা করেন নাই।

স্বামী গৃহোদ্দেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিন চারু সমস্ত দিন কাঁদিল; মাতাকে কত অনুনয় করিল; খাদ্য, পেয় কিছুই স্পর্শ করিল না; পোষা বিড়াল ছানাটীকে আছাড়িয়া ফেলিয়া দিল; পিঞ্জরাবদ্ধ ময়না পক্ষীটীকে খাবার দিতে ভুলিয়া গেল; খেলার সাথীদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। পরদিন প্রত্যূষে চারুর সেই ক্ষুদ্র মানসিক-যাতনা-ক্লিষ্ট মুখ-খানি দেখিয়া তাহাকে চিন্তাক্লিষ্টা ষোড়শী যুবতীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

পথে যাইতে যাইতে চারু অনেক নূতন জিনিষ দেখিল। তাহার সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায়, কত স্বচ্ছ সলিলা সরোবর তাহার গাড়ীর পার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া গেল। তাহাদের পুকুরধারের আমগাছটীর মতন কত আমগাছ দূরে জড়াজড়ি করিতেছে দেখিতে পাইল। কত লোক তাহাদের গাড়ীতে উঠিল; কতলোক নামিল; কত যৌবনোদ্ধতা রূপসী স্বামীসহ বিদেশে যাইতেছে শুনিল। কিন্তু চারু কেমন মেয়ে কে জানে, তাহার মন সেই ক্ষুদ্র গ্রামটীর প্রতি পড়িয়া রহিল।

স্বামীর কর্ম্মস্থানে আসিয়া দেখিল, অপরিসর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩টী কক্ষবিশিষ্ট একটী বাটীতে তাহাকে আবদ্ধ করা হইল। পল্লীগ্রামের সেই বিস্তৃত শস্য-ক্ষেত্রের কথা তাহার মনে পড়িল। গোপনে একবিন্দু অশ্রুপাত করিয়া চারু ভাবিল, যত শীঘ্র পারি, এস্থান ত্যাগ করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বামী সম্ভাষণ।

বেচারা গোপেন্দ্রনাথ চারুকে আনিয়া বড় বিপদে পড়িল। বিদেশে এতদিন হাত পুড়াইয়া খাইয়া কোনওরূপে বাঁচিয়াছিল—এক্ষণে উপযুক্ত পত্নীকে সঙ্গে লইয়া আসিল, কিন্তু তাহার এমনি দুরদৃষ্ট যে, তাহার দুঃখের এখনও অবসান হইল না। প্রথম দিন আসিয়া চারু শয্যায় শয়ন করিল আর উঠিল না—গোপেন্দ্রনাথ ভাবিল, কখনও বিদেশে আসে নাই, নূতন আসিয়া মা বাপের জন্য মন কেমন করিতেছে, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।

রাত্রে যখন গোপেন্দ্র সোহাগ করিয়া চারুকে সম্ভাষণ করিতে গেল, চারু কোনও উত্তর দিল না, কেবল ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভবিষ্যতে অন্যরূপ সম্ভাষণ পাইবে, আশা করিতে করিতে গোপেন্দ্রনাথের শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ অতি শীঘ্রই নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইল। চারুর কিন্তু সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। প্রত্যূষে ৬টার সময় যখন রেল আফিসের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, তখন গোপেন্দ্রনাথের অভ্যাস বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ হইল।

উঠিয়া দেখিল, চারু তখনও বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। গোপেন্দ্রনাথ আদর করিয়া চারুকে বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিল, কিন্তু নিষ্ঠুর চারু "যাও, ভাল লাগে না" বলিয়া তাহার হস্ত সরাইয়া দিল। গোপেন্দ্রনাথ চোরটীর মত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। এইরূপ করিয়া প্রায় এক সপ্তাহকাল গেল। কিন্তু চারুর স্বভাবের কোনওরূপ পরিবর্ত্তন হইল না। গোপেন্দ্র ভাবিল, বিদেশে একলাটী থাকিতে কষ্ট বোধ করে, একজন দাসী রাখিয়া দিলে বোধ হয় মন ভাল হইবে। গোপেন্দ্রের বেতন সবে বিশ টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তুষ্ট করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে কোন্ সুরসিক নাগর ইতস্ততঃ করিয়া থাকে ? পরদিন, পোষ্টমাষ্টার বাবুর বাড়ীর দাসী তাহার দেশের একজন লোক আনাইয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

পাঁচদিন পরে মোক্ষদা দাসী আসিয়া তাহার প্রভুর নিকট হইতে চার্জ্জ বুঝিয়া লইল। মোক্ষদা দেখিল, সংসারের গৃহিণী ছেলে মানুষ—কিছু দেখেনা, কিছু বুঝেনা। ইহাকে প্রতারিত করা তাহার ন্যায় বুদ্ধিমতী দাসীর পক্ষে কঠিন হইবে না।

পরদিন রাত্রে গোপেন্দ্র শয়নাগারে গিয়া দেখিল, চারু শয্যার উপর বসিয়া আছে। আজ আর কাঁদিতেছে না। ভাবিল, দাসীর সহিত কথোপকথন করিয়া বুঝি মনটা একটু ভাল আছে। কাছে গিয়া বলিল, "চারু, বল, আমি কি করিলে তুমি সুখী হও; আসিয়া পর্য্যন্ত তুমি সর্ব্বদা বিষণ্ণ হইয়া থাক। তোমাকে প্রসন্ন দেখিলে আমি কত সুখী হই, তাহা যদি বুঝিতে।" আমাদের বলিতে লজ্জা হয়—কিন্তু কি করিব,—অরসিকা চারু উত্তর করিল, "তুমি আমার নিকট না আসিলে আমি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মোক্ষদা দাসী।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত স্বামী-স্ত্রীর সম্ভাষণ পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে, চারু গোপেন্দ্রকে কিছুমাত্র ভয় করে না। বাঙ্গালীর ঘরে যদিও এরূপ ঘটনা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না—তথাপি প্রকৃতপক্ষে চারু বাল্যকাল হইতে কেমন জেদী—কাহারও কথা শুনিত না, কাহাকেও ভয় করিত না।

উল্লিখিত ঘটনার পর কয়েকদিন আর গোপেন বড় চারুর সহিত কথাবার্ত্তা কহে নাই। আবশ্যক হইলে মোক্ষদার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত। বেচারীর মনে বোধ হয় আঘাত লাগিয়াছিল!

মোক্ষদা আসিল বটে, কিন্তু চারুর স্বভাব ফিরিল না। নানারূপ চিন্তা করিয়া গোপেন দেখিল, চারুকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ। গোপেন বেচারী দ্বিতীয় পক্ষ হইলেও স্বভাবতঃ একটু লাজুক। শ্বশুরকে এ কথা লিখিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। তাই সে একদিন রাত্রে চারুকে বলিল, "তোমার যদি এখানে থাকিতে না ইচ্ছা হয়, তোমার বাবাকে পত্র লিখিও," তিনি আসিয়া লইয়া যাইবেন।" চারু আজ একটু হাসিল।

পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্ত পড়িতে যদি কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মোক্ষদার সহিত তাঁহার পরিচিত হওয়া আবশ্যক হইতেছে। মোক্ষদা কোন জাতীয়া, তাহা ঐতিহাসিক মহোদয়েরা জ্ঞাত ছিলেন না, তবে সে লোকের কাছে বলিত, "সে কৈবর্ত্ত।" কৈবর্ত্তরা শুদ্ধজাতি, তাহাদের জল হিন্দুমাত্রেই ব্যবহার করিতে পারেন। মোক্ষদার বয়স অনুমান ৩৫।৩৬, কিন্তু সে বলিত, এক কুড়ি দুগণ্ডা। মোক্ষদা রূপসী কিনা তাহা জানি না, তবে রূপসী হইবার কামনা রাখিত, এবং গোপনে কেশবিন্যাস করিতেও দেখা যাইত। মন্দলোকের মন্দস্বভাব—লোকের নিন্দা করে, আমরা যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া যাইব। লোকে বলিত, মোক্ষদার দেশের কাহার সহিত অপবাদ হওয়ায়, তাহার মাসী তাহাকে এই দূর দেশে চাকরী করিতে পাঠাইছে।

চারু বাপের বাড়ী যাইবে, মোক্ষদা তাহা শুনিল। ইহাতে তাহার মনে কি হইল কেমন করিয়া বলিব, তবে পোষ্টমাষ্টার বাবুর দাসী তাহার অন্যত্র কর্ম্ম সন্ধান করিতে লাগিল, আমরা তাহা শুনিয়াছি।

স্বামীর অনুমতি পাইয়া চারু পিতাকে চিঠি লিখিল। লেখাপড়া চারুর তত ভাল লাগে না—সে ভাল লিখিতেও পারিত না। বাঁকা বাঁকা অক্ষরে কোনওরূপে পত্রখানি শেষ করিয়া পাঠাইয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পিত্রালয়।

যথাসময়ে চারুর পিতা তাহাকে বাটী লইয়া আসিলেন। ডুলি হইতে অবতরণ করিয়া, চারু একেবারে ছুটিয়া তাহাদের চিরপরিচিত সেই প্রাঙ্গণ মধ্যে আসিয়া জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "মা, কোথা গো, আমি এলাম।"

জননী। এলি, এস মা এস। তা এত রোগা হয়ে গেলি কেন মা?

চারু। ও কিছু নয়, সেখানকার জল হাওয়া ভাল নয়, তাই। লোকে জানিত, পশ্চিম প্রদেশের স্বাস্থ্য বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর; কিন্তু চারুর কেন সেরূপ বোধ হয় নাই, পাঠক পাঠিকা, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন।

বাপের বাড়ী আসিয়া প্রথম কয়দিন চারুর বসিবারও অবসর ছিল না। পাড়ায় পাড়ায় সকলের বাড়ী ছুটাছুটি করা—খেলার সাথীদের সহিত দেখা করা—তাহার পুত্তলিকা-জামাতার—কুশলপ্রশ্ন করা—তাহার পোষা বিড়াল ছানাটীর যত্ন করা—তাহার ময়না পাখিটীর সহিত রঙ্গ করা—ঘোষেদের হরিমতীর কন্যার সহিত তাহার কাল্পনিক পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ করা—সেই বিবাহোৎসবে সমাগত আত্মীয় কুটুম্বদিগের সেবা যত্নের বন্দোবস্ত করা—এই সব নানা কাজে চারু বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যখন কোন সুরসিকা বর্ষিয়সী তাহাকে ধরিয়া তাহার বরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন কিন্তু তাহার মুখ ভার হইয়া পড়িত—তাহার অনন্ত বাক্যস্রোত হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া পড়িত। চারু এইরূপ আমোদ আহ্লাদে

দিন কাটাইতে লাগিল; কিন্তু বর্ত্তমান সমাজের প্রথানুসারে পিত্রালয়ে পদার্পণ করিবামাত্র সুরঞ্জিত চিঠির কাগজ লইয়া গোপেন্দ্রনাথকে প্রেমপত্র লিখিতে তাহার ভুল হইয়া গেল।

চারু যে তাঁহাকে পত্র লিখিবে, গোপেন্দ্রনাথ তাহা আশাও করেন নাই। চারুর নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া গোপেন্দ্রনাথ একটু বিচলিত—একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু চারুর আশা আদৌ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি, এখন গোপেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব পত্নী বিমলার কথা চিন্তা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে বন্ধুদিগের নিকট বিমলার প্রশংসা করিতেন। বিমলার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাহার বয়স অষ্টাদশবর্ষ হইয়াছিল। সে আজ তিন বৎসরের কথা। গোপেন্দ্রনাথ এখন অষ্টাবিংশবর্ষ বয়স্ক যুবাপুরুষ।

চারু নিশ্চিন্তমনে পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু গোপেন্দ্রনাথ মোক্ষদাকে লইয়া বড় বিপদে পড়িলেন। তিনি তাহাকে দূরদেশ হইতে আনাইয়া ছিলেন; এখন তাহাকে বিদায় দিলে তাহার অসুবিধা হয়। তাহার কর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নিজে বৃথা বেতন দিয়া তাহাকে রাখাও সঙ্গত মনে করিলেন না। অগত্যা, তাহাকে তাহার যাতায়াতের ভাড়া ও পাঁচ টাকা বেশী দিয়া বিদায় করিতে চাহিলেন; কিন্তু সে দেশে যাইতেও অস্বীকার করিল। গোপেন্দ্রনাথ একবার ভাবিলেন, দুই এক মাস পরে আবার চারুকে লইয়া আসিবেন। এ দুই মাস না হয় মোক্ষদা থাকুক। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, গোপেন্দ্রনাথ বড় লাজুক, যদি কেহ কিছু সন্দেহ করে! ফলতঃ মোক্ষদা রহিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গোপেন্দ্রনাথ।

চারু চলিয়া যাইবার পর ৪ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু চারুকে আনিবার জন্য গোপেন্দ্রনাথ আর কোনও প্রস্তাব করিলেন না। চারুর পিতা একটু বিস্মিত হইলেন। চারুর মাতা ভীতা হইলেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর চারু স্বামীকে এক পত্র লিখিল, কিন্তু তাহার কোনও

উত্তর পাইল না। বাবাজীর শরীর অসুস্থ হইল কি না, জানিবার জন্য পোষ্টমাষ্টারকে চারুর পিতা এক পত্র দিলেন। পোষ্টমাষ্টার মহাশয় ভদ্রলোক, তিনি উত্তর লিখিলেন, "প্রায় একমাস হইল, গোপেন্দ্রবাবু স্ত্রীকে আনিবার জন্য দেশে গিয়াছেন। কিন্তু, আপনার পত্রে বোধ হইল, আপনারা তাঁহার সংবাদ পান নাই, ইহাতে আমরা বড় আশ্চর্য্য হইলাম। এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বে মোক্ষদা নাম্নী এক দাসী তাঁহার বাটীতে কাজ করিত। গোপেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার ৩।৪ দিন পর হইতে তাহারও আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।"

চারুর পিতার জ্ঞান ছিল, গোপেন্দ্রনাথ সচ্চরিত্র। পত্র পড়িয়া তিনি একটু আশ্চর্য্য হইলেন, গৃহিণীকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিণীর রোদনমাত্র তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল। সেই অবধি গোপেন্দ্রের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। চারুর আর এখন সে প্রফুল্ল ভাব, সে উদ্দাম চঞ্চলতা, সে হাস্য-মুখরিত-উচ্চকণ্ঠ নাই। পাড়ার ঠাকুরাণী দিদি বলেন, "চারু অল্প বয়সে বুড়ীর ন্যায় গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে।"

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বি, এ।

সভায় সভ্যতা।

হিতোপদেশে দেখিবে, "সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।" সাধারণ পাঠক বলেন, "সভায় বাক্‌পটুতা দেখাইবে এবং যুদ্ধে বিক্রমের পরিচয় দিবে।" পাশ্চাত্য সভ্যরাজ্যে কিন্তু হিতোপদেশের এইবাক্যে অন্যরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কথার ব্যাখ্যা অপেক্ষা দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা অধিক গ্রাহ্য; সভ্য ইউরোপ আমরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যাই অধিক গ্রাহ্য। অতএব, "সভায় প্রথমে বাক্‌পটুতা অর্থাৎ বাগ্‌যুদ্ধ, পরে প্রকৃত যুদ্ধ এবং তাহাতে বল প্রকাশ—অর্থাৎ বাহুবলের পরিচয়," ইহাই হইতেছে হিতোপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম। এই মর্ম্মেই কার্য্য হইয়া থাকে। ইউরোপ আমরিকার সকল সভাতেই প্রথমে সভ্যেরা বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া, পরে বাহুযুদ্ধ করিয়া থাকেন। ইউরোপের সকল রাজ্যের মহাসভায় এই নিয়ম। সভ্যদিগের অঙ্গহানি এবং শোণিতপাত হইতেও দেখা যায়। আমরিকা অষ্ট্রেলিয়া নিউজীলণ্ড প্রভৃতি রাজ্যেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

বিলাতের পার্লেমেণ্টেও বাগ্‌যুদ্ধ বাহুযুদ্ধে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অল্পদিন হইল, বিলাতের কমন্স সভায় বাহুযুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। কয়েক জন আইরিষ সভ্যকে সভাস্থল হইতে প্রকৃত প্রস্তাবেই তুলিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। পাঠশালের পড়ো-ধরা, কলিকাতায় পাহারাওয়ালাদের মাতাল-ধরা, অনেকেই দেখিয়াছেন। বিলাতের কমন্স-সভায় যে সভ্য-ধরা হইয়াছিল, তাহাও মাতাল ধরার মত। দশ বারজন প্রহরী আসিয়া এক একজন সভ্যকে উধাও করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। দুষ্ট মাতালেরা পাহারাওয়ালার স্কন্ধে চড়িয়া যেরূপ হাত পা ছোড়ে, কমন্স-সভার সভ্যেরাও প্রহরীর স্কন্ধে উঠিয়া সেইরূপ হাত পা ছুড়িয়া ছিলেন। এই সংবাদে যাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা অল্প। অনভিজ্ঞ-দিগের অভিজ্ঞতা-সম্পাদনের জন্যই ১৮৯১ অব্দের ঘটনায় আমাদিগকে একবার ইঙ্গিত করিতে হইতেছে। ১৮৯১ অব্দের জুলাই মাসের বিবরণীতে দেখা যায় ;—

"গ্লাডষ্টোনের হোমরুল বিলে অর্থাৎ আইরিষ আত্মশাসনের ব্যবস্থায় দোষ দিবার সময়ে চেম্বার্লেন বলিলেন, লিবারেল দলের কোন সভ্যেরই কোনরূপ স্বাধীন বিবেচনা নাই। সকলেই গ্লাডষ্টোনের গোঁড়া, সকলেই তাঁহার তোষামোদ করিতে ব্যস্ত। সেকালে য়িহুদিরাজ হেরডের যেরূপ সকলেই তোষামোদ করিত, একালে গ্লাডষ্টোনদলের সভ্যেরা সেইরূপ গ্লাডষ্টোনের তোষামোদ করিয়া থাকেন।"

এই কথা শুনিয়া এক সভ্য তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "চেম্বার্লেন যুডাস, ইহুদী যুডাস যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যীশুখৃষ্টের শত্রুতা করিয়াছিল, চেম্বার্লেনও সেইরূপ বিশ্বাসঘাতক হইয়া, গ্লাডষ্টোনের শত্রুতা করিতেছেন।" এই উক্তির প্রতিবাদ হইল, প্রতিবাদের প্রতিবাদ হইল, তাহারও আবার প্রতিবাদ হইল। এইরূপে প্রতিবাদ ক্রমে বিবাদে পরিণত হইল। তখন পূর্ব্বদলের সভ্যেরা মুখ ছাড়িয়া হাত ধরিলেন ; সভাপতিকে কাষ্ঠপুত্ত-লিকাবৎ বসিয়া থাকিতে হইল। ফিশার নামে এক যুবক টোরি সভ্য অন্যদলের সভ্য নোলান সাহেবের গলা টিপিয়া ধরিলেন। বিখ্যাত টোরি সভ্য সার আস্মদ বার্টলেট ও ফিশারের সাহায্যার্থ লাফাইয়া উঠিয়া, নোলানকে চাপিয়া ধরিলেন। শেষে দুইজনে মিলিয়া নোলানকে কাঁধে করিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইত্যবসরে সভাস্থলেই হাতাহাতি লাগিয়া

গেল। "মারো, ধরো, লাগাও ভাগাও" প্রভৃতি শব্দে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পঞ্চাশ ষাট জন সভ্য হাতাহাতি করিতে লাগিলেন। ঘুষাঘুষি কিলাকিলি, চাপড়া-চাপড়ি, পাকড়া-পাকড়ি, ঠেলাঠেলি, চুলাচুলি প্রভৃতি বিবিধ বাহুযুদ্ধের ধুম লাগিয়া গেল। কাহারও কোট ছিঁড়িল, কাহারও টুপি উড়িল, কাহারও কলার ছিঁড়িয়া অন্য কাহারও হস্তে রহিল। দমাদম্ গমগম্ শব্দে সভাগৃহ গমগম করিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ অভিনয় দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। চারিদিকে "ছি ছি! ধিক্ ধিক্! দূর দূর!" ধ্বনি উঠিতে লাগিল। দণ্ডাধিক কাল এইরূপে কাটিয়া গেল। মল্লদিগের বাহুবলে একটা পুস্তকপূর্ণ আল্‌মারী পড়িয়া গেল। ঠিক যেন হনুমান আসিয়া গন্ধমাদন ফেলিয়া দিলেন। অভিনয়ের চূড়ান্ত হইল। ক্রমে যুদ্ধে স্বতই শান্তিসংস্থাপন হইল।"

১৮৯৩ অব্দের জুলাই আগষ্টের বিলাতী পত্রিকায়ও এই বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। আগষ্টের এক মাসিক হইতেই আমরা যুদ্ধবিবরণটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একটা নজির সম্মুখে ধরিয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। বিলাতের পার্লেমেণ্ট জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাসভা; মানে, গৌরবে, গাম্ভীর্য্যে, অদ্বিতীয়। সে অদ্বিতীয় সভার নজিরও অদ্বিতীয়, জগৎমান্য। মধ্যে বঙ্গীয় পার্লেমেণ্ট ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে যে অভিনয় হইয়াছিল, বিলাতের পার্লেমেণ্টের অভিনয়ের তুলনায় তাহা ত কিছুই নহে। এখানে কেবল কিঞ্চিৎ বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। আর জন বিশ বাইশ সভ্য সভাস্থল হইতে অবিনয়সহকারে রীতিবিরুদ্ধরূপে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাকে আর অভিনয় বলে না। বিলাতের আদর্শই আদর্শ! এদেশে সবে এই সভ্যতার সূত্রপাত। অদৃষ্টে থাকে, ক্রমে সভ্যতা এখানেও বাড়িবে; সভ্যতা ক্রমে চরমে উঠিবে। এখানেও হিতোপদেশের প্রকৃত ব্যাখ্যাই বাহাল হইবে। সভাস্থলেই বাক্‌পটুতা হইবে, সভাস্থলেই যুদ্ধের বিক্রম দেখিতে পাইবে। সবুরে মেওয়া ফলে। সে মেওয়া এখানে শীঘ্রই ফলিবে; সবুর করিতে হইবে না।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

চিন্তাকণিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শরীর ধারণে জীবের এত দুঃখ। পরমাত্মায় অবস্থিতি করিলে জীবের সকল দুঃখের অবসান হয়। ৯৪।

চৈতন্যময় পুরুষের পূর্ণাবির্ভাব হইলে, শরীর চৈতন্যে পরিণত হয়। ৯৫।

সংসারে আপনাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলাই হচ্ছে বাহাদুরি। ৯৬।

বক্তৃতাকে পিটিয়া সোণার পাতের মত লম্বা চওড়া করিয়া কাহাকেও ধর্ম্ম-পথে আনিতে পারিবে না। হৃদয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে বিবেক ও বৈরাগ্য নিয়ে তাঁতে প'ড়ে থাক। তখন তোমায় দেখিয়া কত শত লোক তোমার অনুসরণ করিবে। ডাক্‌তেও হবে না। নিমন্ত্রণ কর্‌তেও হবে না। ৯৭।

দুই সাধকের সাক্ষাৎ বড়ই সুন্দর! অবাক প্রাণে নয়নে নয়নে অনিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, পরস্পরের হৃদয়ের ভাব বুঝিতেছে এবং হৃদয় দুইটী এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ৯৮।

সকলকেই বেদে অধিকার দেওয়া হ'লো, কিন্তু কেহই গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লে না। পেটে নেই আগুন, দিলে কি না বেদ, হজম ক'রবে কিসে? কাজেই উগ্‌লে উগ্‌লে এমন জিনিষটাকে অপবিত্র ক'রে ফেল্‌লে। ৯৯।

তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে বেদ অধ্যয়ন করিলে, তবে অধ্যয়নের ফল পাওয়া যায়। ১০০।

যার কথা যত বেশী, কাজ তার তত কম। ১০১।

নিজের জন্য ধর্ম্ম সঞ্চয় কর। পরকে শিক্ষা দিতে অত ব্যস্ত হইও না। যখন তোমার হৃদয় ধর্ম্মের আলোকে আলোকিত হইবে, তখন সেই আলোক চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া অন্য লোকের হৃদয় হইতে অন্ধকার-গুলিকে অপসারিত করিবে। ধর্ম্মই লোককে ধার্ম্মিক করে, তোমার সাধ্য কি। ১০২।

কামনার পশ্চাতে সিদ্ধি নাই। ১০৩।

ঋষিদের আদর্শে চল, তাহা হইলেই ঋষি হইতে সক্ষম হইবে। যাহা স্থির, তাহাই গভীর। গভীরতায় মিশে যাও; চঞ্চলতা ছাড়। ১০৪।

অর্থচিন্তায় শরীর ক্ষয় করিতেছ। যদি ধর্ম্ম চিন্তা করিতে, তাহা হইলে দীর্ঘজীবী হইয়া স্বাস্থ্যসুখ ও শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হইতে। ১০৫।

ধ্যানের স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁহার চরণমূলে উপস্থিত হও। ১০৬।

আমি কি—জান্তে হ'লে, আমি কি নই—দেখ্তে হয়। ১০৭।

সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে—সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল। এইটি গ্রহণীয় বটে। কিন্তু কেহ গ্রহণ করে না। ১০৮।

জগৎশুদ্ধ লোক তোমার বিপক্ষ হউক, সেও তোমার মঙ্গল। তথাচ অসৎ লোকের সঙ্গে সদ্ভাব করিয়া আপনাকে নষ্ট করিও না। ১০৯।

কেহ তোমার সঙ্গে মেশে না, তাতে তোমার ক্ষতি কি? তুমি তোমার আত্মার উন্নতি করিতে থাক, এবং প্রফুল্ল অন্তরে তোমার গন্তব্য স্থানে তোমার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিয়া রাখ। ১১০।

সুখের আশায় কোথায় যাও! সংসারে কি সুখ আছে তা পা'বে। সুখ-শান্তি তোমার অন্তরের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া লও। ১১১।

এখন আমি রোগে শোকে তাপে তাঁহাতে থাকিয়া কেমন তৃপ্তিলাভ করিতেছি। ১১২।

ভাবশূন্য কথা, আর প্রাণশূন্য দেহ, এ দুয়ের কোনটিও নাহি চাহে কেহ। ১১৩।

বৈদিক মন্ত্রগুলি সংসারের কথা নয়, যে তুমি সংসারী হইয়া তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে। ১১৪।

যদি রে লইয়া যাবে, দিয়ে যাও সঙ্গে যাবে। এখানে রয়েছে যাহা, সঙ্গে নাহি যাবে তাহা। যাহা করিয়াছ ব্যয়, তাহা ত হ'য়েছে ক্ষয়। ১১৫।

মনেতে ভাব পুরণ কর, বাক্য আসিয়া যেন মনকে অধিকার করিয়া না লয়। কোন বিষয় চিন্তা করিও না, যাহা হইবে, তাহাই হউক। ১১৬।

যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া পরমাত্মার সংস্পর্শে থাকিয়া উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে, তাঁহারা যদি কখন কোন কার্য্য করেন, তাঁহাদের চিত্তে সেই কার্য্যের কোন দাগ পড়ে না। তখন তাঁহাদের নিকটেই পাপ পুণ্য সমান ভাব ধারণ করে। কেন না, তাঁহারা পরমাত্মাকে পাইয়া সকল বিষয়েই অনাসক্ত হইয়াছে। কি পাপ কার্য্য, কি পুণ্য কার্য্য, কোন কার্য্যেই তাঁহারা আসক্ত হয়েন না। তাঁহারাই মুক্ত পুরুষ। আসক্ত বদ্ধ জীবগণকে পাপপুণ্য মানিয়া চলিতে হয়। ১১৭।

বাস্তবিক কেহ পৌত্তলিক নহে। মানুষ এতই নির্ব্বোধ হইতে পারে না

যে, সে পুতুলকে ঈশ্বর বোধ করে। সকল স্থানে সকল ভূতে সমভাবে সকল সময়ে ভগবানের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিতে না পারিলে, প্রকৃত ভগবদ্দর্শন হয় না। ১১৮।

জগতের স্রষ্টা কেবল কৈলাসেও থাকেন না, চতুর্থ আস্মানেও থাকেন না। জন্মগ্রহণ বৈথেলেমেও করেন নাই, গোকুলেও নয়। অবতীর্ণ সত্যযুগেও নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও নয়। তিনি অনন্তকাল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। তিনি সমানভাবে সকল ভূতে থাকিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাইতেছেন। যাহা জগতের কোন এক স্থানে বা কোন এক কালে অবস্থিতি করে, তাহা তাঁহারই সৃষ্টবস্তু জানিবে। ১১৯।

যাহার আকৃতি আছে, তাহার আধার আছে। যাহা নিরাকার, তাহাই নিরাধার। যাহা নিরাধার, তাহাই ব্যাপক। যাহা ব্যাপক, তাহাই অনন্ত। যাহা অনন্ত, তাঁহাকেই অক্ষয় ও অব্যয় পুরুষ বলিয়া জানিবে। ১২০।

জ্ঞান আছে বলিয়াই জগৎ আছে। জ্ঞানের আকার নাই, জগতে পড়িয়াই আকার ধারণ করিয়াছে। ১২১।

জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া এই পঞ্চভূতময় শরীরকে বিশুদ্ধ করিয়া লও, দেখিবে, যেন শত শত গোলাপের গন্ধ ও সৌন্দর্য্য এই শরীর হইতে বাহির হইতেছে। অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়া শরীরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া আপনাকে ও শরীরকে একেবারে ঘৃণিত ও দুর্গন্ধযুক্ত করিয়া ফেলিও না। ১২২।

শ্রীহরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।



ধর্ম্মবিবেক-কাব্যম্।

(হলায়ুধ-বিরচিতম্)

(১)

শ্রদ্ধাবীজো বিপ্রবেদাম্বুসিক্তঃ
শাখা বিদ্যাস্তাশ্চতস্রো দশাঽপি।
পুণ্যাস্তর্থা দ্বে ফলে স্থূলসূক্ষ্মে
মোক্ষঃ কামো ধর্ম্মবৃক্ষোঽয়মীড্যঃ॥

ধর্ম্ম-বৃক্ষ সকলেরি পূজ্য সর্ব্বক্ষণ,
বেদ-জলে পুষ্ট তাহা করেন ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দশ বিদ্যা-শাখা তার চারিধারে,
যত্ন করে তারে লোক পুণ্যলাভ তরে।
স্থূল সূক্ষ্ম দুই ফল তাহে অবিরাম,
কাম মোক্ষ এই দুই তাহাদের নাম!

(২)

যাতঃ ক্ষামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতালমূলং বলিঃ
শক্তুপ্রস্থবিসর্জনাৎ স চ মুনিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ।
আবাল্যাদসতী সতী সুরপুরীং কুন্তী সমারোহয়ৎ
হা সীতা পতিদেবতাঽগমদধো ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ॥

সমস্ত পৃথিবী দান করি নারায়ণে
বলিরাজ বদ্ধ রন্ পাতাল-ভবনে।
এক সরা ছাতু দিয়া সে ঋচক্ মুনি,
স্বর্গে বাস করিলেন, এ কথাও শুনি।
বাল্যকাল হ'তে কুন্তী পরম অসতী,
অবশেষে হ'লো তাঁর স্বর্গধামে গতি।
কিন্তু সেই সীতা দেবী পতিব্রতা নারী,
কি দোষে পাতালে যান্, বুঝিতে না পারি!
ধর্ম্মের পরম সূক্ষ্ম গতি নিরন্তর,
সন্ধান কি পায় তার স্থূলবুদ্ধি নর!

(৩)

কানীনস্থ মুনেঃ স্ববান্ধববধূবৈধব্যবিধ্বংসিনো
নপ্তারঃ খলু গোলকস্থ তনয়াঃ কুণ্ডাঃ স্বয়ং পাণ্ডবাঃ।
তেঽমী পঞ্চ সমানযোনিরতয় স্তেষাং গুণোৎকীর্ত্তনা-
দক্ষয্যং সুকৃতং ভবেদবিকলং ধর্ম্মস্থ সূক্ষ্মা গতিঃ ॥

পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম-কথা-বিবরণ
আশ্চর্য্য হইবে লোক করিলে শ্রবণ ;—
তাহাদের পিতামহ ব্যাস ঋষিবর,
ব্যাসের জন্মের কথা শুন, ওহে নর!
মৎস্যগন্ধা রমণীর সুখ সহবাসে—
ঋষিবর পরাশর জন্ম দিল ব্যাসে।
বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হইবার পরে
অম্বালিকা পত্নী তাঁর রহিলেন ঘরে,
ভ্রাতৃবধূ হইলেও অম্বালিকা সতী
তাঁর সনে ব্যাসদেব করিলেন রতি।
সেই রতিফলে পাণ্ডু জন্মিল ধরায়,
তাঁর পত্নী কুন্তী তাঁর জীবৎ-দশায়
বিহার করিয়া ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র সনে,
জন্ম দিল যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনে।
আর এক পাণ্ডু পত্নী, মাদ্রী নাম যার,
অশ্বিনী-কুমার সনে করিল বিহার ;
নকুল ও সহদেব এই দুইজন,
সেই বিহারের ফলে দিলেন দর্শন।
পঞ্চ পাণ্ডবের কথা কহিতে না পারি,
এক দ্রৌপদীর সনে বিহার সবারি।
হেন পঞ্চ পাণ্ডবের গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে,
অতুল অক্ষয় পুণ্য হয় ত্রিভুবনে!
হায়রে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি নিরন্তর,
বুঝিতে কি পারে তাহা স্থূলবুদ্ধি নর?

(৪)

আহারে শুচিতা ধ্বনৌ মধুরতা নীড়ে পরাধীনতা
বন্ধৌ নির্ম্মমতা বনে রসিকতা বাচালতা মাধবে।
এতৈরেব গুণৈর্যুতং পরভৃতং ত্যক্ত্বা কিমেতে জনা
বন্দস্তে খলু খঞ্জনং কৃমিভুজং চিত্রা গতিঃ কর্ম্মণাম্॥

পরম পবিত্র ফল নিত্যই আহার,
পরম মধুর ধ্বনি মুখে অনিবার,
পালকের গৃহে রয় অধীন হইয়া,
বন্ধু বান্ধবের মায়া দেয় কাটাইয়া,
লোকালয় ত্যজি কত যত্ন বনবাসে,
মাধবে দেখিলে মুখে কত কথা আসে;—
মহা সাধু পুরুষের যে সব লক্ষণ,
কোকিলের সেই সব রহে অনুক্ষণ।
এত গুণ থাকিলেও কোকিলে ত্যজিয়া,
কীটভোজী খঞ্জনেরে ধরিয়া আনিয়া,
যত্ন করি রাখে লোক গৃহে আপনার,
হায়রে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি বুঝা ভার!

(৫)

কান্তং বক্তি কপোতিকাকুলতয়া নাথান্তকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপশাণিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি।
ইত্থং সত্যহিনা স দষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেনাহত-
স্তূর্ণং তৌ তু যমালয়ং পরিগতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ॥

মনোদুঃখে কপোতিকা কপোতেরে কয়,
আসিল মোদের আজ অন্তিম সময়।
নিম্নদিকে দেখ ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ ধ'রে,
চারিদিকে বাজ পক্ষী দেখ ঘুরে ফিরে,
এইরূপে প্রাণভয়ে দোঁহের জল্পন,
ইতিমধ্যে ব্যাধে সর্প করিল দংশন।

ধনুকে যে বাণ ছিল, তাহা ছুটে গিয়া
সেই বাজ-পক্ষীকেও দিইল বিঁধিয়া।
এইরূপে দুই শত্রু গেল যমালয়,
দৈবের বিচিত্র গতি, জানিও নিশ্চয়!

(৬)

শুণ্ঠীগোক্ষুরয়োর্বিচার্য্য মনসা কল্কাশনং যন্ময়া
প্রোক্তং তদ্বিপরীতকং কৃতমহো গোঃ খুরমাত্রং দদৌ।
নার্থো মুর্খজনালয়ে ন চ সুখং নো বা যশো লভ্যতে
সদ্বৈদ্যে কবিভূপতৌ হরিহরে লাভঃ পরং গোবধঃ॥

মনে মনে সবিশেষ বিচার করিয়া
শুণ্ঠী গোক্ষুরের দিনু ব্যবস্থা করিয়া।
যা বলিনু, হ'লো তার বিপরীত ফল,
শুণ্ঠী নাহি দিয়া দিল গোক্ষুর কেবল।
কিবা সুখ, কিবা যশঃ, কিবা আর ধন,
মূর্খের বাটীতে নাহি মিলে কদাচন!
"কবিরাজ হরিহর" খ্যাতি অনিবার,
হইল লাভের মধ্যে গোবধ আমার!

(৭)

পঞ্চাস্যস্য পরাভবায় ভষকো মাংসেন গোর্ভূয়সা।
দধ্যন্নৈরপি পায়সৈঃ প্রতিদিনং সংবর্দ্ধিতো যো ময়া।
সোঽয়ং সিংহরবান্মহাস্তরগমভ্ভীত্যাকুলঃ সম্ভ্রমাদ্
হন্তাশা বিলয়ং গতা হতবিধে লাভঃ পরং গোবধঃ॥

সিংহ-জয় করিবার অভিলাষ করি
পুষিনু কুকুর এক কত দিন ধরি।
গোমাংস পায়স দধি-অন্ন দিয়া তারে,
হৃষ্ট পুষ্ট করিলাম কতই আদরে।
কিন্তু সিংহ-রব শুনি প্রাণভয়ে হায়
প্রবেশ করিল এক পর্ব্বত-গুহায়।

যত কিছু আশা মোর হ'লো ছারখার,
ওরে পোড়া বিধি! শুধু গোবধ আমার!

(৮)

পারীন্দ্রস্থ পরাভবায় সুরভীমাংসেন দুর্মেধসা
পুষ্যস্তে কিল পীবরাঃ কটুগিরঃ শ্বানঃ প্রযত্নাদমী।
নত্বেতন্মদমত্তবারণচমুবিদ্রাবণঃ কেশরী
জেতব্যো ভবতা কিরাতনৃপতে লাভঃ পরং গোবধঃ॥

সিংহ-জয় করিবার আশে অবিরল
যতনে পুষিলে এই কুকুর সকল।
গোমাংস খাইয়া হ'লো হৃষ্ট পুষ্ট সবে,
ঝালাপালা হ'লো কাণ কিন্তু কটু রবে।
মদমত্ত হস্তীকেও ধরিয়া নখরে
যে সিংহ বিদীর্ণ করে খণ্ড খণ্ড ক'রে,
সেই সিংহ-জয় হেতু করি অভিলাষ
পুষিলে কুকুর গুলা তুমি বারমাস।
হে ব্যাধ! তোমার মত মূর্খ কেবা আর,
হইবে লাভের মধ্যে গোবধ তোমার!

(৯)

একা ভূরুভয়োরৈক্যমুভয়োর্দলকাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে॥

কিবা শ্যামা ঘাস আর কিবা শালি ধান,
এক ভূমিতেই তাহাদের জন্মস্থান।
কিবা তাহাদের দল, কিবা কাণ্ড আর,
অনায়াসে ভেদ করা কঠিন ব্যাপার।
কিন্তু এক এক ফল করিয়া দর্শন
কেবা শ্যামা, কেবা শালি, বুঝে সর্ব্ব জন!

(১০)

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িণী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।

দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা ॥

সূর্য্যবংশে জন্ম, যাঁর পিতা দশরথ,
যে পিতার দশদিকে বহু রথী রথ,
সীতা সতী প্রণয়িণী যাঁর নিরন্তর,
লক্ষ্মণ পরম বীর যাঁর সহোদর,
যাঁর মত মহাবীর নাই ত্রিভুবনে,
সাক্ষাৎ বিষ্ণুই বলি যাঁরে সবে গণে,
বিধিবশে বিড়ম্বিত তবু সেই রাম,
কি কব অন্যের কথা বিধি যার বাম!

(১১)

একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা বসতিরুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ ॥

এক ভার্য্যা সরস্বতী বড়ই মুখরা,
যাঁহার মুখের চোটে ফেটে যায় ধরা।
আর এক খানি ভার্য্যা, লক্ষ্মী নাম তাঁর,
এ বাড়ী ও বাড়ী করা মহারোগ যাঁর!
দিগ্বিজয়ী এক পুত্র দুরন্ত মদন,
পঞ্চ শরে খুঁচে খুঁচে করে জ্বালাতন।
অনন্ত সর্পেতে শয্যা, সমুদ্রে নিবাস,
গরুড় বাহন ল'য়ে চড়া বারমাস!
এই সব মনে মনে তোলাপাড়া করি
শুকাইয়া কাঠ খানি হ'য়েছেন হরি!

(১২)

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্।
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ ॥

অসার সংসার, সার শ্বশুরের ঘর,
হরি রন্ সাগরেতে, হিমালয়ে হর!

(১৩)

অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥

সাধুসঙ্গ, শিবপূজা, কাশীধামে বাস,
জাহ্নবীর জলে স্নান পান বারমাস,
অসার সংসারে এই চারিটীই সার,
তাহা বিনা যত কিছু সকলি অসার!

(১৪)

আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেৎ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি॥

বিপৎ তরিতে ধন রাখ যত্ন করি,
ধন দান করিয়াও রক্ষা কর নারী,
কিবা সেই নিজ নারী, কিবা সেই ধন,
দুই দিয়া রক্ষা কর নিজের জীবন!

(১৫)

চিন্তা জরা মনুষ্যাণামনধ্বা বাজিনাং জরা।
অসম্ভোগো জরা স্ত্রীণাং বস্ত্রাণামাতপো জরা॥

জীর্ণ শীর্ণ হয় লোক দুশ্চিন্তা থাকিলে,
জীর্ণ শীর্ণ হয় অশ্ব পথ না চলিলে,
সুখ-ভোগ বিনা নারী জীর্ণ শীর্ণ হয়,
জীর্ণ শীর্ণ হয় বস্ত্র রৌদ্রে যদি রয়!

(১৬)

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥

কৃষ্ণপদ চিন্তা করে সদাই যে জন,
সেই পদে পুনঃ যার ভক্তি সর্ব্বক্ষণ,
কি ভয়, কি ভয়, তার দুর্গম কাননে,
কি ভয়, কি ভয়, তার মরণে বা রণে ?

(১৭)

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

কিবা দেব, তীর্থ, মন্ত্র অথবা ব্রাহ্মণ,
কি ঔষধ, কি দৈবজ্ঞ, কিংবা গুরুজন,
এই সবে চিন্তা যার যেরূপ রহিবে,
ঠিক সেইরূপ ফল তাহার ফলিবে !

(১৮)

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।
ন হিংসা কুরুতে সাধুর্ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ॥

পুত্রে অভিশাপ মাতা না দেয় কখন,
সর্ব্বংসহা কারো দোষ না করে গ্রহণ,
হিংসা নাহি করে সাধু কাহারো উপরে,
দেবতাও সৃষ্টিনাশ কভু নাহি করে !

(১৯)

জল্পন্তি সূরয়ঃ সর্বে ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্।
এতজ্জ্ঞাতব্যমদ্যৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি॥

ধর্ম্মই রাখেন তারে, ধর্ম্মে যার মন,
একথা কহেন নিত্য সাধুজনগণ।
এ চির প্রবাদ সত্য, কিংবা মিথ্যা আর,
পরীক্ষা লইব আমি অদ্যই ইহার !

(২০)

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।

জয় জয় জয় পঞ্চ পাণ্ডবের জয়,
যাঁহাদের পক্ষে রন্ কৃষ্ণ কৃপাময়।
যে স্থানে রহেন কৃষ্ণ, ধর্ম্ম সেই স্থানে,
যেখানে রহেন ধর্ম্ম, জয় সেই খানে!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর, বি, এ

জীবতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

১০ জোনাকীপোকা ও কেঁচো।—এই দুই জীব রাতকাণা এবং অল্পদৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্ট রোগীর পরমোপকারী ঔষধ। ইহাদের শরীর হইতে Phosphorus প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দ্বারা এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক নানা রকম ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা অন্যমনস্ক ও স্মৃতিশক্তি হ্রাসের অমোঘ ঔষধ। যেমন পাঁটার মাথা, চিংড়ীমাছের মাথার ঘি, চিলের চোখভাজা প্রভৃতিতে Phosphorus পাওয়া যায় এবং উহা রতিশক্তি উৎপাদক, মুরগী, বটের পাখী ও চড়াই পাখীর মাংস যেমন বীর্য্যবর্দ্ধক, সেইরূপ ঐ দুটি জীবের দ্বারাও হয়।

১১ বৃশ্চিক বা বিছে।—খাঁটি সরিষার তৈলে বড় তেঁতুলে বিছে কিংবা কাঁকড়া বিছে ফেলিয়া সেই তৈল খুব ফুটাইয়া নালি ঘা, কিংবা কোন বিষাক্ত ঘায়ে দিন কতক দিলে তাহা আরোগ্য হয়।

১২ সর্প।—ইহার বিষ মহৌষধি। আয়ুর্ব্বেদীয়, হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক প্রভৃতি সকল চিকিৎসায় সর্পবিষ ব্যবহৃত হয়, সচরাচর বিষবড়িতে বিকারগ্রস্ত রোগীকে চাঙ্গা রাখে। শরীর হিমাঙ্গ হইলে বিষবড়ি কিম্বা হোমিওপ্যাথিক Cobra বা ল্যাকেসিস্ ৩০ মাত্রা দেওয়া হয়।

১৩ বিচ্ছু বা পার্ব্বতীয় কৃষ্ণকাঁকড়া বিছা বিশেষ।—ইহা ভয়ানক বিষাক্ত জীব। যে স্থানে ইহা থাকে, সে স্থানে আদৌ ঘাস হয় না, সাদা হইয়া যায়। প্রস্তরে যদি ইহা দংশন করে, প্রস্তর জরিয়া সাদা চূনমত হইয়া যায়; তাহা হইতে সেঁকোবিষ তৈয়ারী হয়। এই সেঁকোবিষে নানাপ্রকার দুরারোগ্য রোগ ভাল হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে

যে Arsenic নামে ঔষধ আছে, তাহা এই। হোমিওপ্যাথিক বইপড়ে দেখিলে বুঝিবেন, ইহা কত রোগ আরোগ্য করে। স্থূলকথা, ইহার গুণাগুণ বলিতে গেলে প্রকাণ্ড ১খানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

১৪ তুলসীগাছের পোকা।—ইহা তুলসীগাছে থাকে ও ঘর বানাইয়া তন্মধ্যে বাস করে। পোকাগুলি আকারে অনেকটা শোঁপোকার ন্যায়। ইহা গলায় মাদুলী করিয়া ধারণ করিলে হাঁপানিরোগ আরোগ্য হয়। শ্বাসকাশ প্রভৃতি শ্লেষ্মরোগের পক্ষে ইহা গলে ধারণ করা ভাল।

১৫ মক্ষিকা বা মাছি।—ইহা রোগীকে বমন করাইবার মহৌষধ। ইহার নাড়িভুঁড়ী কিংবা পাখ্‌না দু'খানা একটু পেটে গেলেই বমন হইতে থাকে। কেহ বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে গরমজল খাওয়াইয়া যেমন বমন করান যায়, ইহাতে তদ্রূপ হয়। ইহার হুল হইতে হোমিওপ্যাথিক যে ঔষধ হয়, তাহা Apis Mellifica নামে অভিহিত। মাথাঘোরা, মাথাধরা, স্ত্রীলোকের ঋতুবন্ধ হইয়া উন্মাদ অবস্থা প্রভৃতিরোগে এই ঔষধ বড় উপকারী।

১৬ জোঁক।—ইহা এক প্রকার কেঁচোর ন্যায় জলীয় কীট। ইহারা দুষ্ট রক্তভোজী। কাহার অঙ্গে বদ্‌রক্ত হইলে কিম্বা গেঁটেবাত হইলে জোঁক বসাইয়া দূষিতরক্ত ইহাদ্বারা শোষাইয়া বাহির করিলে বাতাদি ভাল হয়। ইহাদের মুখে নুন দিলে কিম্বা চুণ দিলে তবে রক্তপানে নিবৃত্ত হয়, নচেৎ এক একটা জোঁক এমন কি ৴১ সের পর্য্যন্ত রক্ত পান করে।

১৭ শুশুক।—ভিস্তির মুসকের ন্যায় এক প্রকার জলীয় জীব। ইহার চর্বি বা তৈল হস্তের তালুর একদিকে দিলে অন্য দিকে বাহির হয়। ইহার তৈলে বাতাদি এবং ধনুষ্টঙ্কাররোগ আরোগ্য হয়। জেলেরা জলে জাল পাতিয়া ধরিয়া, বহুমূল্যে ডাক্তার কবিরাজদিগকে বিক্রয় করে। ইহা নীরিহ জীব, মনুষ্য দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে, আঘাত করেনা; তবে বড় মৎস্যভোজী।

১৮ শূকর।—ইহার চর্ব্বিতে Hogs lart বলে; ইহা এলোপ্যাথিক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। গ্লিসারিন্ উহা হইতে প্রস্তুত হয়, গুহ্যদ্বারে পানের বোঁটা করিয়া গ্লিসারিন্ দিলে আটকান মল নির্গত হয়। অস্ত্রচিকিৎসায় ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। শূকরের চর্ব্বিতে পমেটম্ প্রভৃতি, মাথার চুল শীতল ও চিকণ রাখিবার জন্য সৌগন্ধি তৈলাদি প্রস্তুত হয়। Hogs lart মেরুদণ্ডের পীড়া, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি শুশুকের তৈলের ন্যায়

উপকারী। উহার মাংস মেথর, ধাঙ্গড়, সাহেব প্রভৃতি বিজাতীয়ের পরম সুখাদ্য; উহার খোঁচা খোঁচা লোমে ব্রুস্, ঝাড়ন প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারী হয়।

১৯ গণ্ডার।—ইহার দু'পার্শ্বের চর্ম্মে ঢাল প্রস্তুত হয়, খড়্গো কোসা কুশী প্রস্তুত হয়। ইহার মূত্রে প্লীহা যকৃৎ আরোগ্য হয়।

২০ হস্তী।—ইহার দন্ত গজদন্ত নামে বহুমূল্যে বিক্রিত হয়। সেই দন্তে খেলনা, ছাতিরবাঁট, যষ্টি প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য প্রস্তুত হয়। কথায় বলে না, "মরা হাতিও লাক টাকা।" ইহার দন্ত ও অস্থিতে নানা দ্রব্য তৈয়ারী হয়, ইহার চর্ম্ম শুদ্ধ, মানবের কাজে লাগে, কিছুই ফেলা যায় না। ইহার মল বা হাতির নাদ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ শিশুদিগকে মাখাইলে হস্তীর ন্যায় মোটা হয়, কেহ বলে, শিশুকালে মাখাইলে মোটাত হয়, তৎসঙ্গে রং উজ্জ্বল ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে। হস্তী মনুষ্যের উপকারী জীব।

২১ হরিণ।—হরিণমাংস শুদ্ধ ও ভাল আহারীয় সামগ্রী। উহার চর্ম্মে ও শৃঙ্গে মানবের অনেক ব্যবহৃত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উহার মূত্রে শিশুদিগের প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ্য হয়। মাথা ধরিলে কিম্বা রগ্ ধরিলে হরিণের শিং জলে ঘসিয়া কপালে দিলে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। শৃঙ্গ সুধু ঘসিয়া ফোড়ায় দিলে তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া যায়। হরিণের মল ছাগের মলের ন্যায় বেদনায় গরম করিয়া লাগাইলে তৎক্ষণাৎ উপশম হয়।

২২ ছাগ।—ইহার মাংস মনুষ্যের নিত্য উপাদেয় খাদ্য। ইহার চর্ম্মে জুতা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ইহার দুগ্ধে শিশুদের আমাশয়, রক্তামাশয় আরোগ্য হয়। অর্দ্ধভাগ জল ও অর্দ্ধভাগ দুগ্ধে অর্শরোগ আরোগ্য হয়। ইহার মলে বেদ্না ছাড়ে।

২৩ মেষ বা ভেড়া।—ইহার মাংস পোষ্টাই কার্য্যে লাগে ও পরম সুখাদ্য। ইহার দুগ্ধে জিহ্বার ঘা, মুখমধ্যের ক্ষত আরোগ্য হয়।

২৪ গর্দ্দভ বা গাধা।—ইহা শীতলাদেবীর বাহন নামে অভিহিত। সকলজীবের বসন্তরোগ হয়, শুদ্ধ ইহার হয় না। ইহার দুগ্ধ পানি বসন্ত, ইচ্ছা বসন্তের অমোঘ ঔষধ ও বসন্তের ঘায়ে দিলে শুখাইয়া যায়। ইহার দুগ্ধ পোষ্টাই কার্য্যে লাগে এবং শিশুদের খাওয়াইলে মোটা হয়। পেটের অসুখের পক্ষে গর্দ্দভ-দুগ্ধ ও ছাগ-দুগ্ধ উভয়ই উপকারী। তবে খাঁটী না দিয়া কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা জলের সহিত গরম করিয়া খাওয়াইতে হয়। ইহা

২৫ গো ও মহিষ।—ইহার বিষয় বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন; এদেশবাসী সকলেই বিশেষ জানেন। তবে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকলেই ইহার দুগ্ধ ও ঘৃতে শারীরিক উপকার প্রাপ্ত হন। এমন কি কৈলে বাছুরের চোনাতে যকৃৎ রোগ, শিশুদের পালাজ্বর ও প্লীহা রোগ আরাম করে। গোচোনা ও গোবরে ঈশ্বরপূজা পর্য্যন্ত হয়। গোচোনা ও গোবর মহাব্যাধিনাশক ও শুদ্ধ। শারিরীক নানারোগ ইহাদ্বারা আরোগ্য হয়। কৃষ্ণগাভীর দুগ্ধ বেশী উপকারী ও সুখাদ্য এবং বেশী পুষ্টিকর। গাভীরদুগ্ধে হাজার হাজার মুখরোচক আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা গাভীদ্বারা অনেক উপকার পান বলিয়া পূজা করেন, যত্নে রাখেন ও ভগবতী নামে অবিহিত করেন, এমন উপকারী জীব ধরায় আর নাই বলিলেই হয়। কালগাভীকে ছোলা খাওয়াইয়া সে যে গোবর দেয়, তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া ছোলা তুলিয়া এক রাত্রকাল পাথরবাটীতে রাখিয়া, পরদিন প্রাতে সেই ছোলা শুদ্ধ জলপান যে করে এবং গোবর মাখিয়া এবং গঙ্গামাটী মাখিয়া যদ্যপি একমাস গঙ্গাস্নান করে, তাহা হইলে গলিতকুষ্ঠ ও দুরারোগ্য শারিরীক ব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহা জনৈক সন্ন্যাসী প্রদত্ত পরীক্ষিত মহৌষধ। ইহাদের শৃঙ্গে কাঁচকড়া প্রস্তুত হইয়া নানা দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়, গা চু জুতা ও নানা চর্ম্মদ্রব্য তৈয়ারী হয়। গো মহিষের হাড়ে চিনি ও নুন্ পরিষ্কার করা হয় ও অনেক খেল্না ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

(নাম ছাড়।)

শ্রীউপেন্দ্রগোপাল মিত্র বি-এল—পিতার নাম ৺ বিপিনবিহারী মিত্র, পিতামহের নাম ৺ ফকিরচন্দ্র মিত্র। যশোর জেলার অন্তর্গত ত্রিলোচনপুর ষ্টেট ৺ ফকিরচন্দ্র মিত্র মহোদয় নিজ বুদ্ধিবলে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ফকিরচাঁদের বিমলা যশঃভাগ ও অতুলৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে বেশী আর কি বলিব, ত্রিলোচনপুরে যে সুশোভন হিমালয় সদৃশ ইষ্টকময় আলয় প্রস্তুত করিয়া

অনুশোভন নহে। প্রত্যুত, এই পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত অট্টালিকা অপেক্ষাও তদীয় হৃদয় আরও বৃহৎ ছিল। কেন না, ফকিরচাঁদ নিজ উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি তুল্যাংশে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রদ্বয়কে দিয়া গিয়াছিলেন. তাঁহার দানের পরিমাণ ২০০০। ৫০০০ বার্ষিক ছিল, এক্ষণেও বাগডালী হইতে ত্রিলোচনপুর পর্য্যন্ত গমনাগমনের রাস্তা যাহার প্রশস্ততা ১৬ হাতের কম নহে, ঐ রাস্তা তদীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। গ্রামের ৩টা জলাশয় ৬৪ বিঘা পরিমিত প্রকাণ্ড অথচ ফলফুলে পরিপূর্ণ উদ্যান তাহার কৃতিত্ব ঘোষণা করিতেছে। পুত্র বিপিনবিহারী পিতা অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে বেশী হইয়াছিলেন। নিজ পরিশ্রমে ওকালতি পরীক্ষায় পাশ করিয়া যোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি পৃথিবীর বাহ্যাকর্ষণে ভুলিতেন না, সুবিজ্ঞ উকীল হইলে ধর্ম্মগত প্রাণ বিপিনবিহারী ওকালতি কার্য্যে মনোযোগ মত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার আইনজ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জনে বেশী সহায়তা করে নাই, কেবল দেশের উপকার করিয়াছেন মাত্র, যত সালিশ তিনিই হইতেন, দেশের লোক তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। সকলেই তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকার স্পৃহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। সবদাপুর গ্রামের প্রজাগণ তাহাকে জলকষ্ট জানাইলে তিনি ৫০০ টাকার বেশী ব্যয়ে তথায় পুকুর কাটাইয়া দেন, ধার্ম্মিকপ্রবর নিজ গ্রাম হইতে ক্ষিয়াটী পর্য্যন্ত একটা রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে ৫০০ টাকার অধিক দান করেন, ত্রিলোচনপুরের স্কুলে বার্ষিক ৬০০ টাকার উপর দান করিতেন। ঈদৃশ ধার্ম্মিক পিতার সন্তান বাবু উপেন্দ্রগোপাল ১২৬৫ সালের ১৪ই মাঘ তারিখে ত্রিলোচনপুরে ভূমিষ্ঠ হন। ইনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, বি এল। "লতিকা" নামক পুস্তক ১৮৮১ সালে প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ সালে সহজ মহম্মদীয় আইন প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার অনেক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। কাউপর নূতন শব্দ সংকলন করিয়া ভাষাদেবীর গলদেশে সুগন্ধ মাল্যবৎ পরিধান করাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজীও অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত। ইহাঁর কবিত্বের ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে, সে সমস্ত অদ্যাপি প্রকাশ করেন নাই, তবে আমরা তাঁহার রচিত সঙ্গীত ও কাব্য শুনিয়া মোহিত হইয়াছি। উহাদের প্রকাশ প্রার্থনীয়।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

নূতন টেলিগ্রাফ।

মার্কোনির কলে ফল ফলিতেছে। তারের লেটা, তারের খরচ, তার বসাইবার কষ্ট, কোন অসুবিধাই থাকিবে না; দুইটা উচ্চ স্তম্ভ আর দুইটা যন্ত্র হইলেই টেলিগ্রাফে খবর দেওয়া চলিবে; এ বড় কম সুবিধা নহে! ইংলণ্ডের সাউথ ফোরল্যাণ্ড হইতে ফ্রান্সের বুলো সহরের কাছ পর্য্যন্ত খবর দেওয়া লওয়া চলিয়াছিল। দুই স্থানে দুইটী উচ্চ স্থানে দুইটী যন্ত্র রাখা হইয়াছিল। বিলাতে বাতিঘরের উপর যন্ত্র বসান হইয়াছিল, ফ্রান্সে ১৮০ ফুট উচ্চ চণ্ড বাঁধা হইয়াছিল, ৩২ মাইল দূরে সংবাদ চলিয়াছিল। যন্ত্রে সংকেত করা হইয়াছিল, সেই সংকেত বায়ুর ভিতর দিয়া চলিয়া অন্য যন্ত্রে প্রতিহত হইয়াছিল, তাহাতেই সংকেত বুঝা গিয়াছিল, আর সংবাদও ধরা গিয়াছিল। সাধারণ টেলিগ্রাফ-তারেও ত এই কার্য্যই হইয়া থাকে। মার্কোনি বলেন, ইউরোপে একটা আর আমেরিকায় একটা—দুই স্থানে দুইটা—১৫০০ ফুট উচ্চ-স্তম্ভ বসাইলেই বিনা তারে টেলিগ্রাফ চলিবে; আটলাণ্টিকের ভিতর তার রাখিতে এখন যে কষ্ট ও ব্যয়, তখন আর তাহার কিছুই থাকিবে না। কিন্তু ১৫০০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ রাখা সহজ নহে, ফ্রান্সের ঈফেল টাউয়ার এক হাজার ফুটের বড় অধিক নহে; এত উচ্চ স্তম্ভ পৃথিবীতে নাই। কিন্তু মার্কোনি বলিতেছেন, কলের যতই উন্নতি করিতেছি, স্তম্ভের দূরতাও ততই কমিতেছে। দিন কতক পরে আমরিকার জন্য আর ১৫০০০ ফুট উচ্চ স্তম্ভের কথা কহিতে হইবে না। আপাততঃ মার্কোনি জাহাজী সংবাদের পথ সহজ করিতেছেন। শত জাহাজ একস্থানে রহিয়াছে, তাহার ভিতর যেখানির সহিত ইচ্ছা মার্কোনি সেই খানির সহিত তারহীন টেলিগ্রাফে সংবাদের আদান প্রদান করিতেছেন। সমুদ্র-বক্ষে জাহাজে জাহাজে এইরূপ সংবাদ দেওয়া লওয়ার সুবিধা হইলে বড়ই উপকার হইবে। আর বিশ পঁচিশ ক্রোশ দূরে এখনও বিনা তারে সংবাদ চালাইবার সুবিধা হইবে। মার্কোনির যন্ত্ররহস্য এখনও সাধারণের বিদিত হয় নাই. তিনিও ক্রোড়পতি হইবার চেষ্টায় আছেন। বিলাতে একটী কোম্পানি হইতেছে, ইহাঁরাই মার্কোনির কলের একচেটিয়া করিবেন; আর বিলাত ও আফরিকায় এই কলে নিরন্তর টেলিগ্রাফ চালাইবেন।

কলিকাতাতেও তারবিহীন তাড়িদ্বার্ত্তা প্রচলিত হইতে চলিল। শীঘ্রই সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস ও আলিপুরের ওয়ার্কস্ পর্য্যন্ত এই তারবিহীন তাড়িদ্বার্ত্তা প্রচলন হইবে।

সমালোচনা।

বিজয়-গীতিকা।—২য় খণ্ড। বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বিজয়চন্দ্‌ মহাতাব্‌ বাহাদুর বিরচিত সঙ্গীত মালা। উৎকৃষ্ট কাগজে, উৎকৃষ্ট রঞ্জনে, উৎকৃষ্ট অক্ষরে অতি পরিপাটিরূপে মুদ্রিত। পুস্তিকার প্রথমেই নবীন মহারাজের প্রতিরূপ চিত্র আছে, গীতগুলি অতি সুন্দর। প্রথম খণ্ডের আলোচনাকালে আমরা বলিয়াছিলাম, অল্পবয়সে মহারাজ একজন ভাল কবিরূপে গণনীয় হইতেছেন, বর্ত্তমান খণ্ডেও তাঁহার কবিত্বের সমুজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রথম খণ্ডে কাব্যাঙ্গের পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা কিছু অভাব দৃষ্ট হইয়াছিল, এখণ্ডে অধিকাংশ স্থলেই তাহা সুন্দররূপে প্রপূরিত হইয়াছে। দেশের কতিপয় মহা পুরুষের উদ্দেশ্যে কতিপয় সুললিত সংগীত এই গীতিকা পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহাপুরুষগণকে মহারাজ যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত ধর্ম্মভাবে চিত্র করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ অর্পণ করিতে হয়, তরুণ বয়সে ধনেশ্বর মহারাজ বিজয় মহাতাব্‌ আমাদের কাব্য-সাহিত্যের সাদর আলোচনা করিয়া দেশীয় ধনিসন্তানগণের আদর্শস্থানীয় দণ্ডায়মান হইয়াছেন, ইহা বঙ্গদেশের মহা-গৌরব সন্দেহ নাই। মহারাজের জয় জয়কার হউক।

রাজর্ষি কুমার।—পৌরাণিক ক্ষুদ্র কাব্য, শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার বিরচিত, উলুবেড়িয়া দর্পণযন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ॥০ আট আনা। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বুঝা গেল, এখানি ধ্রুবচরিত্রের রূপান্তর। কবিতার মধ্যে যে যে স্থানে ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস আছে, সেই সেই স্থানের রচনা যথার্থই বিমল ভক্তিপূর্ণ; অনেক স্থলেই মজুমদার মহাশয়ের উত্তম কবিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। ধ্রুব যখন সপ্তর্ষির চরণ বন্দনা করেন, ধ্রুবকে পরম ভক্ত বলিয়া চিনিতে পারিয়া সপ্তর্ষি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"বন্দ্য তুমি এবে; বন্দিছ কাহারে?
গাও প্রেমভরে হরিগুণ গান,
তৃপ্ত সপ্তর্ষির হউক পরাণ।"

এইরূপ পদগুলি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। হরি-ভক্তিতে যাঁহারা অকপট অনুরাগী, এই কাব্য পাঠ করিয়া তাঁহারা অনেক শিক্ষালাভের সহিত প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

"সুধাইলা রমণীরে মধুর রচনে,
কে তুমি কামিনী একা বিজন বিপিনে!"

কাব্যাংশের স্থানে স্থানে এইরূপ যে সামান্য সামান্য দোষ আছে, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। একটি বিষয়ে বোধ হয় আপত্তি হইতে পারে। কাব্যের নামটি অথবা ধ্রুবের পরিচয়টি ঠিক হয় নাই। কাব্যের নাম "রাজর্ষি কুমার"। এইখানেই গোল। রাজা উত্তানপাদ বাস্তবিক রাজর্ষি ছিলেন না, পুরাণে তিনি একজন সংসারবিষয়াসক্ত নরপতি ছিলেন।

দাতাপরীক্ষা।—কবিচন্দ্রের "দাতাকর্ণ" পুঁথি অবলম্বনে শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র নাটকের প্রণালীতে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কি আছে, বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে তাহার পরিচয় দিবার অপেক্ষা নাই। ইহার স্থানে স্থানে হরিভক্তির উৎস বহিয়াছে। বৃষকেতুর হরি-ভক্তি শ্লাঘনীয়। পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করা যায়। এক এক স্থলে অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ দেখিয়া আমরা কিছু ক্ষুব্ধ হইয়াছি। দাতাকর্ণের অপূর্ব্ব অতিথিসেবা ও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনের মধ্যে টিকেওয়ালা ও লুচি মতিচুরলোভি ফলারে ব্রাহ্মণকে কি জন্য আনয়ন করা হইয়াছে, বুঝিতে পারা গেল না। বস্তুত মূলাংশ পাঠে আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি, হরিমহিমার নিদর্শনে তুলসীদাসের একটি পদ* উদ্ধৃত করা সার্থক হইয়াছে। "দুঃখ পাওয়ে তো হরি ভজে, সুখে না ভজে কোই, সুখমে যো হরি ভজে, দুঃখ কাঁহাসে হোই।"

অমর গ্রন্থাবলী।—ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে যে কয়েকখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছেন, এই গ্রন্থাবলীতে সেইগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট আছে। দুটিপ্রাণ, শ্রীকৃষ্ণ, মজা, থিয়েটার, কাজের খতম, চাবুক, নির্ম্মলা, দোললীলার গীতাবলী, সীতারামের গীতাবলী, দেবীচৌধুরাণীর গীতাবলী, দুর্গাদাসের গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ছবি, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, আলিবাবার গানের স্বরলিপি, হরিরাজের গীতাবলী, এইগুলি এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। রচনার সমালোচন অপেক্ষা এই গ্রন্থাবলীর অভিনয়ের আলোচনাই শ্রেষ্ঠকল্প। যাঁহারা ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল দৃশ্যকাব্যের রসাস্বাদনে আনন্দ ও কৌতুক উভয়ই লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা ।)

১০ম বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩০৯ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

বর্ষ-বিদায়।

বঙ্গের পরিচিত ১৩০৮ সাল বিদায় গ্রহণ করিল। রাশীচক্রে চক্রগতি আর এক আবর্ত্তনে ঘুরিয়া গেল। সৃষ্টিকাল গণনায় জগৎ সৃষ্টির আর একটি পূর্ণ বর্ষ বর্দ্ধিত হইল; আনন্দমাদকে মাতোয়ারা মোহবিমোহিত অজ্ঞলোকেরা স্মরিয়া শিহরিবে—জীবের পরমপ্রিয় পরমায়ুর এক বৎসর কমিয়া গেল! অনন্ত আকাশ—অনন্ত মেদিনী এবং রবি শশী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ সমস্তই সমভাবে বিদ্যমান রহিল, হেমশিশির বসন্তাদি ষড়ঋতুর সমান আধিপত্য বজায় রহিল, অয়ন মাস পক্ষ, অহঃ, ইত্যাদি বর্ষাংশগুলিও অপরিবর্ত্তিত থাকিল, পরিবর্ত্তন হইল কেবল মানব জীবনের;—সূক্ষ্মবাক্যে জড়চেতনাদি সমগ্র জীব-জীবনের।

এই যে জীব-জীবন, বিদায় প্রাপ্ত ১৩০৮ বঙ্গাব্দের দ্বাদশমাসকাল ইহার কিরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা বর্ষালোচনার সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য। দেশের রাজা এখন ইংরাজ, সম্মানে তাঁহারা সভ্য, বিস্তায় তাঁহারা বিজ্ঞান-বিশারদ, প্রজাকুলের কল্যাণ-কামনায় তাঁহারা সর্ব্বদা জীবলোকের স্বাস্থ্যশান্তি রক্ষার উপায় করিতেছেন। কখন কোন্ মাসে কোন্ দেশে জল হাওয়ার গতি কেমন, কোন্ কোন্ ঋতুতে, কোন্ কোন্ প্রদেশে ক' ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টির জল পড়িল; জল হাওয়া মন্দ হইলে তাহা ভাল করিবার উপায় কি? বহুবেতনাদৃত চিরস্থায়ী স্বাস্থ্যসচিব কোন্ প্রদেশের স্বাস্থ্য কিরূপ, তাহার কেমন রিপোর্ট লিখিলেন, প্রজাপুঞ্জকে ব্যাধিশূন্য করিবার জন্য এই সকল তত্ত্ব নিরূপণে তাঁহারা এখন নিত্য ব্যাপৃত রহিয়াছেন,

ফল কিন্তু আর এক প্রকার হইতেছে। স্বাস্থ্য নিরাপদের মন্দীভাবে নিত্য নিত্য প্রায় অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন নূতন উৎকটরোগের উদয় হইতেছে। এ দুঃখের কথা বলিতে গেলেই "জন্মভূমি" সর্ব্বাগ্রেই বর্ষালোচনায় আমাদের ভারতবর্ষকে বিশেষতঃ বঙ্গদেশকেই মনে করেন। এই দেশের সঙ্গেই "জন্মভূমির" বর্ষবিদায়ের ফলাফলের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতএব আমরা বঙ্গদেশের অবস্থাই বেশী বলিব। বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য কেমন? বিগত ১৩০৮ সাল বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যকে কেমন দেখিয়া, কেমন রাখিয়া গেল? দেখিবার জন্য—বলিবার জন্য—আহ্লাদের বদলে (বর্ষবিদায়ে) নববর্ষ সমাগমে কাঁদিবার জন্য, আমরা বাঁচিয়া রহিলাম। স্বাস্থ্য কেমন?—নূতন নূতন রোগের প্রবেশ? বঙ্গনাশিনী "ম্যালেরিয়া" কমাইবার চেষ্টা হইতেছে, ম্যালেরীয়ার মূলকারণ নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে অনেক প্রকার চেষ্টা হইয়াছে, সম্প্রতি বিজ্ঞানবলে এক রকম স্থির হইয়া গিয়াছে যে, বন্য মশকেরা ম্যালেরিয়া উৎপত্তির প্রধান হেতু; এ অবস্থায় মশার বংশ নির্ব্বংশ করিতে না পারিলে ম্যালেরিয়া ঘুচিবে না। প্রমাণও দেখা যাইতেছে, প্রতিবৎসরেই ম্যালেরিয়া বাড়িতেছে,—কমিতেছে না। ১৩০৮ সালে নগরে নগরেও ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিতেছে, ১৩০৮ সাল বঙ্গের নগরের ও পল্লিগ্রামের অনেকগুলি মনুষ্যকে ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী অথবা শ্মশানশায়ী করিয়া গিয়াছে! ইহা ছাড়া গোটাকতক বিকট বিকট রোগের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ইংরাজী নাম লোকমুখে উত্থিত হওয়াতে বোধ হয়, যেন নূতন প্রকার ব্যাধিবংশের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা,—নিউমোনিয়া, ব্রন্‌কাইটিশ, থাইসিস, শিফিলিশ ইত্যাদি। "প্লেগ" নামক একটা অবাহূত রোগ ভিন্ন দেশে হইতেছিল, চারি বৎসর ধরিয়া এই উৎকট রোগ বঙ্গদেশে অধিকার বিস্তার করিতেছিল, ১৩০৮ সালে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে প্লেগরোগ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে! ভারতের স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানের বিজ্ঞানসম্মত বিধি-বিধানগুলি এই সকল রোগের নিকটে লজ্জা পাইয়া পরাজয় মানিতেছে।

ইহার পর জীবের আহার। জগতের প্রধান সৃষ্টজীব মনুষ্য। ১৩০৮ সালের শরৎ ঋতুর প্রারম্ভে একটি শুভ সমাচার প্রচার হইয়াছিল যে, এ বৎসর বঙ্গের সর্ব্বত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়াছে। সে প্রচারের ফলও নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই। স্থানে স্থানে যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক শস্য জন্মিয়াছে। কিন্তু হায়! এই বঙ্গে গত বৎসরেও ৫৲ পাঁচ টাকা

মনের নূতনে সাধারণ ভদ্রলোকের খাদ্য তণ্ডুল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই! অভাগিনী বঙ্গমাতার সাতকোটি দরিদ্র সন্তান প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ কষ্টভোগ করিতেছে; গত বৎসরেও ঐ দৃষ্টান্তে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ গিয়াছে, নূতন বৎসরে কি হইবে, ভগবানের ইচ্ছা।

বৎসরের প্রকৃতিপর্য্যায়, বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যসৌভাগ্য এবং বঙ্গবাসী লোকের আহার্য্যদ্রব্যের মহার্ঘতা একে একে স্থূল কথায় বলা হইল। এইগুলি রাখিয়া গত বৎসরটি বিদায় হইয়া গিয়াছে; ব্যাধি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়নে অতীত বর্ষের গুণগান করিতে আমরা অক্ষম হইলাম। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের সহিত পুনর্ব্বার যদি সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে বর্ষ ফলাফলের সবিশেষ কীর্ত্তন করিবার অবসর লওয়া যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে যে বৎসরকে নববর্ষ বলিয়া সাদরে অভিনন্দন করা হইয়াছিল, "পুরাতন" বিশেষণপ্রাপ্ত হইয়া সেই বৎসরটি এখন অনন্তকালে মিশিয়াছে। সংসারের যাহা কিছু অনন্তকালে মিশিয়া যায়, তাহা আর ফিরে না। অতএব উদ্দেশ্যে বর্ষদেবকে নমস্কার করিতেছি।

অতীত বর্ষে বঙ্গদেশে কতগুলি মনুষ্য বাস করিয়াছে; তাহার একটি বিবরণ এইখানে রাখিয়া দেওয়া ভাল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক দশম বর্ষে সর্ব্বরাজ্যের অধিবাসী গণনা করেন। ১৩০৭ সালের শেষে নূতন সংখ্যা অবধারণ করা হইয়াছে। সেই সংখ্যাজ্ঞাপক বিজ্ঞাপনিতে বঙ্গদেশের এইরূপ লোকসংখ্যার দৃষ্ট হয়। বঙ্গ বেহার উড়িষ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭ কোটী ৮৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪১০ জন নরনারীর বাস ছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বের গণনায় ৭ কোটী ৪৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭ শত ৯৮ জন জানা যায়। তুলনায় নূতন গণনায় পূর্ব্বাপেক্ষা ৩৮ লক্ষ ৯ হাজার ৬ শত ১২ জন বেশী দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্ব গণনায় তৎপূর্ব্ব গণনার উপর শত করা ৭ জন বেশী হইয়াছিল; এবারের নূতন গণনায় শত করা পাঁচজন বেশী দাঁড়াইতেছে। কারণ কি? মানুষের পুত্র-কন্যার জন্ম কম হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত; অবস্থাগতিকে কেবল ইহাই বোধ হয় যে, প্রদেশে প্রদেশে নূতন নূতন রোগে—মারীভয়ে এই দশ বৎসরে অনেক লোক মরিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই মানুষ কম। সহস্র সদ্‌চেষ্টাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অভাগা বঙ্গের স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ হইতেছে। সেনশশে অথবা আদম শুমারিতে ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে।

দেখা হইল, বঙ্গে এখন প্রায় ৮ কোটি লোকের বাস, ইহার মধ্যে প্রায় ৫ কোটী হিন্দু। বিলক্ষণ বংশবৃদ্ধি থাকিলেও মুসলমানের সংখ্যা আড়াই কোটীর বড় অধিক নহে। খৃষ্টান ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩ শত ৬৬ জন, ইহাদের মধ্যে স্বধর্ম্মত্যাগী এদেশী খৃষ্টান ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৭ শত ৬৩ জন মাত্র। পূর্ব্ব গণনার তালিকা অপেক্ষা এ গণনায় খৃষ্টান বাড়িয়াছে ৮৫ হাজার ৮ শত ৮২ জন। কোন্ কোন্ শ্রেণীতে বাড়িয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ নাই; আইন বহির্ভূত প্রদেশের সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে নূতন নূতন খৃষ্টান হইয়াছে, ইহাই অনুমান হয়। বৌদ্ধ ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮ শত ৯৫ জন। ইহা ব্যতীত অপরাপর ইচ্ছানুগত ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৪ শত ৬৮ জন।

এই সংখ্যা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের ৩৩ হাজার ৫ শত টাকা খরচ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব গণনায় খরচ হইয়াছিল, ৭৫ হাজার ৫ শত টাকা, তফাত ৪২ হাজার টাকা। লর্ড কর্জ্জন-গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সেন-শশের অনেক কার্য্যই বেগারে সারিয়াছেন, কাজেই ব্যয় লাঘব হইয়াছে। শঙ্কা হইতেছে, কার্য্য হয় ত ভাল হয় নাই, গণনাও ঠিক হয় নাই। দোষ কাহার? বৎসরের।

বিশেষ বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা গত বৎসরে বড় অধিক হয় নাই। মহারাণীর বিয়োগ-শোকে রাজপুরুষগণের শোকচিহ্ন ধারণ এবং গড়ের মাঠে মহারাণীর ধাতুময়ী প্রতিমা স্থাপন, এই তুইটি প্রধান ঘটনা; ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি গভর্ণর জেনারল ব্রহ্মদেশবিজয়ী লর্ড ডফরীণের পরলোকপ্রাপ্তি একটী শোচনীয় ঘটনা; জাতীয় সাধারণ কার্য্যের মধ্যে কংগ্রেস নামক জাতীয় মহাসমিতির দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন গতবর্ষে কলিকাতার বিডন উদ্যানে হইয়াছিল; কেবল ষোলকলা পূর্ণ বক্তৃতায় পর্য্যবসিত না হইয়া, সুমতিপ্রাপ্ত মেম্বর মহাশয়গণের কল্যাণে এবারে বর্ষিক উৎসবের সঙ্গে শিল্পকৃষি প্রদর্শনি মেলা বসিয়াছিল। ইহা একটি শুভ অনুষ্ঠান *। গত বর্ষের অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে নমস্কার করিয়া, আর একটি

---

* চড়ক পূজা পর্ব্বাদির পূর্ব্বে ২৭এ মার্চ্চ ধর্ম্মতলা হইতে খিদীরপুর পর্য্যন্ত ট্রাম গাড়িগুলি বিদ্যুতের দ্বারা চালিত হইতেছে, ইংরাজী নাম

অনুষ্ঠানের কথা বলি ; শুভ অশুভ, পাঠক মহাশয়েরা বিচার করুন। কলিকাতা সহরের কতকগুলি কায়স্থসন্তান পৈতা পরিবার জন্য একটি সভা বসাইয়াছেন। জুগী প্রভৃতি ইতর জাতির উপবীত ধারণের ধূমের যুগে, দিকভ্রান্ত বিপ্রসন্তানগণের যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগের ধূমের যুগে, উপবীত ধারণ করিয়া কায়স্থ সন্তানেরা কি এমন উচ্চপদ লাভ করিবেন, নব সভার সভ্যেরা সে কথাটা কিছুই খুলিয়া বলেন না। পরম্পরায় শুনা যায়, বৈদ্যজাতি অপেক্ষা বড় হইবার বাঞ্ছা। সত্য যদি তাহাই হয়, সে বাঞ্ছা পুরণের নিমিত্ত পৈতে পরিবার প্রয়োজন কেন আইসে ? "এই দেখ আমার পৈতে আছে, আমি বৈশ্য অপেক্ষা বড়", এইরূপ আত্ম-শ্লাঘা বাড়াইবার জন্যই কি বিপ্রপালক মহৎ কায়স্থজাতির উদ্ভব ! ১৩০৮ সাল কেন যে তাদৃশ কায়স্থপুত্রগুলির মস্তিষ্কে এরূপ কুমতি প্রদান করিয়া গিয়াছে, মানুষে তাহার উত্তর দিতে পারে না। মানুষকে ক্ষেপাইয়া দেওয়াও বৎসরের দোষ। আশা হয়, নববর্ষে তাঁহারা এই মানহানিকর বাহ্যাড়ম্বরের সংকল্প পরিত্যাগ করিবেন।

১৩০৮ সালে বঙ্গে প্রায় ছয় মাস অনাবৃষ্টি। চৈত্র মাসের দশম দিবস হইতে জলদগর্জ্জনের সঙ্গে স্থানে স্থানে বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ হইয়াছে, ফল কিরূপ হয়, নববর্ষে দেখা যাইবে। এইরূপ মঙ্গলাচরণে পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিয়া, আশার উপদেশে মঙ্গল প্রত্যাশায় আমরা অদ্য নববর্ষকে অভিনন্দন করিতেছি।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব ?

বৈশাখ মাস—কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে একদিন কোন একটি মরুস্থলীতে ঘুরিতেছিলাম। স্থানটি মরুস্থলী হইলেও তাহার চারিদিকে শীতল স্নিগ্ধ ছায়ার অভাব ছিল না। অদূরে একটা মহাসাগর নীল জলরাশি লইয়া উর্ম্মির পর উর্ম্মি তুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে এমনি একটি স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম যে, তথায় নাতি আলো আঁধার-মাখা উবকরমাত প্রভাতমুক্ত সমীরণ সঙ্গে দিগন্তের অনন্ত কোনে মিশিয়া গিয়া, হৃদয়ে কবিতার রাজ্যে লইয়া যাইতেছিল।

সেই প্রভাত সময়ে আমার পথশ্রমে অতিশয় পিপাসা উপস্থিত হইল। আমার সঙ্গীগণ অতি পুষ্ট, অতি সুবল, অতি শ্রমসহিষ্ণু। আমি বড় দুর্ব্বল, বড় ক্ষীণ, বড় শ্রমকাতর অসহিষ্ণু। আমার জীবন আবার "স্পর্শদোষ প্রথায়" প্রতিপালিত, অন্যের স্পৃষ্টজল পান করি না। এমন সময়, এমন অভাবের কালে আমার পিপাসা শান্তির জন্য একজন অতি নিকট আত্মীয় প্রাণের মানুষের আবশ্যকতা উপস্থিত হইল। আমার জল পান করিবার পাত্র আছে, কিন্তু এত শক্তিশূন্য যে, উঠিয়া গিয়া জল আনিতে পারিব না।

ঐ যে দূরে একটি মহাসাগর নীল জলরাশী লইয়া উর্ম্মির পর উর্ম্মি উঠাইয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিতেছে—উহা হইতে জল লইয়া পান করিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে। আমার জল পান করিবার পাত্র আছে, সংগ্রহের শক্তি নাই। আমার এখন একজন নিতান্ত আপনার জনের আবশ্যক হইয়াছে। আমি ত অন্যের স্পৃষ্ট জল পান করি না।

এই অনন্ত বিশ্বরাজ্যে আমার মাত্র একজন অতি সুহৃদ ভিন্ন আর কেহ নাই। যিনি আছেন, তিনি আমার বড় আদরের জন, নিকট বন্ধু, প্রাণের মানুষ। আমি তাঁহার—তাঁহার কিন্তু অনেক আছে। আমার ভাগ্যদোষে তাঁহার স্বভাব বড় চঞ্চল। তিনি বড় কুহকী, বড় বহুনামরূপধারী। তিনি বড় সহজে নিকটে আইসেন না—এই চরাচর বিশ্ববাসী লোকে তাঁহাকে ডাকিতেছে কিন্তু কুহকী সকল সময় ডাক শুনেন না। প্রাণের সহিত তাঁহার "রাশ" নাম ধরিয়া ডাকিতে না পারিলে, তিনি ডাক শুনেন না। তাঁহার এমনি চরিত্র যে, যে তাঁহাকে একবার প্রাণের মধ্য হইতে সুর চড়াইয়া "রাশ" নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে, তাহার নিকট ভৃত্যবৎ দাঁড়াইয়া থাকেন।

আমি সেই কারণে তাঁহার রাশ নাম খুঁজিতেছি। অন্য সময় হইলে না হয় যাহা হয় হইত, আমার যেরূপ পিপাসা উপস্থিত, এ সময়ও আর অপেক্ষা করিতে পারি না। কি বলিয়া যে তাঁহাকে ডাকিব, স্থির করিতে পরিতেছি না—শুনিয়াছি—এবং জানিও বটে যে, তাঁহার নামের তালিকা অদ্যাপি কেহ স্থির করিতে পারে নাই। আপনারা আমার পরম সঙ্গী—তাই আপনাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন না—তাঁহাকে কি বলিয়া

এই সময় আমার প্রিয় সঙ্গীগণের মধ্যে একজন অতি প্রাচীন পট্টবস্ত্রধারী উষ্ণিষমণ্ডিত গভীরকণ্ঠ সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ উত্তর * করিলেন কেন, চিন্তা কি ? আমি তোমার প্রাণের মানুষের "রাশ নাম" বলিয়া দিতেছি, অবস্থানের কথা শুনাইতেছি। তিনি আছেন, এই বায়ু জল ব্যোম প্রতিবিম্বিত অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত বস্তুতে। দেখিতেছি, তাহার দূরদূরান্তরব্যাপী অস্ফুট, অব্যক্ত, নিত্য, সত্য, শাশ্বত, শব্দময় মূর্ত্তি। শুনিতেছি, তাঁহার মনপ্রাণপ্রীতিকর অমিয়জড়িত—অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত আশ্বস্ত শব্দ।

তুমি ভাবিয়া দেখনা কেন ? আর একবার বল—"ওঁ শিবং শান্তমদ্বৈতং সচ্চিদানন্দনদ্বয়ং ব্রহ্ম"। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া আমি অতি কাতরে অতি বিনিত মস্তকে বলিলাম, "ঠাকুর! ক্ষমা করুন—আপনি তাঁহার যেরূপ আকার প্রকার, গুণ চরিত্র জানেন, আমি তাহা ভাবি না, দেখি না—শুনি না—বুঝি না এবং জানিও না। আপনার উপদেশমত তাঁহাকে ডাকিলে তিনি যে আমার নিকট আসিবেন—আমারও তাহা আদৌ বিশ্বাস হয় না। কেন না, আপনার কথায় বুঝিতেছি যে, তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আমিও তাহা ভাবিনা ঠাকুর। আমি ভাবি, তিনি যখন আমার, তখন আমার এই হৃদয়ই তাহার ঘড় বাড়ী। আমারই জন্য নিয়তই আমার সম্মুখে আছেন। আপনার উপদেশমত তাঁহাকে ডাকিলে আমার পিপাসায় জল দেওয়া ত দূরের কথা, প্রত্যুত্ত আসল নামের পরিবর্ত্তে নকল নামের ডাক শুনে চটিয়া উত্তর পর্য্যন্ত দিবেন না। তাহা হইলে যে আমার আর উপায় নাই, পিপাসায় মরিতে হইবে। বলুন না, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব ?"

এই সময় আমার সঙ্গীদিগের মধ্য হইতে আর একজন রক্তবস্ত্রপরিহিত রক্তচন্দনানুলেপিত রুদ্রাক্ষধারী—জটাজূটসমাযোক্ত মধ্যাহ্ন ভাস্করসন্নিভ সুদীর্ঘবপু, ঘোরগম্ভীর মূর্ত্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "মাভৈ †।" আমি তোমার প্রাণের মানুষের নাম শিখাইয়া দিতেছি। তিনি আছেন মহাশূন্যে—মহাশ্মশানে, করিতেছেন সদা মাভৈঃ মাভৈঃ রব—ডাকিতেছেন নিয়ত স্নিগ্ধ শীতলকরসঞ্চালনে, হইয়াছেন "প্রচণ্ড খর্পরাখণ্ডধৃতা

* বেদ।

† তন্ত্র।

মুণ্ডমালাবিভূষিণাং মুক্তকেশী দিগম্বরীং।" বল "তারা ত্রিতাপহরা দুর্গে দেবি মহাকালি।" ও বাবা—ক্ষমা করুন মহাশয়, ক্ষমা করুন। আমি তাহা পারিলাম না—শুনিয়াই আমার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়াছে—ভয়ে যে আরো পিপাসা বাড়িল, আমি দেখি আমার মনের মানুষকে, জানি মধুরভাষিণী, পিযুষধারিণী, স্নেহকারিণী, সন্তানপালিনী; স্থির শান্ত মূর্ত্তিমতী জগন্মাতা আছেন সর্ব্বদা ক্ষুধাতুর, পিপাসিত, পীড়িত, মর্ম্মাহত আশ্রয়হীন সন্তান সম্মুখে। আপনি দেখি—আমার মতের—আমার চিন্তার—আমার জ্ঞানের—আমার ধারণার বাহিরে তাঁহাকে ডাকিতে বলিতেছেন। আমিতো তাহা পারিলাম না মহাশয়। এমন দারুণ পিপাসার সময় কি একৈব অদ্বৈত সুহৃদের 'আসল নাম ছাড়িয়া—ঐ সকল ভীষণ কটু মটে নামে ডাকিতে পারি? বলুন না তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব?

তাহার পর আর একটি শিখাধারী মুণ্ডিতমস্তক সৌম্যকায় প্রবীণ ব্রাহ্মণ* বলিলেন, আমি তোমার আত্মীয়টির মূল নাম বলিয়া দিতে পারি। তিনি আছেন সত্যের রাজ্যে—তাঁহার রূপ হইতেছে "দূর্ব্বাদলশ্যামল ধনুকধারী।" বল—প্রাণের অর্গল খুলিয়া বল, "বন্দে রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং।" ও হরি—তবেই হইয়াছে, আপনার আদেশমত তাঁহাকে ডাকিতে পারিলাম না। আমি জানি, তিনি আমার, আমি তাঁর—তিনি আছেন আমার এই ক্ষুদ্র শুষ্ক মিথ্যা প্রবোধিত ক্ষুদ্র হৃদয়ে। তাঁহার আকার নিরাভরণ—তিনি পাপ, তাপ, শোকে পিপাসাবারীমিত্র। এখন দেখিতেছি, আপনার উপদেশেও আমার তাঁহাকে ডাকা হইল না—বলুন না, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব?

আমার অতি মর্ম্মান্তিক কষ্ট দেখিয়া অপর একজন নামাবলীধারী তুলসীচন্দনচর্চ্চিত অলকা-তিলকাবিমণ্ডিত সুকণ্ঠ ব্রাহ্মণ † বলিলেন—শোন দেখি, আমি তোমার প্রাণের মানুষের নাম শিখাইয়া দিতেছি—তিনি কখনো—

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যং পাদমেকং
ন গচ্ছতি—করেন না।

---

* রামায়ণ বা বাল্মীকি।

তাঁহার রূপ হইতেছে দ্বিভুজ মুরলীধর সুবঙ্কিম নটবর। নাম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। আমি বলিলাম, না ঠাকুর, আপনার সঙ্গেও একমত হইতে পারিলাম না। আমি জানি, তাঁহার রূপ "জ্বলন্ত জ্যোতি জাগ্রত কিরণ মধ্যাহ্ন ভাস্কর"-সন্নিভ দীপ্তিময়। নাম হইতেছে—"কাঙ্গালের ঠাকুর।" আছেন আমার মত দীনদুঃখী শক্তিহীন কাঙ্গালের নিকট। সুতরাং আপনার উপদেশমত আমার তাঁহাকে ডাকা হইল না। বলুন না, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব ?

তদনন্তর আমার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া একটি চীররক্তাম্বরপরিহিত মুণ্ডিতমস্তক চারুচর্ম্মাসনধারী কৌমণ্ডলহস্ত সন্ন্যাসী বলিলেন,—যুবক! ও সকল তোমার খেয়াল, জাগ্রতে তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ, প্রাণের মানুষ কখনো কাহারো থাকে না। তুমি যে আপনাকে শক্তিহীন ভাবিতেছ, উহা তোমার স্বপনের বিভ্রম—খেয়ালের কুহক। কেন বৃথা আকুলি ব্যাকুলি করিতেছ ?—উঠিয়া গিয়া জল পান কর ; আর ভাব—"সবারি হৃদয়-রক্ত আপনার মত।" বল—"অহিংসা পরমধর্ম্ম"। এই দুই মন্ত্রে * দীক্ষিত হইয়া নিজের পাত্রে, গিয়া জল পান করিয়া আইস।

হরিবোল হরি! এই সন্ন্যাসীর উক্তি শুনিয়া, আমার অন্তরাত্মা শিহ-রিয়া উঠিল—সর্ব্ব শরীর হইতে কেমন যেন একরূপ উষ্ণ তেজ বাহির হইতে লাগিল, সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল মধ্যে শোণিতের এক অভিনব কম্পনশক্তি জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম, একি কথা! সন্ন্যাসী বাতুল না কি ?—অথচ দেখিতেছি, দিব্য তেজঃপুঞ্জ কমনীয় শান্তকান্তি—ললাটে অতি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আভা, বাক্যে অমৃত সিক্ত—তবে এমন অস্তিত্বশূন্য উদাস কথা কেন ? আমি দিব্যজ্ঞানে দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, আমার একজন প্রাণের মানুষ আছে, ইনি তাহা উড়াইয়া দিতে চাহেন। দূর হউক, ইহার কথা প্রাণের এক অংশে লাগিলেও আমার উহাতে আবশ্যক নাই। ওরূপ কথা কর্ণে স্থান দেওয়া উচিত নহে। তখন আমি দক্ষিণদিকে মুখ ফিরাইলাম। অমনি একজন বিদেশী বন্ধু উত্তর করিলেন, "ভাই, আমি তোমার সেই আত্মজনের নাম শিখাইয়া দিতেছি। দেখিলাম, এই ব্যক্তির মাথায় একটি লোহিতাভ শুভ্র পাগড়ি, পাঁচকাপড়া, ঢিলে জামা পরা, সভ্য শান্ত তেজপ্রদীপ্ত দীর্ঘ-

* বুদ্ধদেব।

কায়। ইনি বলিতেছেন, তোমার প্রাণের মানুষ আছেন স্বর্গে—"আরসের" উপরে। তাঁহার আকার তেজপ্রদীপ্ত—নাম—

* লায় এলাহা এলেল্লাহ্—এলাহি দীন দুনিয়ার মালেক খোদা। আমি বলিলাম, না—ভাই সাহেব হইল না—যে ভাবে পাইব ভাবিয়া রাখিয়াছি, আপনার "বর্যাতের স্থরায়" তাহা হইতেছে না। তিনি যদি দুনিয়ার মালেক হন, তবে আমার নিকট তাঁহার আইসা হইল না—কেন না, আমি দুনেছাড়া হাওয়া পাণির লোক, আমার এই শরীর তাঁহার পায়ের ধূলা—আমার এই বাক্‌শক্তি তাঁহার করুণার বায়বীয় শক্তি, আমার এই গতি প্রক্রিয়া তাঁহার পরাভাবের জীবন্ত আদর্শ, দনিয়াতো কিছুই নয়—তবে ভাই সাহেব, আমার আর আপনার কথায় তাঁহাকে ডাকা হইল না। বলুন না, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব ?

অতঃপর আর একজন অমলধবল সুধাধবলিত বিমলকান্তি শ্বেতাঙ্গ যুবক বলিলেন, ভাইরে, আমি পারি তোমার বন্ধুর নাম শিখাইয়া দিতে। আমি বলিলাম, ভাল, দেখি যদি আপনার দয়াতেই আমার পিপাসায় শীতলতা দান করিতে পারে। তখন সেই কুঞ্চিত কেশ শ্বেতপুরুষ বলিলেন—

"তোমার প্রাণের মানুষের স্থান স্বর্গে বটে—কিন্তু এই মরভূমিতে তাঁহার অনন্তসত্বা প্রতিনিয়ত দেদীপ্যমান। তাঁহার নাম—প্রেমময় গড্ (God) বল, গিভ্ মি ডিয়ার ফাদার, গ্রেস্ এণ্ড হেবেন্"। †

তখন আমি বলিলাম, না মহাশয়, আপনার আদেশমত আমার ডাকা হইল না। তাঁহাকে যদি পিতা বলিয়াই ডাকিতে হয়, তবে তাহা আমি পারিলাম না—যেহেতু পিতার নিকট মনের কথা বলিতে বড় ভয় হয়। পিতার শাসনভয়ে তাঁহাকে অনেক সময় ডাকিতে ভয় করে। প্রাণের কথা বলা দূরে থাকুক, অনেক সময় পিতার নিকট বাক্‌সংযত থাকিতে হয়। আমার এই পিপাসার সময় হইলেও পিতাকে আদেশ করিতে পারিব না! সুতরাং আপনার কথায়ও ডাকা হইল না—বলুন না, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব ?

যখন এই সকল সঙ্গিদিগের কথায় আমার শিক্ষা পূর্ণ হইল না এবং

* ময়মনসিংহ হইতে বাঙ্গালা কোরাণ অনুবাদ।

† বাইবেল বা খৃষ্ট।

আহ্বানের শক্তি স্ফূর্ত্তি হইল না, তখন আমার একজন স্বদেশী কম্বাস্কন্ধ-দণ্ডধারী, জ্যোতির্ম্ময়বপু, মণ্ডিত মস্তক, গৈরিক পরিহিত, রোদন তৎপর, বিনীত যুবক সন্ন্যাসী * আমার বুকের উপর হাত দিয়া বলিলেন—

"চিন্তা কি দাদা! আমি তোমার প্রাণের মানুষ চিনাইয়া দিতেছি। ভাইরে, তোমার সেই প্রাণের মানুষ—

"নন্দের নন্দন বংশীবদন বাঁশীতে গান করে" নয় কি? স্বদেশী সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া আমার প্রাণের ভিতর কেমন যেন একটা আকুলতামাথা—ছোব, ছোব ভাব জাগিয়া উঠিল। শীতের পর যেন নব বসন্ত সৌন্দর্য্য-রেখা—প্রকৃতির নীরব নিস্তব্ধ মল্লিকার উদ্যানে ফুটিয়া উঠিল। গ্রীষ্মের উষ্ণতাময় রাজপথে যেন বৈশাখি মেঘের ছিটা ফোঁটা শীতলধারা পতিত হইল। আমি তখন বলিলাম—হাঁ প্রভু, আপনি আমার প্রাণের আবেগ কতকটা নিবৃত্ত করিয়াছেন বটে। আমার সেই প্রাণের বন্ধুটি বাঁশীতে বড় সিদ্ধ—তাঁহার বংশীরব শুনিয়া এই স্থাবরজঙ্গমজড়াত্মক জগত সত্য সত্যই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আছে। সত্যই তাঁহার বাঁশীর গানে প্রেম যমুনা উছলিয়া উঠে—ভক্তি রাধা—লাজ কুল শীল পরিত্যাগ করিয়া শশিকরস্নাত জগতকুঞ্জে ছুটিয়া যায়। প্রবৃত্তিরূপা ধরণী গাই উদাস হৃদয়ে অনন্ত শূন্যের দিক চাহিয়া থাকে।

কিন্তু—কিন্তু প্রভু, ওতেও যে আমার প্রাণের আবেগ মিটিয়া প্রাণের মানুষের পূর্ণমুক্ত সম্বোধন শিখিতে পারিলাম না। বলুন না, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব?

যখন আমার এই সকল দেহধারী সঙ্গীগুলি আমারে তাঁহার আসল নাম শিখাইতে পারিলেন না, তখন এক জন অনঙ্গ সঙ্গী উত্তর করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইনি আমার নিত্য সহচর নিকটবন্ধু †। দেহী সঙ্গিগুলির কাহারো সঙ্গে কাহারো মিল নাই। মত গুলিও বড় শব্দাড়ম্বরপূর্ণ হজগব ভাবের। ইহারা বলেন, তিনি ফলে ফুলে, অনলে অনিলে, পর্ব্বতে প্রান্তরে, জলে স্থলে শূন্যে আছেন। আচ্ছা বলুন দেখি, এক ব্যক্তির অত-গুলি বসতির স্থান হইলে ডাক শুনিবার সময় কোন্ স্থান হইতে ডাক

* গৌরাঙ্গ।

† মন বা অন্তঃকরণ।

শুনিবেন? উহারা তাঁহার অনন্তকোটি নাম বলিতেছেন, তুমি কি অত অনন্তকোটি নাম ধরিয়া—পিপাসার সময় ডাকিতে পার। উহাতে পিপাসা বাড়িবে বই কমিবে না। কি আশ্চর্য্য! এক ব্যক্তিকে মধু, সদু, যদু, হরি, কৃষ্ণ, রাম, কালি, শিব, গোপাল, দুর্গা বলিয়া ডাকিলে, সে ডাক শুনে, না উত্তর দেয়? যাঁহার অত অনন্তকোটি নাম, অবশ্য তাঁহার একটা না একটা মুল বা রাশ নাম আছে। নিদান পক্ষে তাঁহার মা বাপ তাঁহার অন্নপ্রাশনের সময় একটা রাশিনাম রাখিয়া ছিলতো বটে। বলুন না, তাঁহার কোন্ নামে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিয়া ছিল। আরো আর একটি কথা আছে—যে ব্যক্তির অতগুলি বসতি বা চলা ফেরার স্থল, সে ব্যক্তি যে স্থানেই থাকুন না কেন, বিশ্রামের জন্য রাত্রে তো একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্ণয় করিয়াছেন—মুল নামই না হয় বলিতে পারিলেন না। অন্ততঃ সেই স্থানটার পরিচয়ই করিয়া দিন।

আমার স্বভাব বড় একগুয়ে, আমি আসল ছাড়া নকল চাই না—আমি গুঁড়ি ছাড়া শাখা ধরি না। হলকরা গিল্‌টির গহনা ভালবাসি না। তাই—তাঁহার আসল নামটি খুঁজিতে ছিলাম। আপনারা পথ-প্রদর্শক আশ্রয়দাতা—সেই জন্য কিন্তু আমার ভাগ্যেদোষে দেখিতেছি, আপনাদের মত এক নহে সুতরাং আমার নিত্যসঙ্গী বন্ধুর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইল, তাহাতে যদি প্রকৃত উত্তর না পাই, তবে সেই বহুরূপী কুহকীর নিকট জিজ্ঞাসা করিব—কেমন, এই যুক্তি সমীচিন ত?

অবশেষে—আমার পরম সঙ্গী উত্তর করিল, কেন, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ না কি? যে দিন তুমি প্রথমে এই বায়ু জল ব্যোম্ প্রতিবিম্ব চন্দ্র-সূর্য্য-তারকাকীর্ণ-জ্যোতির জগতে আসিয়াছিলে, সেই দিন একটি অতি মধুর শব্দ করিয়া অভ্যুত্থিত হইয়াছিলে। সেই সময় তোমার প্রাণের মানুষটি তোমার অতি নিকটে থাকিয়া অতি মহান সন্তর্পণে তোমাকে সেই মহাশব্দ শিখাইয়া ছিলেন। তুমি আবার সেই অমৃত অপেক্ষা অমৃতময় শব্দ করিবামাত্র অমনি তিনি তোমার ক্ষুধায় অন্ন, পিপাশায় জল, রোগে ঔষধি, সন্তাপে শান্তি দিয়াছিলেন। আজ দেখিতেছি, তুমি সেই মহামহিম শব্দ বা নামটি এই সকল সঙ্গীদিগের কচ্‌কচিতে ভুলিয়া যাইতেছ।

আর ভুলিও না। সে শব্দটির বড় আকর্ষণীশক্তি—বড় প্রাণমাতান উচ্ছ্বাস—বড় মোহকরি আবেগ। বড় মধুমাখা সুর। তুমি সেই শব্দটির

চিরসেবক। ইহারা তোমারে তাহা ভুলাইয়া—সখা, পিতা, দাদা, দিদি, প্রাণনাথ শিখাইতেছেন—তুমি ও সকল শিখিও না, ভুলিয়া যাও। জন্মের দিন যে শব্দ বা নাম শিখিয়াছ, তাহাই ধরিয়া ডাক, অবশ্য তোমার প্রাণের মানুষ ডাক শুনিবেন। বল ওঁয়া—ওঁয়া—মা—মাগো ওমা মা, বড় পিপাসা, একটুকু জল দে মা। হাঁ—হইয়াছে, মন মহাশয়, তোমাকে কোটি নমস্কার, তুমি আজ আমার প্রাণের মানুষের আসল নাম শিখাইয়াছ বটে। ঐ যে আমার মা জগতের মা হইয়া স্বর্গীয় অমৃত আনিয়া আমার চির-পিপাসার শান্তি করিলেন। মা ও মা মাগো মা জগজ্জননি! আয় মা, পিপাসা নিবারণ করিয়া দে। প্রাণ যে বড় আকুল, বড় উৎকণ্ঠিত—বড়—পিপাসিত, একবার তোর শীতল করুণা আনিয়া তাপিত সন্তানের হৃদয় শীতল করিয়া দে মা।

হাঁ—এখন বুঝিলাম, তাহাকে কি বলিয়া ডাকিব, না—

"মায়ের কাছে বলবো হরি,
হরির কাছে বলবো মা।"

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

বিজন-মন্দিরে।

[১]

সাঁঝের আঁধারে ঢাকে প্রশান্তমেদিনী,
তরু-শির-স্বর্ণ-শোভা আঁধারে মিলায়,
দূরে ধরে হাসি-রাশি জ্যোছনা-যামিনী—
শশাঙ্ক মু'খানি-মাঝে, সুর-সুষমায়।
অদূরে প্রান্তর,
সুদূর সীমায় তা'র তরু-শ্রেণী-শোভা,
সুনীল অম্বর শেষে, পাদপের শীর্ষদেশে,
মধুর হরিৎ রেখা মোহিতে অন্তর,
দূরে শোভি'ছে সুন্দর।

[২]

সেই রেখা-অন্তরালে হেরি যেন দূর,
কপট সংসার-বাস অস্ফুট আভাসে,
দেখায় পিশাচ-হাসি, তপ্ত-তৃষাতুর—
হৃদয়েরে কাঁদাইতে বেদন উচ্ছ্বাসে!
সুনীল বিমান
নত যেন পরশিতে জগৎ-সীমায়,
দূর তরুরাজি তা'য়, দূরে রাখিবারে চায়,
জগতে গগনে যেন ক্ষীণ ব্যবধান,
তা'য় হেরি কি মহান!

[৩]

প্রান্তরের এক প্রান্তে নীরব বিজন,
তা'রি মাঝে সুবিশাল অতীব গম্ভীর,
বিরাজে মন্দির চারু সুচারু গঠন,
প্রকৃতি-মাধুরী সেথা' অতি স্থির ধীর।
সেথা দু'টী পথ
রজতের রেখা যেন শোভিছে নীরবে,
সেথায় আঁধার সাজে, স্তব্ধ তরুকুল রাজে,
নীরব বিজনময়, লুকাইয়ে একা—
চাঁদ শুধু দেয় দেখা!

[৪]

ছলিতে নাহিক সেথা' কপট সংসারী,
সদা তা'র মুখে হাসি, প্রাণে হলাহল—
সেইখানে ফেলি মোর শোক-অশ্রুবারি,
নিবাইব হৃদয়ের যাতনা-অনল!
কেন গো জনম?
জগতের কোণে যদি তিতি আঁখি-নীরে,
ভাবি' মিছে সুখ-আশা, স্মরি প্রেম ভালবাসা,
পুড়িবে কি চিরদিন বেদনে মরম?

[৫]

কেহ ত চাহে না মোরে তবু গো নীরবে,
তরল শোকাশ্রু-ধার কা'র তরে বহি ?
কা'র স্মৃতি সযতনে হৃদে রাখি তবে ?
প্রাণময় এ যাতনা কা'র তরে সহি ?
এ মন্দির-দ্বারে
একেলা বসিয়ে সুখে নীরব মাধুরী,
হেরিয়ে হৃদয়জ্বালা, প্রাণের কলঙ্কমালা,
মুছে ফেলি—ধুয়ে ফেলি নয়ন-আসারে !
কেন বহি শোক-ভারে ?

[৬]

পড়িয়ে বিজনে এই পাদপের তলে,
অনন্তের পানে চাহি' আকুল নয়ন,
অফুট জ্যোছনা-স্রোতে সাধ পলে পলে,
সাঁতারিয়ে যাই, ধরি সে যুগচরণ।
কাঁদিব না আর !
মধুর প্রকৃতিপাশে গাহি' হৃদিগাঁথা,
এই প্রাণ সঁপে দিয়ে, জুড়া'ব তাপিত হিয়ে,
প্রবাসে আহুতি দিব ব্যথা বেদনার ;
সংসারে যাবনা আর !

[৭]

সেথা' লাগে বড় ব্যথা জ্বলে যায় প্রাণ,
সংসার উপরে শত মর্ম্ম যাতনায়,
সহস্র বেদনে হৃদি হয় শতখান,
পলে উদে শোক-ভীতি কাঁদি উভরায় !
তাই ভাবি মনে,
চাঁদের এ হাসি দেখি' জুড়াই জীবন,
নিয়ে ও মধুর হাসি, শীতল সোহাগরাশি,
নিবাই প্রাণের জ্বালা এই নিরজনে !

মানবের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যাবলী।

মনোবৃত্তিনিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হর্ষ ও বিষাদ।

কদাচ আনন্দে উন্মত্ত বা দুঃখে অবসন্ন হইও না। কারণ, এই সংসারে এমন কিছু শুভ বা অশুভ ঘটনা ঘটিতে পারে না, যাহা তোমার চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট করিতে পারে।

ঐ অদূরে আনন্দকুটীর পানে দৃষ্টিপাত কর! উহার বহির্ভাগ নানারঙ্গে রঞ্জিত এবং দেখিতে অতি মনোরম। তুমি উহাকে সমুথিত আনন্দধ্বনি দ্বারা অবিলম্বে চিনিতে পারিবে।

ঐ দেখ, গৃহস্বামিনী দ্বারে দাঁড়াইয়া পথিকগণকে আহ্বান করিতেছে; সে অবিরাম হাস্য করিতেছে এবং মধুর সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত করিতেছে।

বামা তাহাদিগকে জীবনের সুখাস্বাদ গ্রহণে আমন্ত্রণ করিতেছে এবং এইরূপ সুখসম্ভোগ অন্যত্র দুর্লভ এই বলিয়া প্রলুব্ধ করিতেছে। কিন্তু কদাচ গৃহদ্বারে প্রবেশ করিও না ও তাহার অতিথি অভ্যাগতগণের সঙ্গ পরিগ্রহ করিও না।

তাহারা আপনাদিগকে নন্দনন্দন বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। তাহারা উচ্চহাস্য এবং বাহ্যিক হর্ষ প্রকাশ করে; কিন্তু তাহাদের সকল কর্ম্মে মত্ততা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়।

অশুভ অনিষ্ট তাহাদের সঙ্গের সাথী। তাহারা কেবল অনিষ্টের দিকে অগ্রসর হয় এবং বিপদরাশি চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া আইসে। অবশেষে মৃত্যুমুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হয়।

ওদিকে লোকলোচনের অন্তরালে ছায়াময় উপত্যকা মধ্যে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, মূর্ত্তিমান বিষাদ তথায় বিরাজমান রহিয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থল দীর্ঘশ্বাসে স্ফীত, মুখে ক্রন্দনধ্বনি এবং মানব-দুঃখালোচনায় অতুল আনন্দ।

সে মনুষ্যজীবনের সামান্য সামান্য দৈবদুর্ঘটনা লইয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করে এবং তাহার দুর্ব্বল প্রকৃতি ও দুশ্চরিত্রের দিবানিশি আলোচনা করে।

সর্ব্বত্র সে অমঙ্গলে নিরীক্ষণ করে এবং সকল বস্তু আত্মদুঃখে দুঃখময় জ্ঞান করে, আর রাত্রদিন অভিযোগের রোলে তাহার বাসভূমি বিষাদপূর্ণ করিয়া তুলে।

তাহার কুটীর সন্নিধানে গমন বা তাহার তপ্তশ্বাস গ্রহণ করিও না, তোমার জীবনের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোরম, সমস্তই সে নষ্ট করিয়া দিবে।

কিন্তু সাবধান, যেন আনন্দধাম পরিত্যাগ করিতে যাইয়া এই বিষাদ পুরীতে প্রবেশ করিও না। এই উভয়ের যাহা মধ্যবর্ত্তী, সেই পথ অনুসরণ করিবে, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় সন্তোষপুরে উপনীত হইতে সক্ষম হইবে।

শান্তিদেবী তাঁহার নিত্য সহচরী, নিবৃত্তি তাঁহার চিরসহবাসিনী। তাঁহার সুখদুঃখ তাঁহার অবস্থার উপর নির্ভর করে না; তিনি প্রশান্ত চিত্তে সুখ দুঃখের ভার বহন করেন। তিনি আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট, সুতরাং সতত প্রফুল্ল-চিত্ত। তিনি কিছু চিন্তাশীল, সুতরাং স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি।

এই স্থান হইতে ঐ হতভাগ্যগণের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া উভয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে এবং তাহারা কিরূপ ভ্রান্ত তাহা অবগত হইয়া তাহাদের গন্তব্যপথ পরিত্যাগ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ক্রোধ।

যেমন ঘূর্ণবায়ু ভীমনাদে বৃক্ষসকল উৎপাটিত করিয়া প্রকৃতির শ্রীভ্রষ্ট করে, অথবা যেমন ভূকম্প প্রবলকম্পনে সুন্দর সুন্দর নগর সমূহ ধ্বংস করে, সেইরূপ ক্রোধ মানবের অশেষ অনিষ্টসাধন ও তাহাকে বিপদগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত করে।

আত্মদোষ স্মরণ করিও, কদাপি বিস্মৃত হইও না; তাহা হইলে তুমি অন্যের দোষ মার্জ্জনা করিতে সক্ষম হইবে।

কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইও না; যে ব্যক্তি ক্রোধকে প্রশ্রয় দেয়, সে আপন বক্ষে আঘাত করিতে অস্ত্র তীক্ষ্ণ করে মাত্র।

যদি তুমি ধৈর্য্যগুণে তুচ্ছ ক্রোধ সম্বরণ কর, উহা তোমার বিজ্ঞতার পরিচয় দিবে সন্দেহ নাই। আর যদি তুমি উহাকে অন্তর হইতে বিলুপ্ত কর, তুমি হৃদয়ে শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারিবে,—কখনও আত্মগ্লানি করিতে হইবে না।

তুমি কি অবগত নহ যে, যে ব্যক্তি কোপনস্বভাব, সে রোষপরতন্ত্র হইয়া আপন বোধশক্তি নষ্ট করে। যখন তুমি প্রকৃতিস্থ থাকিবে, অন্যের মত্ততা দেখিয়া শিক্ষালাভ করিবে।

ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না,—প্রবল ঝটিকাকালে সমুদ্রবক্ষে কেন লম্ফপ্রদান করিবে? অন্তঃকরণে ক্রোধ সঞ্চার হইবার যাবতীয় কারণ অন্তর হইতে নিরাকৃত করিবে।

নির্ব্বোধ অবমাননাকর কর্কশবাক্যে কুপিত হয়, কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি হাস্য করিয়া সমস্ত উপেক্ষা করেন।

প্রতিহিংসা হৃদয়মধ্যে স্থান দিও না, ইহা তোমার অন্তরে দারুণ ব্যথা প্রদান করিবে এবং তোমার সদভিপ্রায় সমুদয় নষ্ট করিয়া দিবে।

বরং ক্ষমাদানে প্রস্তুত থাকিও, কিন্তু হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পাইও না। যে ব্যক্তি এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অবসর অন্বেষণ করে, সে আপন বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনার অমঙ্গল আনয়ন করে।

যেমন বারিধারা অগ্নিরাশি নির্ব্বাণ করিয়া সমুদায় শীতল করে, সেইরূপ কোমল মধুর বাক্য ক্রোধের শান্তি করিয়া শত্রুকে মিত্রে পরিণত করে।

ভাবিয়া দেখ, সংসারে ক্রোধের কারণ অতি অল্পই বিদ্যমান রহিয়াছে, এক নির্ব্বুদ্ধিতা হইতেই এই অনিষ্টের সূত্রপাত হয়, কিন্তু স্থির জানিও, ইহার পরিণাম দারুণ অনুতাপ ও অনুশোচনা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র।

বিশ্ববিদ্যায় দুই বক্তৃতা।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উপাধিদান মহোৎসবে, চেন্‌সেলার বা প্রধান অধ্যক্ষ বড়লাট কর্জ্জন উপাধিভূষিত যুবকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার আভাস অনেক পত্রেই প্রদত্ত হইয়াছে। ঔপাধিক উৎসবে চেন্‌সেলারের বক্তৃতা প্রথাসঙ্গত। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-পঞ্চকের ভিতর কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ই ধনে মানে শ্রেষ্ঠ। বড়লাট আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেন্‌সেলার নহেন, কেবল কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চেন্‌সেলার। তাই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা অধিক। বড়লাট স্বয়ং চেন্‌সেলার বলিয়াই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, ছাত্র, কর্ম্মচারী, সভাসদ ও প্রজাবৃন্দ, বড়লাটের স্বমুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা বর্ষে বর্ষে শুনিতে পান। অনেক বড়লাটের বক্তৃতা শুনিয়াছি, এখনও সৌভাগ্যবশতঃ লাট কর্জ্জনের বক্তৃতা শুনিতেছি। ঔপান্যাসিক কবি লাট লিটনের বক্তৃতা শুনিয়াছি, ধীরবুদ্ধি ধর্ম্মপ্রাণ রিপণের বক্তৃতা শুনিয়াছি, দৌত্যবিশারদ ডফরিণের বক্তৃতা শুনিয়াছি, বিলাতের বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী লর্ড লেন্স-ডাউনের পৌত্র বড়লাট লর্ড লেন্স ডাউনের বক্তৃতাও শুনিয়াছি। শুনিয়াছি অনেকের বক্তৃতা; কিন্তু কর্জ্জনের মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিখ্যাত বৈশ্ববিদ্যালয়িক এম-এ, চেন্‌সেলারের বক্তৃতা আর কখনও শুনি নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালাভ-সম্বন্ধে কর্জ্জনের যেরূপ অধিকার, রিপণের সেরূপ নহে। রিপণ কোন বিশ্ববিদ্যায়য়ের এম-এ নহেন, কিন্তু কর্জ্জন এম-এ। যে ১৮৮৪ অব্দে রিপণ ভারতের চাতুর্ব্বর্ষাধিক রাজকার্য্য সমাপ্ত করিয়া ঘরে ফিরিয়া যান, কর্জ্জন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলীয়ল কলেজে সেই বর্ষেই বি-এ পাস করেন। রিপণের পদে আসিয়া যে বর্ষে ডফরিণ নিযুক্ত হন, তাহার পূর্ব্ব বর্ষে, ১৮৮৭ অব্দে, কর্জ্জন ঐ বেলীয়ল কলেজেই এম-এ পাশ করেন। অনন্তর ঐ অক্সফোর্ডের অল্‌সোল কলেজের তিনি ফেলো-পদে অভিষিক্ত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সম্বন্ধে কর্জ্জনের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু শিক্ষাবিষয়িণী অভিজ্ঞতায় রিপণ কর্জ্জন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। স্বদেশের শিক্ষাব্যাপারে যৌবন অতিবাহিত করিয়া, প্রবীণ রিপণ ভারতে আসিয়া-

দেখাইয়াছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, স্কুলে, সমিতি সভায় রিপণ ক্রমাগত শিক্ষাবিষয়ক অনুরাগ যত্ন ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার কেবল-শিক্ষাসম্বন্ধিনী পঞ্চবিংশতি সারবতী বক্তৃতা আমাদিগের নিত্য পাঠ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ শিক্ষার কথা যে, তিনি কতস্থানে কতবার কহিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা সহজ নয়। ইহাতেই বুঝা যায়, শিক্ষায় রিপণের কিরূপ অনুরাগ এবং আগ্রহ।

ভারতের শিক্ষাপথে রিপণ যেরূপ উন্নতি-চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কর্জ্জনের পূর্ব্বে অপর কোন বড়লাট সেরূপ করেন নাই। রিপণের এডুকেশন-কমিশন যে সকল পন্থা দেখাইয়া দিয়া রাখিয়াছেন, কর্জ্জন যদি কেবল তাহাই ধরিয়া চলেন, তাহা হইলে ধন্য হইবেন। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন কাহারও শিষ্য হইতে ভালবাসেন না। তিনি গুরু হইয়া, নূতন পথ দেখিতে এবং দেখাইতে চাহেন। ভারতের শিক্ষা-বিষয়ে রিপণ যে সকল পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, কর্জ্জন ত সে সকল পথকেই প্রশস্ততম বলিয়া মনে করিতেছেন না। রিপণ যে পথে চলেন নাই, সে পথেও কর্জ্জন চলিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তক্ষেপ।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্জ্জন ১৫ই ফেব্রুয়ারি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই শুনা হইয়াছে। ১৮৮২ অব্দের ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ উপাধিমহোৎসবেই লর্ড রিপণও এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রিপণের সেই বক্তৃতা এবং কর্জ্জনের এই বক্তৃতা আমরা সম্মুখে রাখিয়াই লেখনীচালন করিতেছি। প্রবন্ধে স্থানাভাব না হইলে, আমরা দেখাইতাম, কর্জ্জনের এই বক্তৃতা রিপণের সেই বক্তৃতারই অনুগামিনী। ভাবে সৌসাদৃশ্য, উদ্দেশ্য অভিধেয়ে সৌসাদৃশ্য, ভাষায়ও অনেকটা সৌসাদৃশ্য। কিন্তু বৈশাদৃশ্যও আছে; উভয়ের ভাষাগত শিষ্টাচারের তারতম্যে স্বভাবগত তারতম্য একটু প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। রিপণ ১৮২৭ সনে জন্মিয়া ১৮৮২ সনে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; কর্জ্জন ১৮৫৯ সনে জন্মিয়াছে, ১৯০২ সালের প্রথমেই ঐখানে বক্তৃতা করিলেন। রিপণ ৫৫ বৎসর বয়সে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কর্জ্জন ৪২ বৎসর বয়সে বক্তৃতা করিলেন। বয়সের তারতম্যে স্বভাবে যে

প্রকৃতিগত নিত্য তারতম্য আছে; আবার স্বীয় শিক্ষা এবং নীতির অনুগত যে তারতম্য সর্ব্বমানবেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, রিপণ ও কর্জ্জনে সে তারতম্য ত আছেই। রিপণের ও কর্জ্জনের রাজনীতিগত যেরূপ তারতম্য, সর্ব্বনীতিগত সেইরূপ তারতম্যই স্বতঃসিদ্ধ।

বিনয়ে রিপণ অদ্বিতীয়। ধর্ম্মে কাথলিক বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, রিপণ প্রকৃত বৈষ্ণব; কর্জ্জন কৌল শাক্ত। "তৃণাদপি সুনীচেন লভ্যতে হি সদা হরিঃ।" স্বভাবনম্র রিপণ, অপকট বৈষ্ণবের মত, আপনাকে অতিক্ষুদ্র বলিয়া মনে করেন। কৌল শাক্ত কর্জ্জন মহাশক্তির ভক্ত; শক্তির কৃপায় তিনি যে যেমন শাক্ত তেমনই শক্ত; ভক্ত শাক্ত আপনাকে, শক্তির উপাসক বলিয়া, শ্রেষ্ঠরূপে উচ্চজীবরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব শাক্তের কথায় ভেদ, আচার ব্যবহারে ভেদ, উপাসনায় ভেদ, সকল দিকেই ভেদ। পরম শাক্ত দ্বিজ রামপ্রসাদে আর যে কোন প্রকৃত কৃষ্ণদাসানুদাসে বৈষ্ণবে তুলনা কর; কর্জ্জনে আর রিপণে তুলনা করা হইবে।

কাজে দেখিবে? রিপণ নিজের এডুকেশন কমিশনকে সকল শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করিতে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেন নিষেধ করিয়াছিলেন দেখিবে? ১৮৮২ অব্দের ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপণ নিজেই বলিয়াছিলেন, "ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বা কার্য্য সম্বন্ধে আমি যে, এডুকেশন-কমিশনকে হস্তক্ষেপ করিতে বলি নাই, তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলি নাই, তাহার হেতু আছে। ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই স্বীয় কর্ত্তব্যের সম্যক্‌রূপে সাধন করিতেছে, স্বীয় কার্য্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই সফলতালাভ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে সর্ব্বসাধারণেও সন্তোষলাভ করিতেছেন। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের উপর আমরা বিশ্বাস এবং নির্ভর করিয়াই, নিশ্চিন্ত আছি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগের শীর্ষস্থান। শীর্ষস্থানে উন্নতি আবশ্যক হয় নাই; তলদেশেই উন্নতি আবশ্যক হইয়াছে।"

বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে রিপণের মত কিরূপ, তাহা দেখিলে। কর্জ্জনের মত তোমরা ক্রমাগতই দেখিতেছ। রিপণ যে শীর্ষস্থান হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক এবং অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কর্জ্জন সেই শীর্ষস্থানেই

কাছে রিপণ মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, কর্জ্জন সেই মস্তকেই হাত দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের পণ্ডিত্য যোগ্যতা বিচক্ষণতা প্রভৃতি বিষয়ে রিপণের যেরূপ অটল অচল বিশ্বাস ছিল, কর্জ্জনের সেরূপ নাই। সেরূপ বিশ্বাসভক্তি থাকিলে, কর্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অসন্তোষের পরিচয় দিতে পারিতেন না। উপদেশের সম্বোধনেও বিলক্ষণ বৈসাদৃশ্য আছে। রিপণের ধারণা ;—

“লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥”

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, বি, এ, পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন, মেডিকেল কলেজে পড়িয়া এম, বি. হইয়াছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িয়া বি, ই, হইয়াছেন, তাঁহারা বালক নহেন। দ্বিতীয় পিট যে বয়সে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন, বয়সের যুবক তাঁহাদের ভিতর অনেক আছেন। কর্জ্জন নিজে যে বয়সে কমন্স-সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে বয়সের নবযুবক ত খুব অনেক আছেন। ৫৫ বৎসরের রিপণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে সকল উপাধিভূষিত যুবককে বক্তৃতায় আদ্যন্ত প্যারায় প্যারায় জেণ্টেলমেন অর্থাৎ মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, ৪২ বৎসরের কর্জ্জন তাঁহাদিগকে আগাগোড়া কেবল ইয়ংমেন বা “ছোকরাগণ” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

বক্তৃতার জবানীটাও সম্ভাষণের অনুরূপ হইয়াছে। রিপণ বক্তৃতা সময়ে মনে করিতেন, সমাবস্থ সমবুদ্ধি মনুষ্যবৃন্দের উদ্দেশে কথা কহিতেছি, কর্জ্জন মনে করেন, জ্ঞানে-মানে ক্ষুদ্র ছোকরাদিগকে গুরুমহাশয় হইয়া শিক্ষা দিতেছি।

সৌসাদৃশ্য।

বক্তৃতার বিষয়ে—বিষয়ের আলোচনায়—বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য। অনেক স্থলে অনেক বাক্যসমষ্টিরই একরূপতা, অনেক বাক্যের একতা, অনেক পদেরই একতা। প্রকৃত শিক্ষার রীতি প্রকৃতি গৌরব উপযোগিতা বিশুদ্ধতা প্রগাঢ়তা প্রভৃতির আভাস দিবার জন্য রিপণ যে সকল বিশেষ্য-বিশেষণাদির ব্যবহার করিয়াছিলেন, কর্জ্জনও সেই সকলেরই ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-যুক্তি-পর্য্যায়-প্রবাহেও একরূপতার অভাব নাই

আনন্দলাভ করিয়াছি। আমাদেরত মনে হইয়াছে, লর্ড কর্জ্জন লর্ড রিপণের সকল বক্তৃতাই যত্নপূর্ব্বক পড়িয়াছেন; মতে অবাধ্য হইয়াও জ্ঞানে রিপণের বাধ্য হইয়াছেন।

ইংরাজি সাহিত্যের দোষগুণ রীত্যলঙ্কারাদি লইয়া সমালোচনা করা আমাদের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা হইতে পারে। কিন্তু আমরাও দেখিতেছি, ভাবের গাঢ়তায় বাক্যের অবাধ প্রবল স্রোত ও প্রাঞ্জলতায়, ঐকান্তিকতায়, হৃদয়গ্রাহিতায়, মর্ম্মস্পর্শিতায়, আর বিশেষতঃ স্বাভাবিকতায় রিপণের বক্তৃতা কর্জ্জনের অপেক্ষা হীন নহে। কর্জ্জনের বক্তৃতায় তাঁহার হৃদয় খুঁজিয়া দেখিয়া লইতে হয়; রিপণের বক্তৃতায় তাঁহার হৃদয় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। রিপণভক্ত আমরা আবার কর্জ্জনেরও অনুরক্ত। দুইজনকে তুলাদণ্ডে চড়াইতে ভালবাসি, তাই একবার তুলাদণ্ডে চড়াইলাম।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

চাঁদ-কুমারী।

(১)

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে প্রথম বিবাহিতা পত্নীর নাম সহধর্ম্মিণী। পতির সহিত চিরজীবন অকপটে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, তন্নিমিত্তই পত্নীর ঐ পবিত্র নাম। বিবাহের মন্ত্রেও এই অনুপম ব্রতটির বিশেষ উল্লেখ আছে। ইংরাজ অথবা অন্য কোন জাতির এমন পবিত্র বৈবাহিক বন্ধন নাই।

বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রে পরীক্ষা পূর্ব্বক দার গ্রহণের বিধি আছে। অঙ্গের যে যে লক্ষণে স্ত্রীলোক সুলক্ষণা হয়, যে যে লক্ষণে কুলক্ষণা বুঝায়, শাস্ত্রকারেরা তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইংরাজ অথবা অন্য কোন জাতি স্বপ্নেও কখন লক্ষণ পরীক্ষায় পত্নী গ্রহণের উপদেশ শ্রবণ করেন নাই।

বঙ্গের একজন ডাক্তার ভোলানাথ মজুমদার একটি সুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কামিনীর নাম চাঁদকুমারী। পরীক্ষা পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ এবং সপত্নীক ধর্ম্মানুষ্ঠান, কালসহকারে এই দুটী মহাবাক্য আজকাল প্রায় সমস্ত হিন্দুসন্তানের পক্ষে, সত্য কেবল বাক্যমাত্র সার হইয়া পড়িয়াছে, কেহই প্রায় ঐ দুই মহাবাক্যের এখন আর বড়

আদর করেন না। বিবাহের মন্ত্র আবৃত্তির সময় বিদ্বান ভোলানাথবাবু চাঁদকুমারীর অঙ্গ পরীক্ষা করিয়াছিলেন কি না, তাহা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। ফল কথা, রূপে সুন্দরী দেখিয়াই, মোহিত হইয়া, বিনা পরীক্ষায়, ভোলানাথ ঐ সুরূপা চাঁদকুমারীকে বিবাহ করিয়াছেন।

ভোলানাথ বাবু ইংরাজীতে বিদ্বান, ইংরাজেরা রূপ গুণের পক্ষপাতীও বটেন। ভোলানাথ ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজের মধ্যে বিবাহের অগ্রে কন্যা পরীক্ষার ব্যবহার নাই। চর্ম্ম শাদা, ঘাড় লম্বা, চিকণ চিকণ কটাচুল, চিকণ চিকণ কটাচক্ষু, একটু একটু কোল কুঁজো, বিবিদের এই সকল লক্ষণ থাকিলেই তাহারা পরমাসুন্দরী হয়। যাহারা বিবাহ করে, তাহারাও ভাবে, সর্ব্বসুলক্ষণা, সুতরাং ভোলানাথ বাবুও ঐ লক্ষণকে সুলক্ষণ ভাবিয়াছিলেন।

ভোলানাথ ক্রমে ক্রমে সুন্দরী চাঁদকুমারীর অপরূপ রূপলাবণ্যে এককালে ডুবিয়া পড়িলেন। ভোলানাথ যেন চাঁদকুমারীর আজ্ঞাবহ দাসানুদাস। চাঁদকুমারী যাহা বলে, তাহাই হুকুম। ভোলানাথ গৃহসংসারে ইংরাজী পদ্ধতি ভালবাসেন। প্রধান ধরুন বিবাহ; ইংরাজি বিবাহে অনেক সুখ, অনেক সুবিধা। ইংরাজী বিবাহে কোর্টসিপ আছে, হনিমুন আছে, অশ্বারোহণ আছে, নির্জ্জনে একত্র বাস আছে, এত সুখের সঙ্গে সঙ্গে ডাইভোর্সটীও আছে। এই কারণে ভোলানাথবাবু ইংরাজী বিবাহের বন্ধু।

চাঁদকুমারীকে ডাক্তার ভোলানাথ কেবল রূপের গুণে প্রাণেশ্বরী বলেন, চাঁদকুমারীর কি কি গুণ আছে, না শুনিলে, আমরা এখন সে কথা তুলিব না। চাঁদকুমারীর রূপের কথা একটু বলিব। রোমান্সে এবং নভেলে ভাল ভাল নায়িকাদের যেমন সুন্দর রূপবর্ণনা পাঠ করা যায়, চাঁদকুমারীর রূপের সঙ্গে সেই বর্ণনার অনেক দূর মিল আছে। কেন না, চাঁদকুমারীর কটা চুল, কটা চক্ষু, গলা লম্বা, মাথাটীও কোলের দিকে একটু ঝোঁকা; কপালখানি দিব্য উঁচু, দিব্য চওড়া, দাঁতগুলি দিব্য সাদা সাদা। বিবিদের রূপের পক্ষে সব ঠিক, প্রভেদ এই যে, চাঁদকুমারীর বর্ণটা কিছু ময়লা;—ধপধপে শাদা নহে।

এইরূপ অপরূপ চাঁদকুমারীর রূপ। সাধারণ বঙ্গবাসীর চক্ষে সেরূপ অপরূপ রূপ কদাচ সুন্দর ঠেকে না। ডাক্তার ভোলানাথ মজুমদার

হইয়াছিল কিসে? এ কথার উত্তর এই যে, অন্যান্য গুণের ন্যায় ইংরাজী সুন্দরী বিবিগুলির দেহসৌন্দর্য্যও ভোলানাথের চক্ষে ভাল লাগিয়াছিল।

(২)

চাঁদকুমারীকে লইয়া ডাক্তার ভোলানাথ দেশে দেশে নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া, শেষকালে মেদিনীপুর জেলার একখানি নগরে বাস করেন। দিব্য চকবন্দী অট্টালিকা, তিনধারে উদ্যান, সম্মুখে সরোবর;—উদ্যানের পুষ্পকুঞ্জে নানাজাতি সুগন্ধ পুষ্প প্রেমানন্দে বিকশিত হইয়া, মনোহর সুবাসে দশদিক্ আমোদিত করে;—চমৎকার শোভা;—চমৎকার দৃশ্য;—অতি রমণীয় স্থান।

এই রমণীয় মধুময় কুঞ্জবন মধ্যে মনোহরা পুরী। সুন্দরী চাঁদকুমারী সুখে স্বচ্ছন্দে সেই মনোহরা পুরীতে ক্রমাগত ১০।১১ বৎসর বাস করেন। ডাক্তার বাবুর অমায়িকতাগুণে তথাকার সমস্ত ভদ্রসন্তান তাঁহাকে সমাদর করিতেন; সেই অনুরোধে ডাক্তার ভোলানাথ তাঁহাদের সকলের বাড়ীতেই চিকিৎসা করিতেন; যাঁহারা ধনবান, তাঁহারা মাসে মাসে কিছু কিছু বেতন বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। গৃহস্থ বাটীতে নগদ বিদায়। নগর মধ্যেও দিন দিন ভোলানাথের বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হইল। ডাক্তার ভোলানাথ সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ভোলানাথের নামটি যেমন, তাঁহার কতকগুলি কার্য্যেও তাহার তদ্রূপ সার্থকতা সপ্রমাণ হয়। ভোলানাথ সর্ব্বদাই যেন ভোলানাথ;—সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক। এইমাত্র এক স্থানে যে জিনিষ রাখেন, পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া যান, সহজে খুঁজিয়া পান না। ভোলা মনের উপদ্রবে ভোলানাথ অনেক সময়ে অনেকবার যে সকল ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন, হিসাব না থাকাতে তাহা তিনি নিজেও জানিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁহার প্রতি নগরস্থ ভদ্রলোকের কিছু অধিক দয়া। ডাক্তার ভোলানাথ নিত্য অনেক টাকা রোজকার করেন। বাহিরের বৈঠকখানার একটা অর্দ্ধভগ্ন আলমারিতে নগদ টাকা, নোট, ঘড়ী, আংটী সমস্তই থাকে;—কোন দিন চাবি দেওয়া হয়, কোন দিন ভুল হইয়া যায়। আলমারীর জিনিষ তফাৎ হয় কি না, নিত্য দেখিয়াও সদাশয় ভোলানাথ বেচারা তাহাও বুঝিতে পারেন না।

বৈঠকখানার দেওয়ালে চেইনগাঁথা একটি সোণার ঘড়ী অনেকদিন

অবধি ঝুলিতেছিল। দম্ দিবার সময় হইলেই সে ঘড়ীতে হাত পড়িত, অন্য সময়ে কেহই সে ঘড়ী স্পর্শও করিত না। একদিন সে ঘড়ীটি হঠাৎ দেওয়াল হইতে অদৃশ্য হইল!

বাবুর অত্যন্ত সখের ঘড়ী, নিজের নামটি পর্য্যন্ত ঘড়ীর মধ্যে খোদা, মূল্যও অধিক, কাজে কাজেই শূন্য দেওয়ালে, দৃষ্টি পড়িবামাত্র ভোলানাথ হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। চাকরকে, দাসীকে, পাচিকাকে, দ্বারবানকে, বিশেষতঃ প্রণয়িণী গৃহিণী চাঁদকুমারীকে ঘড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ডাক্তার বাবু ঘড়ির শোকে দিনকতক বারকতক বকাবকি করিলেন, তাহার পর সত্য সত্যই ভোলানাথ হইয়া চুরির কথা ভুলিলেন। গোল মিটিয়া গেল।

বধূরা বৈঠকখানায় সচরাচর আইসে না, তবে কেন ডাক্তার মহাশয় কুলবধূ চাঁদকুমারীকে ঘড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহার কিছু ব্যাখা চাই।—সুন্দরী চাঁদকুমারী যেমন তেমন কুলবধূ নহেন, ইংরাজী বিবিদের ন্যায় সর্ব্বত্র স্বাধীনতা ধারণ করেন। বাবু আপন প্র্যাকৃটিসে বাহির হইয়া গেলে চাঁদকুমারী নিত্য নিত্য বৈঠকখানায় আসিয়া বিহার করিতেন; বাবুর সাক্ষাতেও মধ্যে মধ্যে বিহার করিতে আসিতেন। বাবু তাহাতে বাধা দিতে পারিতেন না। কেন না, বাবু মনে মনে চাঁদ-কুমারিকে বিশেষ ভয় করিতেন; কারণ চাঁদকুমারী স্বাধীনজেনানা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ডাক্তার ভোলানাথ মজুমদার ঐ সুন্দরী পত্নীর একান্ত অনুগত, ঠিক যেন আজ্ঞাবহ কিঙ্কর। বাবু ভোলানাথ বঙ্গ গৃহস্থ সংসারে ইংরাজী পদ্ধতির প্রশংসাকারী বন্ধু; সাহেবেরা যেমন হনিমুনের পর সংসারি হইয়া বিবিকে সর্ব্বময়ী অধিশ্বরী করিয়া রাখেন, ভোলানাথ বাবুও চাঁদকুমারীকে সেইরূপ অধিশ্বরী করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবাহ হইলে সাহেবেরা আর সাহেব লোক থাকেন না, বিবিদের গোলাম হইয়া থাকেন। এদেশে যাঁহারা বিবাহিত সাহেব দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সাহেব সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করেন, কড়ায় গণ্ডায় তাহা আনিয়া বিবির হাতে দেন; বিবি যাহা করেন, তাহাই হয়, বিবিরাই সংসারের "কর্ত্তা"। কৈফিয়ত দিতে হইলে সাহেবকে বিবির পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিতে হয়; বিবাহের পূর্ব্বেই সুরসিক সাহেবেরা সুরসিকা সুন্দরী বিবিগুলির পায়ে ধরিতে যান, বিবাহের পর তাঁহারা আর কত

কি করেন, সে সকল বিষয় অনুমানে বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ভোলানাথের সেইরূপ আদরের পাত্রী, প্রণয়ের পাত্রী, আতঙ্কের পাত্রী, সম্মানের পাত্রী, পরমাসুন্দরী আদরিণী চাঁদকুমারী।

(৩)

ঘড়ি চুরির এক বৎসর পরে চাঁদকুমারীর গর্ভ। গর্ভবতী অবস্থায় চাঁদকুমারীর আরো আদর বেশী। কার্ত্তিক পূজা আসিল। রাত্রিকালে একটী ভদ্রলোকের বাড়ীতে ডাক্তার বাবুর নিমন্ত্রণ যাইবার কথা। তাঁহার এক জোড়া বেশীদামের উৎকৃষ্ট কাশ্মিরী শাল ছিল, পোষাকের সিন্দুক খুলিয়া ভোলানাথ দেখিলেন, সেই শাল জোড়াটি সিন্ধুকে নাই। মন বড় অস্থির হইল। ভদ্রলোকের বাড়ী, বন্ধুর বাড়ী, ঘটার কাত্তিক পূজা, নিমন্ত্রণে না গেলেও নয়, কিন্তু মন বড় অস্থির;—ঘড়ি গেল, শাল গেল, মন গেল ভিতরে ভিতরে আরো কত কি যাইতেছে, কে জানে!

অকস্মাৎ এই সকল কথা ভোলানাথের ভোলা মনে উদয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে অন্দরে গিয়া চাঁদকুমারীকে তিনি ঐ শালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; চাঁদকুমারী রাগিয়া উঠিলেন। চক্ষু ঘুরাইয়া কর্কশ-স্বরে বলিলেন, "আমার কাছে কি? আমি তার কি জানি? তোমার সিন্ধুকে জিনিষ, তোমার কাছেই চাবি, বাতাসে বাতাসে জিনিষ উড়িয়া গেল! ন্যাকা! আমার কাছে তদারক! কেন গা! আমি বুঝি চোর?"

এই সব কথা বলিয়াই তেজস্বিনী চাঁদকুমারী দারুণ অভিমানে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। ভয়ে ভয়ে সান্ত্বনা করিয়া, চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, ডাক্তার বাবু বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিলেন; একখানি শুভ্র আলোয়ান গায়ে দিয়া সেরাত্রে পূজাবাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। আহারের সময় নির্জ্জনে বাবুকে পাইয়া, চাঁদকুমারী শিহরিয়া শিহরিয়া চুপিচুপি বলিলেন, সত্তি গো সত্তি! যা ভেবেছি, তাই। আগে আমার মনে হয়েছিল, তোমার ভোলা মন, কোথায় রেখেছ, তা হয়ত মনে নাই, মিছামিছি চুরি বলিতেছিলে। এখন বুঝিতেছি, চুরিটাই সত্যি! শাল আমি পাইয়াছি! তখন এই পর্য্যন্ত কথা।

বাবুর আহারান্তে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চাঁদকুমারী মনে মনে হাসিতে হাসিতে রন্ধনগৃহের পার্শ্বে একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করিলেন। সে ঘরে কি? বাড়ীতে একজন অনেকদিনের পুরাতন ঝি ছিল, তাহার নাম

কুন্তী। আপনার দুই একখানি পরিধেয় বস্ত্র, দুই একটি মাটীর ভাঁড়, দুই চারিটা পয়সা, কুন্তী সেই ঘরের একটা ভগ্ন সিন্দুকে রাখিয়া দিত। সিন্ধুকের তলা ছিল না, খানকতক খপরের কাগজ দিয়া তলাটা ঢাকা ছিল; চাবিও ছিল না, রাত দিন খোলাই থাকিত। ঘরে প্রবেশ করিয়াই চাঁদকুমারী তাড়াতাড়ি সেই সিন্দুকের ডালাখানা খুলিয়া ফেলিলেন; চোরা শাল বাহির হইল। তলায় খপরের কাগজ, তাহার উপর শাল, তাহার উপর দুইখানা ময়লা কাপড়, তাহার উপর অন্যান্য বাজে জিনিস। শাল বাহির হইল। চাঁদকুমারী বলিলেন, "এই দেখ, তোমার সাধের কুন্তীর বিদ্যে দেখ! কুন্তী তোমার সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া শাল চুরি করিয়াছে। এখনি বেটিকে দূর করিয়া দাও! বেটি চোর! পুলিশে দাও।"

ভোলানাথ মহাবিস্ময়ে বিষণ্ণ হইলেন। বিষণ্ণবদনে বলিলেন, "যতই বল, বিশ্বাস হয় না। কুন্তী চোর, একথা ভাবিলে আমার ভারি অধর্ম্ম হইবে। কুন্তী বিশ্বাসী, আমার উপর কুন্তীর ঠিক্ যেন মাতৃস্নেহ। কেবল এই মেদিনীপুরে এগারো বৎসর নহে, অন্যান্য স্থানেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে; বাবার আমলে কুন্তী ছিল। সত্তর বৎসর বয়স, আমাদের সংসারেই কুন্তী জীবন কাটাইল; একদিনের জন্যও কুন্তীর একটা মন্দ কার্য্য কেহ কখন দেখিতে পায় নাই। অকস্মাৎ চোর হইবে, বিশ্বাস হয় না। আমি উহাকে তাড়াইতে পারিব না, ক্ষমা কর।"

মুখ ফুলাইয়া চাঁদকুমারী বলিলেন, "না পার কুন্তী লইয়া তুমি থাক, আমি বাহির হইয়া যাই।" ভোলানাথের মাথায় যেন শত বজ্রপাত হইল। অত্যন্ত ভালবাসা, অত্যন্ত আদরিণী সহধর্ম্মিণী চাঁদকুমারী; একটা সামান্য দাসীর জন্য সেই চাঁদকুমারী বাহির হইয়া যাইবে, একথা ভোলানাথের প্রাণে সহিল্ না, বাকি বেতন চুকাইয়া দিয়া, সেই দিনেই মাতৃসম স্নেহবতী কুন্তীকে তিনি গৃহ হইতে বিদায় করিলেন। প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। চাঁদকুমারির ভয়ে মুখ ফুটিয়া কাঁদিতে পারিলেন না, প্রাণের ভিতর রোদনের কল্লোল উঠিল। সংসারে সততার পুরস্কার নাই।

নেত্রজল মার্জ্জন করিতে করিতে ডাক্তার ভোলানাথ স্তম্ভিত হৃদয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। বিষাদিত অন্তরে কত কথাই উদয় হইল, তিনি তাহা ভাবিলেন। টেবিলের উপর হইতে কতবার সোণার বোতাম,

পকেট হইতে কতবার কত টাকা, কত জিনিষ উড়িয়া গিয়াছে, আল্‌মারি হইতেই বা কত কি চুরি গিয়াছে, সেই সব কথা মনে পড়িল। সমস্তই কি কুন্তীর কার্য্য? সিদ্ধান্ত হইল, একটাও না! তবে ব্যাপার কি?

(৪)

দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হইল, চাঁদকুমারী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। সুতিকাগারে দুইজন নূতন ধাত্রী নিযুক্ত হইল। দিনে দিনে দিন যাইতে লাগিল, কন্যা লইয়া চাঁদকুমারী সুতিকাগার হইতে বাহির হইলেন। আট মাস পূর্ণ হইল, ঘটা করিয়া ডাক্তার ভোলানাথ প্রিয়তমা কন্যাটির অন্নপ্রাশন দিলেন। অন্ন প্রাশনের পর ডাক্তার বাবুকে একবার হুগলি আসিতে হইল। হুগলির একজন জমিদারের সহিত ডাক্তার বাবুর বন্ধুত্ব ছিল, সেই বন্ধু অনেকদিন অবধি অতিসার রোগে ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত; ভোলানাথ ডাক্তার অতিসার রোগের উত্তম চিকিৎসা জানেন, সেই জন্য বন্ধু তাঁহাকে আসন্নকালে স্মরণ করিয়াছেন, ভোলানাথ সেই কারণে মেদিনীপুর হইতে হুগলিতে আসিলেন। প্রায় একমাস তাঁহাকে হুগলিতে থাকিতে হইল। দাসি চাকরের উপরেই গৃহরক্ষণের ভার; গৃহিণী চাঁদকুমারী।

বন্ধুকে আরাম করিয়া, একমাস দশদিনের পর ভোলানাথ ডাক্তার মেদিনীপুরে ফিরিয়া গেলেন। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, দেখিলেন, একজন ডাকহরকরা (পিওন) বাটির ভিতর হইতে বাহির হইতেছে। বাবুকে দেখিয়াই সেলাম করিয়া পিওন কহিল, "হুজুরের নামে একটা প্যাকেট আছে, দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম।"

অন্যমনস্কভাবে পুলিন্দাটি গ্রহণ করিয়া ডাক্তার বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেলাম করিয়া পিওন ফিরিয়া গেল। পুলিন্দায় কি আছে, দেখিবার জন্য ডাক্তার মহাশয়ের কৌতূহল এত প্রবল হইল যে, কাপড় না ছাড়িয়াই—মুখে হাতে জল না দিয়াই, অন্দরে গিয়া চাঁদকুমারির চাঁদমুখ না দেখিয়াই, বৈঠকখানায় দাঁড়াইয়া চঞ্চল হস্তে শীঘ্র শীঘ্র পুলিন্দাটি খুলিয়া ফেলিলেন, ভিতর হইতে কি একটা ভারি জিনিষ ঠন্ ঠন্ শব্দে পদতলে পড়িয়া গেল। চঞ্চলভাবে কুড়াইয়া লইয়া, আবরণ খুলিয়া বাবু দেখিলেন, চেইনযুক্ত একটি সোণার ঘড়ি;—দেখিয়াই চিনিলেন, তাঁহার

নিজের ঘড়ি। দুই বৎসর পূর্ব্বে বৈঠকখানার দেওয়াল হইতে সেই ঘড়িটিই চুরি গিয়াছিল।

বাবুর কৌতূহল আরো বৃদ্ধি হইল। প্যাকেটের মধ্যে দীর্ঘ একখানা পত্র। সে পত্রে কি লেখা আছে, মহা আগ্রহে কৌতূহলী ডাক্তার তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। কাশী হইতে আসিতেছে। পত্রে স্বাক্ষর আছে, শ্রীধনঞ্জয় মিত্র। এই ধনঞ্জয় মিত্রটি ভোলানাথ বাবুর পরম বন্ধু। ধনঞ্জয় লিখিয়াছেন, অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই, কুশল সমাচার লিখিয়া সুখী করিও। তিনমাস হইল, একটি লোক আসিয়া, আমার কাছে একটি সোণার ঘড়ী বন্ধক রাখে, তিনমাস আমি সে ঘড়ীটি খুলিয়া দেখি নাই, গত কল্য খুলিয়া দেখিলাম, ঘড়ির ভিতর তোমার নাম। সন্দেহ হইল। তোমার ঘড়ি অন্য লোকে আমার কাছে কেন বন্ধক দিল, বুঝিতে পারিলাম না। অতএব অদ্যকার ডাকে এই পত্রের সঙ্গে সেই ঘড়িটি তোমার নামে রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইলাম, বিশেষ বৃত্তান্ত কি, প্রাপ্তি-স্বীকারের সঙ্গে তাহা লিখিয়া পাঠাইয়া আমার উদ্বেগ ও সংশয় দূর করিয়া দিও। কে বন্ধক রাখিয়াছিল, তাহার নাম আমি বলিতাম না, কিন্তু না বলিলে তুমি অন্ধকারে থাকিবে, সেই জন্য বন্ধুর ন্যায় বিশ্বস্তভাবে লিখিতেছি, তাহার নাম গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঠিকানা শিবতলা পাড়া, মেদিনীপুর।

পত্র পাঠ করিয়া ভোলানাথের যেমন আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সংশয় জন্মিল। গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিবাসী, গোকুল একদিনও তাঁহার বৈঠকখানায় আইসে না, তাহার হস্তে তাঁহার ঘড়ি কেমন করিয়া গেল, সংশয়ে সংশয়ে ইহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। বন্ধুর পত্রখানি আর একবার ভাল করিয়া পাঠ করিলেন। পকেটে রাখিবার অগ্রে অপর পৃষ্ঠায় দেখিলেন, পুনশ্চপাঠে অল্পাক্ষরে লেখা রহিয়াছে, গোকুলচন্দ্র ভদ্রলোক। গোকুল আমাকে বলিয়াছিল, কাশীতে একটি বিশেষ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত ডাক্তার বাবুর স্ত্রী চাঁদকুমারী দেবী পতির অজ্ঞাতসারে এই ঘড়িটী আমার হস্তে দিয়াছেন। সত্য সত্য গোকুল সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী, অতি সাবধানে গোপনীয় পত্রে তাহা তুমি আমাকে লিখিয়া জানাইও।

এই অংশ পাঠ করিয়া ভোলানাথের বদনে এক প্রকার বিরস হাস্যরেখা দেখা দিল। সেই পোষাকেই তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া চাঁদকুমা-

স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। একমাস দশদিন বিচ্ছেদের পর ভালবাসা পত্নীর সহিত যে প্রকারে আলাপ করিতে হয়, সেই প্রকারে আলাপ করিয়া, শেষকালে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাড়ার গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তুমি চেন?" মুখ ভারী করিয়া, চক্ষে একবিন্দু জল আনিয়া, চাঁদকুমারী বলিলেন, "ওমা! একি কথা গো! কূলের বউ আমি, কখন বাড়ীর বাহির হই না, কোথাকার গোকুল, কোথাকার কে, আমি কেমন করিয়া চিনিব?"

বাবু তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর এ নাটকের নূতন অঙ্কের অভিনয়। ডাক্তার ভোলানাথ বাহিরে বাহিরে গোকুলকে চিনিতেন, গোকুলদের বাড়ীতে কখন যান নাই, সেই দিন, সন্ধ্যার পর বাড়ীতে গিয়া গোকুলকে তিনি ডাকিলেন। গোকুল সম্মুখে আসিল। গোকুল বিংশতিবর্ষীয় রূপবান নবীন ছোক্‌রাবাবু, ডাক্তারবাবুকে গোকুল বেশ সমাদর করিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া, বার বার অভয় দিয়া, সত্য কথা বলিবার অঙ্গীকার করাইয়া, চুপি চুপি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কাশীধামের পত্রের কথাও বলিলেন। গোকুল প্রথমে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া লজ্জা প্রকাশ করিয়াছিল, অবশেষে সমস্ত সত্য কথা স্বীকার করিল। চাঁদকুমারীর সহিত গোকুলের গুপ্ত-প্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল, সেই ভালবাসার খাতিরে স্বামীর ঘড়ি চুরি করিয়া, চাঁদকুমারী গোপনে সেই ঘড়ীটী প্রীতি-উপহার স্বরূপ গোকুলকে দান করিয়াছিলেন।

(৫)

ভোলানাথ আর বেশী কথা শুনিবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিলেন না; বৈঠকখানায় ফিরিয়া গিয়া, ঘড়ীটি পকেটে লইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশিলেন। শান্তবদনে চাঁদকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোকুলকে তুমি চেন না, কিন্তু আর কাহারও দ্বারা আমার কোন জিনিষ গোকুলকে তুমি কখন দিয়াছিলে কি না?" কাঁদিয়া চাঁদকুমারী অস্বীকার করিলেন। ভোলানাথের অশান্ত বদন রক্তবর্ণ হইল;—পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া, চাঁদকুমারীর চক্ষের কাছে ধরিয়া, তৎক্ষণাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ দেখি, এই ঘড়ী তুমি চিনিতে পার কি না? বৈঠকখানা

ব্যবহার করিবার জন্য অথবা বন্দক দিবার জন্য এই ঘড়ী তুমি গোকুলকে দিয়াছিলে কি না? গোকুলের সঙ্গে তোমার গুপ্ত-প্রণয় আছে কি না?"

চাঁদকুমারী ক্রন্দন করিলেন, রাগ করিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। মুখ দেখিয়া ভোলানাথ বুঝিলেন, ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ! ঘড়ী চুরি, সাল চুরি, জিনিষ চুরি, টাকা চুরি, সমস্তই চাঁদকুমারীর কাজ! চাঁদ-কুমারী চোর, চাঁদকুমারী অসতী! ডাক্তারবাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, দূর্ হও। গহনাগুলি খোল, বাহির হও;—দূর হইয়া যাও! অনেক যত্নে কালসর্পিণী পুষিয়া ছিলাম! শয়নের শয্যায় সমাদরে ভয়ঙ্করী ডাকিনীকে স্থান দান করিয়াছিলাম! ব্যভিচারিণী, চোরা কামিনীর স্বামি আমি! হায়, হায়! তোর কথায় আমি মাতৃসমা স্নেহময়ী বর্ষিয়ষি কুন্তীকে বিনা-দোষে তাড়াইয়াছি। দূর হইয়া যা। স্ত্রীহত্যা করিব না, সে ইচ্ছা থাকিলে এখনি তোরে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতাম, তাহা আমি করিব না;—দূর হইয়া যা!"

চাঁদকুমারী একটিও উত্তর করিলেন না, গহনাও খুলিলেন না, কেবল রাগভরে পতির মুখপানে রক্তচক্ষে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তারবাবু স্বয়ং সেই পাপীয়সির গহনাগুলি খুলিয়া লইয়া, ছিন্ন বস্ত্র পড়াইয়া, গলাধাক্কা দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন, চাঁদকুমারী কাঁদিয়া কন্যাকে লইবার জন্য আবার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছিলেন, সবলে আবার একধাক্কা দিয়া ডাক্তারবাবু সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই চাঁদকুমারী আমাদের ডাক্তার ভোলানাথের আদরিণী সহধর্ম্মিণী ছিল। কেন না, ডাক্তার ভোলানাথ ইংরাজী বিবাহের পক্ষপাতী। সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া সংসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ইংরাজী বিবাহে দম্পতির ধর্ম্মানুষ্ঠান কি প্রকার?—প্রতি রবিবারে মনোহর বেশ বিন্যাস করিয়া সাহেবের বগল ধরিয়া গির্জ্জায় যাওয়া ভিন্ন বিবিলোকের অপর কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বদা আমরা দেখিতে পাই না। ডাক্তার ভোলানাথ মজুমদার ইংরাজী ধরণে সহধর্ম্মিণীর পদসেবা করিয়া বিলক্ষণ প্রতিফল পাইলেন। বাপের বাড়ী গিয়া চাঁদকুমারী দেবী গলায় দড়ী দিয়া মরিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা।)

১০ম বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

লি-ভেসো।

বক্সারের ভীষণ যুদ্ধের পর হতভাগ্য বাঙ্গালার শেষ নবাব মীরকাসেম আলি খাঁকে ভগ্নপাদ হস্তীপৃষ্ঠে অসহায় ও অসম্বল অবস্থায় বিদায় দিয়া, যবনকুললক্ষ্মী বৃটিশ অঙ্কশায়িনী হইলেন;—সে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের কথা। কিন্তু সেই যুদ্ধে যে দুই বীরের বাহুবলে নবাব শত্রু-সম্মুখীন হইতে পারিয়াছিলেন, সেই দুই ফরাসী বীরের নাম ছিল,—সমরু ও মাডক।

ভীষণ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া, মাডক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতে বাধ্য হন। এই পলায়নে সমরুর বলদর্প ক্ষীণ হইল,—তিনি পরাস্ত হইলেন। পরিশেষে নবাবের বিশ্বাসঘাতক উজিরের দলভুক্ত হয়েন। এই সময়ে উজিরের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধির প্রস্তাব হয়; ইংরাজেরা সমরুকে ধরাইয়া দিবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু উজির সমরুকে সমর্পণ করিতে না পারায়, বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরাজেরা সমরুকে এক নাচের মজ্‌লিসে নিমন্ত্রণ করিয়া গোপনে হত্যা করুন। কিন্তু ইংরাজেরা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

এখন সমরু স্পষ্টই উজিরের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিলেন, তখন প্রকাশ্যভাবে জাঠদিগের সহিত যোগদান করিলেন; কিছুদিন পরে তাহা-দিগের সহিত বিবাদ করিয়া, পুনরায় জাঠদিগের পক্ষে যোগদান করেন। এই সময়ে জেব উন্নেসানাম্নী কোন নর্ত্তকীর সহিত সমরুর বিবাহ হয় *।

* এই জেব উন্নেসা ইতিহাসপ্রসিদ্ধা বেগম সমরু।

১৭৭৬ খৃঃ দিল্লীর তদানীন্তন মন্ত্রী নজফ খাঁ সমরুকে আহ্বান করেন। ১৭৭৭ খৃঃ ইংরাজেরা সমরুকে প্রত্যার্পণ জন্য মন্ত্রীকে পীড়াপীড়ি করেন; কিন্তু মন্ত্রী সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অধিকন্তু সমরুর স্বহস্ত গঠিত সৈন্যদল ব্যতীত মন্ত্রী তাঁহাকে আর এক দলের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। এই দুই দল সৈন্যের পোষণ জন্য সমরু দিল্লীর দরবার হইতে সাহারণপুর জেলার মধ্যস্থ প্রসিদ্ধ সার্দ্ধনা পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। ১৭৭৮ খৃঃ মে মাসে সমরুর প্রাণবায়ু দিল্লীর নিকট অবসান হয়।

সমরুর মৃত্যুর পর সার্দ্ধনার জায়গীর ও সৈন্যগণের ভার বেগম সমরুর হস্তে পতিত হয়। বেগম অতীব দক্ষতাসহকারে সৈন্যগণের পরিচালন করিতেন। সার্দ্ধনার আয় প্রথমে ৬ লক্ষ টাকা ছিল, কিন্তু বেগমের যত্নে ও সুবন্দোবস্তে সেই আয় ১০ লক্ষ টাকা হইয়া উঠে। সার্দ্ধনার দুর্গমধ্যে বেগম অবস্থিতি করিতেন। সেই দুর্গে ৫ দল সিপাহী, ৪০টা কামান ছিল, এবং প্রায় ২০০ শত ইউরোপীয় গোলন্দাজ তাঁহার সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হয়।

ইতিপূর্ব্বে ভারতক্ষেত্রে অনেকগুলি নব বল প্রবেশ করিয়াছিল—পূর্ব্বে ভারতের ভাগ্যে যাহা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইত, ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ডচ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের নবপ্রণালী শিক্ষিত সৈন্যের অনলোদ্গারী কামান বন্দুকের সম্মুখে ঢাল-তলোয়ার-সড়্‌কী-ধনুধারী ভারতীয় সৈন্যের তিষ্ঠান ভার হইত, সুতরাং ভারতীয় সৈন্যকে নববেশে সাজাইতে হইবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যদি সমগ্র ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ একীভূয় হইয়া ভারতের প্রতিকূলে রণসজ্জা করিত, তাহা হইলে মোগল রাজত্বের মধ্যভাগেই সমস্ত ভারত ইংরাজের পদানত হইত, কিন্তু ভারতকে সেরূপ ভাবে অবলোকন করা ভারতলক্ষ্মীর অভিপ্রেত নহে, তাই প্রত্যেক ইউরোপীয় জাতি পরস্পরের প্রতিকূলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই প্রতিকূলতার ফল মৃদুগম্ভীর বেশ ফলিল। অনেক।নেক সুচতুর যবনরাজ ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি সেনানী নিযুক্ত করিয়া, স্ব স্ব সৈন্য-গণকে পাশ্চাত্য অভিনব সমর-চাতুর্য্য শিখাইয়া লইলেন। ভারতের ভাগ্য মন্দ, তাই সে সব চাতুর্য্যকুশল রাজা অথবা সম্রাটের পর কয়েকটী কাপুরুষ, ভীরু, অকর্ম্মণ্য, অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির হস্তে সেই সব চাতুর্য্য বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে সমস্ত পাশ্চাত্য প্রতাপ বিমলিন করিয়া, ইংরাজ ও ফরাসী তূর্য্যধ্বনি পরস্পর প্রতিকূলে দক্ষিণ ভারত

নিনাদিত করিয়া বাজিয়া উঠিল। ইংরাজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন;—ফরাসী ক্ষমতা বিধ্বস্ত ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। অনেকানেক ফরাসী সেনানী ও সেনাগণ তখন দেশীয় রাজের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তৎপরে কতক বা তাহাদের উত্তেজনায়, কতক বা অন্য কারণে ঘুরিয়া, উদয়নালার বক্সারের যুদ্ধ। কেহই ইংরাজ বিপক্ষে তিষ্ঠিতে পারিল না। ব্রিটনের ভীষণ ঝড়ে অনেক সবল ভারতীয় মহীরুহ ভূপতিত ও বিনষ্ট হইয়া গেল। ভারতক্ষেত্রে নূতন বীজ আরোপিত হইল।

বেগম প্রথমে পাউলী নামীয় কোন জর্ম্মাণ সেনানীর হস্তে স্বীয় সৈন্য পরিচালন ক্ষমতা অর্পণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যথাক্রমে বাভার, ইভান্স ও দুদ্রেণী (ডুড্রেনী) নামে তিনজন ইউরোপীয় বেগমের সৈন্য পরিচালন করেন। পরিশেষে "লি-ভেসো" নামক জনৈক শিক্ষিত ফরাসী সেনানায়কের উপর তাঁহার সৈন্যগণের নেতৃত্ব ভার পতিত হয়।

লি-ভেসো প্রথমে সমস্ত সৈন্যদলকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া নূতন নূতন রণক্রীড়া প্রদানে সুশিক্ষিত করেন। অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও পদাতিক তিন প্রকার সৈন্যই তাঁহার শিক্ষাগুণে শিক্ষিত হইয়া উঠে। এই সময়ে টমাস্ নামক একজন ইংরাজ বেগমের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হয়। টমাস্ স্বকীয় প্রতিভা ও তেজস্বিতাবলে বেগমের সৈন্যগণকে যুদ্ধে অজেয় ও নিপুণ করিয়া তুলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বেগমের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। প্রবাদ, তাঁহারই বাহুবলে এবং তেজস্বিতায় বেগম বাদসাহ পক্ষ হইতে নজফকুলী খাঁকে আক্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন।

এদিকে লি-ভেসো দেখিলেন যে, টমাসের ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তখন আপনার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, এরূপ হইলে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইবে। বেগমের উপর আপন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। না জানি কোন অজ্ঞাতকারণে বেগম সে প্রস্তাবে সম্মতা হইয়াছিলেন। বিবাহ হইল—অবশ্য খৃষ্টান মতে, কিন্তু বিবাহের কথা সাধারণে প্রকাশিত হইল না। গ্রেগরি নামে জনৈক পাদ্রী ব্যতীত আর কেহ এই বিবাহের কথা জানিত না। এই বিবাহের পর টমাস্ মনক্ষুণ্ণ হইয়া বেগমের সৈন্যদল পরিত্যাগ করেন এবং নিজে এক নূতন সৈন্যদল সংস্থাপন করেন। তাঁহার ক্ষমতা

সেনানীরা বাধা না দিলে সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশের আধিপত্য লাভ করিতে পারিতেন।

লি-ভেসো উচ্চ কুলোদ্ভূত ছিলেন। বেগমকে বিবাহ করায় তাঁহার সম্মানের হানি হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কেবল বেগমের সৈন্যদলের উপর একাধিপত্যই তাঁহার মুখ্যোদ্দেশ্য ছিল। সেই সৈন্যদলে যে সমস্ত ইউরোপীয় ছিল, তাহাদের অধিকাংশ নীচবংশসম্ভূত হইলেও বেগম কখনও কখনও তাহাদের সহিত একত্রে আহারাদি করিয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করিতেন *। এ দৃশ্য লি-ভেসোর চক্ষে ভাল লাগিল না। যেহেতু প্রথমতঃ, তিনি দলভুক্তসৈন্যগণ অপেক্ষা অনেক উচ্চ-পদস্থ ও উচ্চ বংশসম্ভূত, তাঁহার সহিত একত্র হইয়া নীচবংশীয়েরা আহার বিহার করিবে, ইহা ভাল নয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পত্নী সার্দ্ধনার অধীশ্বরী, একটা সামান্য লোককে এরূপ রাজ-মহারাজকে বাধ্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়। এই সব চিন্তা করিয়া, তিনি সে প্রথা রহিত করিয়া দেন। এইরূপ অন্যান্য আরও কয়েকটী কারণে ইউরোপীয়গণ বিরক্ত হইয়া উঠিল। নানাপ্রকারে অবাধ্যতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। লি-গো নামক একজন ফরাসী সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। বহুবিধ যত্নসত্ত্বেও যখন তাহারা শান্ত হইল না, তখন বেগম তাহাদিগের সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

তৎকালে বৃটিশ সৈনাধ্যক্ষ কর্ণেল ম্যাকগোয়েল অম্বুপ সহরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অবাধ্য সৈন্যদলের হস্তে নিহত ও অবমানিত হইবার আশঙ্কায় লি-ভেসো ইংরাজাধিকারে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু কর্ণেল সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করেন। এই সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রাজনৈতিক গগনে ভীষণ বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। সিন্ধিয়া দিল্লী

* ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। শ্বেতবর্ণের মান্য পূর্ব্বাপর সমান আছে। পূর্ব্বে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে বলিয়া, সম্রাট অথবা দেশীয় রাজগণ ভয় করিয়া মান্য করিতেন। এখন দেশীয় রাজার জাতি সবুট পদাঘাতের ভয়ে ভয় করিয়া চলেন। এমন কি, দেশীয় বড় বড় রাজা মহারাজাও সামান্য একটা ফিরিঙ্গীকে ভয় করিয়া চলেন।

আক্রমণের চেষ্টায় ফিরিতেছিলেন। বৃটিশ গবর্ণর জেনারেল সারজন শোর গোলযোগের সম্ভাবনায় মেজর পামারকে তদ্দেশে প্রেরণ করেন। লি-ভেসো কর্ণেলের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া গবর্ণর জেনারেলকে লিখিয়া পাঠান। ইহার মধ্যে মেজর পামার আসিয়া সিন্ধিয়ার শিবিরে উপস্থিত হইলেন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ। বেগম সমরুর দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং তাঁহার সৈন্য বাধ্য রাখিবার ক্ষমতা নাই বুঝিতে পারিয়া, উক্ত সৈন্যদলকে বশে আনিবার জন্য সিন্ধিয়ার ইচ্ছা হইল। সিন্ধিয়া পামারের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, বেগম যদি তাঁহার সমগ্র সৈন্য ও ১২ লক্ষ মুদ্রা অর্পণে সম্মতা হয়েন, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে নিজ সৈন্যদলভুক্ত করিয়া লই, নতুবা তাঁহাকে ইংরাজাধিকারে প্রবেশে বাধা দিব। মেজর এই কথা লি-ভেসোকে জানাইলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, সৈন্যরক্ষার অস্ত্র শস্ত্র ব্যয় বাদে নগদ ৪ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত আছেন কি না? অবশেষে পামারের মধ্যস্থতায় স্থিরীকৃত হইল যে, সিন্ধিয়া বেগমের সপত্নী পুত্রকে মাসিক ২ সহস্র টাকা দিবেন। সৈন্যগণও তাঁহার অধীন হইবে। বেগম ইংরাজাধিকারে প্রবেশ করিতে পারিবেন। বেগমের সৈন্যেরা যখন এই কথা শুনিল, তাহারা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এক্ষণে তাহারাই বেগমের বৃটিশ অধিকারে প্রবেশের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল।

রাত্রি অন্ধকারময়ী—বৃষ্টিও অল্প অল্প পড়িতেছে, আকাশে মেঘ সকল এখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া—হেলিয়া দুলিয়া বায়ুসাগরে ভাসিতেছে, প্রকৃতি গম্ভীরা অথচ ভয়ঙ্করী, স্থিরা অথচ স্ফুটমুখীনী! ভাগ্যবিতাড়ন বিক্ষুব্ধ দম্পতি সমস্ত সুখস্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া গোপনে ফরাকাবাদ অভিমুখে যাই-তেছেন। উদ্দেশ্য বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ইংরাজাধিকারে আশ্রয়! বেগম শিবিকারোহণে যাইতেছিলেন, তাঁহার হস্তে শাণিত ছুরিকা ছিল। লি-ভেসো একখানি তরবারী ও পিস্তল হস্তে অশ্বারোহণে তাঁহার পাশে পাশে যাইতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে কি?

কিছুদূর যাইতে না যাইতে উন্মত্ত সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। বলপ্রয়োগে উদ্যত হইলে বেগম হস্তস্থিত ছুরিকাদ্বারা বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। লি-ভেসোও প্রাণপ্রিয়ার রক্তাক্ত পরিচ্ছদ

তৎপরে সৈন্যগণ উভয়ের দেহ সার্দ্ধনায় লইয়া আইসে। ছুরিকাঘাতে বেগমের মৃত্যু হয় নাই—কিছুক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল। কিন্তু লি-ভেসোর চৈতন্য আর ফিরিল না। অনন্তচৈতন্যে তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর সৈন্যগণ বেগমের উপর অমানুষী অত্যাচার করে। তাঁহাকে কামানের সম্মুখে রাখিয়া পাহারাবন্দী করে। সাতদিন তাঁহাকে অনাহারে রাখে। পরে কদর্য্য আহারে, এমন কি, পরিচারিকাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে সেই স্থলে টমাস্ আসিয়া উপস্থিত হন। লি-ভেসোর মৃতদেহের অবমাননা হইতেছে দেখিয়া,সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং নিজেই লি-ভেসোর দেহ সমাধিস্থ করেন। বিদ্রোহী সৈন্যগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বেগম স্বপদে না থাকিলে সার্দ্ধনার জায়গীর সম্রাট অধিকার ভুক্ত করিবেন। এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া, তিনি বেগমকে স্বপদে পুনঃ স্থাপিত করিলেন।

লি-ভেসোর উপাখ্যান শেষ হইল। ভারত ইতিহাসের অপরিচ্ছন্ন কক্ষে লি-ভেসোর ন্যায় কত রত্ন লুকায়িত আছে, কে জানে? শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।

কেন এত ভয়?

দাঁড়ায়ে গবাক্ষ বক্ষে কে তুমি ললনে,
সুনীল আকাশে হেরি শশধর মত?
চঞ্চল নয়নে চাও কার অন্বেষণে,
কার তরে এত ক্লেশ সহ শত শত?
বেসেছ যাহারে ভাল তারে দিতে প্রাণ,
উপজে হৃদয়ে বল কেন এত ভয়?
কেন এত ভয় দিতে জাতি, কুল, মান?
তোমার পরাণ বল তোমার কি নয়?
খুলিয়ে পূরব দ্বার যবে দিনমণি,
ফুটিয়ে উঠেন এবে নির্ম্মল আকাশে,
বুকের বসন খুলে দেয় কমলিনী,
নাহি তার লাজ ভয় মধুকর হাসে।



শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশাবলী।

সনাতন ধর্ম্ম-সংসারে অধুনা যে মহাত্মার নাম জনসাধারণে এতদূর প্রখ্যাত, সেই স্বজাতিবৎসল, ধর্ম্মপ্রাণ পুণ্যাত্মা, শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মন্ কলিকাতা মহানগরীয় যোড়াসাঁকো পল্লির স্বর্গীয় প্রিন্স—দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই ঠাকুর-বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। প্রিন্সের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন,—ক্ষমতাশালী, বিচক্ষণ ব্যক্তি বাঙ্গালাদেশে, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে আর কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? এ বিষয়ে অনেকের মতভেদ হইয়া থাকে। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত হইতে "প্রিন্স" উপাধি পাইয়াছিলেন *।

---

* (১২৪৯ সাল) ইং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ ৯ই জানুয়ারী তারিখে প্রথম তিনি বিলাত যাত্রা করেন, তথায় রাজমন্ত্রীবর্গ অশেষ সম্মান প্রদর্শন করায়, মহারাণী ভারতেশ্বরী সমাদরে তাঁহার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তথায় অনেক মান্যগণ্য বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহাকে "প্রিন্স" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। প্রায় আট মাস কাল বিলাতে অতিবাহিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

(১২৫১ সাল) ইং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তিনি বিলাত যাত্রা করেন, এবং নিজব্যয়ে বিলাত হইতে ডাক্তারি শিক্ষা করিয়া আসিবার নিমিত্ত ভোলানাথ বসু ও সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীকে (গুডিব চক্রবর্ত্তী) একত্রে লইয়া যান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজ রাজ প্রদত্ত কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই। ইত্যগ্রে যে সময় প্রথম এদেশের ধনবান ভূস্বামী-মহলে "রাজা" উপাধি বিতরণের তুফান উঠে, বঙ্গের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সেই সময় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিবার আগ্রহ জানাইয়া, তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহেন। "জীবনের বৃথা গর্ব্ব তিনি ভালবাসেন না" ধন্যবাদের সহিত এই উত্তর দিয়া শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই উপাধি গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন।

শক ১৭৩৯ অব্দের ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়; প্রথমে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত এক বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন, তাহার পর হিন্দু-কালেজে ভর্ত্তি হন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সবিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। সেই ভক্তি-সূত্র হইতেই শৈশবাবধি ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ে পবিত্র সনাতন ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে।

হিন্দু-কালেজে অধ্যয়ন সময়ে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, একদা নির্ম্মল নীলাকাশের অপরূপ দৃশ্য দর্শনে, অনন্ত ঈশ্বর-প্রেমে আকৃষ্ট হন, কিন্তু ভাবানুরূপ ফল তখন প্রসূত হয় নাই; কারণ একে যৌবনকাল তাহাতে অতুলধনের অধিপতি, সুতরাং যৌবন-সুলভ-চাঞ্চল্যে মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া যাইত। তাঁহার যখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হয়;—শশ্মানে পিতামহীর মৃত-দেহ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার অন্তরে মায়াময় সংসারের নশ্বরত্ব পরিস্ফুটরূপে জাগরূক হইয়া উঠে; মানব-জীবন ক্ষণস্থায়ী, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য অসার, ইহাও তিনি সেই সময় বুঝিতে পারেন। এক পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিভাব বিকশিত হইতে থাকে। একদিন তিনি একটি ধর্ম্মপ্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছিলেন,—"এমন এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে এমন এক অব্যক্ত আনন্দের মধ্যে মগ্ন করিয়াছে যে, তেমন আনন্দ ইহজীবনে আর কখনও অনুভব করি নাই।"

শিবপুরের "বোটানীক্যাল গার্ডেনে" প্রায়ই গমন করিয়া, তৎকালে তিনি তথায় সমস্ত দিন ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ধর্ম্মতৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণ নিতান্তই তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠিল। "কিসে দেশের উন্নতি হয়, আত্মা উন্নত হয়, ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়", ইহাই তাঁহার ধ্যান ও

ধারণা। দৈবযোগে একদিন একখানি ধর্ম্মগ্রন্থের একটি ছিন্নপত্র বাতাসে উড়িয়া তাঁহার হস্তে পতিত হয়; তিনি দেখিলেন, ঈশোপনিষদের ছিন্ন পত্র। সেই পত্রে এই শ্লোকটি লেখা ছিল :—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাঞ্জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥"

অর্থাৎ "এই জগতের সমস্ত পদার্থই তাঁহার সত্তায় পূর্ণ। নিষ্কাম হইয়া তাঁহাকে উপভোগ কর, এবং অন্যের ধনের প্রতি লোভ করিও না।"

শাস্ত্রের এই শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহর্ষির প্রাণে সাময়িক চাঞ্চল্য বিদূরিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব শান্তিময়ভাবের উদয় হইল। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কোথায় পাইবেন, তাহার অন্বেষণার্থ পূর্ব্বে পূর্ব্বে তিনি অস্থির হইতেন, এই শ্লোক পাঠ করিয়া অবধি তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মতত্ত্বের অন্বেষণে দূরদেশে যাইতে হইবে না, স্বদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই নিগূঢ় ধর্ম্মভাবটি নিহিত। পূর্ব্বে তিনি ভাবিতেন, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল প্রতিমা-পূজায় পর্য্যাপ্ত, তখন তিনি দেখিলেন, কেবল তাহাই নহে, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যেই পরমার্থ ভাব-উদ্দীপক সারাৎসার একেশ্বরবাদ অতি সূক্ষ্মরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শক ১৭৬৫ অব্দের ৭ই পৌষ তারিখে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যের নিকট ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞা রচনা করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

শক ১৭৬১ অব্দের ২১ আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীমন্মহর্ষি হিন্দুশাস্ত্রান্তর্গত ব্রহ্ম-প্রতিপাদক মূলতত্ত্বের বহুল প্রচারার্থ কলিকাতা নগরে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপ্‌চাঁদ, নবদ্বীপাধিপতি শ্রীশচন্দ্র, ধর্ম্মাত্মা রাজা রামমোহন রায়, স্বদেশানুরাগী স্বাধীন সওদাগর রামগোপাল ঘোষ, এবং অপরাপর স্বধর্ম্মলিপ্সু মহোদয়গণ এই সভার সভ্য হইয়াছিলেন। বেদান্ত শাস্ত্র হইতে সাধারণ একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক নীতিবাক্যের সংগ্রহ করাই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; বলা বাহুল্য, বেদান্ত অথবা উপনিষদ্ তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি-ভূমি। যাঁহারা উহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সভ্যগণকে বৈদান্তিক বলিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রায় তিন শত সভ্য সমবেত হইয়াছিলেন।

শক ১৭৬২ অব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনতায় একটি বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়; ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত উপনিষদ শিক্ষা দেওয়া সেই বিদ্যালয়ের কার্য্য ছিল। কিছুদিন পরে সেই বিদ্যালয়টি কলিকাতা হইতে হুগলীর নিকটবর্ত্তী বাঁশবেড়িয়াতে উঠিয়া যায়; দুঃখের বিষয়, বিদ্যালয়টি স্থায়ী হয় নাই, দুই বৎসর পরেই বন্ধ হইয়া যায়।

শক ১৭৫০ অব্দে অর্থাৎ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের যত্নে চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর উদ্‌যোগে কমল বসুর বাটীতে প্রথমতঃ কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। শক ১৭৫১ অব্দে সেই সমাজটি যোড়াসাঁকোর নূতন বাটীতে উঠিয়া আইসে। যোড়াসাঁকোর বর্ত্তমান আদি ব্রহ্মসমাজের বয়ঃক্রম এক্ষণে ৭২ বৎসর। শক ১৭৬২ অব্দে শ্রীমন্মহর্ষি এই সমাজের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। সে সময় উপাসনার কোনরূপ পদ্ধতি ছিল না, কেবল শাস্ত্র হইতে শ্লোক পাঠ, শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং ধর্ম্ম-সঙ্গীতের সহিত অন্য প্রকার নীতি-সঙ্গীত হইত, সমাজের নাম হইয়াছিল,—"ব্রহ্মসভা", উপাসকদিগের আখ্যা ছিল, "ব্রহ্মজ্ঞানী", আচার্য্য ছিলেন,—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ব্রাহ্মনামে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ছিল না। শ্রীমন্মহর্ষি এই সময় ইহার সংস্কার করেন; এই সময়েই তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হয়! ব্রাহ্ম সমাজের আয়ও নিতান্ত অল্প ছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতি মাসে ৮০৲ দান করিতেন, তাহাতেই যথাসম্ভব সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। শ্রীমন্মহর্ষি স্বরচিত একখানি পুস্তকে আপন পিতৃদেবকে ব্রাহ্ম সমাজের "গুপ্তবন্ধু" ও রাজা রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

শক ১৭৬৪ অব্দে কলিকাতায় একটি "বেদ বিদ্যালয়" সংস্থাপিত হয়। বেদজ্ঞ পণ্ডিত বঙ্গদেশে দুর্ল্লভ ছিল, এজন্য শ্রীমন্মহর্ষির উপদেশে তত্ত্ববোধিনী সভা, শক ১৭৬৬ অব্দে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে বেদ-অধ্যয়নার্থ ৺কাশীধামে প্রেরণ করেন। পর বৎসর তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, রমানাথ ভট্টাচার্য্য, এবং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ঐ অভিপ্রায়ে ৺বারাণসীতে প্রেরিত হন। স্থির হয়, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ অথর্ব্ববেদ ও বেদান্ত-দর্শন, তারকনাথ ভট্টাচার্য্য ঋগ্বেদ এবং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবেন।

শক ১৭৬৫ অব্দে "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়

সম্পাদক হন বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। সেই বৎসর পৌষ মাসের সপ্তম দিবসে শ্রীমন্মহর্ষি এবং তত্ত্ববোধিনী সভার ১৮ জন সভ্য প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া আচার্য্যপ্রবর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সময় হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি। ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ, এই সকল শব্দ শ্রীমন্মহর্ষি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শক ১৭৫১ অব্দে ১১ই মাঘ তারিখে বর্ত্তমান সমাজগৃহে ব্রাহ্মসভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল ; তদবধি প্রতি বৎসর সেই দিবসেই ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব সমারোহে নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। শক ১৭৯১ অব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুবর্ত্তী উপাসকেরা তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করায়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হয়। অবশেষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন আদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

শ্রীমন্মহর্ষি শক ১৭৬৭ অব্দে "হিন্দুহিতার্থী" নামক একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন ; ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে বাধা দিবার জন্যই ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহর্ষি ঐ বিদ্যালয়ের জন্য হিন্দুসমাজ হইতে ৩২ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন। বাবু আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু নামে প্রসিদ্ধ) দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহর্ষি স্বয়ং এবং বাবু হরিমোহন সেন ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে খৃষ্টান মিশনারী মহাশয়েরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভয়ানক আক্রমণ করেন। পক্ষ-সমর্থনার্থ "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। শ্রীমন্মহর্ষি সেই সকল প্রবন্ধ একত্র করিয়া Vedantic Doctrine Vindicated নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। বেদান্তকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিবার হেতু এই যে, বেদান্তের সমস্ত বাক্যই সত্য এবং যুক্তিযুক্ত।

শক ১৭৬৮ অব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয় *। শ্রীমন্মহর্ষি

* ১২৫৩ সালে ৫২ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ইংলণ্ডে বেলফাষ্ট নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। কেন্সাল গ্রীণ নামক স্থানে, স্বর্গীয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমাধি হইয়াছে। সমাধিস্তম্ভে রজতফলকে লেখা আছে "১৮..."

ব্রাহ্মমতে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে পরিতুষ্টরূপে অর্থদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন প্রকার পৌত্তলিকক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় নাই, কিছুদিন পরে মফস্বলের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। সুখসাগর, বাঁশবেড়ে, মণিয়াণপুর এবং মেদিনীপুরেই প্রথম সূত্রপাত। বাবু শিবচন্দ্র দেব মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি তখন মেদিনীপুরে ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন, তিনি বদলী হইলে সেই সমাজের অবনতি হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে আমাদের সত্য-ধর্ম্মপরায়ণ উদারচেতা ঋজুস্বভাব স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিলে, পুনরায় উন্নতি হইতে থাকে। পূর্ব্বে বঙ্গের সমাজ-সংস্কারক ব্রজসুন্দর মিত্র ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। শক ১৭৭০ অব্দে বর্দ্ধমানের মহারাজ দ্বারা "বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ" সংস্থাপিত হয়,—প্রায় তৎসম-সময়েই কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের পত্তন, হিন্দু সমাজপতি নবদ্বীপাধিপতি শ্রীশচন্দ্রের প্রাসাদে তাহার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু পৌত্তলিক ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রণায় মহারাজ আপন প্রাসাদ হইতে ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দেন; ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় তথাকার অন্যস্থানে নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, সেই সমাজের প্রথম অধিবেশনে শ্রীমন্মহর্ষি, বাবু জয়নারায়ণ বসু, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সদরওয়ালা ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন মুন্সী উপস্থিত ছিলেন। পৌত্তলিকেরা অধিবেশন স্থলে ব্রাহ্মগণের গায়ে থু-থু দিয়াছিল, বাবু রাজনারায়ণ বসুর অঙ্গেই অধিক থু-থু পড়িয়াছিল, তিনি তাহাতে যার-পর-নাই গৌরব জ্ঞান করিয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

পদ্য-সংগ্রহঃ

(কবিভট্ট-কৃতঃ)

(১)

নত্বা তাং পরমেশ্বরীং শিবকরীং শ্রীভারতীং ভাস্বতীং
গঙ্গাতীরনিবাসিনা সুকঠিনা লোকোপকারার্থিনা।
নানাপণ্ডিতবক্ত্রনির্গতবতাং নির্ম্মীয়তে কেনচিৎ
পদ্যানামিহ সংগ্রহোঽমৃতকথাপ্রস্তারবিস্তারিণাম॥

স্বয়ং ঈশ্বরী যিনি, যিনি শুভকরী,
যাঁহার সুচারু কান্তি মনোমুগ্ধকরী,
সেই সরস্বতী-পদে নমি অনুক্ষণ
গঙ্গাতীরবাসী কোন কবি এক জন
পর-উপকার হেতু হইয়া তন্ময়
করিলেন এই সব কবিতা সঞ্চয় ;—
যাহা নানা পণ্ডিতের মুখ-বিনির্গত,
যাহা স্বাদু সুধারসে সিক্ত অবিরত !

(২)

কাব্যে ভব্যতমেঽপি বিজ্ঞনিবহৈ রাস্বাদ্যমানে মুহু-
র্দোষান্বেষণমেব মৎসরজুষাং নৈসর্গিকো দুর্গ্রহঃ।
কাসারেঽপি বিকাসিপঙ্কজচয়ে খেলন্মরালে পুনঃ
ক্রৌঞ্চশ্চঞ্চুপুটেন কুঞ্চিতবপুঃ শম্বুকমন্বেষতে॥

যে কাব্যের সুধারস পিয়া অবিরল
বিহ্বল হইয়া গেছে পণ্ডিতের দল,
সে কাব্য দাম্ভিক জন হেরিলে নয়নে,
অমনি ছুটিবে তার দোষ-অন্বেষণে।
খেলিতেছে রাজহংস যেই সরোবরে,
ফুটেছে পদ্মিনীগণ যাহার উপরে,
তার তীরে ধীরে ধীরে বক ঠোঁট দিয়া
শামুক খুঁজিতে থাকে ঘাড় বাঁকাইয়া।

(৩)

অতিরমণীয়ে কাব্যে পিশুনোঽন্বেষয়তি দূষণান্যেব।
অতিরমণীয়ে বপুষি ব্রণমেব হি মক্ষিকানিকরঃ ॥

রম্য দেহ দেখিলেই মক্ষিকা যেমন
শুধু তার ক্ষত স্থান করে অন্বেষণ,
সেরূপ সুরম্য কাব্য হেরিলে নয়নে
ছুটে যায় খল তার দোষ-অন্বেষণে।

(৪)

কীর্ত্তিস্বর্গতরঙ্গিনীভিরভিতো বৈকুণ্ঠমাপ্লাবিতং
ক্ষৌণীনাথ তব প্রতাপতপনৈঃ সন্তাপিতঃ ক্ষীরধিঃ।
ইত্যেবং দয়িতাযুগেন হরিণা ত্বং যাচিতঃ স্বাশ্রয়ং
হৃৎপদ্মং হরয়ে শ্রিয়ে স্বভবনং কণ্ঠং গিরে দত্তবান্ ॥

তব কীর্ত্তি-মন্দাকিনী, ওহে মহারাজ!
বৈকুণ্ঠ প্লাবিত করি করিছে বিরাজ।
পরম প্রচণ্ড তব তাপ-দিবাকর
সন্তাপিত রাখিয়াছে ক্ষীরোদ সাগর।
নিরাশ্রয় হরি তাই দুই ভার্য্যা সনে
আশ্রয় মাগিল আসি তোমার ভবনে।
হরিকে করেছ দান নিজ হৃদাসন,
লক্ষ্মীকেও দিলে তুমি আপন ভবন।
তার পর রহিলেন যিনি সরস্বতী—
তাঁহাকেও নিজকণ্ঠে দিয়াছ বসতি!

(৫)

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং
কৃষের্ভয়ং কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ।
সদা ভয়ং চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাং
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্ ॥

সূর্য্যের কি সার বস্তু ? প্রচণ্ড কিরণ।
কবির কি সার বস্তু ? অমৃত-বচন।
যুদ্ধের কি সার বস্তু ? রথী সমুদয়।
কারে ভয় করে কৃষি ? শস্তবিঘ্ন ছয়।
কোন বস্তু খায় ভৃঙ্গ ? রস স্বাদযুত।
কোন্ জন ভীত সদা ? যে জন আশ্রিত।
কার মনে নাহি রয় কিছুমাত্র ত্রাস ?
গঙ্গাতীরে বাস যার রহে বারমাস !

(৬)

বাসঃ কাঞ্চনপিঞ্জরে নৃপকরাম্ভোজৈ স্তনূমার্জ্জনং
ভক্ষ্যং স্বাদুরসালদাড়িমফলং পেয়ং সুধাভং পয়ঃ।
পাঠঃ সংসদি রামনাম সততং ধীরস্থ কীরস্থ মে
হাহা হন্ত তথাপি জম্মবিটপিক্রোড়ং মনো ধাবতি ॥

সর্ব্বদাই করি বাস সোণার পিঞ্জরে,
নিজহস্ত দিয়া রাজা দেহ তাজা করে,
নিত্য খাই রসে ভরা দাড়িমের ফল,
সুধাসম জলটুকু খাই অবিরল,
রাজসভা মধ্যে আমি থাকি অবিরাম,
নিরন্তর বলি মুখে শুধু রামনাম,
হায়রে এসব সুখ তথাপি ছাড়িয়া
গাছের কোটরে রয় প্রাণটী পড়িয়া !

(৭)

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতাগ্রে শিলায়াম্।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি-
র্ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥

যদ্যপি পশ্চিম দিকে হয় সূর্য্যোদয়,
পর্ব্বত-শিখরে যদি পদ্ম ফুটে রয়,
সুমেরু পর্ব্বত যদি চলে অবিরল,
প্রবল অনল যদি হয় সুশীতল,
তথাপি যথার্থ সাধু হন যেই জন,
অন্যথা না হয় কভু তাঁহার বচন!

(৮)

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

প্রদীপ নিবিলে কিবা ফল তৈলদানে?
চোর পলাইলে কিবা ফল সাবধানে?
বয়স কাটিয়া গেলে ভার্য্যায় কি ফল?
বাঁধ বেঁধে কিবা ফল বাহিরিলে জল?

(৯)

বরমসিধারা তরুতলবাসঃ
বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে পতনং
ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধবশরণম্॥

বরং কণ্ঠেও লগ্ন সুশাণিত অসি,
বরং বৃক্ষের তলে বাস দিবানিশি,
বরং পরের দ্বারে ভিক্ষা বারমাস,
বরং করাও ভাল নিত্য উপবাস,
বরং বিষম ঘোর নরকে পড়িয়া
সুখ আছে নানাবিধ কষ্টেও পড়িয়া,
হায়রে তথাপি কিন্তু যেন কোন জন
ধনমত্ত বান্ধবের না লয় শরণ!

(১০)

কুগ্রামবাসঃ কুজনস্য সেবা
কুভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা
বিনাগ্নিনা সংদহতে শরীরম্ ॥

কুগ্রামে বসতি করা ভাগ্যে যার রয়,
কুজনের সেবা করি যার দেহ-ক্ষয়,
ক্রোধভরা ভার্য্যা ল'য়ে ঘরকন্না যার,
যার ভাগ্যে প্রতিদিন কুখাদ্য আহার,
বিধবা কন্যারে ল'য়ে সদা যার ভয়,
মূর্খপুত্র ল'য়ে যার সুখ নাহি রয়,
বিনা আগুনেই হায় দেহখানি তার
দিবানিশি পুড়ে পুড়ে হয় ছারখার!

(১১)

বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং
বরং ক্লৈব্যং পুংসাং ন চ পরকলত্রাভিগমনম্।
বরং ভৈক্ষ্যাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদনসুখং
বরং প্রাণত্যাগো ন চ পিশুনবাদেষভিরতিঃ ॥

বরং সর্ব্বদা তুমি মৌনভাবে রবে,
তবু কিছুতেই নাহি মিথ্যা কথা কবে।
বরং পুরুষ হ'য়ে ক্লীব সম রও,
তবু পরনারী সনে আসক্ত না হও।
বরং ভিক্ষায় তুমি যাপিবে জীবন,
তবু পরধনে সুখী না হবে কখন।
বরং স্বচ্ছন্দে তুমি ত্যজিবে পরাণ,
তথাপি খলের বাক্যে নাহি দিবে কাণ।

(১২)

নিঃস্বোঽপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাংকাঙ্ক্ষতি।
চক্রেশঃ সুররাজতাং সুরপতি র্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ ॥

শত মুদ্রা ইচ্ছা করে যেজন নির্ধন,
পেলেও শতেক মুদ্রা সহস্রে মনন।
সহস্র পেলেও হ'তে চায় লক্ষপতি,
লক্ষপতি চায় পুনঃ হইতে ভূপতি।
ভূপতিও ইচ্ছা করে হই চক্রেশ্বর,
চক্রেশ্বর ইচ্ছা করে হই পুরন্দর।
পুরন্দর ব্রহ্মপদ, ব্রহ্মা বিষ্ণুপদ,
বিষ্ণুও বাসনা করে শিবের সম্পদ্।
যত চায় তত পায়, তবু ইচ্ছা করে,
হায় রে দুরাশা! তোর পেট নাহি ভরে!

(১৩)

খ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গো বিধুরপি মলিনো মাধবো গোপজাতো
বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠঃ খলহৃদয়যমঃ সর্ব্বভক্ষ্যো হুতাশঃ।
ব্যাসো মৎস্যোদরীয়ঃ সলবণজলধিঃ পাণ্ডবা জারজাতা
রুদ্রো ভস্মাস্থিধারী ত্রিজগতি বসতঃ কস্য দোষো ন জাতঃ ॥

ইন্দ্রের ভগাঙ্গ নাম জানে সর্ব্ব জন,
শ্রীকৃষ্ণ গোপের পুত্র জানে ত্রিভুবন,
বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র, যমরাজ খল,
সর্ব্বভুক্ নাম দেখ পেয়েছে অনল,
ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধা নারীর তনয়,
সমুদ্রের লোণাজল মুখে নাহি সয়,
জারজাত দেখ পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন,
চিতা-ভস্ম অস্থিধারী দেব ত্রিলোচন।

ত্রিজগতে হেন জন দেখিতে না পাই,
কোন কিছু দোষ যার কখনই নাই!

(১৪)

তুরগশতসহস্রং গোগজানাঞ্চ লক্ষং
কনকরজতপাত্রং মেদিনীং সাগরান্তাম্।
বিমলকুলবধূনাং কোটিকন্যাশ্চ দদ্যাৎ
নহি নহি সমমেতৈরন্নদানং প্রধানম্॥

কিবা লক্ষ লক্ষ যত সুন্দর তুরঙ্গ,
কিবা আর লক্ষ লক্ষ ধেনু বা মাতঙ্গ,
কিবা স্বর্ণপাত্র কিবা রৌপ্যপাত্র আর,
কিবা এই সসাগরা ধরা সুবিস্তার,
যে বংশ নির্ম্মল বলি নিত্য খ্যাত রয়,
তাহে জাত কোটি কোটি কন্যা সমুদয়,
এই সব দানে যত পুণ্য এ ভুবনে,
তা হ'তে অধিক পুণ্য এক অন্ন-দানে!

(১৫)

কালিদাসকবিতা নবং বয়ো
মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
এনমাংসমবলা চ কোমলা
সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি॥

কালিদাস-সুকবিতা, নবীন যৌবন,
মহিষের দধি, দুগ্ধ শর্করা-মিলন,
মৃগমাংস, সুকোমল-দেহা নারী আর,
জন্মে জন্মে ঘটে যেন অদৃষ্টে আমার!

(১৬)

কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন কোনও একটী নীচবংশীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন ইহা জানিতে পারিয়া একখানি পত্রে তাঁহাকে এই শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন:—

শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেৎ নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ॥

এই মোর নিবেদন, শুন ওহে জল!
স্বভাবতঃ তুমি স্বচ্ছ, তুমি সুশীতল।
তুমি যে কতই শুচি, কি কহিব আর,
অশুচিও শুচি হয় পরশে তোমার।
তোমার গুণের কথা বলা নাহি যায়,
প্রাণ ধরে প্রাণিগণ তোমারি কৃপায়।
তুমি যদি নীচ পথে করহ গমন,
কে করিতে পারে বল তোমায় বারণ!

(১৭)

পুত্র লক্ষ্মণ সেনের উক্ত পত্র পাইয়া পিতা বল্লাল সেন তাঁহাকে পত্রে এই শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন :—

তাপো নাপগত স্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলি স্তনো
র্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা।
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ॥

কিছুমাত্র তাপ মোর না হইল দূর,
কিছুমাত্র না কমিল পিপাসা প্রচুর,
শরীর হইতে মোর নাহি গেল ধূলি,
না সুখে খাইনু মূল, না করিনু কেলি,
দূর হইতেই কর করি প্রসারণ

(১৮)

বল্লাল সেনের পত্র পাইয়া লক্ষ্মণ সেন লিখিলেন :—

পরীবাদ স্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্ধাম্নাং হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটিতহতাশেষতমসো
রবে স্তাদৃক্ তেজো ন হি ভবতি কন্যাং গতবতঃ॥

যদিও বা হয় সত্য কিংবা মিথ্যা হয়,
সাধুর দুর্নাম কভু ঘুচিবার নয়।
সাধুর দুর্নাম যদি রটে একবার,
নিশ্চয় হইবে নষ্ট মহিমা তাঁহার।
যে সূর্য্য করেন অন্ধকার নিবারণ,
সেই সূর্য্য যদি হায় কন্যাগত হন্,
তার পর তুলোত্তীর্ণ হইলেও, তাঁর
পূর্ব্বের মতন তেজ নাহি রহে আর!

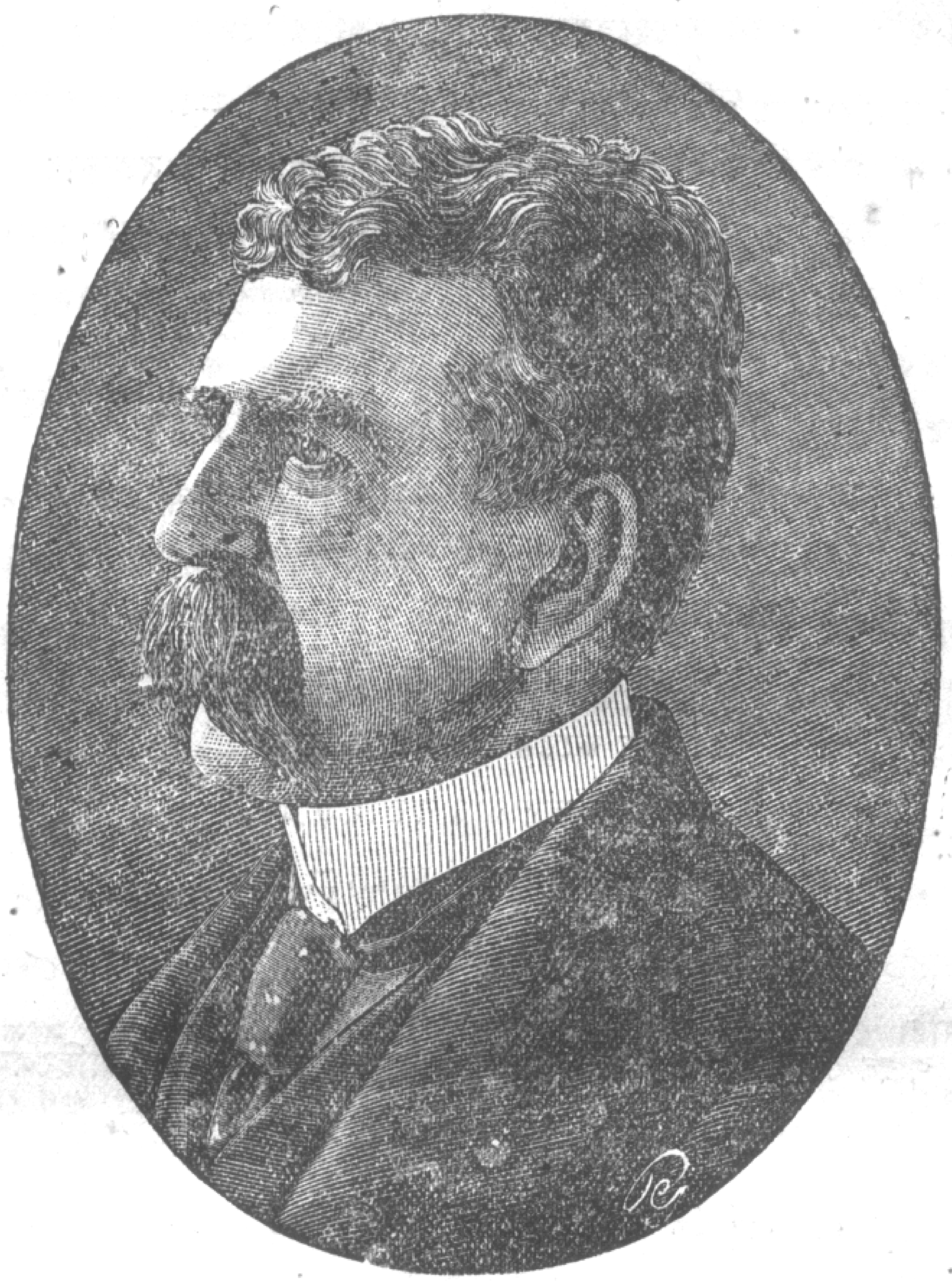
(১৯)

লক্ষ্মণ সেনের পত্র পাইয়া বল্লাল সেন এই শেষ উত্তর দিয়াছিলেন :—

সুধাংশো র্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতু র্দোষোঽয়ং ন চ গুণনিধে স্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণি-
র্ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিংবা ন বসতি॥

যা কিছু কলঙ্ক-রেখা চন্দ্রে দেখা যায়,
বিধাতারি দোষ তাহে, চন্দ্রের কি তায়?
চন্দ্র কি সুধাংশু নন্? নন্ গুণনিধি?
অত্রিপুত্র নামে খ্যাত নন্ নিরবধি?
না রহেন তিনি হরশিরে অনিবার?
না করেন নষ্ট তিনি ঘোর অন্ধকার?
জগতের ঊর্দ্ধে তিনি না করেন বাস?
বৃথা অপবাদে কিবা মহতের ত্রাস?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ।



ধর্ম্মের পরিণাম।

(চা-করের ভবিষ্যৎ।)

বড় লাট কেনিঙ বড় ভাল শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তথাপি তাঁহাকে নীলকর সাহেবদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য, অন্যায় কাজ করিতে হইয়াছিল। যখন বারাশতের মাজিষ্টর ইডেন সাহেব কলারোয়া অঞ্চলের নিরীহ দুর্ব্বল কৃষকদিগকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, যখন কলারোয়ার পুলিশ নীলকরের অত্যাচারে সাহায্য করিতে নিষিদ্ধ হন, তখন প্রথমে ইডেন সাহেবকে দিগ্বিজয়ী দেশপতি নীলকর সাহেবদিগের জন্য বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। শেষে কিন্তু অদ্বিতীয় দয়াময় সার জন পীটার গ্রাণ্ট বঙ্গের লাটপদকে

উজ্জ্বল করিয়া, ইডেন সাহেবের হস্ত সবল করিয়া দেন। বঙ্গের লাটকে ন্যায়ধর্ম্মের অবতার হইতে দেখিয়া, যত নীল-অবতার প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। শেষে কিন্তু তাঁহারাও বীরের মত আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এখন এদেশে যেরূপ ইংরেজ-সমাজের পনর আনা উনিশ গণ্ডাই চা-করবন্ধু, তখনও পনর আনা উনিশ গণ্ডা সেইরূপ নীলকরবন্ধু ছিলেন। এখন বিলাতের চা-সমিতি অতুল প্রতাপ পরাক্রমে বিরাজ করিতেছেন, তখনও বিলাতের নীল-সমিতি সেরূপই বিরাজ করিতেন।

এরূপ অবস্থায় লর্ড কেনিঙকে নীলকর-তোষণে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া, বঙ্গের বহুদর্শীরা বিস্মিত হন নাই! করুণাময় কেনিঙ বুঝিয়াছিলেন, "প্রবল নীলকরদলকে শান্ত রাখিয়া ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে কৃষকদিগের কষ্ট দূর করিতে হইবে। নীলকরদলকে ক্রোধে আক্রোশে উত্তেজিত করিলে, আমাকে সিপাহি-বিদ্রোহের ন্যায় সাহেব-বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইবে। যে দলের ভারতে বিলাতে অতুল প্রতাপ পরাক্রম, সেই দলকে শত্রু করিলে, আমার পক্ষে ভারতে রাজত্ব করাই দুঃসাধ্য হইবে।"

ভারতহিতৈষী লর্ড কেনিঙ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই, রাজনীতি কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন, মিনিট মন্তব্যে রেজলিউশন সার্কুলারে নীলকরদিগকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের কার্য্যে গুণ দেখিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; নীলের জন্য বঙ্গের যে উপকার হইয়াছে, তাহা জ্বলন্ত বর্ণে আঁকিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নীলকরদিগকেও ন্যায়ধর্ম্ম দয়া সহানুভূতির পথে বিচরণ করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে "ডেমি-অফিশাল" বা "গুপ্ত সরকারী" পত্রে বঙ্গের লাট গ্রাণ্টকেও সমজাইয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহাকেও নীলকর-তোষণে প্রবৃত্ত করিবার মত সলা পরামর্শ দিতে লাগিলেন। সন্তানদিগের মধ্যে কলহ হইলে, বুদ্ধিমান পিতা যেরূপ দুই পক্ষকেই নরম গরম কথায় শিক্ষা দিয়া থাকেন, লর্ড কেনিঙও নীলকর ও কৃষকবন্ধু রাজপুরুষ সন্তান-দিগকে সেইরূপেই শিক্ষা দিয়া শান্ত করিতে লাগিলেন। তৎকালীন অভিজ্ঞদিগের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা জানেন, লর্ড কেনিঙের নীলপক্ষপাতী আদেশে বঙ্গের লাট গ্রাণ্ট সাহেবকে কিরূপ কুণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল; কৃষকবন্ধু ইডেন এবং সীটনকার সাহেবকে কিরূপ ক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছিল। যাঁহারা ভিতরের খপর রাখিতেন না, সেরূপ নিরপেক্ষ ও

দীনবন্ধু লোকে কেনিঙের নীলপক্ষপাত দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। যাঁহারা রহস্য জানিতেন, তাঁহারা করুণাময় কেনিঙকে দুইদিক রাখিতে দেখিয়া বিস্মিত হন নাই, কিন্তু তাঁহারাই বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। নীলকরদিগের পরিণাম যে, শোচনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" দূরদর্শীদিগের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, বঙ্গের নীল ও নীলকর উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, কেনিঙ যদি পূর্ণ সাহসে ভর করিয়া কেবল ন্যায়-ধর্ম্মেই নির্ভর করিয়া চলিতেন; রাজনীতিকে দূরে ফেলিয়া কেবল ধর্ম্মনীতির আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন; যদি সার জন পীটার গ্রাণ্ট তাঁহার কাছে পৃষ্ঠপোষণ পাইয়া, ইডেন কার প্রভৃতির মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সিবিলিয়ানদিগকে নীলকর-দমনে ও কৃষকপালনে অকুণ্ঠিত অধিকার দিতে পাইতেন, তাহা হইলে বঙ্গবিহারী নীলকরদিগের স্পর্দ্ধা দুঃসাহস প্রভৃতি কমিয়া যাইত; তাহা হইলে বঙ্গের কৃষককুলকে অত্যাচারে আকুল হইতে হইত না; তাহা হইলে, বঙ্গের যত দুর্ব্বল কৃষক অসহ্য যন্ত্রণায় হতাশ হইয়া সেরূপ প্রবল হইয়া উঠিত না; তাহা হইলে, বঙ্গে কৃষকবিদ্রোহ উপস্থিত হইত না; আর তাহা হইলে, বঙ্গের নীল ও নীলকর তত শীঘ্র উৎসন্ন হইয়া যাইত না।

বরাবর বলিয়াছি, আবার বলিতেছি; বঙ্গের সেই নীল অভিনয় অনেকটা আসামের চা-অভিনয়ে পরিণত হইয়া, আবার শোচনীয় পরিণামের সূত্রপাত করিয়াছে। নীল উপলক্ষে লর্ড কেনিঙ যে নীতির অবলম্বন করিয়াছিলেন, চা-সূত্রে লর্ড কর্জ্জন ঠিক সেই নীতিরই অবলম্বন করিয়াছেন। তখন কেনিঙ বঙ্গের গ্রাণ্টের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এখন লর্ড কর্জ্জনও আসামের কটনের সহিত ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করিলেন। কেনিঙ নিজের মন্তব্যে নীলকর-শাস্তির জন্য যে যে কথা কহিয়াছিলেন, কর্জ্জনও চা-কর-শাস্তির জন্য সেই সেই কথাই কহিয়াছেন। তখনকার অভিজ্ঞেরা, দুই রেজলিউশনে মিলাইয়া দেখিলেই, বুঝিতে পারিবেন, "ভাবে অভিপ্রায়ে ত কথাই নাই, ভাষা ও রচনায়ও অনেক স্থলে ঠিক ঐক্য হইয়া গিয়াছে।" বড় লাট-আপিশের পুরাতন দপ্তরে কেনিঙের মন্তব্য এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বড় লাট কর্জ্জন মিলাইয়া দেখিলেই, আমাদের কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

অবস্থায়ও সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। বঙ্গের কর্ত্তা গ্রাণ্ট সাহেবকে নীলকরদলের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। নীলকর জন ম্যাক্

আর্থরই, সমগ্র নীলকরসম্প্রদায়ের মুখপত্র হইয়া, বঙ্গেশ্বরের নামে লাইবেলের নালিশ করেন; সুপ্রীম কোর্টে এক টাকা জরিমানা দিয়া গ্রাণ্ট সাহেবকে কিছুদিনের জন্য রাজ্য ছাড়িয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে হয়। আসামের কোন কোন চা-করও আসামের কর্ত্তা কটন সাহেবকে লাইবেলে ফেলিবার মৎলব করিয়াছিলেন। কিন্তু আইনের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, এখনকার কোন শাসনকর্ত্তার নামে এরূপ নালিশ হয় না, কিন্তু কটন সাহেবকে ক্ষুণ্নহৃদয়ে রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে; কেনিঙের কাছে গ্রাণ্ট যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছিলেন, কর্জ্জনের কাছে কটনও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার পাইলেন। কেনিঙ নীলকরদিগের কৃষকপীড়নশক্তি বাড়াইবার জন্য একটা আইন প্রস্তুত করিয়াছিলেন; নীলকরদিগকে কৃষকের দণ্ড-শাসনে অধিকার দিয়াছিলেন; কর্জ্জন চা-করদিগের জন্য সেরূপ আইন করেন নাই বটে, কিন্তু কটন পুরাতন আইনের যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, কর্জ্জন সেরূপ পরিবর্ত্তনে অনুচিত বিলম্ব ঘটাইয়া, চাকরদিগের অন্যায় ব্যবহার অকুণ্ঠিত করিয়াই রাখিয়া দিয়াছেন। কেনিঙের জন্য নীলকর সাহেবেরা যেরূপ প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন, যেরূপ স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছিলেন, কর্জ্জনের জন্যও চা-কর সাহেবেরা সেইরূপ প্রশ্রয় পাইলেন, সেইরূপ স্পর্দ্ধা বাড়াইলেন। অবস্থার এরূপ এবং অন্যরূপ ঐক্য সাদৃশ্য অনেক দেখিতে পাইবে। রামায়ণ ও মহাভারতে যেরূপ সাদৃশ্য, নীলায়নে ও চাভারতে প্রায়ই সেইরূপ সাদৃশ্য। ত্রেতার অবতারদিগকেই ত আবার দ্বাপরে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল!

চা-কর-কটন-কর্জ্জন-ঘটিত ব্যাপার উপলক্ষে বিলাতেও আলোচনা চলিয়াছে। বিলাতের পনর আনা—বরং অধিক—সংবাদপত্র পূর্ব্বে যেরূপ নীলকরপক্ষপাতী ছিল, এখন সেইরূপ চা-কর-পক্ষপাতী। কিন্তু তখন যাহা ছিল না, এখন তাহা হইয়াছে। এখন টুরুথের মত সংবাদপত্র এবং লাবুশেরের মত সম্পাদক দুর্ব্বল চা-কুলীর প্রাণে দৃষ্টি রাখিয়া প্রবল চা-করের প্রবলতায়ও দৃষ্টি রাখিতেছেন; কটনের দুর্ব্বল-পালন ও প্রবল-দমন ব্যর্থ হইল দেখিয়া ঘোর প্রতিপাদ করিতেছেন। কর্জ্জন, কটনের কার্য্যে ধর্ম্মভীরুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়াও, বহু চা-করের কার্য্যে ভয়ঙ্কর দোষ হৃদয়ঙ্গম করিয়াও, চা-করদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য, ধর্ম্মভীরু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সহকারী কটনের মনে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না; ইহাতে টুরুথের

লাবুশের একান্ত ব্যথিত এবং বিচলিত হইয়াছেন। ইঁহার ব্যথা বা বৈচলিত্যে আশু ফল হইবে না বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। কিন্তু যদি ফল না হয়, যদি সকল চা-করই ঘোর স্বার্থ-তামসে ও স্পর্দ্ধান্ধকারে অন্ধ হইয়া ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে, ভবিষ্যৎ তাঁহাদেরই অধিক শোচনীয় হইবে; স্বার্থপরতা ও ঐহিকচিন্তা চরমে উঠিলে হয় ত চাকেও নীলের আসনে বসিতে হইবে। দেবতারা বিরূপ হইলে, আত্মরক্ষা অসাধ্য হইয়া উঠে। অশান্তি উদ্বেগ তখন চা-কর হৃদয়েই একাধিপত্য করিবে। ভারতের দীনহীন মজুর সংগ্রহ। পূর্ব্বে আমাদিগকে নীলকর-দিগের জন্যই মনঃকষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পরে যদি চা-করদিগের জন্যও মনঃকষ্ট পাইতে হয়, তাহা হইলে আমরা একান্ত ব্যথিত হইব। আমরা দেখিয়াছি, মহাত্মা কটনের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পূতচিত্তে শান্তির অভাব নাই। কটনের মনে শান্তির অভাব কোনকালে হইবে না। তিনি জানেন, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" ধর্ম্ম শিমলার গুহাতেই নিহিত আছেন।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

সুন্দরী।

সহযোগী "মাদ্রাজ টাইমস্" সম্প্রতি হিন্দুজাতীয়া এক সতী রমণীর বিচিত্র সতীত্ব-কাহিনী প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সতী পতি-বিয়োগ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, আত্মহত্যা দ্বারা মৃত পতির অনুগমন করেন। ঘটনাটি বিশেষ বৈচিত্র্য পূর্ণ এবং হিন্দু রমণীর পাতিব্রত্য ও পতিনিষ্ঠার অতুলনীয় দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া নিম্নে ইহার আনুপূর্ব্বিক সত্য ঘটনা মাদ্রাজ টাইমস্ হইতে ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশিত হইল।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণভাগে কাবেরী তীরে কোন গ্রামে ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। পরিবারের মধ্যে তিন সহোদর, দুই ভগ্নী ও তাঁহাদের বিধবা জননী। ক্রমে তিন সহোদরের বিবাহ হইলে, নববধূরা আসিয়া পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। সহোদরত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠটী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ; শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ ও

স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তথাকার চরম পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে পূর্ত্ত-বিভাগে প্রবেশ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিন্তু অগ্রজ দুইজনের অনুসৃত পথ ছাড়িয়া কৃষিকার্য্যে মনঃসংযোগ করেন।

মধ্যম সহোদরের নাম শ্রীমান সুন্দরম আয়ার। যুবদ্দশায় "সুন্দরী" নাম্নী এক পরমাসুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সুন্দরী নামেও সুন্দরী,—গুণেও সুন্দরী, দেখিতেও পরমাসুন্দরী। আধুনিক মান্দ্রাজী রমণীগণের ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিতা না হইলেও একবারে নিরক্ষরা ছিলেন না, মাতৃভাষায় লিখিতে পড়িতে পারিতেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে মান্দ্রাজ অঞ্চলের হিন্দুমহিলা সমাজে এখনকার মত স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয় নাই; সুতরাং সুন্দরী যে সামান্য লেখাপড়া জানিতেন, তাহাতেই চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য-রশ্মি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই সুন্দরীকে বিদুষী বলিয়া সুখ্যাতি করিত ও যথেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করিত। ইহার উপর আবার সুন্দরীর অবিচলিত পতিভক্তি, শ্বশ্রূদেবী এবং ভাসুর, দেবর ননন্দাদ্বয়, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদিগের উপর অদ্ভুত স্নেহ ও ভক্তিনিবন্ধন তিনি উক্ত গ্রামবাসীমাত্রেরই নিকট আদর্শস্থানীয়া রমণীর ন্যায় দেবীপূজা পাইতেন—সকলেই তাঁহার গুণগ্রামের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। সুন্দরী একান্তমনে পতিসেবা, শাশুড়ীর সেবা, ও অপর সাধারণের চিত্তরঞ্জনের জন্য যত্নবতী ছিলেন। এইরূপে সুন্দরম ও সুন্দরী পরমানন্দে আদর্শ দাম্পত্য জীবন পরমসুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ সুন্দরম আয়ার সরকারী কার্য্যে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে অবস্থার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছিলেন,—সংসারের কোন অভাব কষ্টই তাঁহার ছিল না—পরম সুখে দিন কাটিত। অভাব বা কষ্টের মধ্যে সুন্দরীর পুত্রকন্যাদি কিছুই হয় নাই; তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে সুন্দরী ও সুন্দর উভয়ের মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাদের দাম্পত্য প্রণয়ের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

এইরূপে কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। তাহার পর মিঃ সুন্দরম গোদা-

বরী জেলায় বদলী হইয়া সস্ত্রীক নূতন কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন। এইস্থানে অবস্থানকালেই শ্রীযুক্ত সুন্দরম ভীষণ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি অনেক পেটেণ্ট ঔষধ খাইলেন, অনেক ডাক্তার দেখাইলেন, বিস্তর অর্থব্যয় করিলেন, কিছুতেই কিন্তু ম্যালেরিয়া বিষের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। ব্যাধির প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার পূর্ব্বের সেই সুগঠিত সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। অগত্যা সুন্দরম কার্য্য হইতে দীর্ঘ অবকাশ লইতে বাধ্য হইলেন। তিনি সস্ত্রীক জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া গ্রাম্য চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। পতিগতপ্রাণা সুন্দরী এই সময় অহোরাত্র পতির চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন—মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে একা ফেলিয়া অন্যত্র যাইতেন না,—পতির রোগ-কষ্ট মোচনের জন্য দুর্ব্বলা অবলার যাহা সাধ্য,—কিছুরই অনুষ্ঠানের ত্রুটি করিতেন না। প্রাণপতির রোগ মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট কায়-মনোবাক্যে কতই প্রার্থনা করিতেন। তথাপি দুরন্তব্যাধি সুন্দরীর সেই জীবন-সর্ব্বস্বকে পরিত্যাগ করিল না; দিন দিন রোগীর অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন সুন্দরীর বক্ষে বজ্রঘাত। নিষ্ঠুর শমন সুন্দরকে নিজ কুক্ষিগত করিল।

সুন্দরমের মৃত্যুতে সেই সরল ব্রাহ্মণ পরিবারে শোকের অনন্ত উৎস উছলিয়া উঠিল। সুন্দরমের বৃদ্ধা জননী, প্রবীণ অগ্রজ, স্নেহশীল কনিষ্ঠ, ভগিনীদ্বয় ও ভ্রাতৃজায়ারা সুন্দরমের বিয়োগশোকে অতিমাত্র বিকল হইলেন। কিন্তু পতিগতপ্রাণা সুন্দরী পতিবিয়োগে কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হইলেন, তাহা লেখনীমুখে বর্ণনা করা যায় না। পতির মৃত্যুতে সতীর কি কষ্ট, তাহা একমাত্র আর্য্য রমণীই পাতিব্রত্যের আদর্শস্থল হিন্দুরমণীই বুঝিতে পারেন। সতী সুন্দরী পতির মৃত্যুর পরও সাবিত্রীর ন্যায় সেই মৃতদেহ দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরল অশ্রুধারে ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণ তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন,—সুন্দরী কিন্তু কিছুতেই পতির শবদেহ ছাড়িলেন না। অগত্যা তাঁহারা বলপূর্ব্বক সুন্দরীর আলিঙ্গন হইতে সুন্দরমের মৃতদেহ বিমুক্ত করিয়া সৎকার করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া চলিলেন। সুন্দরী তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন,—নিদারুণ নৈরাশ্যতাড়নে তাঁহার সংজ্ঞা-লোপের উপক্রম হইল। বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে

বলিলেন,—"স্বামিন, প্রভু! চলিলে?—যাও, কিন্তু অধিকক্ষণ তোমাকে একা থাকিতে দিব না—তোমার দাসী শীঘ্রই তোমার পার্শ্বে যাইবে।"

সুন্দরীর শাশুড়ী পুত্রশোকে মুহ্যমানা হইয়া পড়িলেও তিনি হিন্দু পরিবারের বর্ষিয়সী গৃহিণীর কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি সুন্দরীর মুখে উল্লিখিত গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক বিষম সংকল্পের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, সুন্দরীর যেরূপ পতিভক্তি, সুন্দরীর যেরূপ পতিনিষ্ঠা, তাহাতে এক্ষণে উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে, হয় ত অভাগিনী পতিবিরহে আত্মহত্যা করিয়া বসিবে। তাই তিনি আপনার পুত্র-শোকোচ্ছ্বাস প্রদমিত করিয়া, অতিকষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিয়া, সেই বিরহ-উন্মাদিনী বধূকে প্রবোধ বচনে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুন্দরীর মন কিন্তু বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় একলক্ষ্যে একপথে ছুটিয়াছে,—শাশুড়ী, ননন্দা, বা অন্যান্য আত্মীয়গণের কথায় তাহা ফিরিল না,—আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অভাগিনী বিধবা কিরূপে নিজ অকিঞ্চিৎকর দেহ বিসর্জ্জন দিয়া তাহার সর্ব্বস্বধন সুন্দরমের আত্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহারই উপায় উদ্ভাবনে মনঃসংযম করিলেন। বেগতিক বুঝিয়া সুন্দরীর শাশুড়ী স্বয়ং বধূর চেষ্টিতের উপর অহোরাত্র তীব্র দৃষ্টি রাখিলেন এবং অপর সকলকেও সযত্নে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল; সুন্দরী নিজ অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধির কোন সুযোগই দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে এক অমাবস্যার গভীর রাত্রে সুন্দরীর ঈপ্সিত সুযোগ ঘটিল। সুন্দরীর শাশুড়ী ও ননন্দা সুন্দরীকে লইয়া একটী প্রকোষ্ঠে নিদ্রিত ছিলেন। সুন্দরী নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে দেখেন, সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত। ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক সুন্দরী প্রকোষ্ঠের বাহিরে গমন করিলেন এবং বাহির হইতে ঐ ঘরের দরজা টানিয়া শিকলবদ্ধ করিলেন। কিন্তু শিকলনড়ার শব্দে সুন্দরীর শাশুড়ী জাগিয়া উঠিলেন এবং শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে সুন্দরীকে দেখিতে না পাইয়া, বাহিরে যাইবার জন্য দরজা ঠেলিয়া দেখেন, দ্বার বাহির হইতে বদ্ধ। তখন তিনি চিৎকার করিয়া সকলকে জাগাইয়া তুলিলেন, এবং সুন্দরীর সন্ধানে বাটীর বাহির হইতে কহিলেন। সকলে বহির্দ্বারের নিকটে যাইয়া দেখেন, সদর দরজা বদ্ধ করিয়া বাটী ত্যাগ করিয়াছেন। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা দ্বার খুলিতে পারিলেন না। অগত্যা

ক্ষুণ্ণমনে সে রাত্রি অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটাইয়া, পরদিবস প্রাতে প্রতিবেশী-দিগকে ডাকাইয়া সদর দরজা খুলাইলেন। তাহার পর তাঁহারা চারিদিকে সুন্দরীর সন্ধানে ছুটিলেন, কিন্তু কোন উদ্দেশই পাইলেন না। কেবল যে শ্মশানে সুন্দরমের শবদেহের সৎকার হইয়াছিল, সেই শ্মশানের সমীপবাসী এক ব্যক্তি বলিলেন, গত রাত্রে শ্মশানভূমি হইতে তিনি একটী রমণীর মর্ম্মভেদী বিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই শুনিয়াছিলেন, সেই রমণী বলিয়াছিল,—"প্রভু, কোথায় তুমি? এই স্থানেই তোমার নশ্বরদেহ পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়াছিল; তাই আমি তোমার উদ্দেশে এই স্থানে আসিয়াছি। এস প্রভু এস, তাপিতা দাসীকে তোমার বুকে তুলিয়া লইয়া শীতল কর; তোমার বিরহব্যথা আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। একটু অপেক্ষা কর—আমি আসিতেছি—আসিতেছি,—তোমার সহিত এইবার অনন্ত মিলন হইবে,—এ মিলনে মৃত্যুও আর বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিবে না।"

সুন্দরীর আত্মীয়গণ ঐ লোকটীর নিকট উল্লিখিত কথা শুনিয়া বেশ বুঝিলেন, নিশ্চয়ই উহা পতিবিয়োগবিধূরা সুন্দরীর বিলাপোক্তি, তখন তাঁহারা শ্মশানের আসপাশে সুন্দরীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উদ্দেশই পাইলেন না। কেবল কয়েক জন ধীবর বলিল, গত রাত্রে নদীতে কোন ভারি বস্তু পড়ার ন্যায় একটা শব্দ শুনা গিয়াছিল। সকলেই তখন বুঝিলেন, অভাগিনী সুন্দরী নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। নদীটী কুম্ভীরে পরিপূর্ণ, কুমীরেই সুন্দরীর মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার অনুসন্ধান বৃথা। তাহার পর কিন্তু অদূরবর্ত্তী অন্য এক গ্রামের অধিবাসীরা বলিল, কথিত ঘটনার পরদিবস প্রাতে তাহারা নদীবক্ষে প্রবল তরঙ্গ তাড়িত হইয়া একটী পরমা সুন্দরী রমণীর মৃতদেহ সমুদ্রাভিমুখে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। সুতরাং সুন্দরীর পরিণাম জানিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

সেক্সপিয়র।

সেক্সপিয়র।—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত দ্বারা অনুবাদিত। হারাণবাবুর এই বঙ্গানুবাদ সেক্সপিয়র বৃহৎ চারি ভাগে সম্পূর্ণ। আটপেজী ডিমাই সাইজের এগার শত ষাট (১১৬০) পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পঞ্চাশখানি উৎকৃষ্ট বিলাতী চিত্র আছে। মহাকবি সেক্সপিয়রের সমগ্র নাটকাবলী, চৌত্রিশখানি নাটক, মধুর মনোহর উপন্যাসের আকারে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কবির অদ্ভুত জীবনী, গ্রন্থ সমালোচনা, বন্দনা ও কবি প্রতিভা নামে চারি ভাগে চারিটী বিস্তৃত ভূমিকা আছে। কবির প্রতিমূর্ত্তিটী চতুর্থ ভাগে প্রকটিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগ সেক্সপিয়রের মূল্য সুলভ সংস্করণ পাঁচসিকা, রাজসংস্করণ দুই টাকা মাত্র। ছাপা কাগজ বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট, কলিকাতা ৫২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে গ্রন্থকারের নিকট অথবা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

প্রথম ভাগ সেক্সপিয়রে নিম্নলিখিত আটটী উপন্যাস আছে;—(১) ওথেলো, (২) ভেনিস নগরের বণিক, (৩) রোমিও জুলিয়েট, (৪) পেরিক্লিস, (৫) দ্বাদশী নিশা বা ভাইবোনের গল্প, (৬) টাইমন, (৭) সিম্বেলিন, (৮) লিয়র। দ্বিতীয় ভাগ সেক্সপিয়রে নিম্নলিখিত আটটী উপন্যাস আছে;—(১) ম্যাক্‌বেথ, (২) ভুলের বাহার, (৩) শীতকালের গল্প, (৪) যেমনকে তেমন, (৫) কুঁদুলে স্ত্রীর বশ্যতা, (৬) সব ভাল যার শেষ ভাল, (৭) ভেরোনার দুই ভদ্রলোক, (৮) ঝড়। তৃতীয় ভাগ সেক্সপিয়রে নিম্নলিখিত আটটী উপন্যাস আছে; (১) হ্যামলেট, (২) অতি আড়ম্বরে লঘুক্রিয়া, (৩) জুলিয়াস সিজার, (৪) যেরূপ অভিরুচি, (৫) কিং. জন, (৬) নিদাঘ নিশীথ-স্বপ্ন, (৭) তৃতীয় রিচার্ড, (৮) আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা। চতুর্থ ভাগ সেক্সপিয়রে নিম্নলিখিত দশটি উপন্যাস আছে;—(১) কোরায়েরলেনাস, (২) উইণ্ডসরের রসিকা রমণী, (৩) টাইটাইস আন্‌ড্রো নিকাস, (৪) প্রেমের নিষ্ফল প্রয়াস, (৫) ট্রইমস্ক ও ক্রোসিদা (৬) দ্বিতীয় রিচার্ড, (৭) চতুর্থ হেনেরি, (৮) পঞ্চম হেনেরী, (৯) ষষ্ঠ হেনেরী, (১০) অষ্টম হেনেরী।

প্রত্যেক গল্প উপদেশ পূর্ণ এবং সংযত ভাষায় লিখিত, সমগ্র সেক্সপিয়রের বঙ্গানুবাদ ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম দ্বিতীয় ও

তৃতীয় ভাগ সেক্সপিয়র প্রকাশিত হইলে পর যথাসময়ে জন্মভূমিতে তাহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। চতুর্থ ভাগ বা শেষ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই আমাদের আলোচ্য। সেক্সপিয়র কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় নহেন, তিনি জগতের কবি, তাঁহার নামও অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলীর বিষয় সর্ব্বদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ যাঁহারা, কেবল নাম মাত্র শুনিয়া সেক্সপিয়রকে প্রাণের সহিত ভক্তি করেন,—তাঁহাদের আজ মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত,—বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সমগ্র সেক্সপিয়র অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সকলেই অবাধে পাঠ করিতে পারেন।

সেক্সপিয়র বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সুলেখক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত একটী অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। আমাদের এই হিংসা প্রবলদেশে সৎকার্য্যের সাধুবাদ নাই,—বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর "সেক্সপিয়র" প্রাপ্ত হইয়া রক্ষিত মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, বিলাতে সেক্সপিয়রের জন্মস্থান Strotaord-on-Avon নামক স্থানে সেক্সপিয়র সোসাইটিতে বঙ্গানুবাদ সেক্সপিয়র প্রেরণ করিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের জন্য আটত্রিশ সেট সেক্সপিয়র খরিদ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীর পক্ষে ইহা বড় অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। অমর কবি সেক্সপিয়র গ্রন্থাবলী বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় অমরত্বলাভ করুন, তাঁহার লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সমালোচনা।

চপলা।—(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।) শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত। চৈতন্যপ্রেসে মুদ্রিত; ছাপা কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট, মূল্য এক টাকা মাত্র। অনেক দিন পরে আমরা একখানি উৎকৃষ্ট ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস সমালোচনার্থ উপহার পাইয়াছি। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে যে সকল ঘটনার বৈচিত্রতা চমৎকারিত্ব থাকিলে, সাধারণ পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ হয়, "চপলা" উপন্যাসে তাহা যথাযথ সন্নিবেশিত হইয়াছে।—ভাষার লালিত্য ও উপন্যাসের মাধুর্য্য আছে। চপলা উপন্যাসপাঠে আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি, বাস্তবিকই উপন্যাসখানি বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনা।)

১০ম বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩০৯ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

পাশ্চাত্য জাতির ভারতাক্রমণ।

(১)

প্রাচীন গ্রীক এবং রোমকেরা জানিতেন যে, এসিয়াখণ্ডে ভারতবর্ষ নামে এক অতি সমৃদ্ধিশালী স্থান আছে। কিন্তু ঐ স্থান এসিয়ার কোন অংশে অবস্থিত এবং তথায় উপস্থিত হইতে পারা যায় কি না, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন জ্ঞানই ছিল না। আমরা যেরূপ উপকথার পরীরাজ্য বা আরব্য-উপন্যাস পাঠে সিন্ধুবাদ নাবিকের গল্পের কথা শুনিয়া থাকি, তাঁহারাও ভারত-সম্বন্ধে সেইরূপই মনে করিতেন। ফলে তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষে উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

পরে ইউরোপীয়গণ সভ্যতার প্রথম স্তরে পাদক্ষেপ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নানাবিধ কাল্পনিক জীবের পরিবর্ত্তে ভগবত্তত্ত্ব তাঁহাদিগের মনে প্রবেশ করিতে লাগিল, ক্রমেই সমুদ্র সম্বন্ধে নানাবিধ ভীতি ও নানাবিধ কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা ভারতের বিষয়েও জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহারা সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা লক্ষ্মীর আবাসভূমি ভারতভূমির বিষয় সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিলেন।

কিন্তু যতই ভারতবর্ষের বিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞান ইউরোপীয়দিগের লাভ হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষে প্রবেশ করা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ তথনও ইউরোপীয় নৌ-বাণিজ্য মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত ছিল, সুতরাং অসীম মহাসাগর আটলাণ্টিক উত্তীর্ণ হইতে পারা

যায়, এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের মনে তখনও স্থান পায় নাই। পক্ষান্তরে তাঁহারা দেখিলেন, ভারতবর্ষ ও রোমদেশের ব্যবধানও বড় সামান্য নহে। স্থলপথে সেই বহুদূরবর্ত্তী ভারতবর্ষে আগমন করিতে হইলে, বহু উচ্চশীর্ষ পর্ব্বত, ভীষণ মরুভূমি, শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় জঙ্গল ও দুরবগাহ স্রোতস্বতী সমূহ পার হইতে হয়। তাহার উপর যখন হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতার কথা তাঁহাদিগের জ্ঞানের গোচরীভূত হইল, তখন ভারতবর্ষ যে প্রকৃত একটী দুষ্প্রবেশ্য স্থান, এ বিষয়ে তাহাদিগের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তথাপি সেই সময় হইতেই তাহাদিগের বিলুব্ধদৃষ্টি ভারতবর্ষ হইতে কখনও অন্তর্হিত হয় নাই।

পাশ্চাত্য প্রদেশে যে সমস্ত বীরকেশরী সমর-বিজয়ী হইয়া বহু দেশ করায়ত্ব করিতে পারিতেন, ভারত-বিজয়-বাসনাও তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বতঃই উদয় হইত। ভারতের তাৎকালিক সমৃদ্ধি, লোকসংখ্যা, শিল্পকৌশল ও ভারতবর্ষীয়দিগের সভ্যতা, আচার ব্যবহার, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া কোন সমর-বিজয়ীর মনে ভারত-বিজয়ের বাসনা বলবতী না হওয়াই বিচিত্র ? বস্তুতঃ পাশ্চাত্যগণ ক্রমেই ভারত-সম্বন্ধে যতই জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহারা ভারতে প্রবেশলাভের সুবিধার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পুরাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে অনুমান করা যায় যে, পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে ইহুদীরাই প্রথমে ভারতবর্ষের কথা জানিতে পারেন। তবে কি উপায়ে যে তাঁহারা সেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কারণ তৎকালে তাইগ্রীস নদী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপাদসমূহ ব্যতীত পূর্ব্বদিকে আরও কোন স্থান আছে কি না, তাহা তাঁহাদিগের জ্ঞানের অগোচর ছিল। এমন কি, ঐ স্থানেই যে পৃথিবীর শেষ হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্তেও তাঁহারা উপনীত হইয়াছিলেন।

য়িহুদীরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাঁহারা পৃথিবীর নানাস্থানে পর্য্যটন করিতেন। তাঁহাদিগের প্রাচীন পুস্তকাবলী পাঠ করিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্বকালে বাণিজ্য করিয়া তাঁহারা যে সকল পদার্থ স্বদেশে লইয়া যাইতেন, ভারতবর্ষ ব্যতীত সে সকল পদার্থ তৎকালে কুত্রাপি পাওয়া যাইত না। তাঁহাদিগের ইজিকেল নামক পুস্তকে যে সমস্ত কারুকার্য্যখচিত শিল্পজাত এবং সূত্রবদ্ধ বস্ত্রালঙ্কার

পূর্ণ কাষ্ঠপেটিকার বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, ইউফ্রেটিস নদীর পার্শ্ববর্তী এবং অপরাপর স্থানের অধিবাসীরা উহা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কারণ ঐ সমস্ত প্রদেশ তখন বর্ব্বর জাতির বাসভূমি ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য স্থানে ঐ সকল পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া দূরের কথা, প্রস্তুত হইতেও পারিত না, ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। বোধ হয় য়িহুদীরা বাণিজ্য-ব্যপদেশে সাগরবক্ষে বা অন্য কোন পথে আরবদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল মূল্যবান্ বস্ত্রাদি ভারতবর্ষ হইতেই স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

প্রাচীন মিশরীয় মাইথলজি বা পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বেক্স নামে এক দেবতা ভারতবর্ষ-বিজয়ে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই দেবতাটীও বড় সহজ ছিলেন না। ইনি পাশ্চাত্য প্রদেশে মদিরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মাইথলজিতে ইঁহার মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। ইঁহার মস্তক আইভি লতার মুকুট-পরিশোভিত। এক সময়ে ইউরোপ অঞ্চলের পবলিক হাউস বা শৌণ্ডিকালয়-সমূহের বহির্দ্দেশে আইভিলতা ঝুলাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও বিলাতে মদিরা সম্বন্ধে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, "Good wine needs no bush"। সে যাহা হউক, বেকসের ভারত বিজয়বার্ত্তা এতই অতিরঞ্জিত যে, তাহা কেবল মাইথলজিরই উপযুক্ত, তাহা হইতে ইতিহাস-তথ্য বিন্দুমাত্র পাওয়া যায় না। তবে সত্ত্বগুণ প্রধান আর্য্য-সন্তানদিগকে তমোগুণকারী সুরা-সেবন করিয়াই যে ম্লেচ্ছ-পদতলে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিলে বোধ হয়, এই পৌরাণিক অদ্ভুত জীবটীর ভারতবিজয় নিতান্ত অবিশ্বাস্য হয় না।

অতি প্রাচীনকালে মিশররাজ সিসষ্ট্রীস বহু প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, ভারতবর্ষও তৎকর্তৃক আক্রান্ত হয়। কিন্তু তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। তাহার পর আসিরিয় রাণী সেমিরেমিসের কাহারও কাহারও মতে "শ্যামারমা" ভারতাক্রমণের কথা শুনা যায়।

এই রমণীর অসীম সাহস এবং অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যের বলে এসিয়া-খণ্ডের বহুপ্রদেশে আসিরীয় বিজয়কেতন উড্ডীয়মান হয়। যদিও তৎকালে গ্রীকদিগের জ্ঞান এসিয়া-সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণ অল্প ছিল, তথাপি দুই একখানি গ্রীক পুস্তকে এই রমণীর ভারতাক্রমণ বিবরণ যেরূপ ভাবে

বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় যে, ঐ সমস্ত উপাখ্যান নিতান্ত কল্পনামূলক নহে।

যৎকালে জুলিয়স সিজর রোমের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে ডাওডোরস্ নামে একজন রোমদেশীয় ঐতিহাসিক সেমিরেমিসের ভারতাক্রমণ-সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অতি-রঞ্জিত হইলেও ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য। তিনি বলেন, আসিরিয়া রাজ্ঞী সেমিরেমিস পশ্চিম এসিয়া পর্য্যন্ত স্বরাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। বক্ত্রিয়া অধিকারভুক্ত হইলে, তাঁহার মনে ভারত-বিজয়ের বাসনা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু দেখিলেন, ভারতাক্রমণের এরূপ দুইটী অন্তরায় আছে যে, তাহাতে ভারতবিজয় এক প্রকার অসম্ভব। প্রথম অন্তরায়, খরপ্রবাহিনী বিস্তীর্ণ সলিলা সিন্ধুনদী অতিক্রম এবং দ্বিতীয় অন্তরায় তৎকালে হিন্দুরা হস্তী লইয়া যুদ্ধ করিতেন, সেই শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান।

তৎকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার এত উৎকর্ষ হয় নাই যে, সহজে সিন্ধু নদী পার হইবার উপযুক্ত জলযান তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারিতেন এবং তৎপূর্ব্বে পাশ্চাত্য সৈনিকদিগের দৃষ্টিপথে কখনও হস্তীর ন্যায় উচ্চাবয়ববিশিষ্ট ভয়ঙ্কর প্রাণী সমরপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হয় নাই। যুদ্ধ করা দূরের কথা, রণক্ষেত্রে হস্তী দেখিলেই পাশ্চাত্য চমূনিচয় যে নিশ্চয়ই ভয়-বিহ্বলচিত্তে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে, তদ্বিষয়ে সেমিরেমিসের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু তিনি কিছুতেই ভারতবিজয়বাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি বক্ত্রিয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ফিনিসিয়া ও সাইপ্রস দ্বীপ হইতে বহুশিল্পী আনয়ন-পূর্ব্বক সুদৃঢ় জলযান-সমূহ প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর কি উপায়ে হস্তীর অভাব পূর্ণ হইতে পারে সেমিরেমিসের মনে এই চিন্তার উদয় হইল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাশ্চাত্য জাতি সমরব্যাপারে কুটনীতির অবলম্বনে সুদক্ষ। সুতরাং পাশ্চাত্যজাতির স্বভাব-সিদ্ধ কূট সমরনীতি অবলম্বিত হইল। কৃত্রিম হস্তী প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্রিশ লক্ষ বলীবর্দ্দের প্রাণ বিনষ্ট হইল এবং তাহাদিগের চর্ম্মে সরল হিন্দু-জাতিকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক হস্তী প্রস্তুত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সেই সকল শূন্যগর্ভ বারণাবয়বের মধ্যে মনুষ্য ও উষ্ট্রাদি প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের গতি সম্পাদিত এবং সজীববৎ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিতে আসিরীয় রাজ্ঞীর না কি তিন বৎসর অতিবাহিত হয়।

এইরূপ বহুসংখ্যক জলযান এবং সেই সকল কৃত্রিম হস্তিসহ কোটী কোটী সৈন্য লইয়া সেমিরেমিস বক্ত্রিয়া হইতে ভারতবর্ষের প্রতি ধাবিত হন। টেসিয়াস নামে জনৈক রোমান ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই বীররমণী ত্রিশ লক্ষ পদাতিক, পঞ্চাশ লক্ষ অশ্বারোহী, দুই সহস্র সমরপোত এবং বহুসংখ্যক কৃত্রিম হস্তী লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একথা যে বড়ই অতিরঞ্জিত, এবং বিশ্বাসের নিতান্তই অযোগ্য, তাহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য।

ঐ সময়ে স্তাব্রোবাতিস নামে এক নরপতি ভারতবর্ষে (?) রাজত্ব করিতেন। সিন্ধুনদীর পূর্ব্বপার্শ্বে তাঁহার সহিত আসিরীয় রাজ্ঞীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজাও বহুসৈন্য এবং হস্তী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমে উভয়দলে জলযুদ্ধ বাধিলে, প্রথমে রাণীর পক্ষই জয়লাভ করেন। ইহাতে রাজার বহুসংখ্যক রণতরী সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। আসিরীয় রাণী সিন্ধুর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ড অধিকার করেন।

অতঃপর আসিরীয় রাণী সিন্ধুবক্ষে একটী সুবিস্তীর্ণ সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া তদ্দ্বারা আপনার বিশাল সৈন্যদল নদীর পরপারে লইয়া আইসেন। আসিরীয় সৈন্যব্যূহের প্রথমেই কৃত্রিম হস্তী সজ্জিত হয়। প্রথমেই সিন্ধুদেশীয় সৈন্যেরা কৃত্রিম হস্তী দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। আসিরীয়দিগের অশ্বারোহী-সৈন্য অধিক ছিল। এই নিমিত্ত প্রথম প্রথম তাহাদিগের জয় হইতে লাগিল। পরে যখন সিন্ধুদেশীয়েরা হস্তী লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন তাহাদিগের জয়াশা তিরোহিত হইয়া গেল।

রাজা স্বয়ং একটা প্রকাণ্ড রাবণ-পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিরীয় রাজ্ঞী সেমিরেমিসের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার হস্তিসমূহ বেগে রাণীর কৃত্রিম হস্তীসকলের প্রতি চালাইয়া দিলেন। রাণীর চাতুরীজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। প্রকৃত হস্তিপদে নিষ্পেষিত হইয়া কৃত্রিম হস্তীর অবয়ব-মধ্যস্থিত লক্ষ লক্ষ মনুষ্য ও উষ্ট্র প্রাণত্যাগ করিল। রাণীর সমস্ত সৈন্যের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের জীবন রক্ষা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, আসিরীয় রাজ্ঞী সেমিরেমিসও এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। যাহা হউক, আসিরীয়দিগের পরাজয়ের

পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত আর কোন পাশ্চাত্য জাতির ভারতাক্রমণ-সম্বন্ধে কোন কথনই শুনা যায় নাই।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশের পর)

প্রথম ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক হাজারীলাল;—ইঁহার নিবাস ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত; ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। হাজারীলাল নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া লোকের গৃহে গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন, এবং স্বাক্ষরের পর প্রত্যেক স্বাক্ষরকারীকে তিনি এক একটী "ওঁ" অঙ্কিত অঙ্গুরী পুরস্কার দিতেন। হাজারীলাল নিরামিষভোজী ছিলেন। এমন কি, দিন কতক তাঁহার আহার ছিল,—কাঁচা বেগুণ আর কাঁচা লাউ। ইহা খাইয়াই তিনি প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহর্ষির আদেশে, তত্ত্ববোধিনী সভা শক ১৭৬৯ অব্দে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থসভা সংস্থাপন করেন; তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় প্রকাশাভিলাষে যাঁহারা যত কিছু প্রবন্ধাদি লিখিতেন, গ্রন্থসভায় সেই সকল আদর্শের ভাল-মন্দ নির্ব্বাচনের বিচার হইত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এবং বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, আরও কয়েকজন ধর্ম্মাত্মা ঐ গ্রন্থ-সভার সভ্য ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী-সভার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে তাঁহাদের সকলেরই আন্তরিক আনন্দ ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই তখন হইতে আজি পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের ধর্ম্মনীতি শিক্ষার একমাত্র মাসিক পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত ও আদৃত হইয়াছে। তখন আর তেমন মাসিক পত্রিকা বঙ্গদেশে ছিল না। তৎকালে উক্ত তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ৭০০ জন হইয়াছিল; তাহা অক্ষয় বাবুর দ্বারা সম্পাদিত হইত। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সুপণ্ডিত দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু, ধার্ম্মিকবর বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং শ্রীমন্মহর্ষির

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মপালকের নাম লইবার সময় প্রথমেই আমাদের মনে হয়, বাবু রাজনারায়ণ বসু। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজনারায়ণ বাবু শ্রীমন্মহর্ষিকে ইংরাজী ভাষায় যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই মহোপদেশ-পূর্ণ পত্রখানির একটী বঙ্গানুবাদ আছে। আমরা ইহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম;—

"আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি ও পুনঃপ্রচার যখন আপনার জীবনের ব্রত, তখন আপনার নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে, সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সকল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃত মূল, সরল বঙ্গানুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা সহ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করুন। ইহার প্রথমভাগে ব্রাহ্ম-প্রতিপাদক শ্লোক সকল থাকিবে, এই সকল শ্লোক কেবল বেদান্তদর্শন হইতে না লইয়া সমস্ত শ্রুতি হইতে সংগ্রহ করা উচিত, কারণ বেদান্তদর্শনকে অন্যান্য হিন্দুদার্শনিকেরা এবং সাকারবাদী অনেক পণ্ডিত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রুতিকে একান্ত প্রামাণিক বলিয়া ভারতবাসী সমগ্র হিন্দু স্বীকার করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকলের সমর্থন জন্য হিন্দুদর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং ইতিহাস হইতে ঈশ্বর-বিষয়ক বচন সকল উদ্ধৃত হইবে। ইহার তৃতীয় অর্থাৎ শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুগণের নীতিবিষয়ক শ্লোক সকল সরল তাৎপর্য্যের সহিত প্রকাশিত হইবে। এই সকল শ্লোক সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া আহৃত হইবে এবং এই শ্লোকসমূহ সৌন্দর্য্যে এবং সারবত্তায় মহাত্মা যীশুখৃষ্টের স্বর্গীয় বচন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও না হউক ত সমকক্ষ হইবে।"

রাজনারায়ণ বাবুর এই পত্রের সমস্ত মর্ম্ম অবগত হইয়া চারি পাঁচ বৎসর পরে শ্রীমন্মহর্ষি ব্রাহ্মগ্রন্থ প্রচার করেন। গ্রন্থের প্রথম ভাগে ঈশ্বরের লক্ষণ, তৎসঙ্গে যোগ এবং তাঁহার উপাসনার বিষয়সমূহ উপনিষদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, মহাভারত, মহানির্ব্বাণতন্ত্র এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র হইতে নীতিবিষয়ক উপদেশ বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। মনুসংহিতার সারসংগ্রহ রাজনারায়ণ বাবু স্বয়ং করিয়া দিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকের নীচে নীচে বাঙ্গলা ভাষায় তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমন্মহর্ষি, অক্ষয়বাবু ও রাজনারায়ণ বাবু প্রথম ভাগের তাৎপর্য্য লিখিয়াছিলেন। অনেকদিন পরে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দ্বিতীয়

ভাগের সরল ব্যাখ্যা করেন; ব্রাহ্মধর্ম্মমূলে বৈদান্তিক ধর্ম্মের কোনরূপ উল্লেখ নাই, খাঁটি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। সকল বাক্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যটি সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী,—"তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব", অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই মহান্ বাক্যটি শ্রীমন্মহর্ষির স্বরচিত। বাইবেলে এইরূপ একটি বাক্য আছে,—"সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমার ঈশ্বরকে ভালবাস এবং তোমার প্রতিবাসীদিগকে নিজের ন্যায় দেখ।" শ্রীমন্মহর্ষির এই মহান্ বাক্যটি বাইবেলের বাক্য অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী রাজা দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে ঐ বাক্যটিকে বেদবাক্য মনে করিয়াছিলেন; শেষে রাজনারায়ণ বাবু বুঝাইয়া দেন, ইহা বেদোক্তি নহে, শ্রীমন্মহর্ষির এই অমূল্য উপদেশটি রচনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ-প্রকাশের কিছুদিন পরে শক ১৭৭২ অব্দে (১১ই মাঘ) মাঘোৎসবে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত একটি বক্তৃতামধ্যে স্পষ্টাক্ষরে বলেন, প্রকৃতিতে ঈশ্বরের সত্তা ও মহিমার উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মগণের একমাত্র লক্ষ্যস্থল, জগৎ-গ্রন্থই ব্রাহ্মগণের একমাত্র পাঠ্যশাস্ত্র। রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরে এই বিশ্বাসই চিরকাল বদ্ধমূল ছিল।

এই সময় "তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদো" ইত্যাদি—মুণ্ডক উপনিষদের এই প্রসিদ্ধ বাক্যটি তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার শিরোভূষণ করিয়াছে। শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, বেদ বেদাঙ্গই নিকৃষ্ট জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, যাহা দ্বারা অব্যয় অক্ষয় ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানগোচর হন, তত্ত্বজ্ঞান বেদ বেদাঙ্গ পাঠে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা মনুষ্যের মনে স্বয়ং সম্ভূত হয়।

নির্জ্জন ধ্যানের অভিলাষে শ্রীমন্মহর্ষি শক ১৭৭৮ অব্দে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করেন, শক ১৭৮০ অব্দে সিপাহি-বিদ্রোহের পর, তিনি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। শ্রীমন্মহর্ষি যখন হিমালয়ে ছিলেন, সেই সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক অধিবেশন হয়, বাবু রমানাথ ঠাকুর সভাপতি হন। সেই সভায় স্থির হয় যে, মৃত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী রাধাপ্রসাদ রায়ের স্থলে, রাজা রামমোহনের বংশধর বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীমন্মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টি নিযুক্ত হইবেন।

বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা পরিত্যাগ

করিলে বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন সম্পাদক হইয়াছিলেন। নবীন বাবুর পরে শ্রীমন্মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন ইহাঁর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ মাত্র। তিনি অনেকগুলি ব্রাহ্ম সংগীত ও জাতীয় সংগীত রচনা করিয়াছেন; ভাষার সৌন্দর্য্যে এবং সমোচ্চ ভাবে গীতগুলি পরিপূরিত। এ দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচলনে এবং জাতিভেদের উচ্ছেদ-সাধনে সত্যেন্দ্র বাবুর সবিশেষ আগ্রহ।

শক ১৭৮১ অব্দে ২৫এ বৈশাখ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের যত্নে ও পরিশ্রমে কলিকাতায় ব্রহ্ম-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, শ্রীমন্মহর্ষি ঐ বিদ্যালয়ে প্রতি রবিবার বাঙ্গালায় এবং কেশব বাবু ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেন। শ্রীমন্মহর্ষির উপদেশগুলি "ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

শক ১৭৮৩ অব্দে ১২ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীমন্মহর্ষির দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয়; সে বিবাহ ব্রাহ্মবিধিমতে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন পাইবার প্রার্থনায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিয়া সিবিল বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়া লন, আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা ব্যতীত অপরাপর ব্রাহ্ম যুবকেরা সেই পদ্ধতিকে ব্রাহ্মবিবাহের আইন বলেন, বাস্তবিক তাহা হইতে পারে না। কারণ, সেই বিধি অনুসারে যে সকল বিবাহ হয়, তাহা ধর্ম্ম-বর্জ্জিত; কেন না, বিবাহ রেজেষ্টারী করিবার সময় যে অঙ্গীকার করিতে হয়, তাহাতে ঈশ্বরের নাম গন্ধ নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রাহ্মগণ ঐ বিবাহে উপাসনাদি ব্রাহ্মক্রিয়ায় সংযোগ করিয়া লইয়াছেন। জগৎপিতা জগদীশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া, যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্ম-বিবাহ। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা ৺ কাশীধাম এবং নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়াছেন, সেই সকল পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহকে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈধ বলিয়া মত দিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মের যে যে অংশে পৌত্তলিকতার সম্বন্ধ আছে,—আদি ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রাহ্মেরা সেই সেই অংশ ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত আকারে শ্রীমন্মহর্ষি-প্রবর্ত্তিত যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার নাম যথা :—

১ জাতকর্ম্ম। ২ নামকরণ। ৩ বিবাহ। ৪ উপনয়ন। ৫ দীক্ষা। ৬ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ৭ শ্রাদ্ধ।

হিন্দুবিবাহে সপ্তপদী-গমনের রীতি আছে, আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা সেই রীতিটি গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতিটি এতই সুন্দর যে, সিবিল বিবাহ-পদ্ধতির প্রণেতা অনরেবল ফিট্‌স জেমস্ ষ্টিফেন সাহেব ইহা ইংরাজসমাজে প্রচলন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক শ্রীমন্মহর্ষির আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, দেশীয় প্রথা যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, পৌত্তলিক আচার ও সংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহা ততদূর পালন করা উচিত। কারণ ব্রাহ্মশব্দে হিন্দুর একমাত্র দেবতা পরব্রহ্মের উপাসক বুঝায়,—অতএব যে ব্রাহ্ম হিন্দুভাবসম্পন্ন নহেন, তাঁহাকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

গীত।

কৃষ্ণ-বিষয়ক।

ভৈরোঁ—চৌতাল।

জয় যদুনন্দন, ভব-ভয়-হারি, কেশব মাধব দানব সংহারি।
করুণাসাগর জয় হরি পীতাম্বর, এ অধমে কৃপা কর ওহে মুরারি॥
সৃষ্টিস্থিতিনাশন, দুর্জন শাসন, ভকত পালন কার্য্য তোমারি।
জয় করুণাময়, অশেষ গুণালয়, ত্রিগুণ আশ্রয় ওহে কংসারি॥
সর্ব্বশক্তিমান্, শ্রীমধুসূদন, যোড় করে করি শুন নিবেদন।
ভুবন কিষণ যাচে কৃপাদান, অন্তিমে শ্রীচরণ দাস ভিখারী॥

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

গঙ্গাস্তোত্রম্

(৺ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-বিরচিতম্) *



(১)

মাতর্জ্জহ্নুসুতে প্রসীদ পরমেশানি প্রপন্নে ময়ি
ত্বৈনৈব দ্রবরূপিণী ত্রিজগতি খ্যাতা যতস্ত্বং শিবে ;
প্রত্যাসন্নকৃতান্তকিঙ্করভয়ব্যগ্রং নিরালম্বনং
মামঙ্কে কুরু পাহি পাহি কৃপয়া কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে ॥

* তীক্ষ্ণ-মনীষা-সম্পন্ন পরম-পূজ্য-পাদ পণ্ডিতবর ৺কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় এই স্তবটীর রচয়িতা। ইনি ভক্তিনিষ্ঠ সাধকবর সুপণ্ডিত ৺ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা, এবং আলিপুরের বর্ত্তমান ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যশোহরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসিস্ট্যান্ট্ রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ। ৺ তর্কপঞ্চানন মহাশয় স্বয়ং যেরূপ সুপণ্ডিত সুভাবুক ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই স্তবটীও তাঁহার অনুরূপ হইয়াছে। ভাবের মাধুর্য্য, ভক্তির প্রাচুর্য্য, ভাষার সৌন্দর্য্য ও রচনার চাতুর্য্য দেখিলে তাঁহার কবিতা, হৃদয়বত্তা ও ভক্তিনিষ্ঠতার প্রভূত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্তবটী এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে যে, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও ব্রহ্মানন্দ

শুন মা পরমেশ্বরি ! জহ্নুর নন্দিনি !
বড়ই বিপদ্ মোর রাখ গো জননি !
তরল তরঙ্গ ধরি করহ বিহার,
ত্রিজগতে খ্যাত মাগো ! মহিমা তোমার।
নিকট যমের দূত দেখে লাগে ভয়,
কোলে তুলে লও মাগো ! আমি নিরাশ্রয়।
আমি অতি দীনহীন, নাহি মোর গতি,
কৃপা করি চাহ এই অধমের প্রতি।
সন্তানের দুঃখ যদি কর মা দর্শন,
তিতিবে কারুণ্য-রসে তোমার নয়ন।

(২)

হিত্বা সৎপথমুৎপথেন চলতা ভ্রান্তেন নিত্যং ময়া
হেলাসঞ্চিতমুৎকটং কতিবিধং পুঞ্জীকৃতং পাতকম্।
নান্তং তস্য বিলোকয়ে ন চ পুনঃ পশ্যাম্যুপায়ান্তরং
সদ্যঃ কল্মষরাশিনাশিনি তত ত্বামাশ্রয়ে শ্রেয়সে ॥

সুপথ ছাড়িয়া নিত্য কুপথে চলিয়া
করিয়াছি মহাপাপ ভ্রমেতে পড়িয়া।
প্রত্যহ সে সব পাপ সঞ্চিত হইয়া
স্তূপাকার হইয়াছে, দেখিনু বুঝিয়া।
এত পাপ কিসে যাবে, ভাবনা সদাই,
উপায় ইহার কিছু খুঁজিয়া না পাই।
অসীম তোমার শক্তি পাপ-বিনাশনে,
আশ্রয় লইনু তাই তোমারি চরণে!

প্রভৃতি প্রাচীন কবির স্তব বলিয়া বোধ হয়। ৺ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বংশ বাস্তবিকই একটী রত্নাকর এবং তাঁহার বংশধরগণও এক একটী সমুজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার মত ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতের বংশে যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পণ্ডিত সন্তান জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি! "আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ"—অনুবাদক।

(৩)

জন্মাঽসদ্বিষয়াশয়া বিচরতঃ স্বৈরং নিরর্থং গতং
ধর্ম্মো নাতিদুরন্তদুর্গপদবীসঙ্গী সহায়োঽর্জ্জিতঃ।
পশ্যাম্যন্তকমন্তিকে কিমধুনা কর্ত্তব্যমিত্থং মতি-
র্ভীতিব্যাকুলচেতসো জননি মে নাস্তি ত্বদন্যা গতিঃ॥

অন্যায় বিষয়-লোভে স্বেচ্ছায় চলিয়া
এ জন্ম বিফলে মোর যাইল কাটিয়া।
সুদুর্গম মোক্ষধাম-পথে যেতে হ'লে
যে ধর্ম্ম হইয়া সঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে চলে,
হায় রে সে ধর্ম্ম আমি ভুলেও কখন
উপার্জ্জন করিবারে নাহি দিনু মন।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে যম, উপায় কি আর,
ভয়েতে ব্যাকুল চিত্ত হয়েছে আমার।
একটী উপায় আছে, বুঝিলাম সার
তোমা বিনা অধমের গতি নাই আর।

(৪)

ব্রূমঃ কিং মহিমানমীদৃশমসামান্যং তবান্যৈরহো
যন্নীচঃ পতিতোঽতিপাতকশতব্যাপন্নদেহোঽস্পৃশঃ।
ত্যক্তো বন্ধুজনৈরতীবঘৃণিভির্দৈবাদ্ যদি ত্বাং স্পৃশেৎ
ত্বং ক্রোড়ে বিনিধায় দাস্যসি পতিস্বারূপ্যমিত্যদ্ভুতম্॥

তোমার সমান কেবা কোথা রহে আর?
তোমার মহিমা মাগো! বুঝে উঠা ভার!
হায় রে পতিত নীচ মহাপাপ-দেহ
স্পর্শও করিতে যারে নাহি চায় কেহ,
যার প্রতি ঘৃণারাশি প্রকাশ করিয়া
তারি আপনার লোক দিয়াছে ত্যজিয়া,
কি আশ্চর্য্য কোলে তারে লইয়া তখনি,
করহ শিবত্ব দান তুমিই জননি!

(৫)

গঙ্গেব্যঙ্গজড়ান্ধপঙ্গুপতিতাঃ কীটাঃ পতঙ্গা স্তথা
যেঽপ্যন্তুর্নিপতন্তি বারিণি তব প্রাণাত্যয়ে জন্তবঃ।
সর্ব্বে স্বর্গপথপ্রয়াণসময়ে সিদ্ধৈঃ সমং সঙ্গতা
যান্তি ক্বাপি দিশস্তিষা চ যশসা সংপূরয়ন্তস্তব ॥

কিবা জড়, কিবা অন্ধ, পঙ্গু বিকলাঙ্গ,
কি পতিত, কিবা কীট, অথবা পতঙ্গ,
এ সকল প্রাণী যদি মরণের কালে
গড়াইয়া গিয়া মাগো! পড়ে তব জলে,
তাঁ হলে সবারে লয়ে যত সিদ্ধগণ
স্বর্গপথ দেখাইয়া করিবে গমন ;
দুর্গত সে সব প্রাণী একত্র হইয়া,
কান্তি-যশে দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া,
বিহ্বল হইয়া গিয়া মনের হরষে
অবশেষে সেই মোক্ষধামে গিয়া পশে!

(৬)

মাত র্ব্রহ্মময়ি ত্রিলোকজননি ত্বামর্থয়ে প্রাঞ্জলি-
র্নত্বাঽষ্টাঙ্গবিধানতঃ করুণয়া সংপূরয়েদং মম।
স্থিত্বা কারণবারিতীরমভিতঃ পীত্বা ত্বদম্ভঃ পুন-
র্ধ্যাত্বা ব্রহ্ম পরং জপন্ পরমনুং জহ্যামসূংস্তেঽগ্রতঃ ॥

ওমা গঙ্গে! ব্রহ্মময়ি! ত্রিলোক-জননি!
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি তোমায় এখনি।
করযোড়ে বলি মাগো! নিকটে তোমার
পূর্ণ ক'রে দাও এই প্রার্থনা আমার ;—
উদ্ধার-কারণ যেই তব পুণ্য বারি,
চারিদিকে রাখি তাহা মধ্যে থাকি তারি,
করিতে করিতে বাস যেন তব তীরে,
করিতে করিতে পান যেন তব নীরে,

স্মরিতে স্মরিতে পরব্রহ্ম মনে মনে,
জপিতে জপিতে মুখে সেই মন্ত্রধনে,
দেখিতে দেখিতে যেন সম্মুখে তোমায়,
এ দেহ ছাড়িয়া মোর প্রাণটী পলায়!

(৭)

যাশ্চান্যা ভুবি বিশ্রুতা বরপুরো মোক্ষপ্রদা ভূময়ঃ
সর্ব্বাস্তা নহি সর্ব্বলোকসুলভাঃ কঞ্চিৎ প্রদেশং শ্রিতাঃ।
ত্বং তাবৎ ভুবনত্রয়ে ভগবতী ধারাভিরাদ্যন্তয়ো-
র্মোক্ষং যচ্ছসি যস্য কস্যচিদপি স্বৈরং চরন্তী পুনঃ॥

এ সংসারে মোক্ষপ্রদ তীর্থ যত রয়,
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহা, এক স্থানে নয়।
কাজেই সে সব তীর্থে সাধারণ জন
সহজে না পারে হায় করিতে গমন।
আদ্যন্ত প্রবাহ তব ত্রিলোক ব্যাপিয়া,
ইচ্ছামত যথা তথা গমন করিয়া
যে জন যেরূপ ভাবে যাচুক যখন,
তুমি তারে মোক্ষপদ কর বিতরণ।

(৮)

গাঙ্গং বারি পরং ভবত্রহরহঃ স্নানায় পানায় মে
গঙ্গা চেতসি বাচি তিষ্ঠতু পুনর্গঙ্গা পুরোগা মম।
গঙ্গেতি শ্রবণং শৃণোতু সততং গঙ্গেতি জল্পন্ মুহু-
র্বক্ত্রং মে রমতাং করৌ প্রকুরুতাং গঙ্গাসপর্য্যাবিধিম্॥

গঙ্গাজলে প্রতিদিন করি যেন স্নান,
গঙ্গাজল প্রতিদিন করি যেন পান।
মনে গঙ্গা, বাক্যে গঙ্গা, গঙ্গাই সম্মুখে,
গঙ্গানাম কর্ণে যেন শুনি সদা সুখে।
গঙ্গা গঙ্গা বলিয়াই যেন সর্ব্বক্ষণ
প্রসন্ন হইয়া রহে আমার বদন।

করিতে হইলে কর্ম্ম আসিয়া ধরায়,
হস্ত যেন ব্যস্ত রয় গঙ্গারি পূজায়।

(৯)

স্ফুরন্মকরবাহিনী হরশিরোরুহোল্লাসিনী
ত্রিলোকপথপাবনী দুরিতদর্পসংহারিণী।
কৃতান্তভয়নাশিনী সুরধুনী জগৎপাবনী
সদা হৃদয়বাসিনী ভবতু মে চিদুল্লাসিনী ॥

মকর-বাহিনী হর-শিরো-বিলাসিনী,
ত্রিলোক-পাবনী পাপ-গর্ব্ব-সংহারিণী,
যম-ভয়-বিনাশিনী চিন্ময়-রূপিণী,
সুরধুনী ত্রিভুবন-পবিত্র-কারিণী,
আর কিছু নাহি চাই জহ্নুর নন্দিনি!
হৃদয়-বাসিনী মোর হও গো জননি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ

দাদার ভাই।

শ্রীহট্ট জেলার একটি ভদ্রলোক ঢাকা জেলায় মুন্সেফি করিতেন, বাসায় তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি কেহই ছিল না; সরকারি কার্য্যে বাবুটির বেশ সুখ্যাতি ছিল, বেতন উচ্চ সীমায় উঠিয়াছে, অতি শীঘ্র তিনি সদরআলা (এখনকার সবজজ) হইবেন, এইরূপ আশ্বাস। প্রায় সপ্তদশ বর্ষকাল তিনি ঢাকায় আছেন, প্রথমে ওকালতি করিতেন, তাহার পর মুন্সেফ হইয়াছেন। পাড়ার সমস্ত লোকেই তাঁহাকে খাতির যত্ন করেন। বাসাতে বাবু স্বয়ং, একটি পাচক ব্রাহ্মণ, আর একজন খোট্টা বেহারা; তাহা ছাড়া বাবুর ভালবাসা একটী বিলাতী কুকুর, পাচকের ভালবাসা একটী কাবুলী সুন্দরী বিড়ালী, আর বেহারার ভালবাসা ছোট একটি ক্ষুদ্র চক্ষু মর্কট বাঁদর, এই ছয় প্রাণি ভিন্ন এই সপ্তদশ বৎসরের মধ্যে স্বদেশের জ্ঞাতিকুটম্বাদি জনপ্রাণিরও সে বাসায় পদার্পণ হয় নাই।

মুন্সেফের নাম অঘোর বাবু। সতর বৎসর আছেন, পরিচিত আত্মীয়বন্ধু কেহই একদিনের জন্য দেখা সাক্ষাৎ করিতে আইসেন নাই, হঠাৎ কেহ সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা গণনা করিতে না পারিয়া, অঘোর বাবু দস্তুরমত কাছারী করিতে গেলেন।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, সদর দরজা বন্ধ করিয়া পাচক-বেহারা উভয়ে বাগবান্ধ খেলা খেলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ সদর দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত; ভয়ঙ্কর আঘাত, হাঁপকম্পিত কণ্ঠে "দাদা গো! দাদা গো!" ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেখিল,—সম্মুখে এক নূতন মূর্ত্তি। ঘর্ম্মাক্তকলেবর, মুখখানা রক্তবর্ণ, সমস্ত অঙ্গবস্ত্র ঘর্ম্মসিক্ত, হাতে পুরাতন কারপেটের মস্ত একটা পাঁচরঙ্গা ব্যাগ।

"দাদা গো! দাদা গো।" চিৎকারে যে ব্যক্তি অপরকে ভুলাইতে চায়, সে লোক বড় সামান্য নয়; ব্রাহ্মণকে ধাক্কা দিয়া সেই লোক সদন্তে বাড়ীর ভিতর গিয়া বৈটকখানা ঘরের ফরসা বিছানায় সটান শুইয়া পড়িল। "বাতাস কর, বাতাস কর, দাদা কোথায়, দাদাকে ডাক, আঃ", এইরূপ উক্তি করিয়া সেই লোক যেন হাঁপাইতে আরম্ভ করিল, এক হাতে ব্যাগটা কিন্তু মাথার কাছে ধরিয়া রাখিল। বেহারা বড় পাখায় বারকতক বাতাস দিল, ব্রাহ্মণ সেই সময় বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তাকে কি খবর দিব?"

নূতন লোকটির নাম সাধুচরণ। কর্ত্তাকে খবর দিবার কথায়, সাধুচরণ সহসা উঠিয়া বসিয়া, দুই হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিল, "না—না! খবর দিতে হইবে না। দাদা কাছারীতে গিয়াছেন, উতলা হইবেন, রাজকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবে, খবর দিতে হইবে না। আমি তাঁহার ছোট ভাই, তিনি আমার দাদা। বিশ বৎসর দেখা নাই। আমিও বিদেশে বড় একটা চাকুরী করি; আমার কন্যার বিবাহ, সেই জন্য সম্প্রতি ছুটি লইয়া আসিয়াছি, দাদার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে, সেই জন্যই এতদূর আমার আসা, সন্ধ্যার পরেই দেখা সাক্ষাৎ হইবে। তোমরা ইতিমধ্যে একটা কাজ কর। কখনও আসা নাই, নূতন আসিয়াছি, দাদার গুটিকতক বন্ধু-বান্ধবকে আজ রাত্রে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক; একজোড়া পাঁঠার দাম এখানে কত?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "কমবেশ তিন টাকা।" সাধুচরণ আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "এত সস্তা! বাঃ! তবে তিনটা আনিও।" এই বলিয়া

ব্যাগের চাবি খুলিয়া লাল রুমালের খুঁট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া গালিচার উপর ফেলিয়া দিল, কহিল, "যত লাগে, তাহাই দিও, যদি কম পড়ে, আবার আমি দিব। তুমি নিজেই যাও, তিনটে আনিও। দুর্গা দুর্গা! এখানে কোন ঠাকুর বাড়ী আছে?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "মা কালী আছেন, পঞ্চানন্দ আছেন, আর একটি বিশালক্ষ্মী মূর্ত্তি আছে।"

গুণ গুণ স্বরে সাধুচরণ বলিল, "বরাত ভাল। ভাগে ভাগে ঠিক মিলিয়া যাইবে, তিন জায়গাতেই পূজা দিয়া তিনটা বলিদান করিও।"

টাকা তুলিয়া লইয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইতে উদ্যত, পাঁচ সাত পা গিয়াছে, এমন সময়ে পাছু ডাকিয়া সাধুচরণ বলিল, "আর দেখ, ঢাকার সোণার মিস্ত্রীরা খুব ভাল ভাল গহনা গড়ে, দাদার গহনা-পত্র যে লোকটা জোগায়, তাহাকে একবার আমার কাছে ডাকিয়া দিও, একজন কাপড়ওয়ালাকে।"

ব্রাহ্মণ আবার পাঁচ সাত পা গিয়াছে, সাধুচরণ আবার পাছু ডাকিয়া, রুমালের আর এক খুঁট খুলিয়া আর দুটী টাকা বাহির করিল, আমোদ করিয়া কহিল, "আর দেখ, তোমরা পরিশ্রম করিবে, এই দুটী টাকা তোমাদের দু'জনের বক্সিস্। তোমার একটি, বেহারার একটি। বক্সিস দিলাম, দাদাকে বলিও না, রাগ করিবেন।" টাকা দুটী ঝনাৎ করিয়া বিছানায় পড়িল, ব্রাহ্মণ খুসী হইয়া কুড়াইয়া লইল। সাধুচরণ ব্যাগের চাবি বন্দ করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, সর্ব্বাঙ্গ বাঁকাইয়া, মস্ত একটা হাই তুলিল। ব্রাহ্মণ পাঁঠা কিনিতে গেল। একজন মুটেকে ডাকিবার হুকুম পাইয়া বেহারাও বাহির হইল। দাদার বিলাতী কুকুর এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এখন একজন অপরিচিত লোক একাকী দেখিয়া, কেমন এক প্রকার সন্দেহের ডাক ডাকিতে আরম্ভ করিল। চুমকুড়ি দিয়া, আদর করিয়া, সাধুচরণ বার বার থামিতে বলিল, কুকুর থামিল না।

স্বর্ণকার আসিয়া উপস্থিত। সাধুচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহের কন্যার সর্ব্বালঙ্কার একসুট তোমার কাছে প্রস্তুত আছে?" স্বর্ণকার বলিল, "কি রকম সুট দরকার?" সাধু বলিল, "সিঁতি, মুকুট, চিক, কাণ, সাতনর, সোণার চন্দ্রহার, যে সুটে মানায়, সেই রকম। বিবাহের গহনা বলিয়া আমি কম দামের চাহি না, ঢাকার গহনা বলিয়া লোকের কাছে প্রশংসা হয়, তাহাই আমি চাই। টাকা যত লাগে, কুচপরওয়া নাই।"

স্বর্ণকার গহনা আনিতে গেল, তন্তুবায় আসিল। সাধুচরণ তাহাকে বলিল, "বরের ধুতি, চাদর যত সরেশ হইতে পারে, একজোড়া, মেয়ের সাড়ি একখানি যত ভাল হয় আনিয়া নমুনা দেখাও, দামের জন্য কসা-কশি হইবে না; দাদা যাহা বলিয়া দিবেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ নগদ পাইবে। যাও, আন।"

তন্তুবায় নমুনা আনিতে গেল, গহনা লইয়া স্বর্ণকার আসিল। পছন্দ করিয়া তারিফ করিয়া, সাধুচরণ বলিল, "দাদা আসুন, দর দস্তুর ঠিক হইবে। তোমার পড়তার উপর শতকরা দশটাকা আমি বেশী দিব। সব জিনিষগুলির মুনফা ছাড়া পড়তা কত?" স্বর্ণকার বলিল, "দুই হাজার সাতশত টাকা।" সাধু বলিল, "বেশ। কি কি জিনিষ আমার কাছে জাঁকড়ে রহিল, একটা ফর্দ্দ করিয়া লও, আমি দস্তখত করিয়া দিই।" স্বর্ণকার বলিল, "না হুজুর, রসিদ দরকার নাই, বাবু আমাদের মা বাপ, স্বচ্ছন্দে রাখুন।" সাধুচরণ তাহা শুনিল না, একখানা ফর্দ্দ লিখিয়া দস্তখত করিয়া দিল। সন্ধ্যার পর আসিবে, এইরূপ কথা। স্বর্ণকার বিদায় হইল। একটু পরে বস্ত্র লইয়া তন্তুবায় আসিল, তাহার সঙ্গেও ঐরূপ বন্দোবস্ত, বস্ত্রের মূল্য ১৫০৲ টাকা।

পাঁঠা তিনটি বলিদান করিয়া পাচক ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত হইল। বেহারা তখনও মুটে ডাকিয়া ফিরিয়া আইসে নাই। ব্রাহ্মণকে নিকটে বসাইয়া, সাধুচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার ভাল ভাল বাছা বাছা বন্ধু ক-জন হইবে?" একটু চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "কমবেশ কুড়ি জন।" সাধুচরণ বলিল, "বেশ। আচ্ছা যাও, সেই কুড়িজনের বাসায় বাসায় নিমন্ত্রণ দিয়া আইস, রাত্রিকালে ভোজন।"

আদেশ মত নিমন্ত্রণ করিতে ব্রাহ্মণ বাহির হইল। সেই সময় বেহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মুটে এখন পাওয়া গেল না, একটু বেলা পড়িলে আনিব।" সাধু বলিল, "আচ্ছা, কাজ নাই, তুমি আর এক কাজ কর। বাজার হইতে ঘি মসলা, দধি সন্দেশ, যাহা যাহা আনিতে হয়, এই বেলা লইয়া আইস।" এই বলিয়া বেহারার হস্তে আর পাঁচটি টাকা দিল, বেহারা বাজারে গেল। বাসায় "সাধু" ছাড়া আর কেহই রহিল না।

বেলা তিনটা বাজিতে ১০ মিনিট দেরি। সাধুচরণ অস্থির হইল। এক ঘণ্টা পরেই দাদা আসিবেন, মৎলব খাটিবে না, এই ভাবিয়া সাধুচরণ

সেই অবকাশে চুপি চুপি গহনাগুলি আর কাপড়গুলি লইয়া প্রস্থান করিল। শূন্য ব্যাগটা বালিসের কাছে পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর মুন্সেফ বাবু বাসায় আসিয়া দেখিলেন, রন্ধনকার্য্যের ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" ব্রাহ্মণ বলিল, "ছোট বাবু আসিয়াছেন, বাবুদের বাসায় বাসায় নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ছোট বাবু হুজুরের ছোট ভাই।"

অঘোর বাবুর চিন্তা উপস্থিত। তাঁহার সহোদর ভাই কেহই ছিল না, তবে এ ছোট বাবু কে? জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বাবু কোথায়?" "বোধ হয় বেড়াইতে গিয়াছেন।" হয়ত তবে অন্য কোন সম্পর্কীয় ভাই হইবে, বিদেশ হইতে আসিয়াছে দেখিলেই চিনিতে পারিব, এই ভাবিয়া অঘোর বাবু তখন কাপড় ছাড়িলেন, হাত মুখ ধুইলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, নিমন্ত্রিত বাবুরা একে একে আসিতে লাগিলেন। রাত্রি ৯টা বাজিল, দশটা বাজিল, ছোট বাবু ফিরিলেন না; এগারটা বাজে, তবুও না, ১২ টা বাজিয়া গেল, ছোট বাবুর দেখা নাই। ক্রমে সকলে সন্দেহ করিতে লাগিলেন, ব্যাগের চাবি ভাঙ্গিয়া দেখা হইল, ব্যাগের গর্ভে কেবল একখানা ছেঁড়া গামছা রহিয়াছে, আর কিছুই না।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, ছোট বাবু ফিরিলেন না। সাব্যস্ত হইল, জুয়াচোর। স্বর্ণকারের তিন হাজার টাকা, তন্তুবায়ের দেড়শত টাকা অঘোর বাবুকে দণ্ড দিতে হইল।

লোকে কথায় বলে, দাদার ভাই। গুণাংশে অথবা দোষাংশে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেই ঐ কথা খাটে। এখানে যে লোকটা 'দাদার ভাই' সাজিয়া দাদা বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে দাদার বাস্তবিক কোন সম্পর্কই ছিল না, সুতরাং 'দাদার ভাই' কথাটা কিছুতেই খাটিল না। অঘোর বাবু অকপট ধার্ম্মিক লোক, ছোট বাবু জাল। ফল হইল, ধার্ম্মিকের গুণগার, জুয়াচোরের অর্থলাভ।

বাজার কেমন ?

রমানাথ সিংহ একজন সমাজ-সংস্কারক ধর্ম্মনীতি-প্রচারক। তিনি ষড়দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন, কাব্য ইতিহাসেও তাঁহার অধিকার ছিল। বঙ্গের ত্রিকালীন সামাজিক অবস্থার বিষয় তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন। ত্রিকালীন অবস্থার ব্যাখ্যা এইরূপ যে, আর্য্য-রাজত্বের অবস্থা, যবন-রাজত্বের অবস্থা এবং ইংরাজ-রাজত্বের অবস্থা। দিন দিন হিন্দু-সমাজের উন্নতি হইতেছে, এইটি যাঁহাদের সিদ্ধান্ত, তাঁহাদের মতের সহিত রমানাথ পণ্ডিতের মতের ঐক্য হইত না।

একবার রমানাথের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল যে, সমাজ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন ব্যবসায়ে যাঁহারা পরিলিপ্ত, সমাজের উপকারী বলিয়া যাঁহারা গণনীয়, তাঁহাদের মনোভাব একে—একে এক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। দেখিয়াও ছিলেন। পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত ফলাফলগুলি অগ্ন আমরা নাটকের প্রণালীতে গ্রন্থন করিয়া পাঠক মহাশয়কে উপহার দিব।

প্রথমে একজন চিকিৎসকের সহিত রমানাথের সাক্ষাৎ। অপরিচিত চিকিৎসক নহেন, অন্যূন ষোড়শবর্ষের আলাপ। প্রশ্ন উত্তর যেরূপ হইয়াছিল, নিম্নে তাহা দর্শন করুন।

রমানাথ।—ডাক্তার মহাশয়! আজকাল চলিতেছে কেমন, বাজারের অবস্থা কেমন ?

চিকিৎসক।—বাজার বড়ই মন্দা। মান বজায় রাখিয়া চলা ভার।

রমানাথ।—কেন ? লোকের ব্যামো শ্যামো কি বড় কম ?

চিকি।—আরে ছ্যাঃ! একেবারেই কম। মাসের মধ্যে পাঁচটা কল আইসে না; ঔষধ-বিক্রয় এককালে বন্ধ বলিলেই হয়। গাড়ী ঘোড়া, পাল্কীবেহারা দূরের কথা, স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার চলা ভার।

রমা।—সে কি! ইংরাজী সভ্যতার আগমনে, নিত্য নিত্য নূতন রোগের আবির্ভাব। তবে কেন আপনাদের এমন দুর্দ্দশা ঘটে ?

চিকি।—ঘটে কপালে। কেবল আমাদের নয়, কবিরাজ, হাকীম, অবধোত, রোজা, হাতুড়ে, গো-বৈদ্য সকলেরই সমান অবস্থা। রোগ বাড়িতেছে, রোগ বিশেষের জোগাড়যোগ বাড়িতেছে, নূতন নূতন ঔষধ

বাড়িতেছে, এ সব কথা সত্য, কিন্তু এই অপয়া ব্যবসা যাহাদের অবলম্বন, তাহারা ত, সকলেই এখন ঘরে বসিয়া কাঁদে।

বেলা দুইপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, দুই প্রহরের পর আর প্রায় অর্দ্ধ প্রহর অতীত হইয়া গেল, আর বেশীকথা বলিবার অবসর হইল না, একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া রমানাথ বলিলেন, "আপনার স্নান আহারের সময় উত্তীর্ণ হইল, আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক।" কবিরাজ বিদায় হইলেন। পুনরায় এক নিশ্বাস ফেলিয়া রমানাথ আপনা আপনি ভাবিতে লাগিলেন। কি বিভ্রাট! এই শ্রেণীর লোকেরা সমাজের উপকারী বন্ধু, রোগ হইলে ইহাঁরা আরাম করেন, সমাজের মঙ্গলকামনায় ইহাঁদের ধর্ম্মত ব্রত, কিন্তু বেশ! টাকার লোভে ইহাঁরা কেবল সমাজের লোকের বেশী বেশী রোগ কামনা করিয়া থাকেন। ধিক্ চিকিৎসার মুখে, ধিক্ উন্নতির মুখে।

চিকিৎসাব্যবসায়ের ভাব পরিগ্রহ করিয়া, তিন দিন পরে রমানাথ একজন পুলিশের দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইল।

রমা।—কি গো দারগা বাবু! বাজার এখন কেমন?

দারোগা। ভারী মন্দা, ভারী মন্দা!

রমা।—সে আবার কিরূপ? রাজার কার্য্যে বাজার মন্দা, সে আবার কেমন?

দারোগা।—সরকারি কথা বলিতে নাই, আপনি আমার পরম বিশ্বাসী বন্ধু, আপনাকে বলি, সব ঠাণ্ডা—সব ঠাণ্ডা! একটা ভাল রকম ডাকাতি নাই, খুন নাই, বলাৎকার নাই; জলেডোবা নাই, সাপে কাটা নাই, এমন কি—ছোট খাটো দুই একটা সিঁদ চুরি নাই, গলায় দড়ি পর্য্যন্ত নাই।

এই লোকটিকেও রমানাথ পণ্ডিত শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিলেন, বিদায়ের পর শিহরিয়া উঠিয়া রমানাথ ভাবিলেন, "বাবা! সব একাকার!"

সংবাদপত্রের সম্পাদককে দেশের প্রণালীমত প্রশ্ন হইল, "বাজার কেমন?"—সম্পাদক উত্তর দিলেন, "ভাল নয়। বড়ই ডল সিজন!

রমা।—কোন্ সময় হইলে তোমাদের ভাল সিজন পড়ে?

সম্পা।—ইয়ে, ইয়ে, ইয়ে, একটা কোন বড় ঘটনা কিংবা নূতন ঘটনা হইলেই সংবাদপত্রের বক্ষপুরণের নূতন সামগ্রী অনেক পাওয়া যায়।

রমানাথ।—ওটা তোমাদের মনের কথা নয়। গৃহাশ্রমী না হইয়াও আমি দুই তিন ভাষার সংবাদপত্র পাঠ করি। ভাল করিয়া দেখিয়াছি, তোমরা ভালবাস কেবল স্বদেশের বিপদ আর বিদেশের যুদ্ধ। তন্ন তন্ন করিয়া দাগ দিয়া রাখিয়াছি, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে তোমাদের বড় ঘটা, দেশব্যাপী মারীভয়ে তোমাদের কাগজের ভারী চটক হয়; জলপ্লাবনে, ঝটিকায়, অভাগার গৃহদাহে, বড় বড় খুনী মামলায় তোমাদের কাগজে বেশী শোভা হয়, ঐগুলই যেন তোমরা চাও, না পাইলেই ডল সিজন। ইহাতেই সপ্রমাণ, তোমরা কেবল বেশীর ভাগে দেশের বিপদ বেশী কামনা কর, মঙ্গল চাও না! ওঃ, আগে আমাদের জ্ঞান ছিল, সম্পাদক স্বদেশের বন্ধু, সম্পাদক স্বদেশের প্রতিনিধি, সম্পাদক স্বদেশের মঙ্গল কামনা করেন, বিষম ভ্রম ছিল, প্রত্যক্ষে বিপরীত। দেশের বিপদে তোমরা রাগরঞ্জন দিয়া যত সুন্দর সুন্দর রচনা প্রচার কর, উৎসবে তাহার শতাংশও কর না। তোমার সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব প্রণয় ছিল, এখনকার ভাব বুঝিয়া তোমার সহিত কথা কহিতেও ভয় হয়, নমস্কার।

রমানাথ বাহির হইলেন, সেই দিনেই সংকীর্ত্তনাদি চার পাঁচটি শ্রেণীর পরীক্ষা লইলেন। ফল পাইলেন, সমাজের অমঙ্গলাভিলাষী সকলেই, মীমাংসা ভাল লাগিল না। স্থির করিবার জন্য অবশেষে তিনি যাত্রা কবি খেমটা বাইজী কীর্ত্তনী প্রভৃতির আলয়ে গতিবিধি আরম্ভ করিলেন, অল্প অল্প মিশিতেও লাগিলেন, মন পাইলেন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল ইহারই উৎসব চায়, পূজা পার্ব্বণাদিতে উৎসব না হইলে উহাদিগকে ডাকে না।

রমানাথ পণ্ডিতের এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল; কিন্তু একাংশ তিনি ত্যাগ করিয়াছেন, এক দল মঙ্গল চায়, একদল অমঙ্গল চায়, ইহা ভাল নহে, রমানাথ পণ্ডিতের এই মত, কিন্তু তিনি দুই শ্রেণীর স্বতন্ত্র থাকার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করেন নাই। ঘটনা এমন অনেক হইয়াছে, শান্তিরক্ষা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত, শান্তি রক্ষা ত হয় না, যদি দৈবাৎ দুই একদিন অশান্তির কিছু বিরাম হয়, তাহা হইলে দারোগাদের বুক ফাটিয়া যায়, চুরি ডাকাইতি কম হইলেই শান্তিরক্ষকের বাজার মন্দা। কেন মন্দা, অপক্ষপাতে সে কথাটিও বলিতে হয়,—সঙ্গিন সঙ্গিন ঘটনা উপস্থিত না হইলে পুলিশের লোকের কার্য্য থাকে না,

খুনী ডাকাইতির তদন্ত,—অপঘাত মৃত্যুর তদন্ত,—সতীত্ব ভঙ্গের তদন্ত, এ সকল বিশেষ বিশেষ তদন্তকার্য্যে লিপ্ত হওয়া হয় না, বেতন দিয়া যাঁহারা প্রতিপালন করে, সেই নিরীহ গ্রামবাসীর উপর উৎপীড়ন করা হয় না, দস্তুর মত কার্য্যও হয় না। হায়! এই পুলিশ আমাদের উপকারী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, শান্তিরক্ষক বন্ধু। ইহাঁরা খুন, জখম, চুরি, ডাকাইতি, দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি বড় বড় অপরাধের বাহুল্য কামনা করেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শান্তিরক্ষকের কার্য্যই এই বটে!

চিকিৎসক স্বদেশীয় লোকের মন্দাভিলাষী, পুলিশও প্রতিপালক পল্লী-বাসীর অমঙ্গলাভিলাষী, ইহা বুঝিয়া লইয়া, রমানাথ আর একদিন আর একস্থানে একজন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাকেও প্রশ্ন দেওয়া হয়, "বাজার কেমন চলিতেছে?" অধ্যাপক উত্তর দিলেন, "বড়ই নরম।" ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে ধর্ম্মকর্ম্মে, পূজা-পার্ব্বনে শ্রাদ্ধ শান্তিতে অনেক লোকের অরুচি জন্মিয়াছে, অনেকেই ডাকে না। গোটাকতক লোক মরিলে শ্রাদ্ধ-সভায় কিছু কিছু বিদায় পাই, আজকাল তারাও প্রায় মরে না।"

এ পাগলের সঙ্গেও রমানাথ বেশী কথা কহিলেন না, মনে বুঝিলেন, দেশের বড় লোকের মৃত্যু-কামনা করাই তাঁহাদের উচ্চ উপাধি ধারণের প্রধান হেতু। সমাজের মঙ্গলকামনা তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবেন না, এই কারণে চাষালোকেও বলে, পণ্ডিতেরা পাগল।

তিন শ্রেণীর এক শ্রেণীকেও রমানাথ সমাজের মঙ্গলাভিলাষী দেখিলেন না, সমাচার পত্রের সম্পাদকদলের চিত্ত একবার পরীক্ষা করিতে তাহার সাধ হইল; একটি নির্জ্জন উদ্যানে তিনি একদিন একজন সুবিজ্ঞ সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

দুর্গার প্রতি বৈষ্ণবের দ্বিধামত। যাঁহারা দুর্গা পূজা করেন, তাঁহাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিলে কিম্বা দুর্গা পূজায় ঢাক ঢোলের সঙ্গে খোল করতাল বাজাইলে বৈষ্ণবের পাপ হয় না। যাঁহারা কেবল অকল্যান কামনা করেন, কল্যানকামীদিগের সহিত তাঁহারা যদি মিলিয়া মিশিয়া চলেন, তাহা হইলে দুই দিক রক্ষা হয়; দেশের উপকারেও মন টানে, আপনাদের ব্যবসাগুলিও বেশ চলে।

রমানাথ এখানে একটি ভ্রম সংশোধন করিলেন। উকীল মোক্তারের

সহিত দেখা করিতে ভুল হইয়াছিল, দুই দিন দুইজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্তরস্থ প্রশ্নের উত্তর লইলেন। উভয়েই বলিলেন, "বাজার বড় মন্দা! মোকদ্দমা কম!" রমানাথ বুঝিলেন, দেশের লোক উৎসন্ন যাইতেছে না; জাল মোকদ্দমা, ফিরিবী মোকদ্দমা, মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু হইতেছে না, সেই জন্য উকীল মোক্তারের বাজার মন্দা।

যে সময়ের কথা, সে সময় এদেশে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ছিল না, রমানাথ তাঁহাদিগকে দেখেন নাই, দেখিলে ভাবিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় উকীল মোক্তারেরা ছোট ছোট পুঁটিমাছ।

রমানাথ বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার দেখেন নাই, না দেখুন, যাহা দেখিলেন; তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল। তিনি বুঝিলেন, সংসারে সংসারী-লোকেরা সংসারীলোকের মঙ্গল কম চায়, অমঙ্গল বেশী চায়; বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়াবলম্বি লোকেরা নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থপর; সংসারে সর্ব্বনাশ হউক, আমার টাকা হউক্, ইহাই অনেকের আকাঙ্ক্ষা। রোমনগরে আগুন দিবার হুকুম দিয়া রোমীয় সম্রাট নিরো এক স্তম্ভের উপর বসিয়া বাঁশী বাজাইয়াছিলেন। সাধারণ লোকে বলে, "হতভাগার ঘর পোড়ে, ফিঙে বোসে ধোঁয়া খায়।" এই ত সংসার, এ সংসারে থাকিতে নাই। ইহা ভাবিয়া সংসার আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পণ্ডিত রমানাথ সিংহ মনের ঘৃণায় বনবাসী হইয়াছিলেন।

সমালোচনা।

গান।—(প্রথম উচ্ছ্বাস) শ্রীবিহারীলাল সরকার বিরচিত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। "বিদ্যাসাগর", "ইংরাজের জয়", "শকুন্তলা-রহস্য" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্র,—"বঙ্গবাসীর" সুযোগ্য সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারী বাবুর নাম ও প্রতিভাদির পরিচয় বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠকগণের প্রায় সকলেই অবগত আছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিহারী বাবুর আসন অচল। রচনা-প্রণালী, ভাব এবং ভাষা সুন্দর ও মনোহর করিয়া ইতিহাস-সঙ্কলনে তাঁহার অসাধারণ শক্তি! তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থই আমাদের এ কথার সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সম্প্রতি "গান" রাশি নামকরণে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা প্রত্যেক গান মনোযোগ সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। কবির প্রাণ উচ্চ

মহান্ ও পবিত্র ; প্রত্যেক গীতই ধর্ম্মভাবে সমুজ্জ্বল ; যেন এক করুণ রসেই প্লাবিত। প্রত্যেক গীতের এক ছত্র পাঠ করিয়া গীতটী সম্পূর্ণ না করিলে প্রাণ যেন অস্থির হইয়া উঠে। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত শ্যামা-সঙ্গীতের একটীমাত্র গান উদ্ধৃত করিলাম :—

ইমন্-ভূপালী—একতালা।

ঐ শ্যামা মা মোর উলঙ্গিনী।
মায়ের লাজ কি বল, মা যে আমার বিশ্বপ্রসবিনী॥
আত্মপর-ভেদজ্ঞান যার,
থাকে প্রাণে নিত্য অনিবার,
লাজ-বাস চাই গো তার,
মা যে আমার সর্ব্বাত্মশায়িনী।
ঐ অনন্ত অসীম কায়, বসন পরাবে কোথায়,
মাকে কি বসনে কুলায় ?
মা যে আমার অনন্তরূপিণী।
নিত্য সিদ্ধ নির্ব্বিকার, মুক্ত পুরুষ উদার,
ফেলে বাসনা বসনভার,
আমার মা যে তার মুক্তিদায়িনী॥

* * * *

অতি প্রাচীন কাল হইতে সৎসাহিত্যসেবী সুলেখকমাত্রকেই সংগীত-রচনায় অনুরাগী দেখা যাইত। সেক্সপিয়র মিল্টনের কথা ছাড়িয়া দিন, আমাদের কবিগুরু বাল্মীকি সঙ্গীত-নৈপুণ্যে লবকুশকে সুললিত সুমধুর রামায়ণ গান শিখাইয়াছিলেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ইত্যাদি মহাপুরুষগণ সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসাদিতে সঙ্গীত-রচনায় সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান সুকবি রবীন্দ্রনাথ গীত-রচনায় ও গীত-গানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। এতদিন পরে বিহারী বাবু সঙ্গীত-রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। "গান" পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব, সুরুচিসঙ্গত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে গীত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। বিহারী বাবুর এই অমূল্য ধন সোণায় মুড়িয়া রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভক্তিনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবীর জিহ্বায় বিহারী বাবুর গানগুলি প্রতিধ্বনিত হইলে আমরা বুঝিব যে, মাণিক্য-খচিত সুবর্ণ-পাত্রে রাখা হইল।

১০ম বর্ষ সম্পূর্ণ।